

# গীত-বাদ্যম্

( ১ম খণ্ড )

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ

দিল্লী ও কলিকাতা বেতার কেন্দ্র এবং ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান অর্কেস্ট্রার  
বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিভিন্ন সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষক ও শিক্ষক ।

প্রকাশক :

প্রতাপনারায়ণ ঘোষ, বি. কম.,

১২৩/১-এ শিশির ভাঙ্গুড়ী সরণী

( মানিকতলা স্ট্রীট )

কলিকাতা—৭০০০০৬

ফোন—৩৫-৬০২৬

প্রচ্ছদপট পরিচালনা ও নির্দেশনা : গ্রন্থকার

শিল্পী : শুভময় দর

ব্লক নির্মাণে :

মেসার্স ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং

মেসার্স দাস ব্রাদার্স, গরানহাটা

মুদ্রক :

কালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬, চালতাবাগান লেন

কলিকাতা—৭০০০০৬

চৈতন্য সৰ্বভূতানাং বিবৃতং জগদানুনা ।  
নাদব্রহ্মচিদানন্দমদ্বিভীয়মুপাশ্রয়ে ॥

পরম পূজনীয়া পরমারাধ্যা

শ্ৰীশ্ৰীমাতা আনন্দমহীৰ

অশীতিতম শুভ জন্ম-জয়ন্তীর পুণ্যাহে প্রকাশিত ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ২৮শে মে, ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

অনাদি অনন্ত নাদ প্রণব আকারে  
ধ্বনিক্রমে রয় সদা জীবের অন্তরে,  
অপার করুণা তাঁর বিচিত্র মনন  
নাদ হতে সঙ্গীত তিনি করেন সৃজন  
তাঁহার উদ্দেশে জানাই অসংখ্য প্রণাম  
রচিলু “গীত-বাণম্”, যেন হই সিদ্ধকাম ॥

প্রস্তুকার

প্রাপ্তিস্থান :

মেসার্স দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন- ৩৪-৩৮৭৫, ৩৪-৬৫৪৭

**Firma K. L. Mukhopadhy**

**Publishers and Distributors**

**257B, Bipin Behari Ganguly Street**

**Calcutta-12**

মেসার্স এস চন্দ্র এণ্ড কোং, বাণ্যমল্ল ও সঙ্গীত পুস্তক বিক্রেতা

৪, রফিক আহমেদ কিদোয়াই রোড

কলিকাতা-১৩, ফোন- ২৪-৬৬২৩

মেসার্স কানাইলাল এণ্ড ব্রাদার্স

বাণ্যমল্ল নির্মাতা

৩৭৭, আপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা-৪

সঙ্গীত-কার্যালয় হাথরাস, ইউ. পি.

## উৎসর্গ

বর্তমান ভারতের অভিজাত সঙ্গীত যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রচারিত, প্রসারিত ও আলোচিত হয়েছিল এবং যাঁদের প্রয়াসে সর্বপ্রথম অধুনিক ভারতীয় স্বরলিপি উদ্ভাবিত হয়েছিল ও শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দুই পথিকৃৎ সঙ্গীত-গুণাকর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং রাজা স্মর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশে গীত বাণ্যম্ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে ধন্য হলাম ।



## সঙ্গীত-সাহস্রতদের অভিমত

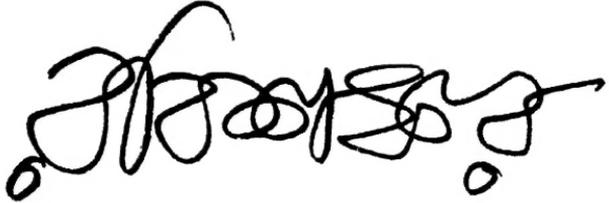
I am very impressed reading the manuscript of "Geet Vadyam" by Shri Lakshmi Narayan Ghosh. A book of such nature was very much needed.

It has materials not only for student of music but also many enlightening things for musicians such as myself. I am sure that this book will meet with the success it deserves.



শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ রুত "গীতবাগম"-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।  
এ ধরণের একটি পুস্তকের অভ্যাস প্রয়োজন ছিল।

সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের উপযোগী বিষয়বস্তুই শুধু পরিবেশিত হয়নি—আমার মত  
সঙ্গীতশিল্পীরাও এতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পানেন। আমি নিশ্চিত যে এ পুস্তক  
নিজ গুণে সাধারণ্যে সমাদৃত হবে।



১৪/৩/১৯৭৫

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ প্রণীত একটি সঙ্গীতপুস্তক আমার হাতে এনেছে যা পাঠ করে আমি পুস্তকটির প্রশংসা না করে পারিনি। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু এই গ্রন্থটির পিছনে অনেক পরিশ্রম, চিন্তা, বিচার ও গবেষণা করে তবে এর মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন সন্দেহ নাই। সঙ্গীতবিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য ও তথ্যপূর্ণ এই বইটি সঙ্গীতরসিক, শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসুদের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এই পুস্তকে যে যে বিষয়ের উত্থাপন ও উদ্ধৃতি আছে তার কিছু কিছু হচ্ছে : সঙ্গীতের বহু বিষয়ের প্রাচীন ইতিহাস; স্বরলিপির বিবর্তনের কথা; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে অগ্গাণ্ড বহু প্রকারের সঙ্গীত-শৈলী এবং বিভিন্ন ঘরাণার কথা; নানা বাণ্যধর্মের ছবিসহ বিবরণ ইত্যাদি।

এতগুলি বিষয়সম্বন্ধিত কোন সঙ্গীত পুস্তক আমার চোখে এর আগে পড়িনি। আমার আশা এই পুস্তকের সরাবণার আমাদের দেশের স্বপীজন করবেন। লক্ষ্মীনারায়ণবাবুকে আমার দহবাদ জানাচ্ছি।

জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

'হেমচায়া', আইরন সাইড রোড  
কলিকাতা

স্বা-গবেষক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ মহাশয় প্রণীত "সীত-বাণ্য" গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেপবার সুযোগ আমার হয়েছে। এটিকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কোমগ্রন্থ বলা যায়। আমাদের দেশে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় কোমগ্রন্থের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, অথচ নানা প্রয়োজনে এই পরণের গ্রন্থ থাকা একান্ত আবশ্যক। পূর্বরচিত অল্প কয়েকটি গ্রন্থ পাকলেও এইকপ প্রচেষ্টা যত ব্যাপকতর হয় ততই ভাল। আমাদের সঙ্গীতে বহু শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে বহুশব্দ আজ অপ্রচলিত, বহু শব্দের ব্যাখ্যা এক পাকলেও অর্ধের পরিবর্তন ঘটেছে এবং বহু আকৃতি ও প্রকৃতির নবতর সংযোজন ঘটেছে। এই সমস্ত বিষয়ের পরিচিতি থাকলে ইতিহাস অবিকৃত থাকবে এবং পরবর্তী গবেষক ও জিজ্ঞাসুরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। গ্রন্থকার সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে আমাদের সঙ্গীতের প্রতিটি বিভাগের প্রচলিত, অপ্রচলিত শব্দসমূহের সংজ্ঞা ও পরিমিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আবশ্যক বোধে বহু চিত্র ও তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইচ্ছা করলে এই গ্রন্থের পরিধি বিপুলতর

করা যেত কিন্তু যাতে সহজে ব্যবহার করা যায়, এর জন্য তিনি অতিবিস্তৃতির দিকে যান নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব সঙ্গতিতে তিনি এতখানি ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র তাঁর মত অক্লান্ত নিবেদিত-প্রাণ বিদ্বজ্জন ব্যতীত আর কেহই এতবড় দায়িত্বভার বহন করতে আন্তরিক প্রেরণা পাবেন না। এই যে বিপুল সহায়তা তিনি স্বয়ংপ্রণোদিত হয়ে আমাদের দেশকে প্রদান করলেন, এর অন্তর্নিহিত মহত্বই তাঁকে পুরস্কৃত ও গৌরবান্বিত করবে এবং আমাদের সঙ্গীতসাহিত্যে ও বিজ্ঞানে তিনি অমরীয়া হয়ে থাকবেন। এই সম্বন্ধে প্রচেষ্টায় আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাতে পেরে সখী হলুম।

### শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

১/১এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট  
কলিকাতা

পরম শ্রীভিভাজন শ্রীলক্ষ্মণনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা "গীত-বাণী" এর পাণ্ডুলিপি খানিকটা উন্টে পাল্টে দেগেই উপলব্ধি করেছিলুম যে বাংলা ভাষায় লেখা এ ধরনের পুস্তক হাঁদে পড়েনি। শেষ পর্যন্ত পড়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় চত্রে চত্রে রয়েছে।

ভারতীয় যন্ত্রবাদের ও বাণীত্বের ক্রমবিবর্তনের বয়স নেহাৎ কম নয়। বাণীত্বের সংখ্যাও প্রচুর। তাই বাদনশৈলী সংক্রান্ত ও অগাঢ় বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দ অসংখ্য। এই পরিভাষা বা Terminology-র তিনি বর্গীকরণ করে একটি সঙ্গীতকোষ কবেছেন। এতে গীতবিভাগকে তিনি বর্জন করেন নি বা কোন বিশেষ বিভাগের প্রতি পক্ষপাত দেখান নি। নাদ থেকে আরম্ভ করে সঙ্গীতের নামা পরিভাষার বিশেষ পরিচয়, চন্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, রাগের সময়, রাগের রসের বিচার, স্বরলিপির ইতিহাস, আলাপ, বাণী, ঘরাণা প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা; নিবদগীতে-ক্রম, ধামার, খেয়াল, ঝুঁরী, টপ্পা, গজল থেকে শুরু করে বহুপ্রকার গীতশৈলীর ব্যাখ্যা; বাউল, ভাটিয়ানী, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন ইত্যাদি উভয় বাংলার বহুপ্রকার পল্লীগীতের পরিচয়; রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি স্বরকারের রচনার বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পুস্তকটির বেশ খানিকটা জুড় রয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর

ଭାରତର ବହୁପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାନ୍ତ ଓ ଦେଶଜ ବାଞ୍ଛ୍ୟତ୍ତ୍ୱର ସଚିତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ । ସଫ୍ଟଜେଇ ଅନୁମାନ କରା যায় যে এই পুস্তକ ଯେ କୌଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯାହା ଉପପତ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଚେଷ୍ଟା କରବେନ, ତାର ପক্ষে “ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୁସ୍ତକ” ହିସାବେ ଅବଶ୍ୟ ସଂଗୃହୀତବ୍ୟ ହବେ ।

ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀସୋମେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ବିଷୟେ ଧାନିବଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରନ୍ତି । ତିନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଡେରା ବୈଦେହ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବାଞ୍ଛ୍ୟ ଉଚ୍ଚାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୌରପୁର ଭବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଂସୁର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରକିଶୋର ରାୟଚୌଧୁରୀ ଓ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀବୀରେନ୍ଦ୍ରକିଶୋର ତାର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ । ତାହାର କାଳେ ତିନି ଉପପତ୍ତକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉପପତ୍ତକର ତାଲିମି ପେରେଇନ । ତାର ଅନ୍ତରାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ଭାରତବିଧାତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଚ୍ଚାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଧାରୀ, ଧ୍ୟାତନାମା ସେତାରୀ ଶ୍ରୀବିଜୟ ଦାସ ପାକଡ଼େର ନାମ ବିଶେଷତାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏତଦ୍ୱାରା ତିନି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୋଷଧିକାରୀ ଡା: ବିମଳ ଦାସ ମହାଶୟର କାଳେ ଓ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଓ ଉପପତ୍ତକ ବିଷୟର ତାଲିମି ପେରେଇନ । ତାର ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକମାଧ୍ୟମେ ତିନି ପାଠକର ସାମନେ ଧରେଇନ ।

ଏ ପୁସ୍ତକଟିର ଭାଷାଗତ ଅଭିନବତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରାଧେ । ପ୍ରାବନ୍ଧିକତ୍ତ୍ୱର ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ଶୁକ୍ଳଗର୍ଭର ହସ୍ତେ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶଃ ତା ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତାର ବାଧିରେ ଚଳେ ଯାଏ । ଶ୍ରୀସୋମେର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଶୁକ୍ଳ ଗର୍ଭର ହଲେ ତିନି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଓ ଅପମାୟା କରେ ପ୍ରାୟ ବିନୋଦନସାଧିତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ୍ଲ କରେଇନ । ଫଳେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୋଷଧିକାରୀ ଯେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହବେନ, ତେମାନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାଠକ ଓ ପ୍ରଗ୍ରହଣେ ବାଧିତ ହବେନ ନା । ଆମି ପୁସ୍ତକଟିର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କାମନା କରା ।

ଅଜୟ ସିଂହରାୟ

୧୮/୬/୫୫ ଫର୍ମ ରୋଡ, କାଲିକାତା-୧୨

ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘୋଷ ‘ଶିତ-ବାଞ୍ଛ୍ୟ’ ନାମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରଚନା କରେଇନ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହଲାମ । ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲେଖା ସଫ୍ଟ କାଜ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରା ବସ୍ତିନ କାଜ । ତାହାଲେ ଯେତେ ପାଠକ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧରଣ କଥା ଜାନା ଯାଏ, ଆର ଜାନା ଯାଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା କୌଣ ପଥ ବା ରୀତିକେ ଅଭିମତ କରେ ହସ୍ତେ ।

‘গীত-বাগম্’-গ্রন্থে বিচিত্র সাক্ষাতিক উপাদানের সমাবেশ করা হয়েছে—  
যেগুলি শুধুই ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদেরও অনেক উপকার-সাধন করবে। শ্রীযুক্ত  
লক্ষ্মীকান্তবাবু শব্দতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীতি, যন্ত্রে ব্যবহৃত তার ও তারের দৈর্ঘ্য-বিচার  
ও সঙ্গে সঙ্গে আঙ্কক পদ্ধতিতে কম্পনসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন একটু বিস্তৃতভাবে।  
তার আলোচিত গমক, তান, চন্দ, তাল, কাল, আলাপ ও স্বরলিপি বা স্বরের  
লিখনপদ্ধতির বিবরণ বিশদ হয়েছে ও কিছুটা নূতন চিন্তা ও শৈলীর আশ্রয়গ্রহণ  
করেছে। মতবাদ ও মতভেদ অবশ্য থাকবেই, কেননা নানা মূনির নানা মত।  
কিন্তু তাহলেও তা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানপদ্ধতির দায় অঙ্গসারী হওয়া উচিত। অবশ্য  
লক্ষ্মীকান্তবাবু বেশ সন্তুর্পণে ও সজাগ দৃষ্টি রেখে বিচিত্র মতবাদ-ভেদ এড়িয়ে  
সকল সাক্ষাতিক উপাদানগুলির নূতনভাবে আলোচনা করেছেন।

তার আলোচ্য বিশেষ রূপ নিয়েছে ভারতীয় বাগযন্ত্রগুলির আলোচনার বেলায়।  
তিনি প্রত্যটি বাগযন্ত্রের প্রতিকৃতি দিয়ে তাদের গঠনপ্রণালী ও ব্যবহারের  
বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—যা সঙ্গীতশিক্ষার্থীদেরই উপকারে লাগবে।  
অবশ্য প্রত্যটি বাগযন্ত্রের ঐতিহাসিক সৃষ্টিকথার বিশদ আলোচনা না দিলেও  
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্তবাবু সংক্ষেপে সকলগুলির সারসংকলন করেছেন। প্রাচীন  
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে বা দেবদেউলে, প্রস্তর-প্রাচীরগায়ে ও রেলিং  
প্রভৃতিতে বহু বাগযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ও সেগুলি দেখে প্রাচীন ভারতে  
খ্রীষ্টীয় ভারতীয় সমাজে যে কঠিনসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতের আলোচনা অস্বীকৃত  
হোত তা বুঝা যায় এবং ঐ বাগযন্ত্রগুলির গঠন ও বাদন-পদ্ধতি যে অসম্ভব  
ক্ল্যাসিক্যাল যুগের ভারতীয় সঙ্গীতভাণ্ডারকে সুষমায়িত করেছিল তা স্বীকার  
করতে হয়।

পার্থেয়ে মন্তব্যের অবসরে বলি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্তবাবুর ‘গীত-বাগম্’-গ্রন্থের  
লিখন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটি চিন্তাবৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রবুদ্ধির রূপায়ণ  
দেখা যায় ও সেই রূপায়ণ ও প্রকাশভঙ্গীর আমরা প্রশংসা করি। আশা করি তাঁর  
স্বতন্ত্র ও নূতন চিন্তার অবদানস্বরূপ ‘গীত-বাগম্’ সূধী ও জিজ্ঞাসুসমাজের বিশেষ  
কল্যাণ সাধন করবে।

**স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ**

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের লেখা "গীত-বাচম্" বইটি আত্মপ্রাপ্ত নিরবিচ্ছিন্ন আগ্রহের সঙ্গে পড়ে অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হলো। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু অনেক আয়াস স্বীকার করে বহু পুরাতন ও দুর্লভ পুঁথি ও পুস্তক-পুস্তিকার ভেতরে প্রবেশ করেছেন, অনুশীলন করেছেন এবং যেভাবে নিহিত গুঢ় তথ্য গবেষণার দ্বারা সকলের মনোনিবেশের জন্মে তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছেন সে জন্মে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। উপপত্তিক দিক দিয়ে তিনি সংগীতের উৎপত্তি, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের কথা যেমন সঠিক অথচ সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ কবেছেন তাঁর প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই বইয়ের 'যন্ত্রবিভাগ' অংশের "অবনদ্ধ বা আনন্দজাতীয় যন্ত্র" বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা সত্য সত্যই এক নূতন দিগন্তেব সন্ধান দেয়।

এই বইখানি সংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী, শিক্ষকদের পক্ষে সহায়ক এবং সংগীত-প্রেমিকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে এই কামনা করি।

হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ( হীরুদা )

৬নং বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ২

## অনুরাগ

সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম সত সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ, যথার্থ আকর্ষণ। এই আকর্ষণ ব্যক্তিকে একাগ্র করে, উন্মুগ্ন করে, জ্ঞানবুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগায়, প্রয়োগরীতির সঙ্গে গভীর পরিচিতির তৃষ্ণা বাড়ায়। সেখানে অনুকরণপ্রবৃত্তি স্তম্ভিত হয়, অপরের দৃষ্টি দিয়ে বিচারের ইচ্ছা প্রশমিত হয় : আপন স্বচ্ছ দৃষ্টি, অসীমবিজ্ঞা, জ্ঞান-বোধ-বিচারের সহায়তায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের উন্মুগ্ন আগ্রহ হয়।

শীঘ্রই লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি পদক্ষেপে এই জাগৃত লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ আছে বলেই গ্রন্থখানিকে অনগ্র করবার জন্ম লক্ষ্মীনারায়ণ অদম্য উৎসাহে গ্রন্থে পর গ্রন্থ, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ অনুশীলন করেছেন, এবং নিজ ধ্যানধারণাকে লেখনীমুখে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি : তাঁর এই সংসাহস অভিনন্দনযোগ্য। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আজ পর্যন্ত যিনি যা বলেছেন, লিখেছেন, শিপিয়েছেন তাঁর অতিবিস্তৃত অনেক কিছু অজানিত, তর্কিত,

অম্পষ্ট বিষয়বস্তু তিনি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে, ব্যাখ্যা করে “গীত বাগ্গম্”-কে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। এই কাজে নানা বাধার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ একা যুদ্ধ করেছেন। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করা, লাইব্রেরি, সংগ্রহালয়, পুস্তক-বিক্রয়-কেন্দ্রে নিত্য নিত্য গত্যাত করাকে তিনি পবিত্র কর্ম মনে করেছিলেন; সে ব্যাপারে কোন অসুবিধাকেই লক্ষ্মীনারায়ণ অসুবিধা বলে গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর এই অসুসঙ্কিত্তসা আমাকে চমৎকৃত করেছে।

“গীতবাগ্গম্”-এর বর্তমান খণ্ডটি প্রথম ভাগ। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের নাদ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের যে কোন পরিভাষার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এতে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু আছে শ্রুতি, রাগ-সময়, রাগে রস, স্বরলিপির ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা। আরও এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে “আলাপ” নিয়ে বিস্তৃত চর্চা, “বাণী” নিয়ে বিবেচনা, “ঘরাণা” নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, “নিবন্ধ গীত” প্রকারের সর্বিশেষ পরিচয়, যার মধ্যে কীর্তন, পল্লীগীত, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুলগীতির পরিচয়ও প্রাধান্য লাভ করেছে।

এই গ্রন্থের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য “বাগ্গ” সম্পর্কিত বিবরণ। একখানি পাঠ্য সঙ্গীতগ্রন্থে বাগ্গের এ প্রকার বিশদ বিবেচন অভাবনীয়। তত, অবনন্দ, ঘন, স্বাধর ব্যবয়ে যে বিস্তৃত তথ্য লক্ষ্মীনারায়ণ প্রকাশ করেছেন তাঁর তুলনা মেলা কঠিন। বাগ্গগুলির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বাগ্গগুলির চিত্র সন্নিবেশিত করেছেন, যা বাগ্গযন্ত্রগুলির গঠন সম্পর্কিত অম্পষ্টতা দূরীকরণে সাহায্য করবে।

বাগ্গগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ বহু প্রাপ্য অপ্রাপ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন এবং বহু প্রচলিত ভ্রমাত্মক মতের নিরাকরণ করেছেন। বাগ্গকাণ্ডটি লক্ষ্মীনারায়ণের অধ্যবসায় ও অসুসঙ্কিত্তসার অমূল্য দান।

আমাদের শুভচ্ছা ও কল্যাণকামনা লক্ষ্মীনারায়ণকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করুক এই প্রার্থনা করি।

ডাঃ বিমল রায়, এম. বি.

১৮সি, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন

কলিকাতা-২৬

## পূর্বরাগ (আলাপ)

প্রায় বছর ছয়েক আগে “আশুবঙ্গনী” নাম দিয়ে এশাজ সঙ্কে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বর্তমান কালে অবহেলিত ও হৃতগৌরব এই বাণ্যবস্তুর বিষয় সঙ্গীতপ্রেমী ও অংশীলনকারী সৃষ্টিকর্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উক্ত প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য ছিল। আমার সেই প্রবন্ধটি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা সঙ্গীতের ঔপন্যাসিক বিষয়ের আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে কয়েকজন সঙ্গীতবন্ধু ও আমার কয়েকজন ছাত্র আমাকে সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে এবং ভারতীয় বাণ্যবস্থাদি সঙ্কে বিশদভাবে লিপিতে অনুরোধ জানান। কাজটি দুরূহ, সময়সাপেক্ষ ও গবেষণামূলক এবং আমার মত সতত জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত মানুষের পক্ষে সময় করে এই সব বিষয়ে লেখায় হাত দেওয়া এক অকল্পনীয় ব্যাপার, কিন্তু শুভার্থীগণের ইচ্ছার মূলা দিতেই হল, কারণ এরই মধ্যে অজান্তে কখন ভারতীয় বাণ্যবস্তুর ইতিহাস ও সঙ্গীতের নানা তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দেবার একটা বাসনা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লেখার সময় যে অরুসন্ধান চালিয়েছিলাম তাতে এটা বুলেছিলাম যে ভারতীয় সঙ্গীতের অজানিত ও অকথিত বিষয়সমূহের এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বাণ্যবস্তুর ইতিহাস লেখা কত কঠিন। ভুলভোগী মাত্রেই এ অভিজ্ঞতা আছে। বাণ্যবস্তুর মূহ ও সঙ্গীতের নানা বিষয় সম্পর্কে আয়াসসাপ্য অরুসন্ধানের ফলে যতটুকু জানতে পেরেছি সে সবেই একটি সংক্ষেপিত রূপরেখা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সঙ্গীত সম্পর্কে অতীতে যেসব পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে ও বাণ্যবস্তুর সঙ্কে যে সকল ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ব্যাপকত্ব ও গুরুত্ব ক্ষণ হলেও পূর্বসূরীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই সময়ের বিশেষ চেষ্টা এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলেই সঙ্গীতগানস্বর্চার প্রথম সোণাম রচিত হয়েছিল, যার ওপর আমি সামান্য কিছু রঙের তুলি চালিয়েছি।

সঙ্গীতের ঔপন্যাসিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের জগৎ এখন সাধারণ সঙ্গীতপ্রেমীদের আগ্রহ অদূর অতীতের অবস্থার তুলনায় অনেক বেশী। বিগত যুগে গান গাওয়া বা বাজনা বাজাবার চেষ্টাই ছিল বড় কথা, তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনার ঔৎসুক্য ব্যাপক ছিল না। তখন কোন বিষয় জানা না থাকলে উদ্ভাদের কাছে

ସେ ବିଷୟ ଜିଜ୍ଞାସା করার সাঙ্গ হত না বা জিଜ୍ଞাସা করলে প্রায় ক্ষেত্রেই সঠিক জবাব মিলত না, কারণ উস্তাদের মধ্যে মনুষুপ্ত ও রক্ষণশীলতার ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। আজ আর সেরকম অবস্থা নাই। এখন নানাদিকে নানাঞ্নে সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায় ও বিভাগের ওপর গবেষণায় মন দিয়েছেন। নানা তথ্য ও লুপ্ত অধ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে, ফলে আমরা এ বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারছি। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত সম্বন্ধে উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁরা সামগ্রিকভাবে এই শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় জানতে ও শিখতে আগ্রহী। সঙ্গীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠক্রমে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বহু বই প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, রবীন্দ্র ভারতীর পাঠক্রম, সঙ্গীতবিহারদ পাঠক্রম, সঙ্গীতপ্রভাকর পাঠক্রম ইত্যাদি চাড়া ও নানা সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ পাঠক্রম রয়েছে। এই সব পাঠক্রমের পরীক্ষায় সাকল্য লাভের জগু অনেক শিক্ষার্থী ও যথাবিহিত পরিশ্রম করছেন। স্বথের কথা যত্নসঙ্গীত এই সব পাঠক্রম থেকে বাদ পড়েনি। এস্রাজ, সেতার, শরোদ, বেণালা, বাঁশী, তবলা, পখাবাজ প্রভৃতি বহু বাগ্যযন্ত্র-শিক্ষার্থীদের স্তযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং উপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তাঁদের “বাগ বশরদ” “বাগ প্রভাকর” প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করা হচ্ছে।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর গঠন ও বিস্তারিত শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে অন্তর্সঙ্কিন্সু সঙ্গীতপ্রেমী ও সাধারণ অনশীলনকারীদের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য বিষয়ও উপেক্ষা করা হয়নি। সঙ্গীতের পারিভাষিক শব্দের জ্ঞান এবং ঔপপত্তিকাংশের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বাগ্যযন্ত্রের আবিষ্কার, প্রসার ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও ভৌগোলিক পবিবেশ কাজ করছে তারও কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। তাছাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা গীর্নশৈলীর ইতিহাস এবং বাংলার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ও এই পুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

আগেই বলেছি আমার প্রচেষ্টা নূতন নয় তবে সর্বিনয়ে নিবেদন করবো যে আঙ্গিক ও বক্তব্যের উপস্থাপনে কিছু নূতনত্বের স্বাদ দেবার চেষ্টা করেছি। সঙ্গীতের উপাধি কোন এক জনেরও যদি এই পুস্তক কোন কাজে লাগে তবেই আমার এই দুঃখ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

পরীক্ষার্থীদের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁরা যেন সত্যকার শিল্পী হবার সাধনা করেন, কেবলমাত্র ডিগ্রী লাভের যোগে তাঁদের সমস্ত শক্তি যেন

ব্যয়িত না হয়। সঙ্গীত-শাস্ত্র জানার প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটাই সব নয়। সঙ্গীতে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে এর ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে দৃঢ় থাকা একান্ত প্রয়োজন, হাতে-কলমে শেখার প্রয়োজন, তা না হলে সঙ্গীতকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। এটি গুরুমুখী বিদ্যা, নিজের গুরুর কাছে নিষ্ঠাসহকারে ক্রিয়াত্মক অংশের “তালিম” নেওয়া দরকার। সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক দিককে বলা হয় কর্তব্য বিদ্যা অর্থে কার্যতব্য। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও বিশেষ অহমীলন দ্বারাই এতে পারঙ্গম হওয়া যায়। সঙ্গীতকে আয়ত্ত্ব করতে হলে চাই “রিয়াজ” অর্থাৎ একাগ্রসাধনা ও দীর্ঘকালের নিয়মিত অভ্যাস। শিক্ষাকালে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

পারশেষে বিনীত অনুরোধ জানাই অন্তর্সাক্ষৎস্ব পাঠকদের ও সঙ্গীত-রসিকদের কাছে, তারা যদি এই পুস্তকের কোন অংশে কোন ভ্রম-প্রমাদের সন্ধান পান তবে অন্তর্গত করে মেটি যেন আমার কাছে লিখে পাঠান। যে কোন ত্রুটি পরের সংস্করণে সংশোধন করার ইচ্ছা রইলো। জিজ্ঞাস্ব পাঠকদের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে উত্তর দেবার চেষ্টা করা হবে।

### জোড় ও তারপর

উত্তর কলিকাতার নয়-চাঁদ দত্ত স্ট্রীটের খ্যাতনামা এটর্নী নিমাই বসুর বাড়ীতে বন্ধুবর স্বর্গীয় পাবতী বোসের শৈঠকখানায় নিবারণবাবুর কাছে আমার প্রথম এশাজের হাতেখড়ি। এখানে দেশীয় বাণ্যযন্ত্রের সমবেত বাণ্যগলীর দলে যোগ দিয়ে অবৈষ্টিয় সংযোগতা করতুম। সে আজ প্রায় ৪০ বছর আগেকার কথা। তারপর বছর দুই বাজনায়ে ছেদ পড়ে। ১৯৩৫ সালে প্রসিদ্ধ বেতালবাদক স্বর্গীয় কাতিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের কাছে ২১৩ বছর শিক্ষালাভ করি। ইং ১৯৩৭ সালে মিশ্র ঘরাণার খ্যাতনামা সেতারী শ্রীযুক্ত বিজয়দাস পাকড়ে মহাশয়ের কাছে সেতারের তালিম পাই ও এশাজে কিছু গততোড়া তুলি। প্রসিদ্ধ লয়-বদ বেনারসের স্বর্গীয় শিবাজীর পুত্র ভাসুসেবক মিশ্রও আমাকে কিছু গত ও বাঁধি তান প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেন। এই সময় বেনারসের গারোয়া বাদক তুরফা মিশর ও খ্যাতনামা এশাজবাদক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দত্ত (নস্তুবাবু) মহাশয়ের কাছেও কিছু কিছু তালিম পেতে থাকি।

ইং ১৯৩৯-৪০ সালে আম দিল্লী বেতারকেন্দ্রের শিল্পী ভারতবিখ্যাত সাবেকী বাদক স্বর্গীয় বন্দু খাঁ সাহেবের কাছে ছুড চালনার কাযদা এবং গমক ও সুরের

লাগড়টি সম্বন্ধে ছেড়ের বিশেষ বিশেষ কায়দা শেখার সুযোগ পাই। ঐ সময় আমি দিল্লী বেতারকেন্দ্রের Indo European Orchestra-তে স্বর্গত John Folds সাহেবের পরিচালনাধীনে ভারতীয় যন্ত্রের সমবেত ঐকতানমণ্ডলীতে একজন বিশিষ্ট এস্রাজবাদক হিসাবে নিয়মিত শিল্পী তালিকাভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করি এবং আমার বাজনার উৎকর্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে বেতার-কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে দিল্লীকেন্দ্র থেকে আমার বাজনার একক অনুষ্ঠান প্রচলন করেন।

এরপর অনিবায কারণে আমাকে কলিকাতায় চলে আসতে হয় এবং দিল্লী বেতারকেন্দ্র তথা উস্তাদ বুনু খাঁ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের কারণে বুনু খাঁ সাহেব সত্ত্বজাত পাকিস্থানের অন্তর্গত করাচী কেন্দ্রে চলে যান, ফলে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। দিল্লী বেতারকেন্দ্রে যুক্ত থাকার সময় তথাকার খ্যাতনামা সারেন্দ্রী বাদক স্বর্গীয় গুলাম সবীর, জয়পুরের সেতার বাদক স্বর্গীয় হাইদার হুসেন, সারেন্দ্রী ও সারীন্দা বাদক হামিদ হুসেন প্রভৃতি গুণীদের কাছেও আমি সঙ্গীত বিষয়ে নানা সাহায্য পেয়েছিলাম।

ইং ১৯৫১ সালে আমি কলিকাতায় ফিরে আসি। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার কারণে এই সময় কয়েক বছরের জন্ত যন্ত্রের রিয়াজ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশ কিছুদিন স্বদের দক্ষিণ ভারতে থাকতে হয়। এর পর ১৯৫৫ সালে সৌভাগ্যক্রমে স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। স্বামীজীর অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হই এবং তাঁকে আমার এস্রাজ বাজনা শেখার আগ্রহের কথা জানাই। স্বামীজী আমাকে গৌরীপুরের জমিদার আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষার পরামর্শ দেন ও বলেন যে “ওঁদের ঘরে সঙ্গীতের খনি আছে” এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে আমার সঙ্গে আচার্যদেবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। আচার্যদেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ভাগ্যের ফেরে আবার আমাকে সঙ্গীতচর্চা বন্ধ রেখে দীর্ঘদিন দক্ষিণ ভারতে গিয়ে থাকতে হয়। প্রতিকূল ভাগ্য কিন্তু আমার সঙ্গীতসাধনার আগ্রহকে পরাস্ত করতে পারেনি। সুযোগ পাওয়ামাত্রই আমি কলিকাতায় ফিরে আসি এবং পরবর্তী সময়ে স্বদীর্ঘকাল ধরে আচার্যের কাছে বহু রাগের আলাপ ও গত তালিম পেতে থাকি।

সঙ্গীত বিষয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিরটি ও বিচিত্র সংগ্রহ সত্যিই খনিবিশেষ। উস্তাদ আবদাল্লা খাঁ, উস্তাদ এমদাদ হুসেন ও তৎপুত্র এনায়েৎ খাঁ,

উস্তাদ দবীর খাঁ, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, উস্তাদ হাফিজ খাঁ, উস্তাদ আমীর খাঁ, পণ্ডিত কানাইলাল টেড়ি ( এম্বাজী ), পণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রসাদ ডবে ( এম্বাজী ), স্বর্গীয় তারাপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নানা গুণীমণ্ডলীর কাছ থেকে সমস্ত গুণ বহু অর্থব্যয়ে যে সমস্ত আলাপ, গত, তান ও গান ইত্যাদি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, অকপটে সেই সব “চিহ্ন” ( উচ্চদরের বন্দিশাদি ) তিনি ছাত্রদের দান করে গেছেন । আমিও বিনা অর্থব্যয়ে আচাষদেবের দয়ায় সেই বিরাট সংগ্রহের অনেকাংশ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি ;

আমার সঙ্গীতগুরুবর্গের মধ্যে কাওয়াল বাচ্ছা ঘরাণার ডাঃ বিমল রায়, এম, বি, মহাশয়ও রয়েছেন । আচাষ ব্রজেন্দ্রকিশোরই আমার সঙ্গে ডাঃ বিমল রায়ের পরিচয় ঘটান এবং আমাকে বলেন “যেহে বাজাবার উপযুক্ত গতকারীর নানা কাজ ও আলাপ প্রভৃতি তোমায় দেওয়া হয়েছে, তবে গান সম্বন্ধেও তোমার কিছু জ্ঞান থাকা দরকার । এম্বাজ ছড়ের যত্ন, এতে গানও বাজান যায় । ডাঃ রায় সঙ্গীতের ঔপপত্তিকাত্মশেই শুধু পণ্ডিত নন, ওর নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, তাছাড়া উনি গান গাইতে পারেন । রামপুরের উস্তাদ মেহেদী হসেন ও খাদেম হসেন খাঁর কাছে এবং এম্বাজীর স্বর্গীয় সতান ঘোষ মহাশয়ের কাছে উনি বহুদিন তালিম নিয়েছেন । ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে তুমি কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে । তাছাড়া আমি তো রয়েইছি, আর আলাপের ব্যাপারে কিছু জানতে হলে তুমি থোকাব ( শ্রদ্ধেয় শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ) কাছে জেনে নেবে ।” আমি ডাঃ রায়ের কাছ থেকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের গান সংগ্রহ করি এবং সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়েও কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করি ; আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সাময়িক শিল্পী হিসাবে বহুবার বেতারে এম্বাজের একক অনুষ্ঠান পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছি ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ

১২৩/১৭ শিশির ভাড়াটা সর্বণ

কলিকাতা—৬

## সেলানী

স্বনামধন্ত সঙ্গীত কোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম, বি, মহাশয় একজন চিকিৎসক হয়েও তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই পুস্তক গ্রন্থনার বিষয় আলাপ-আলোচনা কালে নানা বিষয়ে সঠিক নির্দেশ ও সুপরামর্শ দিয়ে এবং “অনুরাগ” নামে এই গল্পের একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন।

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারক বিশ্ববন্দিত সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই গ্রন্থ সঙ্কল্পে তাঁর অভিমত লিখে দিয়ে এর গৌরব বর্ধন করেছেন।

সবশ্রী জ্ঞান ঘোষ, অজয় সিংহরায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রভৃতি গুণীজনেরা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখে এ সঙ্কল্পে তাঁদের মন্তব্য লিখে এই পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

সঙ্গীতানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র তেওয়ারী এবং তাঁর স্বযোগ্য সহধর্মিনী সঙ্গীত জগতে সুপরিচিতা সোম তেওয়ারী এই পুস্তক প্রস্তুতির গবেষণার সময়ে স্থাননালা লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগারে পাঠ্যদির বিশেষ স্বযোগ-সুবিধা করে দেওয়ায় আমি এঁদের কাছে উপকৃত।

কলিকাতার যাঁঘরের ডাইরেক্টর শ্রীযুত অশোক ভট্টাচার্য মহাশয় যাঁঘরে রক্ষিত কয়েকটি বাণ্যযন্ত্রের ছবি তোলার স্বযোগ দিয়ে এই পুস্তকের বাণ্যকাণ্ডের সৌষ্ঠববৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

স্বর্গীয় অমল বাগচী মহাশয় এই পুস্তকের ব্যাকরণ অংশটির মূল লেখাটি নকল করে দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমরা মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছি। শ্রীভগবানের চরণে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ডাঃ মাখনলাল ধর মহাশয় এই পুস্তকের শব্দসূচী সংকলনে অনলস পরিশ্রম করেছেন।

বাণ্যযন্ত্রনির্গাতা মেসার্স কানাইলাল এণ্ড ব্রাদার্সের শ্রীমান মুরারী ও শ্রীমান গোবিন্দ অধিকারী কয়েকটি বাণ্যযন্ত্রের মাপ ও ফটো দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

সঙ্গীতপুস্তক ও বাণ্যযন্ত্রবিক্রেতা মেসার্স এস. চন্দ্র এণ্ড কোং-র মালিক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চন্দ্র মহাশয় কয়েকটি পত্রপত্রিকা দিয়ে এবং প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়ে এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উদ্দীপিত করেছেন।

বাল্যবন্ধু শ্রীযুত কালিদাস কর, শিল্পী শ্রীগণেশচন্দ্র পাইন কয়েকটি বাণ্যযন্ত্রের

প্রতিকৃতি এঁকে দিয়ে, শ্রীযুত স্তললীত দিন্‌হা মহাশয় মিজরাব বাদিত কাননের ১টি নেগেটিভ দিয়ে, শ্রীযুত ললিতমোহন পাল মহাশয় প্রমথবাবুর একটি পত্র দিয়ে ও মনমথনাথ হালদার মহাশয় রুদ্রবীণার ছবি দিয়ে আমাকে উপরূত করেছেন।

বন্ধুদের শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত দাস ও শ্রীযুত নিত্যহারি সরকার এই গ্রন্থের বাণ্যকাণ্ডের কিছু কিছু অংশের প্রফ দেখে দিয়ে এই পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করেছেন।

সর্বশ্রী বিনয়েন্দ্রকিশোর চৌধুরী, বি. ডি. ওয়া, বিমল ভট্টাচার্য ও সঙ্গীতপ্রেমী তরুণ ঘোষ এই পুস্তক প্রকাশের কালে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। এই পুস্তক রচনায় আর একজন উৎসাহদাতা হলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক বন্ধুদের শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

প্রিন্টার্স মেসার্স নাথব্রাদার্স বৈদ্যতিক নিয়ন্ত্রণ চালু থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে এই গ্রন্থ মুদ্রণে সাহায্য করেছেন।

আমার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান শাস্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমান নিমাই মল্লিক, শ্রীমান রমেশনাথ দাস, শ্রীমান শ্রীকান্ত চন্দ্র, শ্রীযুত পাঁচগোপাল পাল ও শ্রীযুত জহর পাল প্রভৃতি অনেকেই যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে যাদের নাম উল্লেখ করলাম তারা ছাড়াও আরও অনেক সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী এই পুস্তক গ্রহণায় আমাকে নানাভাবে অতুপ্রাণিত করেছেন। শ্রীভগবানের চরণে এঁদের সকলের সবাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি ও আমার অস্ত্রের রক্তজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে একটি কথা স্বীকার না করলে মনের অতৃপ্তি থেকে যাবে। আমার জীবনযাত্রায় নিবেদিতপ্রাণা আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া ঘোষ অস্বস্তিদেহে সাংসারিক নানা বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে নীরবে আমার মনোবৃত্তির অন্তরঙ্গ করেছেন ও অকাতর পরিশ্রমে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার রসদ জুগিয়েছেন এই গ্রন্থ প্রণয়নে। তার প্রস্তুতিপর্বের দীর্ঘকালীন গবেষণার কাজে। তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও ত্যাগই সম্ভব করে তুলেছে আমার এই দুর্লভ প্রচেষ্টা।

জয় মা, জয় গুরু

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ

১২৩১এ, শিশির ভাণ্ডারী সরণী

কলিকাতা-৬

## বিষয়-সূচী

**গীতকাণ্ড :** সঙ্গীত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি—১-৩। নাদ ও তার প্রকারভেদ—৪-৫। আন্দোলন ও তার প্রকারভেদ—৬। শ্রুতি—১৫। স্বর—২০। সপ্তক—২৬-২৬। স্বরের পরিচয়-পত্র, প্রচয়, উদাত্ত, অহুদাত্ত—, স্বরিত—২৭-২৮। মুর্ছমা—৩০। মেল বনাম ঠাট—২২-৩২। বর্ণ, অলংকার—৪০। রাগজাতি—৪১-৪২। গ্রাম—৬৩। গমক—৭৫। প্রাচীন গমক—৪৬। তান—৪৮। মাত্রা—৫২। ছন্দ—৫৩। তাল—৫৮। লয়—৬৩। গণ—৬৫। পরিভাষা-পরিচয়—৬৩-৭৭। রাগবিষয়ক বিভিন্ন ব্যাখ্যা—৭৬-২০। স্বরলিপি ও তার ইতিহাস : ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুদিগম্বর, আকার মাত্রিক ও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির পূর্ণপরিচয়—২৫-১০৬। অনিবন্ধ গীত, আলাপ—১০২-১১৩। নিবন্ধ গীত : ধ্রুপদ, ধামার, খ্যাল, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতির পরিচয়, বাণী ও ঘরাণা—১১৩-১৩৫। সাদরা, তেলেনা, ত্রিবিট, গজল ইত্যাদি—১৩৬-১৪০। কীর্তন, বাউল, শ্রামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, গস্তীরা...ঝুমুর, তরঙ্গা ইত্যাদি—১৪২-:৫৪। রবীন্দ্র সঙ্গীত, ডি. এল. রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—১৫৬-১৬০।

**বাণ্যকাণ্ড :** তত যন্ত্র সকল : এশ্রাজ, সেতার, শরোদ, স্বরবাহার প্রভৃতি—১৬৪-২৬২। আনন্দ যন্ত্র সকল : তবলা, পখাবজ, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি—২৬৩-২২৬। শুধির যন্ত্র সকল : বাঁশী, সানাই, তুবড়ী, বেণু প্রভৃতি—২২৭-৩২৪। ঘণ যন্ত্র সকল : বাঁঝার, কাঁসর, ঘড়ি, ঘণ্টা প্রভৃতি—৩২৫-৩৩৬।

**শব্দসূচী :** ৩৩৭-৩৭০।

**গ্রন্থপঞ্জী :** ৩৭১-৩৭৬।

তত, আনন্দ, শুধির ও ঘণ এই জাতীয় বাণ্যযন্ত্রের বিষয় বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে প্রতিটি জাতিকে এক একটি পৃথক অধ্যায়ে লেখা হয়েছে। **শব্দ-সূচী** দেখুন।

## শুদ্ধিপত্র

- ৮'-এর পাতায় ফুটনোটে প: অহোবল ও শ্রীনিবাসের কথা ভুল বলা হয়েছে ।
- সর্বপ্রথম প: সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধ গ্রহেই তারের লঙ্ঘের কথা বলেন ।
- ৩১-এর পাতায় গান্ধার গ্রামের মূর্ছনায় আলাপী আলাপিনী হবে ।
- ৩৪ " " উত্তর মেলাধ্বনি উভয় মেলাধ্বনি পড়তে হবে ।
- ৪০ " " শ্লোকের মলংকারং=মলংকারং হবে ।
- ৫৬ " " কুর্ষাং—কুর্ষাদ ও বহ্নিজালে—বহ্নিজালে হবে ।  
লোলাস্বালী—লোলস্বালী হবে ।
- ৫৭ " " সমনিকা নয়, প্রমাণিকা পড়তে হবে ।
- ৫৮ " " মৌক্তিকমালা ছন্দ শৌক্তিক নয় ।  
স্রাগিনী—স্রাগিনী পড়তে হবে ।
- ৬১ " " সৌরীন্দ্রমোহন—শৌরীন্দ্রমোহন হবে সর্বক্ষেত্রেই শৌরীন্দ্র  
শ' হবে ।
- ৭৮ " " বাদীস্বর বা অংশস্বরের জায়গায়—'বাদীস্বর বলা হয়' হবে ।
- ১১৫ " " ক্রপদের—ক্রপদের হবে ।
- ১২১ " " শিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে ৩ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম লেখা হয়েছে ।  
এটি সম্পূর্ণ ভুল শিষ্ট মণ্ডলীর মাঝে গুঁর নাম থাকতেই পারে না,  
কারণ উনি বয়সে অনেক প্রবীন ছিলেন । প্রফ দেখার  
প্রমাদে এটি ঘটেছে । নামটি ঘরাণায় কথার পরেই আসবে ।
- ১২২ " " প্রকাশনায়—প্রকাশনার হবে ।
- ১৭৬ " " বাসরস্বভী—বাসরস্বভী হবে ।
- ১৯৩ " " শরীরজ কথার পর পূর্ণচ্ছেদ হবে ।
- ২০৮ " " ডান হাতে তার টেনে—বঁাহাতে হবে এবং বঁাহাতে লেখাটি  
ডান হাতে পড়তে হবে ।
- ২২২ " " প্রচীন—প্রাচীন হবে ।
- ২৬৪ ও ২৬৬ " " মেলম বা স্বরম বা বাণম শব্দগুলি মেলম্ বা স্বরম্ ও বাণম্  
হবে । এবং গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠাতেই এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে  
এই প্রমাদ ঘটেছে ।
- ২৯৬ " " বোহন—বোহণ হবে এবং সর্বত্রই এই শব্দটি বোহণ হবে  
জানবেন ।
- ৩০৬ " " তরীর—তুরীর হবে, এবং শেষ লাইনে রহ শব্দটি হয় হবে ।

## গীতং বাজং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতযুচ্যতে

**সঙ্গীত**—গান, বাজনা ও নাচ এই তিনকে একসঙ্গে সঙ্গীত বলা হয়। এই তিনের মধ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রধান বলে অনেকে সঙ্গীত মানে কণ্ঠ-সঙ্গীত ( অর্থাৎ কেবলমাত্র গানকেই ) মনে করেন ; কিন্তু আসলে শব্দটি সমুদয়বাচক।

**সঙ্গীত শাস্ত্র**—যে বই পড়লে গান, বাজনা ও নাচের সকল বিষয় জানা যায়, সাক্ষীতিক পরিভাষার ( বিশেষ অর্থবোধক ভাবার ) পরিচয় পাওয়া যায় এবং সঙ্গীতের ব্যাকরণ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, তাকেই **সঙ্গীত শাস্ত্র** বলে। এই শাস্ত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত : (১) গীতকাণ্ড, (২) বাজকাণ্ড ও (৩) নৃত্যকাণ্ড। এই তিন কাণ্ডকে একত্রে **তৌর্ষত্রিক** বলা হয়।

এই তৌর্ষত্রিকও আবার দুই ভাগে বিভক্ত : প্রথম—ঔপপত্তিক তৌর্ষত্রিক ; দ্বিতীয়—ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌর্ষত্রিক। সোজা কথায় যাতে গান, বাজনা ও নাচের উপপত্তি ( theory ) বা ঔপপত্তিক ( theoretical ) সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, তাকে বলা হয় “**ঔপপত্তিক তৌর্ষত্রিক**”। আর যাতে ক্রিয়া সিদ্ধাংশের ( practical ) অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাকে বলা হয় **ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌর্ষত্রিক**।

সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ স্মরিতিঃ

এখানে সঙ্গীতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কানে শুনে আমাদের মনে রসের সঞ্চার করে যে গান-বাজনা, তাকে **শ্রাব্য সঙ্গীত** বলে। চোখে দেখে আমাদের অন্তরে রসভাব জাগায় যে নাচ ও হাবভাব, তাকে **দৃশ্য সঙ্গীত** বলে।

**সঙ্গীত-পদ্ধতি**—বর্তমানে ভারতে দুই প্রকার সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত : (১) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি ও (২) কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি। প্রথমে সমগ্র ভারতবর্ষে একই সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টীয় অষ্টম ও একাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পদ্ধতি দ্বিধাভিত্তক হয় বলে জানা যায়। সঙ্গীতের গবেষক অনেক পণ্ডিত এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে রাজী নন। তাই ইতিহাস ছেড়ে বর্তমানে প্রচলিত দুই পদ্ধতির কথা বলছি।

(১) **হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি**—বর্তমানে উত্তর ভারতে সর্বত্র ও দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্রে এই নিয়ম প্রচলিত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে সম্রাটগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ও ফার্সী সঙ্গীত মিশ্রণে তৎকালীন হিন্দুদের ব্যবহৃত ও প্রচলিত অতীত প্রকাশভঙ্গী ও কলাকৌশলের সামান্য সামান্য রদবদলে যে নূতন পদ্ধতির (style) কথা বর্তমানে শোনা যায়, সেটিই “হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি” নামে পরিচিত।

(২) **কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি**—দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে, যে পদ্ধতি সীমাবদ্ধ, সেটি “কর্ণাটকীয় সঙ্গীত পদ্ধতি” নামে পরিচিত। (উডিম্বায় কর্ণাটকী পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত, আসামের কিছু অংশেও দক্ষিণী পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তবে বর্তমানে এইসব প্রদেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির প্রভাব চলছে।)

প্রকাশভঙ্গী পৃথক হলেও এবং মেল ও ঠাটে নামগত প্রভেদ থাকলেও, এই দুই পদ্ধতিতেই সুর ও বিরত মিলিয়ে বারোটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। রাগ ও ঠাটের প্রভেদ থাকলেও উভয় পদ্ধতিতেই এই বারোটি স্বর থেকেই ঠাট ও মেলের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি।

**মার্গ সঙ্গীত**—অনেকের ধারণা এই যে, বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের (classical) রাগ সঙ্গীতকেই মার্গ সঙ্গীত বলা হয়। সেটি ঠিক নয়। মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে বহুকাল লোপ পেয়েছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীত রত্নাকরে মার্গ সঙ্গীত সৃষ্টি কিছু আলোচনা আছে; কিন্তু মার্গ সঙ্গীত বলতে বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের ধরন, খেয়াল প্রভৃতি চালের রাগ সঙ্গীতকেই বোঝায়, এ কথা তা’ দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি না। মার্গ সঙ্গীত মার্গ তালের মতই আজ লুপ্ত।\* স্বরলোকের দেবসঙ্গীতই প্রকৃতপক্ষে মার্গ সঙ্গীত।

**দেশী সঙ্গীত**—বর্তমানে প্রচলিত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শৈলীর উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতই হল দেশী সঙ্গীত।

**লোক সঙ্গীত**—বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ সেই সেই

\* সঙ্গীত-পারিজাতের ভাষ্যকার সঙ্গীতশ্রেণী ত্রিশচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখেছেন : “মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ থেকে অন্ততঃ হাজার বছর আগে।” আমরাও একথা স্বীকার করি।

প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত যে গীত চনতি গ্রাম্য সুরে গীত হয়ে থাকে, তাকেই আমরা “লোক সঙ্গীত” বলি।

**শব্দ**—যে প্রকার অল্পভূতি “কানের ভিতর দিয়া” আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে ধরা পড়ে, তাকেই “শব্দ” বলা হয়। এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর আঘাত-জন্মিত অনুরণন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। শব্দের কোন অস্ত নেই; কত রকম শব্দের উৎপত্তি হতে পারে, তা’ আমাদের ধারণাতীত। প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় ( নাতিশীতোষ্ণ ও নীহারাদিতে আনাচ্ছাদিত অবস্থায় ) শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে সময়ে ১১২০ ফুট প্রসারিত হয়। অনন্ত এই শব্দতরঙ্গ থেকেই সাদৃশ্যাত্মক ধ্বনির জন্ম।

**ধ্বনি**—প্রতিটি শব্দকেই আমরা ধ্বনি বলতে পারি। শব্দ, ধ্বনি ও নাদ এই তিন-ই একার্থবোধক। মানুষের কৃষ্টির প্রথম ও প্রধান বাহন এই ধ্বনি। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত—সবার মূলেই এই ধ্বনির প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত আন্দোলনজাত মনোহর ধ্বনি থেকেই সাদৃশ্যাত্মক ( ধ্বনির ) নাদের জন্ম। সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিটি স্বরধ্বনিকে এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের অর্থে রং-এর অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শব্দের কোনও রং-ও নেই আর গন্ধও নেই; একমাত্র কান দিয়ে শুনেই তা’ উপলব্ধি করা যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক শব্দের রং-এর কথা স্বীকার করেছেন; তা’ছাড়া আমাদের দেশের অনেক যোগীও শব্দের রং-এর কথায় আস্থাবান। আমরা সাধারণ মানুষ শব্দের অর্থে সাদৃশ্যাত্মক নাদের কোন বর্ণ ( রং ) দেখতে পাই না। এই ধ্বনিকে হু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—‘সাদৃশ্যাত্মক ধ্বনি’ ও ‘কঠোর ধ্বনি’।

**সাদৃশ্যাত্মক ধ্বনি**—অনুরণনজাত যে মধুর ধ্বনি পষায়ক্রমে নিয়মিত আন্দোলনের ফলে প্রকাশিত হয়, তাকেই ‘সাদৃশ্যাত্মক ধ্বনি’ বলা হয়।

**কঠোর ধ্বনি**—সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি ছাড়া অল্প সমস্ত অনিয়মিত আন্দোলনজাত অপ্রীতিকর ধ্বনিকে ‘কঠোর ধ্বনি’ বলা হয়। শ্রুতিকটু কর্কশধ্বনি সঙ্গীতের উপযোগী নয় বলে এদের সাদৃশ্যাত্মক ধ্বনির পর্ষায়ে ধরা হয় না। ( কণ্ঠ-সঙ্গীতে যদি কখনও কর্কশ ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তবে তাকে কঠোর ধ্বনির পর্ষায়ে ফেলা সঙ্গত হবে না )

## নাদ

“ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরাঃ  
ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥”

—মতঙ্গ : বৃহদ্দেশী ।

‘নদ’ ধাতু থেকে ‘নাদ’ কথার উৎপত্তি । নদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি । অর্থাৎ, শব্দ মাত্রকেই নাদ বলা হয় । প্রাচীনকালের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা শারীরজ নাদকেই নাদ বলেছেন এবং ব্যাখ্যাটি সেইভাবে হওয়ায় নাদের সাস্কৌতিক অর্থে কিছু অসুবিধা হয় । অবশ্য সংগীত শাস্ত্রে “নগ্নতে ইতি নাদঃ” এরূপও বলা হয়েছে । এখানে আনন্দদায়ক ধ্বনি অর্থে ই নাদ বলা হয়েছে । অপিচ ‘নদাভ্যাং জাতত্বাং নাদঃ’, অর্থাৎ ‘ন’ ও ‘দ’ এই দুই থেকে যার উৎপত্তি, সেই হল ‘নাদ’, এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে এবং সেই ব্যাখ্যায় ।

“নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্মাং দকারো হব্যবাহনঃ ।

তাভ্যাং সংজায়তে যস্মাং তস্মাং নাদ ইতি স্মৃতঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘ন’কার অর্থে প্রাণবায়ু ও ‘দ’কার অর্থে দেহস্থ অগ্নি, এদের সংযোগেই নাদের উৎপত্তি । আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে যে আত্মার স্বপ্রকাশকাজ্জা ইচ্ছারূপ অগ্নিবায়ুতে আঘাত করে : সেই বায়ু নাভিতে মূচ্ছিত হয়ে যোগারুঢ়ী ( নিত্যতা কল্পিত যোগ + রুঢ়ী অর্থে প্রকৃতি ও প্রত্যয় ) শক্তিদ্বারা উপর দিকে উঠে স্বর হিসাবে কণ্ঠে প্রকাশিত হয় ।

### অনাহত নাদ ও আহত নাদ

“অনাহত আহতশ্চেতি দ্বিবিধো নাদস্তত্র ॥”

(১) আঘাত ব্যতিরেকেই শরীরে যে শব্দ উদ্ভূত হয়, তাকেই **অনাহত নাদ** বলা হয় । যোগীদের সাধনায় এই নাদ ধরা পড়ে ; স্বাভাবিকভাবে এই শব্দ কানে শোনা যায় না । যাই হ’ক, সংগীতে আমরা এই নাদকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি ।

(২) কানে শোনা যায় এমন যে কোনও আঘাতজাত ধ্বনিকেই **আহত নাদ** বলা হয় । এই আহত নাদ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ।

**বর্ণাত্মক নাদ**—আহত নাদকে আবার দু’ভাগে ভাগ করা হল । মুখ থেকে জিহ্বা, দাঁত প্রভৃতির আঘাতে যা বের হয়, অর্থাৎ পুস্তকপাঠ, বাক্যকথন ইত্যাদিকে-

বলা হয় **বর্ণাত্মক নাদ** ; এবং গান গাওয়া, বাজনা বাজানো প্রভৃতি স্বরধ্বনি প্রধান শব্দকে বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক নাদ** ।

“সোপ্যাহত পঞ্চবিধো নাদস্ত পরিকীর্তিতঃ ।

নথ বায়ুজ চর্মানি লৌহ শারীরজাস্তথা ॥”

সঙ্গীত মকরন্দ—নারদ

—উপরের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে এই ধ্বন্যাত্মক বা আহত নাদ আরও পাঁচ রকমের আছে । ( বাণম্বলের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য )

(১) বীণা, সেতার, এসরাজ আদি “তত” যন্ত্রদের বলা হয়েছে **নখজ** ;

(২) বাঁশী, সাহনাই প্রভৃতি “ভৃষির” ” ” **বায়ুজ** ;

(৩) পাখোয়াজ, তবলা ” “আনন্দ” ” ” **চর্মজ** ;

(৪) কাঁসর, ঘণ্টা ” “ঘন” ” ” **লৌহজ** ;

ও সর্বশেষ (৫) কণ্ঠনিঃসৃত স্বরধ্বনিকে ” ” **শারীরজ** ।

“অতি সূক্ষ্মং পুরা নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মম্ অতঃপরম্ ।

গলে পুষ্টমপুষ্টং তু শীর্ষে বক্তে চ কৃত্রিমম্ ॥”

—রসকৌমুদী ( শ্রীকণ্ঠ )

• উপরের শ্লোকে দেখা যায় নাদের আরও ভাগ রয়েছে । নাদের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে : নাভি থেকে উৎপিত হয় অতি সূক্ষ্ম নাদ, হৃদয় থেকে সূক্ষ্ম নাদ, কণ্ঠ থেকে পুষ্ট নাদ, মস্তক থেকে অপুষ্ট নাদ এবং মূখ থেকে কৃত্রিম নাদ ।

এ বিষয়ে অল্প মতও রয়েছে । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাদের উৎপত্তিস্থল বুঝাবার জন্ম তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হৃদয় থেকে **মস্তক**, কণ্ঠ-থেকে **মধ্য** ও মস্তক থেকে **তার** ।

**নাদের বৈশিষ্ট্য**—এখন নাদের অর্থাৎ স্বরধ্বনির বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি । আন্দোলনের বিস্তারের ওপরেই নির্ভর করে স্বরের তীব্রতা বা মৃহতা । ইংরাজিতে একেই বলে Intensity of sound.

**তীব্রনাদ**—যখন কোনও শব্দ, অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর, জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়, তখন সেই **তীব্র নাদকে** বলা হয় **বৃহন্নাদ** ।

**মৃহনাদ**—যখন কোনও শব্দ অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর মৃহভাবে প্রকাশ করা হয়, তখন সেই **মৃহ নাদকে** বলা হয় **সূত্রনাদ** ।

আন্দোলনের প্রাবল্যের তারতম্যের উপর যেমন নির্ভর করে নাদের তীব্রতা ও

মূহূতা তেমনি তার তীক্ষ্ণতাও নির্ভর করে এই আন্দোলনের সংখ্যার ওপরেই। একে ইংরাজীতে pitch বলে।

(১) কোনও একটি স্বরকে (base করে) ধরে তা থেকে যে কোন চড়া স্বরকেই (higher pitch) প্রকাশ করা হোক না কেন, সেই স্বরধ্বনিকে “পরাতীক্ষ্ণ নাদ” বা উচ্চনাদ বলা হয়।

(২) কোনও একটি স্বরকে (base করে) ধরে তা থেকে যে কোন নীচ স্বরকেই (lower pitch) প্রকাশ করা হোক না কেন, সেই স্বরধ্বনিকে অশুভীক্ষ্ণ নাদ বা নিম্ননাদ বলা হয়।

**সহায়ক নাদ**—কথাটি হিন্দী শব্দ। এটিকে অনেকে স্বয়ং নাদ বলেন; কিন্তু সেটি ঠিক মনে হয় না, কারণ ‘স্বরমেল কলানিধি’ ও ‘রাগবিবোধ’ দেখলে জানা যায় যে অর্থটি সঙ্গত নয়।

কোন বাণ্যযন্ত্রেই একটি শুদ্ধ শব্দ ( অর্থাৎ একটি একক স্বরধ্বনি ) প্রকাশ পায় না। তার আঘাতজাত শব্দের আশে পাশে অর্থাৎ মূল স্বরের সঙ্গে, আরও অনেকগুলি স্বর যুক্তভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সব সময়ে এই মূহূ ধ্বনিদের ভালভাবে শোনা যায় না কারণ তাদের তীব্রতা মূল স্বরধ্বনির চেয়ে অনেক দুর্বল। এই প্রচ্ছন্ন মূহূ স্বরধ্বনিগুলিই হিন্দীতে **সহায়ক নাদ** নামে পরিচিত। ইংরাজীতে একে বলা হয় “ওভারটোন” ( overtone )। বাংলায় একে বলা হয় **সনাদ**, স্তম্ভভাষায় **উপস্বন**। এই নাদের বিভিন্ন ধরনের কল্পনের অভিনবত্ব থেকেই আমরা আশ্চর্যজনক স্বরধ্বনিকে চিনতে পারি। এটিকে নাদের জাতির পর্যায়ে ফেলা যায়।

## আন্দোলন

তারবহু যখন কোন আঘাত দেওয়া হয়, তখন সেই আঘাতের ফলে তারটি নিজস্ব স্থান থেকে ( from natural starting point, i. e., position of rest ) থেকে চ্যুত হয়ে কিছুক্ষণ ধরে এপাশে-ওপাশে বা উপর-নীচে কাঁপতে থাকে। আঘাতের গতিভেদে বা অঙ্গ নানা প্রভেদে এই দোলনের হেরফের হয়। এই ধরনের দোলনকেই **আন্দোলন** বলা হয়। তানপুরার কোন তার খান্দে বাঁধার পর তাতে আঘাত দিলে খালি চোখেই এটি ধরা পড়ে। সকল প্রকার আহত নাদই এই আন্দোলন-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

ছড় দিয়ে যে সমস্ত যন্ত্র বাঁজান হয়, তাদের তারগুলি পাশে পাশে ঢুলতে

থাকে। যেহেতু ছেঁড়ের টান ডাইনে-বীয়ে চলে, সেজন্য ছেঁড়ের যন্ত্রে সোওয়ারী থেকে আড়ি পর্যন্ত তারটিও লম্বালম্বি ডাইনে-বীয়ে দোলে। এসবাজের তারে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সোওয়ারীর উপর রাখা তারের ক্ষুদ্র অংশটুকু (আধস্থতো বা এমন অংশ) থেকে সোওয়ারীর মাধ্যমে তারের অধরগনটি চর্মাচ্ছাদনকে আশ্রয় করে ধ্বনিকোষে (অর্থাৎ, হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে) গুঞ্জম তোলে; ফলে তবলি, সোওয়ারী, আড়ি, তার ও সমস্ত ধ্বনিকোসকে আওয়াজটি গুঞ্জিত করে তোলে এবং আওয়াজটি বড় ও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।

আমাদের জানা আছে যে এক বস্তুর সঙ্গে অপর এক বস্তুর আঘাত বা ঘর্ষণ লাগলেই বায়ুতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনেই ধ্বনির উৎপত্তি। আমাদের সঙ্গীতের সমস্ত ধ্বনিই আন্দোলনের ফলে জন্ম নেয়। যেমন সকল আঘাত এক রকম হয় না, তেমনি সকল আন্দোলনের গতিও সকল সময়ে এক রকম হয় না, এবং তারই ফলে শব্দের বিভিন্নতা ঘটে। পাণ্ডিত্যে এই আন্দোলনকে সাধারণতঃ দুইটি পর্যায়ভুক্ত করেছেন :

(১) **নিয়মিত আন্দোলন** বা **স্থির আন্দোলন**—যখন আমরা তানপুরার তারে আঘাত করি, তখন তারের দোলন কিছুক্ষণ যাবৎ একভাবে হতে থাকে। যদিও দোলনের গতি ক্রমাশঃ স্লথ হয়ে আসে, তবুও অধরগনটি একই শোনায়। সেই কারণে একে **স্থির আন্দোলন** বলা হয়, যেহেতু এটি নিয়মিত ভাবজাতক। তারের দোলনের গতি বেশ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে একই রকমে চলে বলে এটাকেই আমরা **নিয়মিত আন্দোলন**ও বলি। এই আন্দোলনজাত ধ্বনি শ্রবণস্থলকর হওয়ায় এই ধ্বনি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

(২) **অনিয়মিত আন্দোলন** বা **অস্থির আন্দোলন**—যখন আন্দোলনের গতি নিয়মিতভাবে বা পর্যায়ক্রমে চলে না, তখন এই আন্দোলনজাত শব্দকে আমরা **অস্থির আন্দোলন** বা **অনিয়মিত আন্দোলন** বলি। অনিয়মিত আন্দোলনজাত ধ্বনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অল্পই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরও বহু প্রকারের আন্দোলনে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে আন্দোলনের বৈচিত্র্য [ harmonics, overtones (সহায়কনাদ), sympathetic vibrations (সহানুভূতিক কম্পন) ও beats ] সম্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

এখন বাণীযন্ত্রে তারের মাপ অনুযায়ী আন্দোলনের সংখ্যার তারতম্যের কথা বলছি।

## তারের লম্ব ও আন্দোলন সংখ্যা

স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতার (pitch-এর) কথা বলতে গেলে যেমন স্বভাবতঃই আন্দোলনের বিষয় এসে পড়ে তেমনি তারের লম্ব (length), স্থূলতা বা ওজন (thickness or weight) ও তারের টানের=বিত্তির (tension) বিষয়ও ভাবা উচিত। কোনও বাজনার তারে আঘাত দিলেই আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমেই বলেছি তারের টান (বিত্তি=tension) ও স্থূলতা (thickness)-র ওপরই নির্ভর করে আন্দোলনের তারতম্য। তারটি কাঁপলে একটা স্বর শোনা যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আন্দোলন সংখ্যা এক সেকেন্ডে ১৬-এর বেশী হলে তবেই শোনা যাবে একটা নির্দিষ্ট স্বর; আর আন্দোলন সংখ্যা কম হলে কোন নির্দিষ্ট স্বর কানে শোনা যাবে না। তারটি পুরোপুরী কাঁপলে তবেই তৈরী হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্বর অর্থাৎ তারের লম্ব বা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে। এশ্রাজ, সেতার প্রভৃতি বাজনার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারের দৈর্ঘ্য যত কম, স্বর তত তীক্ষ্ণতর অর্থাৎ উঁচু। অতএব দেখা যাচ্ছে তারের লম্ব কম হলে আন্দোলন সংখ্যা বাড়ে, লম্ব বেশী হলে আন্দোলন সংখ্যা কমে; অর্থাৎ তারের আন্দোলন সংখ্যা তার লম্বের সঙ্গে প্রত্যলুপাতিক (inversely proportional)।

তারের লম্ব যদি জানি এবং সেই লম্বের আলুপাতিক আন্দোলন সংখ্যা যদি ঠিক করতে পারি তবে ঐ লম্বের বিভিন্ন ভাগের আন্দোলন সংখ্যা আমরা প্রত্যলুপাতিক নিয়মে বার করতে পারবো, আবার আন্দোলনের সংখ্যা থেকে লম্বটিও স্থির করতে পারবো। বীণাদি যন্ত্রে প্রধান তারটি লম্ব সাধারণতঃ ২৪ থেকে ৪২ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। সুবিধার জগ্ন ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি চিন্তাশীলেরা খরজের তারের সাধারণ লম্বের প্রমাণ ৩৬" ইঞ্চি ধরেছেন এবং পাশ্চাত্য নিয়মে কম্পাঙ্ক (frequency) ধরেছেন ২৪০ (যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সি (c)-র কম্পাঙ্ক ২৬১)।\*

এইবার হিসাবে আসছি, তবে তার আগে সরগম সম্পর্কে কিছু বলছি। পাশ্চাত্যে সপ্তকের নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতায় (just intonation) স ২৪০ কম্পাঙ্ক, র (২৮ স) ২৭০, গ (৫৪ স) ৩০০, ম (৪৩ স) ৩২০, প (৩২ স) ৩৬০, ধ (৫৩ স) ৪০০, ন (১৫৮ স) ৪৫০, স (২১ স) ৪৮০। আসলে

\* প্রথমে পণ্ডিত অহোবল ও পরে শ্রীনিবাস পণ্ডিত তারের লম্বের হিসাব ৩৬" ধরেন।

হারমোনিয়মের প্রথম চাবিটিই ২৪° অর্থাৎ c বা উদারার স। যে চাবিটিকে আমরা স বলে বাজাই সেটি c (ছোট হাতের c বা মুদারার স) যার কম্পাঙ্ক হল ৪৮° তবে স বলেই আমরা ২৪°-কে ধরে নিই।

উপরের হিসাব থেকে প্রমাণ হয়, স ও র-এর মাঝে অন্তরপাত আছে ৯৮ র ও গ-এর মাঝে ১০৯, গ ও ম-এর মাঝে ১৬১৫, ম ও প-এর মাঝে ২১৮, প ও ধ-র মাঝে ১০৯, ধ ও ন-র মাঝে ২১৮, এবং ন স-র মাঝে ১৬১৫।

পাশ্চাত্য সপ্তকের নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতাই-এর সঙ্গে আমাদের আধুনিক সপ্তকের খুব বেশী মিল আছে বলেই ঐটিকে ধরা হচ্ছে। কিন্তু এক জায়গায় গোলমাল দেখা যাচ্ছে। খরজ পঞ্চম ভাব মানতে গেলে ধৈবত, রেখাবের পঞ্চম হবে, অর্থাৎ র যদি ২৭° হয় তাহলে ধ-কে  $২৭° \times ৩২ = ৪০৫$  কম্পাঙ্ক হতে হবে। তাহলে আমাদের বর্তমান সপ্তক দাঁড়াবে ২৪°, ২৭°, ৩০°, ৩২°, ৩৬°, ৪০°, ৪৫°, ৪৮°।

খরজের তারের দৈর্ঘ্য অর্থে লম্ব যদি ৩৬" ইঞ্চি হয় তাহলে আন্তরপাতিক ভাবে

কম্পাঙ্ক—	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
	২৪°,	২৬°,	৩০°,	৩২°,	৩৬°,	৪০°,	৪৫°,	৪৮°,
দৈর্ঘ্য বা লম্ব—	৩৬,	৩৩,	২৮ $\frac{১}{২}$ ,	২৭,	২৪,	২১ $\frac{১}{২}$ ,	১৯ $\frac{১}{২}$ ,	১৮
প্রত্যন্তরপাত—	৮৯,	৪৫,	৩৩,	২১৩,	১৬২৭,	৮১৫,	১২,	

সপ্তকে এই সাতটি স্বরই শুধু নেই আরও পাঁচটি বিকৃত স্বরও আছে, এমনকি স্বরগত শ্রুতি ছাড়া আরো ১৫টি শ্রুতিও আছে। মধ্যযুগে ১২টি স্বর সম্পর্কে কোন কোন গ্রন্থকার আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রুতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক কোন আলোচনা হয়নি। আধুনিককালে ১২টি স্বর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ২২ শ্রুতির বিচার বলতে গেলে অন্তর্মানের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাই ১২ স্বরের কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা ও তারের লম্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই বিচার করব।

আমরা জানি স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন এই হল ১২টি স্বর। মধ্যযুগে এদের কম্পাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি, কিন্তু তারের লম্বের মধ্যে এদের অবস্থান সম্বন্ধে বিচার হয়েছিল। পণ্ডিত অহোবলই এর প্রথম প্রবক্তা ও শ্রীনিবাস তাঁকেই অন্তরগণ করেছিলেন। এঁদের মতে খরজের তারটিকে  $\frac{১}{২}$ ,

১/৩, ১/৪ ভাবে ভাগ করলে ঐ ১২টি স্বরের স্থান অনায়াসে পাওয়া যাবে। এই মতটিকে সাজিয়ে দেখালে এইরূপ হবে—( যদি স ৩৬" হয় তা'হলে )

স	=	পুরা তার		=	৩৬"
স̣	=	১/২ তার		=	১৮"
ম	=	১/২ তার	স — স̣	=	১৮ + ১২ = ২৭"
প	=	১/২ তার	স — স̣	=	১৮ + ৬ = ২৪"
গ	=	১/২ তার	স — প	=	২৪ + ৬ = ৩০"
র	=	১/২ তার	স — প	=	২৪ + ৮ = ৩২"
ধ	=	১/২ তার	প — স̣	=	১৮ + ৩ = ২১"
ন	=	১/২ তার	প — স̣	=	১৮ + ২ = ২০"

রেখাক্রমে দাঁড়াবে—

৩৬"		৩৩ ১/২"		৩২"		৩০"		২৮ ১/২"		২৭"		২৪"		২৪"		২২"		২১"	
স		র		র		গ		গ		ম		ম		প		ধ		ধ	

অঙ্কের হিসাবটা দেখুন :—

$$স = ৩৬"$$

$$স̣ = ১৮" \therefore ৩৬ \times ১/২ = ১৮"$$

$$ম = ১৮" স — স̣; স — স̣ অংশটি হল ৩৬" ও ১৮"-র$$

$$মধ্যবর্তী অংশ, সুতরাং ৩৬ - ১৮ = ১৮"$$

এই ১৮"-র মধ্যস্থলে ম আছে . কাজেই সে আছে ২"-তে। কোন বিন্দু থেকে ?

$$—স বিন্দু থেকে। অতএব ম আছে ১৮" + ২" = ২০"-তে।$$

$$প = ১/৩ স — স̣, অর্থাৎ ১৮" থেকে তিন ভাগ করে তার প্রথম$$

ভাগের শেষ বিন্দুতে প অবস্থিত। ১৮"-র তিন ভাগ হল ১৮ ÷ ৩ = ৬" (৬"+৬"+৬") অতএব প আছে প্রথম ৬"এর শেষে. অর্থাৎ ১৮"+৬" = ২৪"-তে।  
 র = ২/৩ স — প। স থেকে প হল ৩৬-২৪ = ১২"। ১২"-কে ১/৩ করে ভাগ করা হচ্ছে ৪+৪+৪; কাজেই র আছে প থেকে ৪+৪=৮" দূরে, অর্থাৎ ২৪+৮=৩২"-তে। এই ভাবেই অগ্র সব কয়টির বিচার করতে হবে।

সঙ্গীত পারিজাতের যে সম্বন্ধ পাওয়া গেল তাতে পারম্পরিক অল্পপাত বা স্বরাস্তর বিচার করলে আমরা পাই—

$$\begin{aligned} \text{স/র} &= ৩৬/৩২ = ৯/৮; & \text{র/গ} &= ৩২/৩০ = ১৬/১৫; & \text{র/গ} &= ৩২/২৮ = \frac{৩২ \times ২}{২৮ \times ২} = \\ & \frac{৬৬}{৬৬}; & \text{গ/ম} &= ২৮ \times ২ + ২৭ = \frac{৫৬}{২৭} = \frac{৫৬}{২৭}; & \text{ম/প} &= \frac{২৭}{২৮} = ২/৮; & \text{প/ধ} &= ২৪/২১ = \frac{৮}{৭}; \\ \text{ধ/ন} &= ২১/২০; & \text{ন/স} &= ১২/১৮। \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার } \text{স/র} &= ৩৬/৩০ = \frac{৩৬ \times ৩}{৩০ \times ৩} = \frac{১০৮}{৯০} = \frac{১২}{১০}; & \text{র/র} &= \frac{২০}{৩০} + ৩২ = \frac{২০}{৩০} + \frac{৩২ \times ৩}{৩০} = \frac{২৫}{২৪}; \\ \text{গ/গ} &= ৩০ + \frac{৫৬}{২৭} = \frac{৩০ \times ২৭ + ৫৬}{২৭} = \frac{৮৬৬}{২৭}; \end{aligned}$$

ম/ম = ২৭/২৫; ম/প = ২৫/২৪; প/ধ = ২৫/২২; ধ/ধ = ২২/২১; ন/ন = ২০/১৯; বিচার করলে দেখা যাবে স - র সঙ্গে ম- ও প-র সংবাদিত ঠিক আছে, অর্থাৎ ৪/৩ স্বরাস্তর ও ৩/২ স্বরাস্তর বজায় আছে; গ - র সঙ্গে ন - র সংবাদিতও ঠিক আছে, অর্থাৎ [ ৩০/২০ = ৩/২ ] · গ-র সঙ্গে ন-র সংবাদিতও শাস্ত্রানুযায়ী দেখা যায় [  $\frac{৫৬}{২৭} + ১৯ = \frac{৫৬}{২৭} + \frac{৫১৩}{২৭} = \frac{৫৬৯}{২৭} = ৩/২$  ]; শুধু র ও ধ এর সংবাদিত্বে গোলমাল দেখা যায় :—র-৩২, ধ-২১; অতএব র/ধ = ৩২/২১, যেটি ৩/২ অল্পপাতের চেয়ে বড়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য মতানুসরণকারী পণ্ডিতেরা তাই ধ-কে ২১"-তে সরিয়ে দিয়ে ৩/২ অল্পপাত ঠিক রাখার পক্ষপাতি [ কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখাবার আগে আমাদের বিচার করা উচিত ছিল; প্রাচীন শাস্ত্রমতে র-ধ সংবাদী কিন্তু র-প তো সংবাদী নয়। পারিজাতে র-পও সংবাদী হয়েছে [  $\frac{২৪}{২৮} = \frac{৩}{৭}$  ] যা অর্ন্তাচত মনে হয়। স্তত্রাং পারিজাতের র আর একটু সরে স-এর দিকে আসা উচিত ছিল; কাজেই কেবলমাত্র ধ-কে দোষী করে লাভ কি? পারিজাতের প্রাচীন একটি অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবকে অনুসরণ করতে গিয়ে ভুলে মধ্যযুগীয় ষড়্জ-পঞ্চমকে ব্যবহারে এনে আমরা গণনায় কিছু গুলট পালট করে ফেলেছি। অতএব র গ ধ ন র গ ধ ন সব

কয়টিতেই অশুদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কতটুকু অশুদ্ধতা সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

পারিজাতের ধ এর স্থান পরিবর্তনের স্বযোগ নিয়ে বর্তমানের দু' একজন পণ্ডিত ব্যক্তি পারিজাতের সঙ্গে আধুনিক সপ্তকের মিল করবার জন্তে গ-ন-কেও পরিবর্তিত করতে বলেছেন, যাতে স/গ=৫/৪ হয়, স/ন=১৫/৮ হয়। এঁদের মতে গ আছে স, ধ-এর মাঝে, কিন্তু ঠিক মধ্যস্থলে নয়। গ-এর স্থান ২৮ $\frac{১}{২}$ "-তে নয় ২৮ $\frac{১}{৪}$ "-তে ইত্যাদি। কিন্তু পারিজাতকার কোথাও এইভাবে কল্পনা করতে বলেন নি।

এখানেই শেষ নয়; কয়েকজন সঙ্গীত গুণী ধ-কে ২১ $\frac{১}{২}$ " ধরে গ বার করেছেন ২১ $\frac{১}{২}$ " + (  $\frac{৩৬-২১\frac{১}{২}}{২}$  ) = ২১ $\frac{১}{২}$  + ৭ $\frac{১}{২}$  = ২৮ $\frac{১}{২}$ "-তে এবং ন বার করেছেন ১৮" + (  $\frac{২১\frac{১}{২}-১৮}{৩}$  ) = ১৮" + ১ $\frac{১}{৩}$ " = ১৯ $\frac{১}{৩}$ "-তে। যেহেতু গ পরিবর্তিত হল, সেহেতু

ম ও হবে ১৮" + { (  $\frac{২৮\frac{১}{২}-১৮}{৩}$  ) + ৩ × ২ } = ১৮" + ১০ $\frac{১}{৩}$  ×  $\frac{১}{৩}$ " = ১৮" + ১১ $\frac{১}{৩}$ " = ২৯ $\frac{১}{৩}$ "-তে। তবুও ধ বার করতে অস্ববিধা দেখে এটিকে র-এর পঞ্চম হিসাবে ৩৩ $\frac{১}{২}$ " ×  $\frac{১}{৩}$ " = ২২ $\frac{১}{২}$ "-তে রেখেছেন। এর ফলে সপ্তকটি হচ্ছে—

৩৬" | ৩৩ $\frac{১}{২}$ " | ৩২" | ৩০" | ২৮ $\frac{১}{২}$ " | ২৭" | ২৫ $\frac{১}{২}$ " | ২৪" | ২২ $\frac{১}{২}$ " | ২১ $\frac{১}{২}$ " | ।

স    র    র    গ    গ    ম    ম    প    ধ    ধ

২০" | ১৯ $\frac{১}{২}$ " | ১৮" |

ন    ন    স

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হন নি। তিনি তারকে একটু অল্পভাবে ভাগ করতে চেয়েছেন। স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন-কে তিনি অল্পাল্প পণ্ডিতদের স্থিরীকৃত স্থানেই রেখেছেন, কিন্তু র-কে রেখেছেন স ও র-এর

মাঝখানে অর্থাৎ ৩২" +  $\frac{(৩৬"-৩২")}{২}$  = ৩২" + ২ = ৩৪"-তে; ম-কে রেখেছেন

ম ও প-এর মাঝখানে অর্থাৎ ২৪" +  $\frac{(২৭"-২৪")}{২}$  = ২৪" +  $\frac{৩}{২}$  = ২৫ $\frac{১}{২}$ "-তে;

ধ-কে রেখেছেন র-এর পঞ্চম হিসাবে অর্থাৎ ৩৪" ×  $\frac{১}{৩}$  - ৩২ $\frac{১}{২}$ "-তে; এবং ন-কে রেখেছেন গ-এর পঞ্চম রূপে অর্থাৎ ২৮ $\frac{১}{২}$ " ×  $\frac{১}{৩}$  = ১৯ $\frac{১}{৩}$ "-তে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত করেও ভারতীয় স্বরসম্প্রকের কোন রূপের সঙ্গেই ওপরের হিসাবের মিল হয় নি, মিল হয়নি ডায়ালটোনিক পিথ্যাগোরীয়ান স্কেলের সঙ্গে, এমন কি সমশ্রুতিক বা অসমশ্রুতিযুক্ত সম্প্রকের সঙ্গে।

এবার তারের ব্যাপারে যে দুটি প্রশ্ন জাগে সে দুটি বলছি।

১। একটি স্বরের তারের লম্ব দেওয়া থাকলে অগ্রগুলির স্থান কিভাবে বার করা যাবে ?

২। একটি স্বরের কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে কম্পাঙ্ক উৎপাদনকারী তারটির অল্পপাতিক লম্ব দেওয়া থাকলে অগ্র যে কোন স্বরের কম্পাঙ্ক ও লম্ব কি উপায়ে নির্ণয় করা যায় ?

উত্তর : আমরা ধরে নিয়েছি স তারের লম্ব ৩৬" ও কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে (২৪০)। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কোমল র-এর লম্ব ও কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে স-এর সঙ্গে কোমল র-এর স্বরাস্তর অল্পপাত কি আছে তা জানতে হবে, না হলে উত্তর দেওয়া যাবে না। ধরা যাক, এই অল্পপাত অর্থাৎ  $s/r = 29/25$ । নিয়ম হল, উঁচু স্বরের দৈর্ঘ্য বার করতে হলে জানা দৈর্ঘ্যটিকে অল্পপাত দিয়ে ভাগ করতে হবে, নিচু স্বরের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে

$$\text{এখানে র উঁচু স্বর কাজেই র-এর দৈর্ঘ্য হবে } 36 + \frac{29}{25} = \frac{8}{25} \times 25 = \frac{100}{25} = 40 = 36 \frac{4}{9}$$

অহোবলের ৯। কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়মটি ঠিক উলটো; সুতরাং স-এর

$$\text{আন্দোলন সংখ্যা } 240 \text{ হলে র হবে } 240 \times \frac{29}{25} = \frac{1224}{5} = 244 \frac{4}{5} \text{ সঃ=অহোবলের}$$

কোমল ৯-র কম্পাঙ্ক। অহোবলের শুদ্ধ গ অর্থাৎ আমাদের সময়ের কোমল ৯-

$$\text{এর অল্পপাত আমরা পেয়েছি। } 36/5 \left[ \frac{s}{r} \times \frac{r}{g} = \frac{2}{5} \times \frac{25}{15} = \frac{6}{5} \right] \text{ সুতরাং গ-এর লম্ব}$$

হল  $36 + \frac{6}{5} = \frac{186}{5} = 37.2$  এবং কম্পাঙ্ক হল  $240 = \frac{186}{5} = 244 \frac{4}{5}$  সঃ। কিন্তু অল্পপাত জানা থাকলে হয় দৈর্ঘ্য নয় কম্পাঙ্ক জানা থাকা চাই। এ ক্ষেত্রেও একটি সরল

নিয়ম আছে ; নিয়মটি হল আদর্শের লম্বকে আলোচ্য স্বরটির লম্ব দিয়ে ভাগ করে আদর্শের কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য স্বরের কম্পাঙ্ক পাওয়া যাবে, এবং আদর্শের কম্পাঙ্ককে আলোচ্য স্বরটির কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করে আদর্শের লম্ব দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য স্বরটির লম্ব পাওয়া যাবে। ধরা যাক র-এর লম্ব ৩২", তাহলে তার কম্পাঙ্ক কত হবে ?

এক্ষেত্রে আদর্শের লম্ব হল ৩৬" এবং তার কম্পাঙ্ক ২৪০ ; তাহলে র-এর কম্পাঙ্ক

২ ৩০

হবে  $\frac{৩৬}{৩২} \times ২৪০ = ২৭০$  সঃ। ধরা যাক, গ-এর কম্পাঙ্ক ৩০৩ $\frac{৩}{৪}$ , তাহলে তার লম্ব কত ? এক্ষেত্রেও আদর্শের কম্পাঙ্ক ২৪০ এবং লম্ব ৩৬" ; সুতরাং গ-এর লম্ব হবে

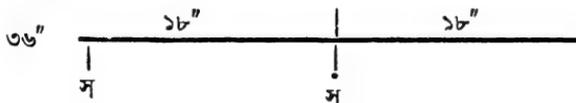
$$২৪০ \times ৩৬ = \frac{৩৬ \times ২৪০}{৩২} = \frac{২৫৬}{২} = ১২৮$$

এবার অহোবলের তারের লম্বের হিসাব বোঝা যাক—

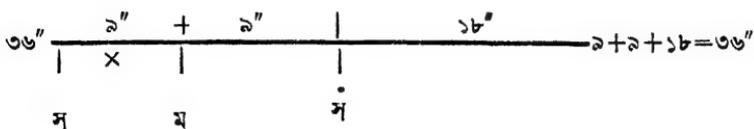
তারটি ৩৬" অর্থাৎ পুরো তারটা বাজলে স বলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বরস্থানের নিচের অংশটিই আন্দোলিত হয়ে স্বরটিকে প্রকাশ করে।

৩৬"

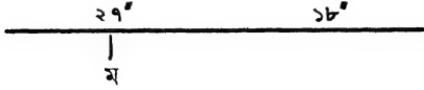
একে অর্ধেক করলে, উপর থেকে অর্ধেকের বিন্দুতে এলে ঐ বিন্দুতে তারার স অর্থাৎ স বসবে। তাহলে স বসল ১৮"র বিন্দুতে। অর্থাৎ এই বিন্দুতে তার চেপে ধরে আঘাত করলে নিচের ১৮" অংশটি স বলবে।



উপরের দিকের এই ১৮" তারটুকুকে অর্ধেক ভাগ করলে উপরের অর্ধেকের শেষ বিন্দুতে বসবে ম। অর্থাৎ ম বসবে উপর থেকে ৯" ইঞ্চি নিচে (১৮"র অর্ধেক)।

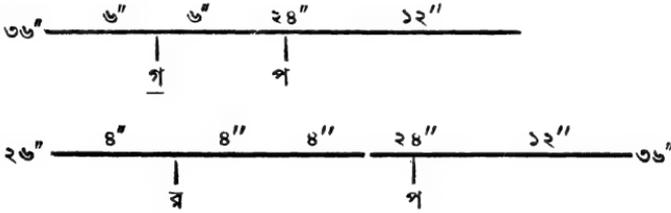


উপর থেকে ২" নিচে এই বিন্দুতে চেপে ধরে তারে আঘাত করলে তারের নিচের অংশটি ম বলবে। এই নিচের অংশটির দৈর্ঘ্য কত?  $৩৬"-২=২৭"$ । স্তত্রাং ম বসছে নিচে থেকে ২৭" উপরে।



এরপর পুরো তারটাকে তিন ভাগ করে ওপর থেকে এক তৃতীয়াংশের শেষ বিন্দুতে প-কে বসান হচ্ছে।  $৩৬"-৩=১২=১২"$ ।

তাহলে প বসছে উপর থেকে ১২"-র শেষ বিন্দুতে এবং এর নিচের অংশটিই আঘাত পেলে প-কে প্রকাশ করছে। যেহেতু এই নিচের অংশটির মাপ  $৩৬"-১২=২৪"$ , তাই বলা হচ্ছে প আছে ২৪"তে। এরপর ওপর থেকে প পর্যন্ত ১২" অংশটিকে অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশে ভাগ করা হচ্ছে। ১২"-র অর্ধেক ৬" এবং একতৃতীয়াংশ ৪", স্তত্রাং র বসছে ওপর থেকে ৪" নিচে আর গ বসছে উপর থেকে ৬" নিচে।



ঐ ৬"-তে চেপে ধরে বাজালে নিচের সম্পূর্ণ অংশটি গ বলবে। যেহেতু নিচের অংশটি  $৩৬"-৬=৩০$ , সেহেতু বলা হচ্ছে, যে গ ৩০"-তে বসছে। ঠিক একই কারণে র বসছে  $৩৬"-৪=৩২"$ -তে। অপর দিকে প ও স-এর মাঝের অংশটির মাপ হল  $২৪"-১৮=৬"$  এই ৬"-কে ঙ্গ করে নিলে ৩" পাওয়া যায়, যেখানে ধ বসে। এর নিচের অংশ হল  $১৮"+৩=২১"$ , যাতে আঘাত করলে ধ বাজবে। স্তত্রাং ধ বসছে ২১"-তে। অগ্গাশ্ব স্বরের ব্যাপারও ঠিক এই ভাবেই বিচার করতে হবে।

### শ্রুতি

শ্রবণাং শ্রুতি—এই ‘শ্রবণ’ শব্দটি থেকেই ‘শ্রুতি’ কথাটি এসেছে। যে সঙ্গীত-ধ্বনি আমরা কানে শুনতে পাই, তাকেই শ্রুতি বলা যায়; অর্থাৎ নাড়

থেকেই শ্রুতির জন্ম। কোন তারে আঘাত করলে প্রথমে তারের কম্পন থেকে যে সর্বনিম্ন কর্ণগ্রাহ্য ধ্বনিটি পাওয়া যায়, তাকেই আমরা আদি শ্রুতি বলে ধরে থাকি।

এই শ্রুতিকে প্রাচীনকালে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি হল স্বরস্থিত অর্থাৎ স্বরগত শ্রুতি; দ্বিতীয়টি হল অন্তর শ্রুতি ( অর্থাৎ, পর পর দু'স্বরের মাঝখানে যে শ্রুতি আছে। ) এখন শ্রুতি বলতে স্বরাস্তর বিভাগকেই বলা হয়। এই শ্রুতির অভিব্যক্তি থেকে প্রকাশিত রঞ্জনগুণ-বিশিষ্ট মধুর ধ্বনিই হল স্বর।

শ্রুতির স্বরসংখ্যা সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত ও মতাস্তর রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ বেছে নিয়েছে মাত্র বাইশটি ( ২২ ) শ্রুতি। শ্রুতি-সংখ্যা-নির্ণয় প্রসঙ্গে ‘শাস্ত্রকারেরা’ বলেছেন—তারা অগণ্য, কারণ তারা “কেশাগ্রবৎ অল্পস্বতঃ”, অর্থাৎ এক চুল পরপর অবস্থিত। আবার বলেছেন, “শ্রুতিস্থানে স্বরাং বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি শক্যতে,” আরও বলা হয়েছে :

“জলেযু চলতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে

গগনে পক্ষীগাং যদৎ তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ ॥

—জলে মাছের চলার পথ বা আকাশে পাখীর উড়ার পথ যেমন বোঝা যায় না, বা তাদের সংখ্যা যেমন গণনা করা যায় না, স্বরের মাঝে শ্রুতির সঠিক অবস্থান ও সংখ্যাও তেমনি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা এই অসংখ্য শ্রুতি থেকে যে বাইশটি শ্রুতি বেছে নিলেন, তাদের নাম হল যথাক্রমে :

তীব্রা, কুম্বরতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রোদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রঞ্জা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিনী।

ভারতবর্ষে মাত্র এই বাইশটি শ্রুতিই কেন গৃহীত হয়েছিল, অথচ আরব, গ্রীস, প্রভৃতি নানা দেশে শ্রুতির সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে কেন ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে উঠেছিল, তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা, বা কেন এই মতাস্তর বর্তমান, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমাদের দেশে অল্পই হয়েছে। শ্রুতি সম্বন্ধে রাজা সুর শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীযুত ভবন রাও পিঙ্গলে, শ্রীযুত মহেশ্বর্কি, শ্রীযুত দেবল, মিঃ উইলিয়াম জোন্স, মিঃ ক্লেমেন্টস, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী, শ্রীযুত আচার্যকর প্রভৃতি গুণী পণ্ডিতেরা অনেক কথা লিখেছেন। শ্রুতির অন্তর-বিভাগের এই অসম বন্টন কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তা তাঁরা খুঁজে বের করার চেষ্টা

করেছেন। এঁদের রচিত পুস্তক পাঠে সে সব কথা জানা যাবে; সব বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমবন্টনের পক্ষপাতী, আবার কেউ বা অসমবন্টনের পক্ষপাতী। সমবন্টন করলে সংবাদীরূপে 'ম' ও 'প' স্বরের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। 'ম' ও 'প'-কে স্থির রাখলে তবেই আমরা সমবন্টনের কথা চিন্তা করতে পারি। অথচ 'ম' ও 'প'-কে স্থির রেখে সমবন্টন করা বিজ্ঞানসম্মত বলে আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষ কেন এই বাইশটি শ্রুতি বেছে নিয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে যুক্তিসম্মত কোন বিচারের সন্ধান আমরা পাইনি।

সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম. বি. মহাশয় শ্রুতির উৎপত্তি ও সংখ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। ডাঃ রায় বলেছেন যে প্রাচীনকালের গান ছিল অবরোহক্রমিক। এই অবরোহ-ক্রম অনুসারে পণ্ডিতেরা একটা 'স্কেল' (scale) তৈরীর চেষ্টা করেন। একটি খরজের তারের অর্দ্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি অবরোহক্রমিক ভাগ করতে গিয়ে তাঁরা অর্ধেক ভাগেই একটি উঁচুর 'স' পেয়ে যান। কিন্তু তিন ভাগ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মাঝখানে পেয়ে যান পঞ্চম বা 'প' স্বরটিকে; চার ভাগ করতে নতুন কোন 'স' পান না; কেবলমাত্র খুঁজে পান মধ্যম, অর্থাৎ 'ম' স্বরটিকে। তখন নীচু 'স' ও উঁচুর 'স'-এর মাঝের অংশটিকে একটি স্কেল ভেবে নিয়ে তাঁরা 'স'-এর সঙ্গে 'ম' এবং 'প'-এর সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে 'ম' ছুই 'স'-এর মাঝখানে রয়েছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে 'প' আছে প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সংযোগস্থলে। ভাষান্তরে বলা যায় যে তারকে অর্ধেক হিসাবে ধরলেও 'ম' ও 'প'-র সঙ্গে সম্পর্কটি হুঁ, ঠু রূপেই রয়ে যাচ্ছে।

আরও মজার কথা, 'ম' যেমন তারের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 'স' ও 'স'-র মাঝে থাকে; 'প' স্বরটিও তেমনি ধ্বনির তীক্ষ্ণতা বিচারে 'স' ও 'স'-র মাঝে রয়েছে, অর্থাৎ দুটি স্বরই বিশিষ্ট।

এ পরণের মিল ছাড়া এদের অপর বৈশিষ্ট্য হল খরজের সঙ্গে এদের অন্তত মিল বা সংবাদিত্ব। তারের মাপ দিয়ে 'স' ও 'ম' এবং 'প' ও 'স'-র অনুপাত স্থির করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন, 'স' ও 'ম' এবং 'প' ও 'স'-র অনুপাত উভয় ক্ষেত্রে একই (৪/৩);

অর্থাৎ 'স' ও 'ম'-র প্রতিটি অংশেরই একটি করে সংবাদযুক্ত অংশ 'প' ও 'স'-তে বর্তমান আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্য বিচার করে 'ম' - 'স'-কে এবং 'স' - 'প'-কে ১/২ ও ১/৩ ভাগ করে তাঁরা আরও চারটি স্বর লাভ করলেন 'র', 'গ', 'ধ' ও 'ন'। এইভাবে শ্রুতিবিভাগে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের উদ্ভব হল, যথা—

সা								
	৩৬		৩৩	৩১ই		২৭		২৪
								২২
								২১
								১৮

এই সপ্তকের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা গেল :—

- (১) এর মধ্যে 'স ম' ও 'প স' এই দুটো সমান অনুপাতযুক্ত অংশ আছে,
- (২) 'স' থেকে শুরু করে পরপর স্বরগুলির মাঝে ১২/১১, ২২/১১, ৭/৬, ২/৮, ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬ অনুপাত আছে, যেখানে কোন স্বর বসানো নেই অথচ বসানো যায়।

এই লক্ষণগুলির সাহায্যে পণ্ডিতগণ অপর একভাবে সপ্তকরচনার বিষয় বিবেচনায় সচেষ্ট হলেন :—(ক) একদিকে তাঁরা 'ম' ও 'প'-র নির্দিষ্ট ২/৮ অনুপাত দিয়ে সপ্তকটির মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করলেন। (খ) অপরদিকে ক্রমিক স্বরগুলির মাঝের অনুপাতসমূহের সাহায্যে সপ্তকটির বিশ্লেষণ করলেন। অতঃপর এই দুই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে (গ) সপ্তককে সাতের পরিবর্তে কত সূক্ষ্মতর ভাবে ভাগ করা যায়, তা আবিষ্কার করলেন এবং স্বরগুলির মাঝের ফাঁক বা অপূর্ণ স্থানগুলিকেও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম স্বব দিয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন।

নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল :—

(ক) 'ম' - 'প'-র ২/৮ অনুপাত দিয়ে 'স' - 'ম' ও 'প' - 'স'-কে ভাগ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাগফল হয়  $২ + \frac{১}{৪}$ । অতএব একটি সপ্তকে

$\left[ \left( \text{স} - \text{ম} \right) \quad \left( \text{প} - \text{স} \right) \right]$  এবং 'ম' — 'প' মিলে ৫টি  $\frac{২}{৮} + ২$ টি  $\frac{১}{৪}$  আছে। ঐ  $\frac{১}{৪}$  আবার  $\frac{২}{৮}$ -এর মধ্যে প্রায় ২ই বার পাওয়া যায়; অর্থাৎ  $\frac{২}{৮}$ -কে ২ ধরলে  $\frac{১}{৪}$  স্থূলভাবে ৪ হয়। অতএব 'ম' — 'প'-কে ২ ধরলে  $\frac{১}{৪}$  স্থূলভাবে ১ হয়। 'মা' - 'পা'-কে ৩ ধরলেও  $\frac{১}{৪}$  স্থূলভাবে ১-ই হয়; 'ম' - 'প'-কে ৪ এবং ৫ ধরলে অপরটি ২ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ম' - 'প'

৪ হলে ঐষ্ট্য়-এর মান ১-এর কিছু বেশী হয়। ভারতীয় গুণীগণ ঐষ্ট্য়-এর মান ১-ই ধরেছিলেন। তাঁরা ঐষ্ট্য়-কে ১ শ্রুতি বলে গণ্য করেছিলেন এবং ২/৮-কে ৪ শ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; ফলশ্রুতি হল এই যে তাঁরা  $৫ \times ৪ + ২ \times ১ = ২২$  শ্রুতি পেলেন। এই দ্বাবিংশ শ্রুতির পশ্চাতে (খ)-এর তথ্যগত প্রভাব বিস্তারিত ছিল: আগেই দেখান হয়েছে, (খ) স্বরগুলির পারস্পরিক অনুরূপাত পাওয়া গিয়েছিল ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬, ২/৮, ১২/১১, ২২/২১ ও ৭/৬। এই অনুরূপাতগুলিকে সমানানুরূপাতে পূর্ণসংখ্যায় রূপায়ন মানসে ল. সা. গু. করে ২৭৭২ সংখ্যাটি প্রাপ্ত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা দেখলেন, একটি সপ্তককে ২৭৭২টি সূক্ষ্মভাবে ভাগ করা যায় এবং এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এককগুলির প্রত্যেকটিকে শ্রুতি ধরলে শ্রুতির সংখ্যা হয় ২৭৭২, অর্থাৎ অনন্তমান।

এই সূক্ষ্ম বিভাগ সঙ্গীতের অনুরূপযোগী বলে প্রাচীন গুণীজন স্থূল সংখ্যার সন্ধানে (ক)-এর সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করলেন। ২৭৭২ এর ভাজক হল ৭, ১১, ১২, ২১, ২২, ২৮, ৩৩, ৪৪, ৬৬ ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'ম' - 'প'-কে ২ ধরলে পাওয়া গেল  $৫ \times ২ + ২ \times ১ = ১২$  শ্রুতি: এটা অতিস্থূল এবং আমাদের সপ্তকের শুদ্ধ ৫ বিরুদ্ধ স্বরের সমষ্টি। 'ম' - 'প'-কে ৩ ধরলে পাওয়া যায়  $৫ \times ৩ + ২ \times ১ = ১৭$  শ্রুতি; আরবীয়রা এর ব্যবহার করেন, কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ১৭ নয় বলে ভারতীয়রা এটি গ্রহণ করেননি। 'ম' - 'প'-কে ৪ এবং ঐষ্ট্য়-কে ১ ধরলে আমরা পাই  $৫ \times ৪ + ২ \times ১$  বা ২২ শ্রুতি! এই ২২ সংখ্যাটি ২৭৭২-এর ভাজক, এই বিবেচনায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। যদি 'ম' - 'প'-কে ৪ ধরে ঐষ্ট্য়-কে ২ ধরা হত, তাহলে গ্রীকদের  $৫ \times ৪ + ২ \times ২$  বা ২৪ শ্রুতি হত বটে: কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ২৪ নয়। তেমনি 'ম' - 'প'-কে ৯ এবং ঐষ্ট্য়-কে ৪ মনে করলে আধুনিক ইউরোপে অচক্ষত  $৫ \times ৯ + ২ \times ৪$  বা ৫৩টি শ্রুতিও ২৭৭২-এর ভাজক নয়। এই কারণেই ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানীগণ ২৭৭২-এর অগ্রতম ভাজক ২২-কেই গ্রহণ করে যোগনা করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি আছে।

এখন বিচার করলে দেখা যাবে, ভগ্নাংশ এড়িয়ে গেলে ২/৮ এবং ৭/৬ হবে ৪ শ্রুতি, ১২/১১ হবে ৩ শ্রুতি এবং ২২/২১ হবে ২ শ্রুতি। অর্থাৎ সপ্তকটি লিপিবদ্ধ করলে দাঁড়াবে:—স ৩, র ২, গ ৪, ম ৪, প ৩, ধ ২,

ন ৪, স। মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালে ব্যবহারিক সঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য

রাধার জন্ম ভারতীয় শ্রেণীগণ 'গ' - 'ম' ও 'ন' - 'স'-র মধ্যে অনুপাতের সমতা এনেছিলেন। ফলে আসল ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের রূপ হয়েছিল :

স্বর ... .. স র গ ম প ধ ন স  
স্বরের মাঝের অনুপাত ... ১২/১১ ৮৮/৮১ ২/৮ ২/৮ ১২/১১ ৮৮/৮১ ২/৮

স্বরের মাঝের শ্রুতি সংখ্যা দাঁড়াল ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪

পরবর্তীকালে এটাকে বদলে আমরা ইউরোপীয় অনুপাত গ্রহণ করেছি।

সুতরাং সপ্তকটি বোধ হয় দাঁড়িয়েছিল নিম্নরূপ :

স, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ২/৮ ম, ২/৮ প, ১০/৯ ধ, ১৬/১৫ ন, ২/৮ স।

বর্তমানে বিলাবল ঠাটের মত সপ্তক হওয়ায় তার অনুপাত দাঁড়িয়েছে :

স, ২/৮ র, ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ২/৮ প, ২/৮ ধ, ১০/৯ ন, ১৬/১৫ স।

শ্রুতির হিসাবকালে বর্তমানে ভারতের দিল্লীস্থিত 'সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি' পঞ্চম ও ষৈবতের মাঝে তিন শ্রুতি ধরেছেন। সেক্ষেত্রে 'প' ও 'ধ'-এর মাঝের অনুপাত হবে ১০/৯, এবং 'ধ' ও 'ন'-এর মাঝের অনুপাত হবে ২/৮। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, মধ্যযুগের প্রাচীন নিখাদকে যদি আমরা 'স'-রূপে ধরি, তাহলে যে সপ্তক পাওয়া যায়, সেটা নিম্নপ্রদর্শিত (খ)-এর মত হবে :

প্রাচীন : (ক) ন, ২/৮ স, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ২/৮ ম, ২/৮ প, ১০/৯

ধ, ১৬/১৫ ন

বর্তমান : (গ) স, ২/৮ র, ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ২/৮ প, ২/৮ ধ, ১০/৯

ন, ১৬/১৫ স।

## স্বর

শ্রুতির ব্যবহারিক অবস্থাই স্বর। নাদের অন্তরণন থেকে যে কোমল আনন্দদায়ক ধ্বনি বেরোয়, তাকেই স্বর বলে। শুদ্ধ স্বর সাতটি। পণ্ডিতেরা শ্রুতিবিভাগে প্রত্যেকটি স্বরের এক একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন; সেই বিশেষ জায়গায় অবস্থানই তার (অর্থে স্বরের) পরিচয়। ইংরাজীতে এদের "নোট" (note) বলা হয়।

স্বরের সংখ্যা সাত; এদের নাম :

ষড়্জ বা খড়্জ = স, ঋষভ বা রিখব = র, গান্ধার = গ, মধ্যম = ম, পঞ্চম = প, ষৈবত = ধ, নিষাদ বা নিখাদ = ন।

এই স্বরসংকেতের প্রাচীন যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা নীচে লেখা হল। এই সাত স্বরের নামের যে প্রাচীন ব্যাখ্যা “সঙ্গীত-রত্নাকর”-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের টাকাকার সিংহ-ভূপাল “সঙ্গীত সময়সার” থেকে উদ্ধৃত করে রত্নাকরের প্রথম খণ্ডে সঙ্গীতাদ্যায়ে শ্লোকটির যে অনুলিপি দিয়েছেন, সেটি নীচে লিখছি। বাংলায় এক কথায় তার সহজ অর্থ ও অর্থ মতের কথাগত শ্লোক উল্লেখ না করে কেবলমাত্র ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে লিখছি :

**যড্‌জ**— নাসা কণ্ঠ উরস্তালু জিহ্বা দস্তান্তথৈব চ।

যড্‌ভি: সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎযড্‌জ ইতি স্মৃতঃ ॥

স—(১) শরীরের ছয় স্থান থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম যড্‌জ।

(২) অপরাপর ছয় স্বরের জনক (অর্থাৎ জন্মদাতা) বলে একে যড্‌জ বলা হয়।

**ঋষভ** ( বা রিখব )—নাভে: সমুখিতো বায়ু: কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।

নদত্যযভবগ্‌স্মান্তস্মাদযভ ঈরিতঃ ॥

র—(১) শির থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম ঋষভ।

(২) প্রথম এবং প্রধান স্বর বলে এর নাম ঋষভ। ( গাভীদের মধ্যে যেমন বুধ, স্বরের মধ্যে তেমনি ঋষভ। )

(৩) ঋগ্‌বেদ এই স্বরে পাঠ করা হত বলে এর নাম ঋষভ।

**গাঙ্কার**—নাভে: সমুখিতো বায়ু: কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।

গঙ্কর্বস্বথহেতু: স্মাদ্‌গাঙ্কারস্তেন হেতুনা ॥

গ—(১) নাসিকা থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম গাঙ্কার।

(২) গন্ধ বহন করে বলে এর নাম গাঙ্কার।

(৩) গন্ধর্বলোক থেকে পাওয়া যায় বলে এর নাম গাঙ্কার।

**মধ্যম**—বায়ু: সমুখিতো নাভেহর্জদয়ে চ সমাহতঃ।

মধ্যস্থানোদ্‌ভবস্তাত্তু মধ্যমস্মেন কীর্তিতঃ ॥

ম - (১) সাত স্বরের মাঝখানে আছে বলে এর নাম মধ্যম।

(২) বক্ষ থেকে জন্ম বলে এর নাম মধ্যম।

**পঞ্চম**—বায়ু: সমুখিতো নাভেরোষ্ঠকণ্ঠ শিরোহৃদি।

পঞ্চস্থানসমুদ্ভূত: পঞ্চমস্তেন কীর্তিতঃ ॥

প—(১) শরীরের পাঁচটি স্থান থেকে জন্ম নেয়, তাই এর নাম পঞ্চম।

(২) ‘স’ থেকে গুণলে পঞ্চম সংখ্যার স্থানে পাওয়া যায় বলে পঞ্চম।

**ধৈবত**—নাভে: সমুখিতো বায়ু: কণ্ঠতালুশিরোহৃদি ।

তন্ত্ৰংস্থানধৃতো ষম্মান্ততোহসৌ ধৈবতোমত: ॥

ধ—(১) নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির ও হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধৈবত ।

(২) অধিকৃতভাবে ধরে থাকার জগ্ৰ ধৈবত ।

**নিষাদ**—নাভে: সমুখিতে বায়ৌ কণ্ঠতালুশিরোহৃতে ।

নিষীদন্তি স্বরা: সর্বে নিষাদন্তেন কথ্যতে ॥

ন—(১) শরীরের সবস্থান থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম নিষাদ ।

(২) সপ্তস্বরের শেষ স্বর বলে এর নাম নিষাদ ।

এখানে দেখা যায় প্রত্যেক স্বরের আত্মাক্ষরকে অবলম্বন করেই স্বরের সাতটি চলিত নাম জন্ম নিয়েছে ।

প্রমাণে—কবিচক্রবর্তী জগদেকমল তাঁর “সঙ্গীত-চূড়ামণি” গ্রন্থে লিখেছেন যে মতঙ্গ-প্রণীত “বৃহদ্বৈশী” গ্রন্থে স্বরনির্ণয় প্রকরণে ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সৌমাদৃশ্য রেখে অ-বর্গ, ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ, য-বর্গ, শ-বর্গের অস্তিত্ব করে স্বরমাত্রায়ুক্ত হিসাবে প্রত্যেক স্বরকে বিভিন্ন বর্গাশ্রিত বলা হয়েছে । বর্তমানে যে “বৃহদ্বৈশী” গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে এ জাতীয় বিচার বা লেখার সাক্ষাৎ যদিও আমরা পাই না, তবুও আগে এরকম লেখা হয়তো ছিল, এই আশায় আমরা সেটি দেখাচ্ছি :

শ— বর্গ থেকে ‘স’—মৃড

অন্তঃস্থ ” ” ‘র’—রিষভ

ক— ” ” ‘গ’—গান্ধার

প— ” ” ‘ম’—মধ্যম

” ” ” ‘প’—পঞ্চম

ত— ” ” ‘ধ’—ধৈবত

” ” ” ‘ন’—নিষাদ

**চল স্বর**—যাদের বিকৃতি ঘটানো চলে, তারা স্বস্থান থেকে এদিক-ওদিক যেতে পারে । তারাই হল চল স্বর । তাদের নড়ানো বা সরানো যায় ।

**অচল স্বর**—যাদের বিকৃত নেই ও যারা অনড়, তারাই হল অচল স্বর । তাদের নড়ানো বা সরানো যায় না ।

**সাত স্বর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী মত**—এই মতে ‘স’ ও ‘প’-কে অচল স্বর ও

শুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। বাকী পাঁচটি ( অর্থাৎ, র-গ-ম-ধ-ন )-কে চল স্বর বলা হয় ; এগুলি কোন সময়েই শুদ্ধ নয়, এই তাঁদের অভিমত। যথা—আমাদের শুদ্ধ ‘ম’=কোমল ‘ম’ ; আমাদের তীব্র ‘ম’=কড়ি ‘ম’ ; অর্থাৎ উচ্চশক্তির চল স্বরদের তীব্র ও নিম্নশক্তিদের কোমল বলা হয়। আমাদের শুদ্ধ ‘র’=তীব্র ‘র’ ; আমাদের কোমল ‘র’=কোমল ‘র’-ই।

কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্যা দাঁড়াল বারটি, যথা :—

|  
স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন।

এখানে শুদ্ধস্বর কেবলমাত্র স ও প, কিন্তু চলিত নিয়মে সাতটি স্বরই তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কালে শুদ্ধস্বর নামে পরিচিত। অতএব এই হিসাবে শুদ্ধস্বর সাতটি—এই শুদ্ধস্বরকে অনেকে প্রাকৃত স্বর বলে থাকেন।

**বিকৃত স্বর**—শুদ্ধ স্বরের নির্দিষ্ট স্থানচ্যুতি থেকেই বিকৃত স্বরের জন্ম। মোট পাঁচটি বিকৃত স্বরের ব্যবহার প্রচলিত, যথা—‘র’ ‘গ’ ‘ম’ ‘ধ’ ‘ন’। এদের মধ্যে ‘র গ ধ ন’ এই চার বিকৃত স্বরকে **কোমল ( কোমিল ) স্বর** ও বিকৃত ‘ম’ স্বরটিকে **তীব্র মধ্যম ( তীব্র মধ্যম )** বা **কড়ি ম** বলা হয়। ‘কড়ি’ ও ‘তীব্র’ শব্দটি হিন্দী। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে ‘স’ ও ‘প’ স্বরদ্বয়ের যে বিকৃতি হয় না, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধরূপেই স্বীকৃতিলাভ করেছে।

এখন আমরা মোট বারটি স্বর পাচ্ছি। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত। কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্যা দাঁড়াল বারটি :

|  
স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন।

এই দ্বাদশ স্বর আমাদের রাগ গঠনের মূলধন। বারটি স্বরের মধ্যে বড়জ ( অর্থাৎ ‘স’ ) স্বরটিই আমাদের প্রধান স্বর। ইউরোপীয় সঙ্গীতে যেমন ‘স’ স্বরটির নির্দিষ্ট উচ্চতা ( pitch ) আছে, আমাদের সঙ্গীতে তেমন নেই। ইউরোপীয়দের যেমন C-নামক একটা নির্দিষ্ট ‘স্কেল’ ( tonic scale ) বাঁধা আছে, আমাদের তেমন নেই। আমাদের সঙ্গীতে ‘স’ স্বরটি গায়কগণ স্ব স্ব কণ্ঠের ওজন ( volume ) অনুযায়ী, এবং বাদকগণ তাঁদের বাগের মাপ অনুযায়ী নিজ নিজ সুবিধামত স্বরের উচ্চতা ( pitch ) স্থির করে শক্তির অন্তর্বিভাগ অনুযায়ী সপ্তকের অন্যান্য স্বর সাজিয়ে নেন।

## হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর পদ্ধতি

উভয় ক্ষেত্রেই বারটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি কর্ণাটক পদ্ধতিতে বিকৃত স্বরগুলির নাম শ্রুতির হিসাবে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পার্থক্যটি আমাদের জানা দরকার। আমরা তাদের বিভিন্ন নামের পরিচয় নীচে লিপিবদ্ধ করলাম। বাহান্তর ঠাট আলোচনার সময় এই পরিচয় আমাদের কাজে লাগবে।

ক্রমিক সংখ্যা	দক্ষিণী পদ্ধতির বারটি স্বর ও তাদের দক্ষিণী নাম	ভেঙ্কটামখীর কায়দায় [ প্রতিটি স্বরের ] অবস্থান-জ্ঞাপনের জন্য সংকেতলিপি	হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে কোনটি কোন্ স্বরের অন্তর্ভুক্ত
১	স	স	স
২	শুদ্ধ 'র', ( একশ্রুতিক	র	র ( কোমল )
৩	শুদ্ধ গ বা চতুশ্রুতি র*	রি, গ	র ( শুদ্ধ )
৪	যটশ্রুতি র বা সাধারণ গান্ধার	ক	গ ( কোমল )
৫	অন্তর গান্ধার	গি	গ ( শুদ্ধ )
৬	শুদ্ধ মধ্যম	ম	ম ( শুদ্ধ বা কোমল )
৭	প্রতি মধ্যম	মি	ম ( তীব্র বা কড়ি )
৮	প	প	প
৯	শুদ্ধ ধ ( একশ্রুতিক )	ধ	ধ ( কোমল )
১০	শুদ্ধ ন ( " ) বা চতুশ্রুতিক ধ	ধি } ন }	ধ ( শুদ্ধ )
১১	যটশ্রুতিক ধ } বা কৈশিকী ন }	ধু } নি }	ন ( কোমল )
১২	কাকলী ন	নু	ন ( শুদ্ধ )

\* আধুনিককালে প্রাচীন কর্ণাটক পঞ্চশ্রুতিক 'র' ও 'ধ' চতুঃশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে এবং হিন্দুস্থানী শুদ্ধ 'র' ও শুদ্ধ 'ধ' সমশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

এই স্বরবিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভেঙ্কটামথী প্রতিটি স্বরের বিভেদ, বিকৃতি ও শ্রুতিগত অবস্থান বোঝানোর জন্য ভাষার বর্ণমালার মাত্র তিনটি স্বরবর্ণের সাহায্য নিলেন। এটি তাঁর এক অভিমব পন্থা; নানা চিহ্নের আবের্তে না হারিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন মাত্র তিন স্বরবর্ণের, যথা 'আ', 'ই' ও 'উ'। অতি সহজ এক উপায়ে তিনি বিকৃত স্বরের যথাক্রমিক নাম দিলেন: 'র', 'রি', 'রু', 'গ', 'গি', 'গু', 'ম', 'মি', 'ধ', 'ধি', 'ধু', 'ন', 'নি' ও 'নু'। অনেকে বলেন তাঁর এই স্বরবর্ণের কায়দাটি তাঁর পিতা গোবিন্দ দীক্ষিতের আবিষ্কার। শ্রীযুত গোবিন্দ দীক্ষিত তাঞ্জোরের রাজা অচ্যুতান্না নায়কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (রাজস্ব-কাল ১৫৭২ খৃঃ—১৬১৪ খৃঃ)। অন্তর্নিহিত আছে, তিনি দক্ষিণ ভারতের কুদিমিয়া-মালাই নামক স্থান থেকে প্রস্তরে উৎকর্ণ স্বরলিপি দেখে সেটি নিজ সংগ্রহের মধ্যে রেখে দেন। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এই লিখন সপ্তম শতাব্দীর। ভারতের 'নাট্যাশাস্ত্র' চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত; কাজেই এটি তৎপরবর্তী ঘটনা। যদিও ভারতবর্ষের Epigraphy Department ১২০৪ খৃষ্টাব্দে এটি আবিষ্কার করেন, তথাপি দক্ষিণ পণ্ডিতবর্গের অনেকের ধারণা যে যেহেতু রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ দীক্ষিতের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও অচসঙ্কিতসা প্রবল ছিল, তখন এই 'কায়দাটি' তিনি এখান থেকেই নকল করে নিজের কাছে রেখেছিলেন; তাঁরই আবিষ্কাররূপে চিহ্নিত করে পরবর্তীকালে পণ্ডিত ভেঙ্কটামথী এটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।

আমাদের মতে এই পদ্ধতির প্রাণির প্রক্রিয়া বাই হউক না কেন, আমাদের স্বরের কড়ি-কোমল চিহ্নিত করার উপায় বা কারণ হিসাবে এই সহজ উপায়টির সাহায্য আমরা নিতে পারি। বর্তমানে দিল্লীস্থিত ভারতীয় সরকারের সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি বিকৃত স্বরের চিহ্নস্বরূপ এই সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি (syllabo-phonetic system) অঙ্গমোদন করার চেষ্টা করছেন।

## স্বর ও সুর

এই দুটি শব্দ বহুক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের জানা দরকার যে 'স্বর' অর্থে স র গ ম প ধ ন এই সাতটি স্বরের যে কোন একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে (a particular note) বোঝায়। সুর অর্থে কোন এক বিশেষ স্বরবিন্যাসকে বোঝায়; যেমন, এই গানের সুরটা এই রকম, ঐ গানের

স্বরটা আপনি দিয়েছেন? ইত্যাদি। আমরা উপযুক্ত স্থানে এই দুই শব্দ সকল সময়ে যথোপযুক্ত অর্থে ব্যবহার করি না। হিন্দী ভাষাতেও এই দোষ বর্তমান।

**একশ্রুতি স্বর :** এই একশ্রুতি স্বরের অর্থ এক ধরণের অপরিবর্তিত শ্রুতি স্বর। এখানে শ্রুতি কথাটি স্বরাস্তর হিসাবে ব্যবহার করছি না। দুই থেকে ডাকার সময় বা একভাবে কাম্বার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরের কোনও বৈচিত্র্য থাকে না, একভাবেই শোনা যায়; সেই কারণে এই ধরণের স্বরকে একশ্রুতি স্বর বা **একশ্রুত স্বর** বলা হয়। কারখানার কলের বা উড়োজাহাজ প্রভৃতির একঘেয়ে স্বরধ্বনিও এর কোঠায় পড়ে।

**সপ্তক :** স্বরাস্তর নিয়ে সাত স্বরের সমবায়কে **সপ্তক** বলা হয়। স র গ ম প ধ ন—এই সাত স্বরধ্বনি ও তাদের স্বরাস্তর নিয়েই একটা সপ্তক গঠিত হয়। অনেকে এই সপ্তককে **নাদস্থান** বলেন। স্বরের উঁচু-নীচুর কথা ভেবেই নাদস্থানকে ত্রিধা ভাগ করা হয়েছে :—

**মন্দ স্থান :** উদারার স্বর সপ্তক ( খাদ )।

**মধ্য স্থান :** মৃদারার „ ( মাঝ )।

**তার স্থান :** তারার „ ( চড়া )।

আমাদের কণ্ঠে বা যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে ২৥ ( আড়াই ) সপ্তকের প্রয়োজন। যত্ন নিলে কণ্ঠে আড়াই সপ্তক স্বর সাধনা সম্ভব। বলা কণ্ঠে ও যত্নে এবং বিশেষ সাধনাবলে তিন সপ্তক পর্যন্ত স্বরসাধনা করা সম্ভব হয়। লক্ষ লোকের মধ্যে দু-একজনের কণ্ঠে ৩৥ ( সাড়ে তিন ) সপ্তক শোনা যায়। আমাদের গায়কদের মধ্যে অনেকের কণ্ঠে আড়াই সপ্তকও পরিষ্কারভাবে শোনা যায় না।

## । স্বরের পশ্চিম পত্র ॥

স্বরের নাম	অধিষ্ঠাত্রী	ভিন্নমতে	বর্ণ অর্থে	ঋষি	ছন্দানুক্রম	সঙ্গীত দর্পণ	সঙ্গীত পারিজাত	সঙ্গীত রত্নাকর
স	যড়্ জ	অগ্নি	লাল পদ্মের মতন	অগ্নি	অচ্যুতপ্	রোদ্র	হাস্ত	বীর, অদ্ভুত ও রোদ্র
র	ঋষভ	ব্রহ্মা	হলদে বা গোলঙ্গী	ব্রহ্মা	গায়ত্রী	বীর	শঙ্কর	"
গ	গান্ধার	সরস্বতী,	স্ববর্ণ	চন্দ্রমা	ত্রিষ্টপ্	করণ	হাস্ত	করণ
ম	মধ্যম	মহাদেব	বেতবর্ণ	বিষ্ণু	বৃহতী	হাস্ত	শঙ্কর	হাস্ত
প	পঞ্চম	লক্ষ্মী,	কাল বা বেঙনী	নারদ	পংক্তি	হাস্ত	ভয়ানক,	শঙ্কর
ধ	ধৈবত	গণপতি	নীল	তুধুরু	উক্ষিক	বীভৎস	বীভৎস	বীভৎস
ন	নিবাদ	স্বর্ষ	বহু বং মিশ্রিত বা মাদা	কুবের	জগতী	করণ	করণ	করণ

কোন কোন জীব	শরীর স্থান	স্বরের	স্বরের বংশ	স্বরের স্ত্রী	সকল	অথবা পুত্রগণ
বা	জন্তুর অঙ্গগত	জন্মস্থান	জাতি	পরিচয়	( অর্থে শ্রেণি )	
স	ময়ূর	কণ্ঠ	জম্বুদ্বীপ	ব্রাহ্মণ	( মমন্ত দেবকুল	ভৈরব
র	বৃষ বা চাতক	মস্তক	শাকদ্বীপ	ক্ষত্রিয়	কোমল (ঋষি) মুনিবল	মালকোণ
গ	ছাগল	নাসিকা	কুশদ্বীপ	বৈশ্য	ও কডি দেবকুল	হিন্দোল
ম	ক্রৌঞ্চ মানে বক	উরু	ক্রৌঞ্চদ্বীপ	ব্রাহ্মণ	স্বরকে দেবকুল	দীপক
প	কৌচ বক			শূদ্র জাতি		
ধ	কোকিল		উরু, দীর্ঘ, কণ্ঠ	শায়ালীদ্বীপ	ব্রাহ্মণ	মেঘ
ন	অথ বা ব্যাং	ললাট	সেতদ্বীপ	ক্ষত্রিয়	মাদন্তী, রোহিণী, রমা । ৩	স্ত্রী
	হস্তি	সর্বসন্ধি থেকে	পুষ্করদ্বীপ	বৈশ্য	উগ্রা, ক্ষেভিনী । ২	নিমগ্জন

স্বরের এই পরিচয়পত্রের প্রতিটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সব বিভাগের যুক্তিযুক্ত অর্থও সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন তবে প্রাচীন যুগের পণ্ডিতেরা বিশেষ অল্পশীলন দ্বারা বা গভীর ভাবে চিন্তা করে যা পেয়েছিলেন সে সমস্তকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ করতে পারি না। এর মধ্যে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে নেই এমন নয়। বর্তমানে আমরা সে সব আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।

## উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত

বেদের কালে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ ভঙ্গী নিম্নাভিমুখী হওয়ার ফলে ‘উদাত্ত’ বলতে উচ্চস্বর, ‘অনুদাত্ত’ বলতে তার থেকে নিম্ন স্বর ও ‘স্বরিত বলতে এই দুই স্বরের বিশ্রান্তি অবস্থাকেই বুঝাত। উদাহরণ :

উদা.	অনু.	স্ব.
গ	র	স
অথবা ন	ধ	প

স্বরিত স্বরগুলির উচ্চারণকালে যে অর্ধস্বরের কণ্ ব্যবহার হত, তাকে **প্রচয়** বলা হত।

অনেকে বলেন বেদের উচ্চারণ-ভঙ্গিমা বুঝানোর কারণেই এই শব্দ সকল প্রচলিত হয়েছিল। বেদের শেষ যুগ থেকে এই নামগুলির প্রকৃত অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাঙ্গীতিক ব্যবহারে এদের প্রয়োগ কি ভাবে করা হয়েছিল. সেকথা পরে বলব।

**উদাত্ত :** পানিনীয় স্বরবিচারে বলা হয়েছে “উচ্চৈরুদাত্তঃ” (পা ৪.২.২২)। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে বড় নাদ দিয়ে এর বিচার করা হবে না। কণ্, তালু প্রভৃতি জায়গার উপর দিক থেকে খুব কণ্ঠ করে যা বার করা হবে, যে স্বরসমূহ প্রকাশ করতে শরীরে টান পড়ে (কণ্ঠ হয়), স্বর রুদ্ধ ও তীব্র ভাবে প্রকাশ পায়, কণ্ঠবিবর সঙ্কোচ করে উচ্চারণ করতে হয়, সেই স্বরগুলিই উদাত্ত। স্ততরাং এদেরকে আমরা তার স্থানের, অর্থাৎ চড়ার স্বর বলে ধারণা করতে পারি।

**অনুদাত্ত :** পানিনীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে “নীচৈরনুদাত্তঃ” (পা. ৩০)। এই স্বরের প্রকাশকালে শরীর শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়, স্বরগুলি মোটা হয়, কণ্ঠবিবর বড় হয়, আর স্বরগুলি স্নিগ্ধভাবে প্রকাশ পায়। ফলে আমরা অনুদাত্তকে উদার স্থানের স্বর, অর্থাৎ খাদের স্বর বলে ধারণা করতে পারি।

**স্বরিত :** পাণিনীয় ব্যাখ্যায় আমরা পাই “সমাহারঃ স্বরিতঃ” ( পা. ৩১ ), “তশ্চ আদিত উদাত্তমর্জ্জ্বশ্চ” ( পা. ৩২ ), “বৃত্তি-উদাত্তাহ্ৰদাত্ত স্বর-সমাহারঃ স্বরিতঃ” । “তৌ সমাহ্রিয়েতে যশ্মিন তশ্চ স্বরিত ইতোষা সংজ্ঞা ॥” অতএব দেখা যায় যে এই স্বরগুলি উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যস্থলের বা সংযোগস্থলের স্বরসকল এবং এরা উদাত্ত, অর্থাৎ তার স্থানের স্বরগুলির চেয়ে লঘু হবে । এইভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে স্বরিত স্থানকে আমরা মুদারার স্থান বলে ধরে নিতে পারি ।

দেখা যায়, পরবর্তীকালে যাজ্ঞবল্ক্যে ও নারদীয় শিক্ষায় বলা হয়েছে, “উদাত্তৌ নিষাদগান্ধারৌ”, অর্থাৎ ‘ন’ ও ‘গ’ উদাত্ত জাতীয় । এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে বর্তমান ‘ন’ ও ‘গ’ দুই শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর । “অনুদাত্তৌ ঋষভধৈবতৌ”, অর্থাৎ ‘র’ ও ‘ধ’ অনুদাত্ত স্বর এবং এরা তিনশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর । “স্বরিতপ্রভবা হেতে ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ” ; অর্থাৎ ‘স’, ‘ম’ ও ‘প’ এই তিন স্বরকে স্বরিতের পঞ্চায়ভুক্ত করা হয়েছে ; এরা চারশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর ।

অতএব দেখা যায় : উদাত্ত=গ, ন =২ শ্রুতি ;  
 অনুদাত্ত=র, ধ =৩ শ্রুতি ;  
 স্বরিত=স, ম, প =৪ শ্রুতি ;

পাশ্চাত্য বৈয়াকরণিক হুইটনি ( Whitney ) তাঁর “Whitney’s Grammar” অনুচ্ছেদ ৮১ ( para 81 )-তে লিখেছেন যে এগুলি সংস্কৃত ভাষার স্বরাঘাত ( accent ) বুঝাবার জ্ঞান ব্যবহৃত হত । তিনি উদাত্তকে acute, অনুদাত্তকে grave ও স্বরিতকে circumflex বলেছেন । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এগুলি ভাষার ব্যাকরণে ছিল এবং পরে সঙ্গীতের ব্যাকরণে স্থান লাভ করেছে । সামবেদের কালে ক্রুষ্ঠ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মঙ্গ্র, অতিস্বাধ প্রভৃতি সপ্ত-স্বরের ব্যবহার-যে প্রচলিত ছিল, একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে । এই ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানকালের স্বর সঠিক মিলান সম্ভব হয়নি । এমনও সম্ভব যে এগুলি গণ্ডভাষিক স্বর ছিল এবং পরবর্তীকালে সঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়েছে । এই সব নানা কারণে, একদিকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এবং অল্পদিকে আগের দিনের স্বরসপ্তকের প্রকৃত-বাবহার সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত ।

আগের দিনের স্বর স্থান ও স্বর সপ্তক বর্তমানে প্রচলিত স্বরস্থান ও স্বরসপ্তক থেকে ভিন্ন ছিল এই কথাটি মনে রেখে বর্তমান প্রচলিত ধারার সঙ্গে জোর করে মিল করতে না চাইলে অনেক জটিলতার নিরসন হবে ।

**মূর্ছনা :** “আরোহশ্চাবরোহশ্চ স্বরাণাং যায়তে ষদা ।

তাং মূর্ছনাং তদা লোকে প্রাহ্ গ্রামাশ্রয়ং বুধাঃ”

—সঙ্গীত পারিজাত

—গ্রামের আশ্রিত স্বরসম্পকের ক্রমানুযায়ী আরোহণ ও অবরোহণকেই **মূর্ছনা** বলা হয়। মূর্ছনা শব্দের অর্থ বিস্তৃত হওয়া বা মূর্চ্ছিত হওয়া। মূর্ছনা বহু প্রকারের হয়। যেমন :

(১) **গ্রাম মূর্ছনা :** যখন ‘স’ ছাড়া অগ্র কোনও স্বরকে ধরে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী উঠা-নামার মারফতে একটা গ্রাম ( scale ) রচনা করা হয়, তখন তাকে **গ্রাম মূর্ছনা** বলে। এই গ্রাম মূর্ছনাকে **বর্গও** বলা হয়।

(২) **স্বর মূর্ছনা :** রাগের প্রারম্ভিক স্বর অনুসারে আরোহণ-অবরোহণকে **স্বর মূর্ছনা** বলা হয়। কোন রাগ কোন বিশেষ স্বর থেকে আরম্ভ করলে স্বর মূর্ছনা সৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ইমন রাগটি ‘ন’ থেকে আরম্ভ করা হল; অতএব একে ‘ন’ স্বরের মূর্ছনা ধরা হল।

(৩) **যান্ত্রিক মূর্ছনা :** বীণা বাজাবার সময় ডান হাতের জায়গা বদল ও বাঁ হাতের তৈরী উঠা-নামাকে আগের দিনে ‘**মূর্ছনা**’ বলা হত। প্রাচীনকালে যখন কোন স্বর থেকে আন্দোলনযুক্ত মীড বা ঘসিট দিয়ে সম্পূর্ণ সপ্তকে উঠা-নামাকেও মূর্ছনা বলা হত। অনেকে একে **গমক মূর্ছনা**-ও বলেন।

(৪) **রাগ মূর্ছনা :** “মূর্চ্ছতে যেন রাগঃ”। একটা রাগের রূপ যখন বিশেষ স্বরসমষ্টির উঠা ও নামার মাঝে ফুটে উঠে, তখন তাকে **রাগ মূর্ছনা** বলা হয়। সমস্বর বিশিষ্ট অগ্র রাগের কোন বিশেষ লক্ষণ যখন বিশিষ্ট মূর্ছনার কারণে ধরা পড়ে, তখন তাকেও ‘রাগ মূর্ছনা’ বলা হয়। এই সংজ্ঞা মতঙ্গের মতানুযায়ী বলেই আমরা জানি।

(৫) **সপ্তকূট মূর্ছনা :** আগের দিনে এক স্বরের ছয় ভেদ মানা হত। কোমল, কোমলতর, কোমলতম এবং তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম এই ছয়টি ভেদ এবং মূল স্বরটি নিয়ে সপ্তকূট মূর্ছনার সৃষ্টি বলা হয়।

আল্লাবন্দে খাঁ সাহেবের ঘরাণার প্রসিদ্ধ রূপদী স্বর্গীয় তানসেন পাণ্ডেজী এক স্বর থেকে অগ্র স্বরের মাঝে শ্রুতিভেদে ছয়টি পৃথক পৃথক স্বরধ্বনি বের করে আমাদের শুনিয়েছিলেন; এক স্বরের মাঝে এই শ্রুতিভেদ প্রদর্শন করাকে তিনি সপ্তকূট মূর্ছনা দেখান বলেছিলেন।

(৬) একবিংশতি ( একুশ ) মূর্ছনা : আমাদের সঙ্গীতে তিন গ্রাম মানা হত। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মূর্ছনা ধরা হয়; সেই হিসাবে মূর্ছনার মোট সংখ্যা ৭×৩ বা ২১।

তিন গ্রামের এই একুশটি মূর্ছনার নাম নীচে দেওয়া হল :—

[ ক ] ষড়্জ গ্রাম মূর্ছনা :—

নারদ মতে ভরত মতে

- |                  |                  |                                 |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| (১) উত্তরবর্ণা   | (১) উত্তরমস্ত্রা | স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।  |
| (২) অভিরুদ্ধতা   | (২) রজনী         | ন স র গ ম প ধ ; প ধ ম গ র স ন।  |
| (৬) অশ্বক্রান্তা | (৩) উত্তরায়তা   | ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।  |
| (৪) সৌবীরী       | (৪) শুদ্ধ ষড়্জ  | প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প।  |
| (৫) হ্রব্যকা     | (৫) মৎসরীকৃতা    | ম প ধ ন স র গ , গ র স ন ধ প ম।  |
| (৬) উত্তরায়তা   | (৬) অশ্বক্রান্তা | গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।  |
| (৭) রজনী         | (৭) অভিরুদ্ধতা   | র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র ॥ |

[খ] গান্ধার গ্রাম মূর্ছনা ( অধুনা লুপ্ত ) :—

নারদ মতে—

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| (১) নন্দা—    | গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।  |
| (২) বিশালা—   | র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র।  |
| (৩) স্মৃথী—   | স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।  |
| (৪) চিত্রা—   | ন স র গ ম প ধ ; ধ প ম গ র স ন।  |
| (৫) চিত্রবতী— | ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।  |
| (৬) স্মৃথা—   | প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প।  |
| (৭) আলাপী—    | ম প ধ ন স র গ ; গ র স ন ধ প ম ॥ |

[গ] মধ্যম গ্রাম মূর্ছনা :—

নারদ মতে ভরতমতে

- |                |                 |                                 |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| (১) আপ্যায়নী  | (১) সৌবীরী—     | ম প ধ ন স র গ ; গ র স ন ধ প ম।  |
| (২) বিশ্বকৃতা  | (২) হারিনাখা—   | গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।  |
| (৩) চন্দ্রা    | (৩) কলোপনতা     | -র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র। |
| (৪) হেমা       | (৪) শুদ্ধমধ্যা— | স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।  |
| (৫) কপর্দিনী   | (৫) মার্গী—     | ন স র গ ম প ধ ; ধ প ম গ র স ন।  |
| (৬) মৈত্রী     | (৬) পৌরবী—      | ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।  |
| (৭) চান্দ্রমণী | (৭) হ্রব্যকা—   | প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প ॥ |

—উপরিলিখিত মূর্ছনাগুলিই আমাদের সঙ্গীতে একুশ মূর্ছনা। এই গ্রামের এই মূর্ছনাদের বলা হত **শুদ্ধ মূর্ছনা**।

এ ছাড়া বিকৃতস্বরযুক্তা মূর্ছনাও ছিল ; তাদের তিন ভাগ ; যথা : কাকলী-কলিতা, শাস্তরা ও কাকল্যাস্তরা। আবার এদেরকেও সম্পূর্ণা, ষাড়বী ও ঔড়বী মূর্ছনা নামে আরও তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। সমস্ত নাম ও তাদের স-র-গ-ম লেখা এখানে সম্ভব হল না।

**মূর্ছনা ও প্রাচীন তান :** প্রাচীনকালে তানে কেবল স্বরের আরোহী গতি ছিল। কিন্তু মূর্ছনার বেলায় স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দুই-ই আছে। ভরতের পুস্তকে ষাড়ব মূর্ছনায় ৪২টি তান, ঔড়ব মূর্ছনায় ৩৫টি তান ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলিকে ভরত মূর্ছনা(গত) তান বলেছেন।

**মূর্ছনা ও তান :** প্রাচীন প্রথা হিসাবে অনেকের ধারণা মূর্ছনা মানে তান। মূর্ছনার সঙ্গে তানের মিল আছে সত্য, তবে তানে ক্রমিক আরোহণ-অবরোহণের নিয়ম মানা হয় না। কিন্তু মূর্ছনায় ক্রম মানতেই হবে। পরে তানের বিষয়ে আরও বিশদভাবে লেখা হয়েছে।

**মূর্ছনা ও ক্রম :** ‘ক্রমের’ অর্থ আমরা গতি বলে ধরতে পারি (এর থেকেই আমরা ‘পরিক্রমা’ শব্দটি পেয়েছি।) সূত্রাং ক্রম হচ্ছে স্বরশৃঙ্খলের গতিনির্ধারক ; আর মূর্ছনা হচ্ছে স্বরসমষ্টির আরোহী ও অবরোহীর মিশ্রণ।

[ মূর্ছনা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জ্ঞাতব্য আছে। স্থানাভাববশতঃ বর্তমানে সে সকল তথ্য অনুল্লিখিত রইল। ]

## মেল বনাম ঠাট

ঠাট মানে কাঠামো। কোন মূর্তি তৈরীর আগে যেমন কাঠ, খড়, মাটি ইত্যাদি দিয়ে একটা কাঠামো গড়া হয়। রাগ-রচনার আগেও তেমনি বিশিষ্ট স্বর সমষ্টির ক্রমপথ্যে রাগের একটা কাঠামো গড়া হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঠাট রাগরচনার সম্বন্ধসূত্র। রাগে অবশ্য ব্যবহার্য স্বরসমষ্টিই তার ঠাটের পরিচয়। ঠাট কতকগুলি স্বরের অভিব্যক্তি মাত্র ; তার গতি নাই, ভাবনা নাই, বাঞ্ছনা নাই,—শুধুই একটা কাঠামো। সেটা রাগের মূর্তি বা আসল চেহারা নয়। অতি সহজে রাগদের বর্ণীকরণের ও সহজে মনে রাখার কারণেই মেল বা ঠাটের প্রয়োজন।

আমাদের ধারণা ছাদশ খুঁটাকেই প্রথম মেল বা ঠাটের প্রবর্তন করা হয়। যদিও সঠিকভাবে আমরা এটি নির্দেশ করতে পারি নি, ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দাজের উপর নির্ভর করেই বলছি। ডাঃ বিমল রায়, এম্. বি. মহোদয় লিখিত “ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ” গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই : “ত্রয়োদশ খুঁটাকে পণ্ডিত মাধবাচার্য পঞ্চদশ মেলের প্রবর্তন করেন।” অগ্রত আমর! পাই : “১৬০২ খুঁটাকে পণ্ডিত সোমনাথ তেইশটি মেলের প্রবর্তন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ‘রাগতরঙ্গিনী’কার লোচনকবি ছাদশ সংস্থানের প্রবর্তন করেন।”

রেভারেণ্ড পোপলে সাহেব রচিত **The Music of India** গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি ( ১৭৭২-১৮০৪ খৃঃ ) জয়পুরের মহারাজ প্রতাপ সিং শুদ্ধ ঠাটপদ্ধতি নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের নির্দিষ্ট রূপদান ও শ্রেণী-বিভাগের কারণে তৎকালীন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেছিলেন আলাপ-আলোচনার জন্ম। এই সূত্রেই আমরা “শুদ্ধ বিলাবল” ঠাটের কথা পাই। এই সত্তার চেষ্টায় “রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসার” নামে একটি পুস্তক ও প্রকাশিত হয় ; তবে এ পুস্তকে তেমন উঁচুদরেব কোন কথা পাওয়া যায় না।

১৬৬০ খুঁটাকে তানাপ্লাচাঘের শিষ্য ও গোবিন্দ দীক্ষিতের পুত্র দক্ষিণী সংগীত-শাস্ত্রী পণ্ডিত ভেক্টামথী “চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা” নামক গ্রন্থে বাহান্তর মেলের ( ঠাটের ) প্রথম প্রবর্তন করেন। অনেকে বলেন যে ইনি শার্ঙ্গদেবের কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরায় শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন ; অবশ্য কিছু লোক এ কথা অস্বীকার করে থাকেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও গণিত শাস্ত্রের হিসাবে এই ঠাট পদ্ধতিকে অনেকেই নিভুল ও ত্রুটিহীন বলে মনে করেন। আমরা এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিভুল হিসাব বলে মনে করতে কিছু দ্বিধা বোধ করি। কোন রাগে একই সঙ্গে শুদ্ধ ( অর্থে কোমল ) ‘ম’ ও বিরুদ্ধ ‘ম’-র ব্যবহারই তার প্রমাণ। তাঁর লেখার মধ্যেও তিনি সারঙ্গ রাগে এই প্রকার মধ্যমের ব্যবহার স্বীকার করেছেন ; অথচ ঠাট সম্বন্ধে সেটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন ; এখানেই তাঁর হিসাবের গলদটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সে যাই হোক, আমরা তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারি না। এই বর্গীকরণ এত সুন্দর যে আমরা তাঁর গাণিতিক হিসাবে মুগ্ধ হয়ে যাই। এখন আমরা সাধারণভাবে তাঁর বাহান্তর ঠাটের সরল হিসাবের কথায় আসছি।

**বাহান্তর ( ৭২ ) ঠাট :** প্রথমে শুদ্ধ সপ্তকে দুই ভাগ করা হল। সপ্তক বলতে ‘স র গ ম প ধ ন’ এই সাত স্বরকে বুঝায়, এ কথা আগেই

বলেছি। এখন সপ্তকের 'স' ও 'প'-কে (স্বতঃসিদ্ধ নিয়মামুযায়ী) অবিকৃত রেখে 'র', 'গ', 'ধ' ও 'ন' এই চারটি স্বরকে বিকৃত করলে এবং হিসাবের স্তবিধার জগ্গ 'ম' স্বরটিকে বাদ দিলে আমরা প্রথম ভাগে পাচ্ছি 'স র র গ গ' ও দ্বিতীয় ভাগে পাচ্ছি 'প ধ ধ ন ন'। এই বিভাগে অপর এক লক্ষণীয় বিষয় এই যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর ব্যবহারের রীতি নাই। এই নিয়ম সর্বদাই মেনে চলা হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে কোন রাগে একই স্বরের বিভিন্ন রূপ (অর্থে বিকৃত রূপ) বিভিন্ন স্বর-নামে পর পর ব্যবহারে বাধা নাই। সেই কারণে ঠাট পদ্ধতি নিরূপণ করার সময় তিনি পর পর স্বর লাগিয়ে বিভাগ করতে পেরেছেন।

স্বরের অদল-বদলে আমরা কি কি বিচ্ছাস পাই, তা জানাই। প্রথমেই বলেছি যে ছুটি বিচ্ছাস পাই :—

(ক) স র র গ গ (ম) ও (খ) প ধ ধ ন ন (স)।

প্রথম বিভাগটির নামকরণ হয়েছে **পূর্ব মেলার্দ্ধ** ও দ্বিতীয় বিভাগটির নামকরণ হয়েছে **উত্তর মেলার্দ্ধ**।

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
(পূর্ব মেলার্দ্ধ)	(উত্তর মেলার্দ্ধ)
(১) স র গ	(১) প ধ ন
(২) স <u>ৱ</u> গ	(২) প <u>ধ</u> ন
(৩) স র <u>গ</u>	(৩) প ধ <u>ন</u>
(৪) স <u>ৱ</u> <u>গ</u>	(৪) প <u>ধ</u> <u>ন</u>
(৫) স <u>ৱ</u> র	(৫) প <u>ধ</u> ধ
(৬) স <u>গ</u> গ	(৬) প <u>ন</u> ন

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে উত্তর মেলার্দ্ধেই আমরা ৬ প্রকার স্বরবিচ্ছাস পাচ্ছি। বোঝাবার সুবিধার জগ্গ আমরা 'ম' স্বরটিকে বাদ দিয়ে রেখেছি, একথা আগেই বলেছি। এখন আমরা পূর্ব মেলার্দ্ধের সঙ্গে শুদ্ধ (বা কোমল) মধ্যম যুক্ত করে

ক্রমাশয়ে 'ক'-বিভাগের ১নং-এর সঙ্গে 'খ'-বিভাগের ১নং থেকে ৬নং পর্যন্ত, পরে 'ক'-বিভাগের ২নং-এর সঙ্গে 'খ'-বিভাগের ১নং থেকে ৬নং পর্যন্ত,—এই ভাবে 'ক'-বিভাগের ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর প্রতিটি সংখ্যার বিচ্ছাসের সঙ্গে 'খ'-বিভাগের বিচ্ছাস উপযুক্তভাবে যদি যোগ করে চলি, তাহলে আমরা পাব  $৬ \times ৬$  অর্থাৎ ৩৬টি বিচ্ছাস।

এখন শুদ্ধ মধ্যমের স্থলে যদি আমরা বিকৃত মধ্যমটিকে ( কড়ি 'ম'-কে ) ব্যবহার করি এবং উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় তাদের যোগাযোগ ঘটাই, তাহলে আমরা আরও ছত্রিশটি ( ৩৬ ) ( কড়ি 'ম'-যুক্ত ) বিচ্ছাস পাব।

অতএব ৩৬টি শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত বিচ্ছাস ও ৩৬টি বিকৃত মধ্যমযুক্ত বিচ্ছাস মিলিয়ে  $৩৬ + ৩৬$  অর্থাৎ ৭২-টি বিচ্ছাস পাওয়া যাচ্ছে। এই ৭২টি ভিন্ন ভিন্ন স্বর-বিচ্ছাসই “বাহান্তর ঠাঁট” নামে পরিচিত।

বিকৃত মধ্যমের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : “যেমন এক ঘড়া ছুঁধে এক ফোঁটা ‘চোনা’ ( অর্থে গোমূত্র ) পড়লে ছুঁধের রূপটি বদলে যায়, তেমন ৩৬টি স্বর বিচ্ছাসের মধ্যে যেইমাত্র বিকৃত মধ্যমের ব্যবহার ঘটলো, অমনি সমস্ত বিচ্ছাসটির রূপ বদলে গেল।” পণ্ডিত ভেঙ্কটামর্থী ১২টি চক্রের আওতায় এই ৭২টি বিচ্ছাস ভাগ করে আবার ওই বারটি চক্রকে ছুঁধে ভাগ করে এক এক ভাগে ৬টি করে চক্র গড়ে অতি নিপুণভাবে ভাগটি দেখিয়েছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র চক্রগুলির নাম ও বিভাগ দেখিয়েই বাহান্তর ঠাঁটের কথা শেষ করছি। সময়ান্তরে বিশদভাবে বোঝাবার ইচ্ছা রইল।

কেবলমাত্র চক্রগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হল :

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ১। একে—ইন্দ্র ॥  | ৭। সাত্তে—ঋষি ॥     |
| ২। দুয়ে—নেত্র ॥ | ৮। আটে—বসু ॥        |
| ৩। তিনে—অগ্নি ॥  | ৯। নয়ে—ব্রহ্ম ॥    |
| ৪। চারে—বেদ ॥    | ১০। দশে—দিশি ॥      |
| ৫। পাঁচে—বাপ ॥   | ১১। এগারোয়—রুদ্র ॥ |
| ৬। ছয়ে—ঋতু ॥    | ১২। বারোয়—আদিত্য ॥ |

**বত্রিশ ( ৩২ ) ঠাঁট :** হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এই হিন্দাব মত কি করে বত্রিশ ঠাঁট রচনা করা হয়, এখন সেই কথা বলছি। আগে বলেছি, আমাদের ঠাঁটে একই স্বরের শুদ্ধ ও কোমল ভাব পর পর ব্যবহার করা হয় না ;

অতএব উপযুক্ত হিসাব থেকে পর পর দুটি স্বর বাদ দিলে কি দাঁড়ায়, সেটা বিবেচনা করে দেখা যাক।

‘ক’-বিভাগ ( পূর্ব মেলার্দ্ব )	‘খ’-বিভাগ ( উত্তর মেলার্দ্ব )
(১) স র গ	(১) প খ ন
(২) স <u>র</u> গ	(২) প <u>খ</u> ন
(৩) স র <u>গ</u>	(৩) প খ <u>ন</u>
(৪) স <u>র</u> <u>গ</u>	(৪) প <u>খ</u> <u>ন</u>

অর্থাৎ পর পর দুটি স্বর রাখা হল না। অর্থাৎ :

- (৫) স র ব      (৫) প খ ধ  
 (৬) স গ গ      (৬) প ন ন

এই বিভাগগুলি বাদ দেওয়া হল। ‘র’, ‘গ’ ও ‘ব’, ‘ন’ কোমল ধরাতেই ১৬টি বিভাগ পাওয়া গেল।

এখন ঠিক পূর্ব প্রক্রিয়া অনুসারে ‘ক’-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ‘খ’-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং-এর সঙ্গে যুক্ত করলে আমরা পাচ্ছি ৪×৩ বা ১২টি বিভাগ। এইবার শুধু ‘ম’-এর স্থলে কডি ‘ম’ ব্যবহার করলে পাই আরও ১৬টি বিভাগ। অতএব ১২+১৬, অর্থাৎ মোট এই বত্রিশটি (৩২) বিভাগ আমবা পাই।

ডাঃ বিমল রায় এই বত্রিশ টাঁটের প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু সেটি সঙ্গীত-সমাজে প্রতিষ্ঠান্য করে নি। স্বর্গীয় বিষ্ণুদীপস্বর পালুঙ্করের ছাত্র নারায়ণ মোরেশ্বর এই ধরণেরই ত্রিশ টাঁট প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন বোধহাই সহরে ; সে প্রচেষ্টাও স্বীকৃতি পায় নি।

স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতঃগেজীর “দশটাঁট” পদ্ধতিই এ যুগে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়েই এই টাঁট

পদ্ধতিকে মান্ত দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের পাঠ্যসূচীতে ( সিলেবাসে ) ঠাটের কথায় এই মতটিকেই গ্রাহ্য করা হয়েছে। এই পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি আমাদের সম্মানার্থ। অবশ্য বর্তমানে অনেক গুণী ব্যক্তি তাঁর অল্পমত এই ঠাট পদ্ধতি অল্পমোদন করেন না ; উদাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে তাঁরা এই ঠাটের বহু ভুল ও ত্রুটি প্রমাণ করেছেন। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে এর কিছু সংশোধন করা প্রয়োজন। দশ ঠাটের মধ্যে রাখতে পারি না, এমন কয়েকটি রাগের নাম উদাহরণ-স্বরূপ আমরা করছি :

	বর্তমানে
পট দীপ	... কাফী ঠাটে
শুক সারং	... ”
ললিত	... মারবা ঠাটে
পিলু	... কাফী ঠাটে ;

ইত্যাদি আরও অনেক বলা যায়। তাদের জ্ঞান আলাদা ঠাট হলে ভাল হয়।

‘রাগ তরঙ্গিনী’, ‘হৃদয় কৌতুক’, ‘হৃদয় প্রকাশ’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ঠাট সম্বন্ধে অতি সরল ও সুন্দর ভাবে আলোচনা হয়েছে। কাজেই তেহটামখীর বাহান্তর ঠাট যদি আবিষ্কৃত নাও হত, তবুও আমরা দশ ঠাটের প্রবর্তন করতে পারতাম। পণ্ডিত ভাতখাণ্ডে বলেছেন তিনি বাহান্তর ঠাটের হিসাব থেকেই দশ ঠাটের হৃদিস পেয়েছেন। তাঁর এ উক্তির তাৎপর্য আমরা হৃদয়ধর্ম করতে পারি নি।

যাই হউক, এখন আমরা তাঁর রচিত ও প্রতিষ্ঠিত দশ ঠাটের কথায় আসছি। উত্তর ভারতে প্রচলিত প্রায় সমস্ত রাগকেই তিনি দশ ঠাটের আওতায় নিয়ে এসেছেন। এই দশটি ঠাটের নাম হল :—

- |             |                |
|-------------|----------------|
| (১) বিলাবল, | (৬) ভৈরবী,     |
| (২) কল্যাণ, | (৭) ভৈরব,      |
| (৩) খমাজ,   | (৮) চৌডী,      |
| (৪) কাফী,   | (৯) পূর্বী,    |
| (৫) আশাবরী, | (১০) মারোয়া ॥ |

এই দশ ঠাটের প্রত্যেকটির নামকরণকালে তাঁর স্বর-স্বরূপে প্রচলিত কোন একটি প্রসিদ্ধ রাগের নামে ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ রাগটিকে

আশ্রয় রাগ এবং ঠাটটিকে জনক-ঠাট বলে। নিচে ভাতখণ্ডেজীর দশ ঠাটের সঙ্গে দক্ষিণী মেলের তুলনামূলক আলোচনা করা গেল।

ভাতখণ্ডেজী প্রবর্তিত দশ ঠাটের নাম : আশ্রয়রাগ বা জনক-ঠাট	দক্ষিণী মেলে এদের নাম •	৭২ ঠাটের মেল-সংখ্যা	স্বর-রূপ
(১) বিলাবল	ধীরশঙ্করাভরণ	২৯	স র গ ম প ধ ন 
(২) কল্যাণ	মেচকল্যাণী	৬৫	স র গ ম প ধ ন
(৩) পমাজ	হরিকাম্বোজী	২৮	স র গ ম প ধ ন
(৪) কাকী	খরহরপ্রিয়া	২২	স র গ ম প ধ ন
(৫) আশাবরী	নটভৈরবী	২০	স র গ ম প ধ ন
(৬) ভৈরবী	হনুমন্তোড়ী	৮	স র গ ম প ধ ন
(৭) ভৈরব	মায়ামালবগৌল	১৫	স র গ ম প ধ ন
(৮) তৌড়ী	শুভপদ্মবরালী	৪৫	স র গ ম প ধ ন 
(৯) পূবী	কামবদিনী	৫১	স র গ ম প ধ ন 
(১০) মারোয়া	গমনশ্রম	৫৩	স র গ ম প ধ ন 

**জনক ঠাট :** গণিত শাস্ত্রের সৌজ্ঞেয় বহু ঠাট রচনা করা সম্ভব। সেই সকল ঠাট থেকে রাগ রচনা করা সম্ভব হলেও অনেক সময় দেখা যায় যে সেগুলি লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না, বা রচনায় নানা অস্ববিধাও দেখা যায়। তাই ঠাটের সাহায্যে রাগ রচনাকালে বহু ঠাটের মধ্যে থেকে সর্বজনগ্রাহ্য কতকগুলি ঠাট আমরা বেছে নিই। দক্ষিণী পদ্ধতিতে পণ্ডিত ভেঙ্কটামখীর বাহান্তরটি ঠাট গ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কেবলমাত্র ১৯টি ঠাটই জনক ঠাট হিসাবে মাত্র পায়। আমাদের উত্তরী পদ্ধতিতেও তেমনি ৩২টি অথবা তদধিক ঠাট রচনা করা গেলেও পূর্বোক্ত দশটি ঠাটই প্রধানতঃ জনক ঠাট হিসাবে

মাত্র পেয়ে থাকে। দশ ঠাটের নাম আগেই বলেছি। ১৯টি দক্ষিণী জনক ঠাটের নাম দিলাম :

১। মুখারী ॥	৭। ভৈরবী ॥	১৩। দেশাক্ষী ॥
২। সামবরালী ॥	৮। শ্রীরাগ ॥	১৪। নাট ॥
৩। ভূপাল ॥	৯। হেজ্জুজ্জী ॥	১৫। শুক্রবরালী ॥
৪। বসন্ত ভৈরবী ॥	১০। কাশ্যোজ্জী ॥	১৬। পশুচরালী ॥
৫। গৌল ॥	১১। শঙ্করাভরণ ॥	১৭। শুক্ররামাক্রিয়া ॥
৬। আহিরী ॥	১২। সামস্ত ॥	১৮। সিংহরব ॥
	১৯। কলাণী ॥	

দক্ষিণের শুক্র ঠাট বলতে তাদের সমস্ত শুক্র স্বর নিয়ে রচিত ঠাটকেই বুঝায়। তাদের শুক্র ঠাট বলতে কনকাক্ষি মেল। বাহ্যন্তর ঠাটের প্রথম “মেল কর্তা” রাগ এটি। স্বরাধায়ে দক্ষিণী স্বর পদ্ধতির তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন।

দক্ষিণী শুক্র স্বর	আমাদের শুক্র স্বর
স	স
( শুক্র ) র	র
( শুক্র ) গ	গ
( শুক্র ) ম	ম
প	প
( শুক্র ) ধ	ধ
( শুক্র ) ন	ন

আমাদের শুক্র স্বর বলতে বিলাবল ঠাটকেই বুঝায়। আমাদের শুক্র ঠাটে ৭ হিন্দুস্থানী স্বর-পদ্ধতির সমস্ত শুক্র স্বরই ( অর্থাৎ, শুক্র স র গ ম প ধ ন ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেটি বিলাবল ঠাটের স্বররূপ। আমাদের শুক্র ঠাটের সঙ্গে

দক্ষিণী শঙ্করাভরণ ঠাঁটটি মেলে। আর দক্ষিণী শুক ঠাঁটের নাম কনকাক্ষী, অর্থাৎ কনকাক্ষী মেল,—এ কথা উপরে বলেছি।

## বর্ণ

**বর্ণ :** প্রাচীনকালে গেয় রচনাকে ‘বর্ণ’ বলা হত। পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্যা বদলে যায় এবং গান করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে বর্ণ বলে ধরা হয়।

“গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরুপিতঃ ॥ ( সঙ্গীত রত্নাকর )

বর্ণ মানে বর্ণনা করা বা বিস্তার করা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজ দিয়ে গানের স্বরসমষ্টির এক একটি পদ দেখান হয়, সেই রকম কাজগুলিকেই বর্ণ বলা হয়।

কথিত আছে, বর্ণ চার রকমের : (১) এক স্বরকেই পর পর বারবার দেখানকে **স্থায়ী বর্ণ** বলা হয়। ‘স্থায়ী’ বলতে গেলে গানের বা গতের স্থায়ী, অস্থায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন কালিকে বুঝায় না; উচ্চারণভঙ্গী দিয়ে বিশেষ স্বরধ্বনির প্রয়োগকেই বুঝায় : যেমন—স স স স, র র র, গ গ গ গ, ইত্যাদি। (২) স র গ ম প ধ ন—এই ভাবে স্বরের পর পর আরোহণকে **আরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৩) ন ধ প ম গ র স : আরোহীর ঠিক বিপরীত ভাবে ক্রমিক নেমে আসাকেই **অবরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৪) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী—এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে **সঞ্চারী বর্ণ** বলা হয়। উদাহরণ : স র গ র, ধ প ম গ ম প, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সে বিকশিত হল। এখানে বর্ণ মানে তাহলে দাঁড়ায় ‘বিকাশ’।

## অলঙ্কার

“নিশিষ্টং বর্ণসন্দভমলংকারং প্রচক্ষতে ॥” ( সঙ্গীত রত্নাকর )।

অলঙ্কার মানে ভূষণ বা আভরণ। ভরত বলেছেন :

“শশিনা রহিতৈব নিশা বিজলেব নদী লতা বিপুষ্পেব  
অবিভৃষিতৈব কাস্তা গীতিরলঙ্কারহীনা শ্রাং ॥”

—অমাবস্তা রাত্রি, শুকনো নদী, ফলফুলহীন গাছ এবং নিরাভরণা নারী যেমন মনোহারী হয় না, তেমনি অলংকারবিহীন গান-বাজনাও মধুর শোনায় না।

সঙ্গীতশাস্ত্রে অলংকারের অর্থ মনোহর স্বরবিগ্ধাস রচনা। বর্ণের সঙ্গে অলংকারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে ; তাই সঙ্গীতালঙ্কারকে বর্ণালংকার নাম দেওয়া হয়েছে। শব্দালংকারে যেমন অল্পপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু, বক্রোক্তি ; অর্থালংকারে যেমন—উপমা, রূপক, অর্থাস্তরগ্ধাস প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়, সঙ্গীত-শাস্ত্রেও সেই রকম ৫০।৬০ রকমের অলংকারের নাম দেখা যায়। শৃংখলাবন্ধ নানা স্বরবিগ্ধাসে বহু রকমের অলংকার রচনা করা সম্ভব ; তাই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন : “অনস্তাস্ত্বতে শাস্ত্রেণ সমস্তেন কীর্তিতাঃ।” স্থায়ীবর্ণের সাতটি, আরোহীবর্ণ ও আরোহীবর্ণের বারটি, সঞ্চারীবর্ণের পচিশটি অলংকারের নাম শাস্ত্রে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকার সুন্দর সুন্দর অলংকারের নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ; তদ্ব্যয়োগে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হতে পারে, এই আশংকায় বিরতি বাঞ্ছনীয়।

বর্ণের সঙ্গে অলংকারের প্রভেদ সহজে নজরে আসে না। কয়েকটি বর্ণের শৃংখলাবন্ধ স্বরবিগ্ধাসে অলংকার রচিত হয়। অনেকে ‘তান’-কে অলংকার মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তান ও অলংকার এক বস্তু নয়। তান যেহেতু গানের ভূষণ, সেই কারণে তানকে অলংকার মনে করা অসমীচীন নয়। কিন্তু শাস্ত্রমতে অলংকার এক বিশেষ ধরণের স্বরগুচ্ছ ; এটি ঠিক তান নয়। বর্ণে আমরা স স স, ন ধ প, স র গ, ধ প ম, ন স র গ—এই ধরণের নানা স্বরবিগ্ধাস দেখতে পাই। কিন্তু অলংকারের ক্ষেত্রে আমরা স গ র ম, র ম গ প, গ প ম ধ, ম ধ প ন, ন প ধ ম—এই ধরণের স্বর-বিগ্ধাসের সম্মুখীন হই। (তানের কথায় তানের স র গ ম দ্রষ্টব্য।)

বাক্যের মধ্যে যেমন পদ গীতরূপ ভাষায় তেমনি বর্ণ। এই বর্ণের আলাংকারিক রূপই অলংকার। তাই অলংকারকে বলা হয় “বর্ণালংকার”।

**রাগ জাতি :** হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, বণিক প্রভৃতি বংশজাতদের (এক ভাষাভাষী হলেও) যেমন বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আচরণভেদে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখতে পাই সঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন ধরণের রাগকে তাদের স্বরসংখ্যা ও মুর্ছনাভেদে নানা জাতিতে বিভাজিত দেখা যায়।

**জাতি :** ভারতের কালে ১৮ প্রকার জাতির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি শুদ্ধ জাতি ও ১১টি বিকৃত জাতির উল্লেখ দেখা যায়।

**রাগ শ্রেণী :** রাগজাতি ছাড়া আর এক ভাবে রাগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল—‘শুদ্ধ’, ‘ছায়ালগ’ ও ‘সংকীর্ণ’। ছায়ালগকে ‘সালগ’ বা সালংক’-ও বলা হত। ‘অবিমিশ্র রাগ’দের বলা হত **শুদ্ধ** ; দুয়ের মিশ্রণজাতদের বলা হত **ছায়ালগ** ; বহু রাগের মিশ্রণজাতদের বলা হত **সংকীর্ণ**। বর্তমানে মিশ্র ও অবিমিশ্র জাতির রাগ খুঁজে পাওয়া দুস্কর ; কাজেই এ প্রথাও যুগোপযোগী নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব এদের কথা আমরাও এড়িয়ে যাচ্ছি।

এর পরে মধ্যযুগে আর একভাবে বর্ণীকরণের চেষ্টা চলেছিল। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রাদি ভেদের দ্বারা কতকগুলি রাগকে একটি বৃহৎ পরিবারভুক্ত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল, এ কথা রাগের ইতিহাসে বলেছি। এইভাবে লিঙ্গভেদে জাতিভেদ সৃষ্টি করে রাগ-রাগিনীদের মবিশেষ কল্পনাপাণন-প্রসূত মূর্তি আঁকা হয়েছিল। যদিও এই ধরনের জাতিবিভাগ বর্তমানে মেনে চলা হয় না, তত্রাচ বর্তমান যুগেও অনেকের মনে এই ধারণা স্বগভীরভাবে রেখাক্তি রয়ে গিয়েছে।

স্বরসংখ্যার ব্যবহার অল্পসংখ্যে বর্তমানে প্রচলিত রাগসমূহকে মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : (১) **সম্পূর্ণ**, (২) **ষাড়ব** ও (৩) **ঔড়ব**।

নীচে সংজ্ঞা দেওয়া হ’ল :

(১) **সম্পূর্ণ** : যে সমস্ত রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই সাতটি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোন সাত স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের “সম্পূর্ণ” বলে।

(২) **ষাড়ব** : যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই ছয়টি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোন ছয়টি স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের বলে “ষাড়ব”।

(৩) **ঔড়ব** : যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচটি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোন পাঁচটি স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের বলে “ঔড়ব”।

একের সহিত অপরের মিশ্রণের ফলে এই তিনটি জাতি ৩ × ৩ অর্থাৎ ৯টি জাতিতে বিভক্ত হয় :—

আরোহণ		অবরোহণ		
(১)	সম্পূর্ণ	...	সম্পূর্ণ	ভৈরবী
(২)	ষাড়ব	...	সম্পূর্ণ	জ্যোমপুরী
(৩)	ঔড়ব	...	সম্পূর্ণ	ত্রী
(৪)	সম্পূর্ণ	...	ষাড়ব	
(৫)	সম্পূর্ণ	...	ঔড়ব	
(৬)	ষাড়ব	...	ষাড়ব	মারোয়া, পুরীয়া
(৭)	ষাড়ব	...	ঔড়ব	
(৮)	ঔড়ব	...	ষাড়ব	নারায়ণী
(৯)	ঔড়ব	...	ঔড়ব	মালকোষ, ছুগা, ভূপালী প্রভৃতি

আমরা আগে বলেছি, হিন্দুস্থানী মতে প্রধানতঃ ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই তিন রকম জাতি আছে ও তাদের মিশ্রণে আরও নানা জাতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণী মতে, অর্থাৎ কর্ণাটক পদ্ধতিতে, ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ, বক্র ও সন্ধাণ এই পাঁচ রকম জাতি আছে; এই পাঁচ জাতির মিশ্রণে আরও বহু জাতির জন্ম হয়েছে।

## গ্রাম

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্রামুর্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ ।

তৌ দৌ ধরাতলে তত্র স্রাং ষড়্জগ্রাম আদিমঃ ॥ ১৪ ॥

( সঙ্গীত-রত্নাকর )

‘গ্রাম’ শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ হল লোকালয়, অর্থাৎ মাতৃবেদর আশ্রয়স্থল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ‘গ্রাম’ মানে স্বর ও মূর্ছনাদের আশ্রয়স্থল।

গ্রাম দুই প্রকার : যথা—ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। কোন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে গাঙ্কার গ্রামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরাজীতে গ্রামকে বলে স্কেল ( scale ) ।

সকল গ্রামের আদি বা আদিম স্বর বিধায় ছই গ্রামের মধ্যে ষড়্জ গ্রামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মধ্যম স্বরটিকেও ‘অবিলোপী স্বর’ বলা হত। পুরাকালে কোন রাগেই মধ্যম স্বরটিকে বর্জন করা হত না; তাই মধ্যম স্বরের নামে “মধ্যম গ্রামটি”ও প্রচলিত হয়।

এদের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উক্ত আছে :

পঞ্চমশ্চৈর্নির্বিংকারঃ ষড়্জগ্রাম স্তদোচ্যতে।

ষোপাস্তু শ্রুতিসংস্থায়ং গ্রামঃ স্রামধ্যম স্তথা ॥

—অর্থাৎ, ‘প’ স্বরটি নিজের চতুর্থ শ্রুতিতে থাকলে, তার আশ্রিত স্বরসমূহ ষড়্জ গ্রাম হবে, এবং পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতিতে স্থাপিত হলে তার আশ্রিত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম হবে।

**গাঙ্কার গ্রাম :** তখনকার দিনে ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামটিই প্রচলিত ছিল। গাঙ্কার গ্রামে পর পর অনেকগুলি ত্রিশ্রুতি ব্যবহারের নিয়ম থাকায় গাঙ্কার গ্রামের স্বরাস্তরগুলি প্রচলিত স্বরাস্তরযুক্ত স্বরসমষ্টি থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ায় তদানীন্তন সঙ্গীত সমাজে গ্রামটি ত্যাজ্য হয়েছিল। এটাই হল তার গন্ধর্বলোকে গমনের কারণ। এইভাবে গাঙ্কার গ্রামের মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ গ্রামটি লোপ পায়।<sup>১</sup>

“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি” পুস্তকে গ্রন্থকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ প্রমাণ করেছেন যে ভরতের গ্রন্থে গাঙ্কার গ্রামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেছেন, দত্তিল, মতঙ্গ, মকরন্দকার নারদ এই গাঙ্কার গ্রামের সামান্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। অতএব আমরাও এ গ্রামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। তিন গ্রামের শ্রুতিস্থান পরে চার্টে ( chart ) দেখান হয়েছে।<sup>২</sup>

বর্তমানে ষড়্জ গ্রামই একমাত্র প্রচলিত। গাঙ্কার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম সম্পূর্ণ লুপ্ত। যে ষড়্জ গ্রাম বর্তমানে প্রচলিত সেটিকেও সঠিকভাবে ষড়্জ গ্রাম বলা

১। পণ্ডিত ভাতখণ্ডজী বলেছেন : ত্রিশ্রুতি গাঙ্কার র ও ম এর এক এক শ্রুতি এবং দ্বিশ্রুতি নিষাদ ধ ও স এর এক এক শ্রুতি গ্রহণ করলে গাঙ্কার গ্রামের সৃষ্টি হয়।

২। আনন্দের বাণ্য়ের সুর মেলাবার পদ্ধতির আলোচনাকালে ভরত গাঙ্কার গ্রামের উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।

যায় না। কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রুতিস্থিত পঞ্চম স্বরের উপর নির্ভর করেই এটিকে আমরা মড়্জ গ্রাম বলে থাকি।

## গমক

“স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃচিত্তস্থাবহঃ।

তত্ত্ব ভেদাস্ত্য তিরিপঃ স্মরিতঃ কম্পিতস্তথা

লীন আন্দোলিতবলিত্রিভিন্নকুরলাহতাঃ।

উল্লাসিতঃ প্রাবিতশ্চ গুন্ধিতো মুদ্রিতস্তথা ॥

নামিতোমিশ্রিতঃ পঞ্চদেশৈতে পরিকীর্তিতাঃ ॥”

—সঙ্গীত-রত্নাকর।

—স্বরের এক বিশেষ ধরণের দোলনযুক্ত কম্পনকে গমক বলে; সঙ্গীতের এক বিশেষ ধরণের অলংকরণ বা স্বরভঙ্গী হল গমক। গমকের সময় স্বর সাময়িকভাবে স্ব-শ্রুতি থেকে সরে যায় ও স্ব-শ্রুতিতেই ফিরে আসে। শাস্ত্রে আছে, এই অলংকার ছাড়া রাগ বা গীতের যথাযথ সৌন্দর্য ফুটে উঠে না; এটি সংগীতের একটি অপরিহার্য অলংকার।

উপরের শ্লোকে আমরা উল্লেখ পাই মাত্র পনেরটি গমকের নামের। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্র মন্বন করে আমরা প্রায় ৭০৮০ রকম গমকের নাম পাই। এদের মধ্যে অনেকগুলি আবার কেবল নামাস্তরমাত্র গ্রহণ করেছে, কিন্তু কার্যতঃ তাদের প্রকাশভঙ্গী একই। প্রাচীনকালে গমক বলতে কেবল স্বরের বিশেষ আন্দোলনকেই নয়, আকর্ষিত, স্পর্শিত ও ঘর্ষিত স্বর সকলকেও এক কথায় গমক বলা হত।

আধুনিককালে গমক বলতে আমরা বুঝি এক থেকে চার স্বরের মধ্যে আবদ্ধ বিশেষ ধরণের দোলনযুক্ত স্বরধ্বনিকেই। এখানে একটি স্বরকেই মুখ্যভাবে ধরে তার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য আগের বা পরের ২।৩টি স্বরের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ২।৩টি শ্রুতির) সাহায্য নেওয়া হয়। আলাপের সময় বা তানের সময় যখন পর পর নানা স্বরে গমকের কাজ দেখান হয়, তখন তাকে যথাক্রমে গমকী জোড় ও গমকী তান বলা হয়।

প্রাচীনকালে এদের মধ্যে যে ৫৪ প্রকার গমক প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ণানুক্রমিকভাবে ( alphabetically ) তাদের নাম দিচ্ছি :—

(১) অগ্রস্বস্থান	(১৯) শুষ্কিত	(৩৭) প্লাবিত বা প্লুতি
(২) অনূহতি	(২০) ঘর্ষণ	(৩৮) বলি বা বলিত
(৩) অবঘর্ষণ	(২১) চ্যাবিত	(৩৯) বিকর্ষ বা বিকর্ষণ
(৪) অহতি	(২২) ঢালু	(৪০) মিশ্র বা মিশ্রিত
(৫) আন্দোলিত	(২৩) তারাহত বা উত্তরাহত	(৪১) মুকুলিত
(৬) আফালন	(২৪) তিরিপ	(৪২) মুট্টেয়
(৭) আহত	(২৫) ত্রিভিন্ন	(৪৩) মুত্রা বা মুদ্রিত
(৮) আহতি	(২৬) দোলন	(৪৪) মুর্চ্ছনা
(৯) উচ্চতা	(২৭) দ্বিরাহত	(৪৫) লীন
(১০) উৎক্ষিপ্ত	(২৮) দ্রুতি	(৪৬) শাস্ত
(১১) উদঘর্ষণ	(২৯) নিজতা	(৪৭) সঙ্গিবিষ্ট
(১২) উল্লাসিত	(৩০) নামিত বা নৈম্ন	(৪৮) স্তচালু
(১৩) কম্পিত বা কম্প	(৩১) পরতা	(৪৯) স্পর্শ
(১৪) কর্তরী	(৩২) পৌড়া	(৫০) স্ফালন
(১৫) কুরুল	(৩৩) পুনঃ স্বস্থান	(৫১) স্কুরিত
(১৬) কৈবল্য বা কেবল	(৩৪) পূর্বাহত	(৫২) হতাহত
(১৭) খশিত	(৩৫) প্রকম্পিত	(৫৩) ভংকৃত
(১৮) গমক	(৩৬) প্রতিহতি	(৫৪) ভঙ্গিত ॥

এই চতুঃপঞ্চাশৎ গমকের বিশ্লেষণ এই খণ্ডে সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র প্রচলিত ২০টির ব্যাখ্যা এখানে লিখছি।

(১) আহত—কোন স্বরধ্বনি প্রকাশ করার সময় আগের স্বরের সাহায্যে প্রকাশ করাকে **আহত গমক** বলে।

(২) আহতি—বিনা আঘাতে এক স্বর থেকে অল্প দূর প্রকাশ করাকে **আহতি গমক** বলে।

(৩) আন্দোলন—স্বরের একবার দোলনে যে গমক দেখান হয়, তাকে **আন্দোলন গমক** বলে।

(৪) আন্দোলিত—কোন স্বরকে তার আগের বা পরের স্বরের সাহায্যে লঘুমাত্রার বেগে দোলায়িত করলে তাকে **আন্দোলিত গমক** বলে।

(৫) উৎক্ষিপ্ত—তার থেকে আঙ্গুল ভুলে নিয়ে আবার তারে আঘাত করলে যে গমক হয়, তাকে **উৎক্ষিপ্ত গমক** বলে ।

(৬) উল্লাসিত—ক্রমিক স্বরের মিলিত আন্দোলনজাত গমককে **উল্লাসিত গমক** বলা হয় ।

(৭) কম্প—দুটি স্বরে দুটি দ্রুত আঘাত দিলে যে গমক করা হয়, তাকে **কম্প গমক** বলা হয় ।

(৮) কম্পিত—এক আঘাতে দুটো স্বর অল্প দ্রুত লয়ে প্রকাশিত হলে **কম্পিত গমক** সৃষ্ট হয় ।

(৯) কুরুল—পর্দার মাঝখানের তারে প্রকাশিত নানা রকমের জটিল গমকের নাম **কুরুল গমক** । [ কুরুল গমক দুই রকম : (ক) মুঠেয় ও (খ) মুকুলিত । ] কুরুল ঈষৎ কমর্নীয় ধরণের হয় ।

(১০) খশিত—বিভিন্ন পর্দায় দ্রুত অঙ্গুলি চালনাকে **খশিত গমক** বলে ।

(১১) গমকী—পুনঃ পুনঃ স্বরের দোলনকে বলা হয় **গমকী গমক** ।

(১২) দর্ষণ—এক স্বর থেকে তারে আঙ্গুল রেখে ঘেঁষে অন্য স্বরে যাওয়াকে **দর্ষণ গমক** বলে ।

(১৩) চ্যাবিত—একটি স্বরেই একটি জোরদার আঘাত দিয়ে যে গমক উৎপন্ন হয়, তার নাম **চ্যাবিত গমক** ।

(১৪) তিরিপ—আবর্তনযুক্ত দ্রুত গমককে বলা হয় **অতিক্রান্ত কম্পন** ; দ্রুতলয়ে একমাত্রার এক চতুর্থাংশের ( ১/৪ অংশের ) মধ্যে যে গমক দেখান হয়, তার নাম **তিরিপ গমক** ।

(১৫) ত্রিভিন্ন—অবিশ্রাম গতিতে তিন সপ্তকে দ্রুতলয়ে কোন একটি বা কয়েকটি স্বরকে দোলনের সাহায্যে প্রকাশ করাকে বলে **ত্রিভিন্ন গমক** ।

(১৬) দ্বিরাহত—এক আঘাতে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে দু'বার যাওয়া-আসা করার অপর নাম **দ্বিরাহত গমক** ।

(১৭) প্লাবিত—প্লুত মাত্রায় আন্দোলনকেই **প্লাবিত গমক** বলা হয় ( যদিও অনেকে বলেন যে এটি মীড়ের মতন । )

(১৮) বলি—বক্রতায়ুক্ত দ্রুত জোরদার আন্দোলনকে **বলি গমক** বলা হয় ।

(১৯) লীন—কোন স্বর থেকে আওয়াজ ক্রমিক গতিতে মুহু থেকে মুহুতর হতে হতে মিলিয়ে যাওয়াকে **লীন গমক** বলে ।

(২০) স্মৃতি—তারে আঙ্গুল রেখে এক স্বরে এক আঘাতে দ্রুত ছটি স্বর প্রকাশ হলে তাকে স্মৃতিত গমক বলা হয়। (এটি অনেকটা মূর্কীর কাজের মত।)

কেবলমাত্র যে ২০টি বিশেষ গমকের বিশ্লেষণ উপরে লিপিবদ্ধ হল, তা থেকে বোঝা যায় যে তদানীন্তনকালে প্রায় সকল প্রকার অলংকারকেই এক কথায় গমক বলা হত।

## তান

‘তনু’ ধাতু থেকেই তান শব্দটির ব্যুৎপত্তি। প্রাচীনকালে তানে স্বরের একক ঘোঁগই ব্যবহৃত হত। ছোট ছোট বিস্তার করাকেও তান বলা হত।

তখনকার দিনে চার রকমের তান ব্যবহৃত হত; যথা :—

- (১) আর্চিক (এক স্বরের তান); (২) গাথিক (দুই স্বরের তান);  
(৩) সামিক (তিন স্বরের তান); (৪) স্বরাস্তর (চার স্বরের তান)।

মধ্যযুগে চার রকমের তান ব্যবহৃত হত; যথা :—

- (১) শুদ্ধ (স র গ ম প ধ ন ইত্যাদি); (২) অলংকারিক (স গ র স, র ম গ র ইত্যাদি); (৩) মিশ্র (গ র ম গ, প ইত্যাদি) ও (৪) কুট (স গ গ র স, প ন ন ধ প, ইত্যাদি)।

বর্তমানে তান বলতে বুঝায় কতকগুলি স্বরের দ্রুত গমনাগমন ও বিস্তার করা। আজকাল বর্ণ, অলংকার সব মিশিয়ে এক কথায় তান বলেই চলছে। এখন তানের বিশেষ নিয়ম আমরা সব সময়ে মেনে চলি না। এখন স র গ ম প ধ ন এই সাত স্বরের সর্ব রকম সম্ভাব্য বিস্তার ও সংযোগে যে ৫০৪০ তানের উৎপত্তি হয়, তার (ফর্মুলা) সহজ গাণিতিক সূত্র বা সঙ্কেতের কথা প্রথমে জানিয়ে পরে তানের প্রসঙ্গে আসছি।

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| (১) | ১                         | = ১                                     |
| (২) | ১ × ২                     | = ২                                     |
| (৩) | ১ × ২ × ৩                 | = ৬                                     |
| (৪) | ১ × ২ × ৩ × ৪             | = ২৪                                    |
| (৫) | ১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫         | = ১২০ ( ঔড়ব রাগের তান-সংখ্যা )         |
| (৬) | ১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬     | = ৭২০ ( ষাড়ব " " " )                   |
| (৭) | ১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ৭ | = ৫০৪০ (সাত স্বরের সম্পূর্ণ তান-সংখ্যা) |

স র গ ম দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় সাধারণভাবে সূত্র দিয়ে বুঝান হয়েছে। ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার পরিবর্তে স র গ ইত্যাদি বসিয়ে হিসাব ধরলে সহজেই জিনিষটি (স র গ ম ভেদ) পাওয়া যাবে। এতে কোন স্বরের দ্বিগুণ প্রয়োগ হয় না।

এখন আসিল তানের কথায় ফিরে আসছি।

বর্তমানে প্রচলিত তানসমূহকে আমরা স্থূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :  
(১) সরল তান, (২) জটিল তান ও (৩) অতি জটিল তান।

(১) সরল তান—সপাট, পলট, উলট, সূঁত, আশ, কড়ক, বিজলী, দানেশ্বর, ছুট প্রভৃতি।

(২) জটিল তান—ফিরত, ফিরকত, উলটি, কূট, লড়ম্ব, খটকা, ঝটকা, বল, চক্র ইত্যাদি।

(৩) অতি জটিল তান—বল-পেচ, মুরক, রেরক, লড়ি, লড়গুখাও, ফান্দা, লড়লপেট প্রভৃতি।

এক সপাট তানের-ই ৩-৩টি প্রকারভেদ রয়েছে : যথা—সপাট, বেড়া-সপাট, বল-সপাট, টেরা-সপাট প্রভৃতি। আমাদের সংগ্রহে ৮০-৮৫ বকম তানের নাম রয়েছে। বর্তমান খণ্ডে সে সবের উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না ; কেবলমাত্র মীড়খণ্ডি, পালকা, লড়ি, লাউগুখাও প্রভৃতি যে সকল তান সাধারণতঃ বন্ধে ব্যবহৃত হয়, সে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল।

**খণ্ডমেরু :** 'সদীত-রত্নাকরে' উল্লিখিত খণ্ডমেরুর প্রস্তার বর্তমান কালের মীড়খণ্ডি তান। সপ্তস্বরের বিছাসে ৫০৪০ তান যে কায়দায় উদ্ভাবিত হয়েছিল, এটিও সেই সূত্রের অনুরূপ। (সূত্রটি আগে লেখা হয়েছে।) প্রাচীনকালের খণ্ডমেরু চার স্বরের প্রস্তারে বৈদিক যুগের স্বরাস্তরের-ই নামাস্তর মাত্র ; এটিকে দুই প্রকারে দেখাচ্ছি। প্রথম প্রকারে চারটি সারিতে 'স' ৬-টি, 'র' ৬-টি, 'গ' ৬-টি ও 'ম' ৬-টি করে দেখান হয়েছে।

[ক]	'স'	[খ]	'র'	[গ]	'গ'	[ঘ]	'ম'
(১)	স র গ ম		র ম স গ		গ ম স র		ম গ র স
(২)	স গ র ম		র স গ ম		গ ম র স		ম স গ র
(৩)	স ম গ র		র গ স ম		গ স ম র		ম স র গ
(৪)	স গ ম র		র স ম গ		গ র ম স		ম র গ স
(৫)	স র ম গ		র ম গ স		গ স র ম		ম গ স র
(৬)	স ম র গ		র গ ম স		গ র স ম		ম র স গ

এবারে দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করা যাক। প্রথমটিতে যেমন ক-খ-গ-ঘ বিস্থাসে আরম্ভ স-র-গ-ম করে ধরা হয়েছে, এটিতে তেমনি শেষ থেকে ম-গ-র-স প্রত্যেক বিস্থাসের শেষে রাখা হয়েছে :

[ক]	'ম'	[খ]	'গ'	[গ]	'র'	[ঘ]	'স'
(১)	স র গ ম	স র ম গ	স গ ম র	র গ ম স			
(২)	র স গ ম	র স ম গ	গ স ম র	গ র ম স			
(৩)	স গ র ম	স ম র গ	স ম গ র	র ম গ স			
(৪)	গ স র ম	ম স র গ	ম স গ র	ম র গ স			
(৫)	র গ স ম	র ম স গ	গ ম স র	গ ম র স			
(৬)	গ র স ম	ম র স গ	ম গ স র	ম গ র স			

দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পংক্তিতে ৬টা করে বিস্থাস রয়েছে। অতএব দেখা যায় এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই  $৬ \times ৬$  অর্থাৎ ২৪ প্রকার বিস্থাস হচ্ছে।\*

এখানেও সংখ্যার সংগ্রাম ও বিস্থাসের (Permutation & Combination) কায়দা অবলম্বন করা হয়েছে : যেমন— $১২৩ = ১৩২, ১৩১, ২১৩, ৩১২, ৩২১, ১২৩$ ; অর্থাৎ  $১ \times ২ \times ৩ = ৬$ , আবার সেই একই বিস্থাসে তিনটি স্বরের কোন একটি স্বরকে ছবার করে ব্যবহার করলে পাই :

১১৩, ২২৩, ৩৩১, ৩৩২, ২২১, ১১২ ;

১৩১, ২৩২, ৩২৩, ৩১৩, ২১২, ১২১

প্রভৃতি ভে কে। এই রকমে ১, ২, ৩-এর পরিবর্তে স, র, গ স্বরকে ধরে নিয়ে এই পদ্ধতিতে সাজলে আমরা 'স' 'র' 'গ' স্বরের নানা বিস্থাস পাচ্ছি।

রাগানুষ্ঠায়ী স্বরের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিবেচনা করে এই সূত্র (formula) অনুষ্ঠায়ী বিস্তার করলে আমাদের কাছে তান গড়া ও স্বরবিস্তার করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

**হলকা বা হালকা :** যন্ত্রে ব্যবহৃত আর এক ধরণের তানের কথা বলছি। এই ধরণের তানকে হালকার তান বলা হয়। হালকার তানে একটি স্বরগুচ্ছ দিয়ে একটা তানের ছন্দ রচনা করার পর সেই ছন্দের, এবং স্বরগুচ্ছের স্বরসংখ্যা একটি করে ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে এনে অল্প ছন্দ সৃষ্টি করা (এবং অনেক ক্ষেত্রে শেষের দিকে পূর্বছন্দে প্রত্যাবর্তন করা) হয়। যথা :—স̣ র̣ স̣ ন̣, ধ̣ ন̣ স̣ ন̣,

ধ̣ প̣ ম̣ প̣ এই তান দিয়ে আরম্ভ করে পরে স̣ র̣ স̣ স̣, ন̣ স̣ ন̣ ন̣, ধ̣ ন̣ ধ̣ ধ̣,

\* আসলে দুটি ক্ষেত্রের স্বর বিস্থাস একই। পৃথক ভাবে সাজান বলে আলাদা মনে হচ্ছে।

প ধ প প ; পরে আবার স্বর কমিয়ে হালকা করা যেতে পারে, যেমন—স র স, ন স ন, ধ ন ধ, প ধ প ; আরও কমানো হলে দাড়ায় স র, ন স, ধ ন, প ধ, ইত্যাদি।

**লড়ি :** অনেকে বলেন যে “লড়াই” থেকে “লড়” কথাটি এসেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। লড়ি কথাটি হিন্দি “লড” শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ \*। এই লড়ি কথার বঙ্গার্থ হল—পংক্তি, লহর বা মাল। স্বরের পংক্তি (line), স্বরের লহর (টেউ) বা স্বরের মালাকে **লড়ি** বলা হয়। যে তানে এই সব ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়, তাদেরই **লড়ির তান** বলা হয়। সাধারণতঃ স্বরের মালার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ; যথা : স র গ র গ ম গ ব, গ র গ ম প ম গ র ইত্যাদি।

লড়ির তানের আরও অনেক ভেদ দেখা যায় ; যথা : ‘লড়ি-ফিরত’, ‘লড়ি-লপেট’, ‘লড়ি-সপাট’, ‘লড়-গুথাও’, ‘লড-নাডস্ত’ প্রভৃতি। যত্নে লড়ির তানে নানা বোল ব্যবহার করা হয় ; লড়ির বোলেব নানা ভেদের পর থেকেই ‘বালা’, ‘ত্রাপরণ’ ইত্যাদি আরম্ভ করা হয়।

**লড়গুথাও :**—হিন্দি “গুথাও” শব্দটির বঙ্গার্থ গেথে চলা বা গীথা। যেখানে স্বরের মালা পর পর গেথে চলা হয়, সেই ধরনের তানকে **লড়গুথাও** বলা হয়। উদাহরণ :—স র গ ম প ম গ র ; ন ধ প ম গ ম গ র ; ধ প ম গ প ম গ র ; ইত্যাদি। অবশ্য যত্নে লড়গুথাও বাজাবার সময় কিছু কঠিন বোল প্রয়োগ করা হয়। লড়গুথাওতে ড্রারভা, দাড়ারভা ইত্যাদি বোল বাজাবার রীতি দেখা যায়। বালা বাজাবার আগেই এই ধরনের তান বাজাবার রীতি। গানের তানে ও যত্নে লড়িতে কিছু প্রভেদ আছে। (মেশুলি গারে প্রকাশমাপেক্ষ রইল।) সাধারণতঃ তবলার বা পাখোয়াজের লড়ির বোলগুলিই যত্নে ব্যবহার করা হয়। (দ্বিতীয় খণ্ডে এই বোলগুলিও প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।)

গানের আলাপের সময়, ধ্রুপদ গানে বা যত্নে রাগ-আলাপনে তান ব্যবহারের রীতি নাই। দ্রুত বিস্তারের সময় তানের বদলে মেথানে জোড়ের কাভ করা হয়।

\* উষ্টবা : ‘রাষ্ট্রভাষা পরিচয়’ (নবম সংখ্যা) ; (২) শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী রচিত ‘হিন্দী-বাংলা অভিধান’ ; (৩) নবল-জী সম্পাদিত—‘নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর’ নামক হিন্দী অভিধান।

টপ্পায় একই ধরণের দানাদার তান ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র খেয়াল গানে ও যন্ত্রে গত বাজাবার সময় নানা ধরণের তান ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ কায়দার কয়েক প্রকার তান বিভিন্ন ঘরাণায় ব্যবহার করা হয়।

## মাত্রা

সঙ্গীতে ব্যবহৃত সময়ের সূক্ষ্ম স্থায়িত্ব বুঝাবার একক পরিমিত ক্ষুদ্র বিভাগ হল **মাত্রা**। সময় নির্ধারণসূচক ঘণ্টা, মিনিট প্রভৃতিকে পরিমাপ করবার জ্ঞান যেমন ঘড়ির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি লগ্নকে মাপা ও তালকে বাঁধার জ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে মাত্রা। অপরিমেয় সময়কে পরিমাপ করার জ্ঞান এর ব্যবহার। এই ছোট ছোট ক্ষণস্থায়ী এক একটি মাত্রার স্থায়িত্বই লয়ের মাপকাঠি। এই মাত্রার চন্দ্রোৎপন্ন সমষ্টিতেই আমরা তালের হৃদিশ পাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে ‘মা’ ধাতুর অর্থ পরিমাপ করা, এই ‘মা’ ধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দ হল ‘মাত্রা’।

আমাদের সঙ্গীতে মাত্রার স্থায়িত্বের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ, অর্থাৎ মাপকাঠি নেই। ব্যাকরণবিদগণ এক একটি বর্ণের উচ্চারণকালকে একমাত্রা সময় বলে থাকেন। একবর্ণের উচ্চারণকাল অতি ক্ষুদ্র সময়, এই বিবেচনায় সাক্ষাতিকের পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণকালকে এক মাত্রা ধরে নিলেন। এ সম্বন্ধেও আবার মতদ্বৈধ দেখা গেল; কেউ ছয়টি বর্ণের, কেউ বা চারটি বর্ণের উচ্চারণকালকে মাত্রার সময়কাল বলে স্থির করলেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রাধা-নামের ডাককে বলা হয় তিন মাত্রা। আবার বলা হয়েছে, শশীকলা, কনকরেখা ও পারিজাত এই বংশীত্রয়ের আওয়াজে যথাক্রমে গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রার সৃষ্টি হয়েছে। নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক একমাত্রা, কাকের ডাক দুই মাত্রা ও ময়ূরের ডাক তিন মাত্রা,—শাস্ত্রে এবং বিধ বর্ণনা আছে। সবশেষ বক্তব্য এই যে, একমাত্রার কাল-পরিমাপের যে সূক্ষ্ম বিভাগ আমরা শাস্ত্রপাঠে অবগত হই, সেগুলি বিভ্রান্তিকর। পণ্ডিতেরা বলেছেন **ক্ষণকাল** হল মাত্রার **প্রথম প্রাণ**; ক্ষণের সময়-নির্দেশ প্রসঙ্গে তাঁরা উপমা দিলেন যে গরুর শিং-এর উপর একটি সর্ষে রাখলে সেটি গড়িয়ে পড়তে যে সময় লাগে, সেটি হল “এক ক্ষণকাল”। ভিন্ন মতে একশোখানা পদ্মপত্র উপর-উপর একসঙ্গে সাজিয়ে একটি সূঁচ দিয়ে সেগুলি বিধে ফেলতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় “ক্ষণকাল” বা **কাল**।

কাজেই ক্ষণের নির্দিষ্ট সময়কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। এই ক্ষণকালকে মাত্রায় নিয়ে যেতে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করলেন তাঁরা :

৮ ক্ষণকাল = ১ লবকাল ; ৮ লব = ১ কাষ্ঠা ; ৮ কাষ্ঠা = ১ নিমেষ ; ৮ নিমেষ = ১ কলা ; ২ বা ৮ কলা = ১ ক্রটি ; ২ ক্রটি = ১ অক্ষমাত্রা ; ২ অক্ষমাত্রা = ১ অর্ধমাত্রা এবং ২ অর্ধমাত্রা = ১ মাত্রা ।

স্বস্থ ও সবল যুবা পুরুষের নাড়ীর স্বাভাবিক স্পন্দনের প্রতিটি আঘাতের গতিকে এক মাত্রার সাধারণ পরিমাপ বলে ধরা হয়েছে কোন কোন গ্রন্থে। এই মতটি আমরাও গ্রহণীয় বলে মনে করি। বর্তমানে বিজ্ঞানের দ্বারা মাত্রামান যন্ত্রে আমরা মাত্রার সময়মান নির্দিষ্ট করার সহজ পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী।

“লঘু”, “গুরু” ও “প্লুত” এই তিন রকম মাত্রার ব্যবহার দেখা যায় মার্গ তালে। এতে লঘুকে ১ মাত্রা, গুরুকে ২ মাত্রা ও প্লুতকে ৩ মাত্রা ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া আরও অনেক রকম মাত্রার ব্যবহার দেখা যায় :—ক্রত অর্ধ ( ½ ) মাত্রা, অক্ষক্রত সিকি ( ⅓ ) মাত্রা, কাকপদ ৪ মাত্রা ইত্যাদি। মাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার আছে, সে সমস্তই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইতি করতে বাধ্য হলাম।

## ছন্দ

“স্বরজাত রাগ সম যাহার আকার।

যতি-মাত্রা সহকারে উচ্চারণ যার ॥

শ্রবণ-মধুর যাহা হৃদয়-রঞ্জন।

তাঁহাকে কহেন ছন্দ আদি কবিগণ ॥”

—( মধুসূদন বাচস্পতি রচিত ‘বাংলা ছন্দমালা’ )

—‘ছন্দ’ শব্দ থেকে ছন্দ কথাটির উৎপত্তি। সাধারণ বিচারে এর অর্থ চল ‘গতি-সৌন্দর্য’ ; যে কোনও গতিশীল ব্যাপারেই ছন্দ প্রয়োগ করা যায়। সঙ্গীত গতিশীল ; তাই তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে ছন্দের। ছন্দ ব্যতীত সে চলতেই পারে না। সঙ্গীতে সীমিত লয়ের মাঝে নতুন কায়দায় নানা ধরনের স্বরাঘাত ও স্বর সঞ্চালন করে তান ও লয়ের নির্দেশ বজায় রেখে অভিনবভাবে মাত্রা ও তালের যে হেরফের করা হয়, তাকে বলে ছন্দ।

সাহিত্যে দেখা যায় লঘু ও গুরু মাত্রাতে ছন্দের সমাপ্তি। কিন্তু সঙ্গীতে আমরা অক্ষক্রত, ক্রত, লঘু, গুরু ও প্লুত এই পাঁচ রকম মাত্রা দেখতে পাই। সঙ্গীতে নানা ছন্দের তান যখন স্বর ও তাল লয়ের মাধ্যমে ভরপুর হয়ে বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন সংখ্যক স্বর সমষ্টির মাত্রাগত বিভাগে গাওয়া বা বাজান হয়, তখন

শ্রোতামাত্রেই তাতে আনন্দিত হয়ে উঠেন। ছন্দবৈচিত্র্য না থাকলে সঙ্গীত একঘেয়ে হয়ে ওঠে; তাই সঙ্গীতে ছন্দ অপরিহার্য।

কাব্যের ছন্দকে ছন্দমঞ্জরীকার প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন :—অক্ষর গণনা করে যে ছন্দ বাঁধা হয়, তাকে বলেছেন **বৃত্ত**। আর লঘু-গুরু-মাত্রায় বর্ণ বাঁধা ছন্দের নাম দিয়েছেন **জাম্বু**। কাব্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এখানে বাদ দিচ্ছি।

বিশ্বনিয়ন্ত্রার সৃষ্টিই ছন্দ থেকে, এক এক বিশেষ প্রকাশের মাঝে সৃষ্টির আদিপর্ব রচিত। সেই সৃষ্টি থেকে এসেছে ছন্দ; সেই ছন্দ আসন পেতেছে সঙ্গীতে। জীবধর্মের মতো ওতঃপ্রোতঃভাবে রয়েছে সঙ্গীত; নানা জীবজন্তুর নৃত্যের মধ্যে মানুষ সন্ধান পেয়েছিল প্রথম ছন্দের; বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালনা ও পরিশীলনের মাধ্যমে সে সেই সমগ্র ছন্দকে নিজস্ব করে নিতে চেষ্টা করেছে।

কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের ছন্দ কিছু ভিন্ন ধরণের; জোর করে মিলাতে চাইলেও সব সময়ে তার ঠিক মিল হয় না। আধুনিক প্রতিটি তালই কোন-না-কোন ছন্দের অধীন। অথচ সেই ছন্দগুলি আমাদের পরিচিত নাও হতে পারে। দাদরা, কাহারবা, একতাল, তিনতাল প্রভৃতি তালের অনুরূপ ছন্দ আমরা কবিতায় দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় “যখন যখন গগন গরজে”, “জীবন যখন শুকায়ে যায়”, “কলকল মুগরিত মণিময় বলয়ং” ইত্যাদি। কিন্তু যখন পাঞ্জাবী-স্টেকা, কুমরা, সওয়ারী প্রভৃতির ছন্দবিভাগ সাধারণ্যে ব্যবহৃত ছন্দের উদাহরণের মধ্যে খঁজে পাওয়া যায় না, স্বভাবতঃই তখন মনে প্রশ্নের উদয় হয়—গানের ছন্দ কাব্যছন্দের অধীন কি না? অতি প্রাচীন সময়ের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তদানীন্তনকালে ভাষাসৃষ্টির পূর্বেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর সেই সঙ্গীতের নৃত্যের মাঝে মধ্যমণি ছিল ছন্দ। আমাদের মনে হয়, যেমন নৃত্য থেকে তালের সৃষ্টি, তেমনই নৃত্য থেকেই ছন্দেরও সৃষ্টি।

কাব্যছন্দের প্রধান উপাদান হল অক্ষর, মাত্রা আর যতি। এদের স্নসংঘত বিজ্ঞাসে তার প্রকাশ। সঙ্গীতে মাত্রার লঘু-গুরু ভেদ ও তাদের সমষ্টিভেদে ছন্দের উদ্ভব। অক্ষরের লঘু ও গুরুর উপর কবিতার বাণী নির্ভরশীল। কবিতার বাণী ও ছন্দকে সেই এক ভাবেই এবং এক নির্দিষ্ট ছন্দে চলতে হয়। অক্ষর ও শব্দের হেরফের না হলে তাকে বদলানো যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। সময়ের মাপকাঠি বজায় রেখে সে নানা কায়দায় নানা ছন্দ সৃষ্টি করে চলে। এটাই সঙ্গীতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য। লঘু-গুরু মাত্রা বিজ্ঞাসে সঙ্গীতের বৈচিত্র্য

প্রকাশমান হলেও, তার মাত্রা বা ছন্দ অক্ষরের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার মুখাপেক্ষী নয়। তালের ক্ষেত্রে সে একটা নির্দিষ্ট ছন্দকে স্বীকার করে নিলেও সেই তালেরই বাণ্ডে বা গীত-অলংকরণের সময় সঙ্গীত তার নির্দিষ্ট তালের নির্দিষ্ট ছন্দ মেলে চলে না। তালের সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নব নব নবীন ছন্দ সে গড়ে তোলে। কবিতার বেলায় এই ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না।

অতি প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তবে তাল সম্বন্ধে প্রামাণিক যে বই প্রথম দেখতে পাই, সেটি হল ভারতের “নার্টিশাস্ত্র”। ঋগ্বেদ গীতি প্রসঙ্গে ছন্দের কথায় ভারত তাঁর পুস্তকের দ্বিত্বিংশ ( ৩২ ) অধ্যায়ে বলেছেন যে ঋগ্বেদের পদ গঠিত হবে ছন্দে, কিন্তু গান হবে চচ্চংগুট ইত্যাদি তালে। স্তত্রাং প্রমাণিত হচ্ছে, ছন্দের যে বৃত্তিগুলি ঋগ্বেদগীতিতে ব্যবহৃত হত, সেগুলি তাল নয়; সেগুলি গীতিভাষার কাব্যিক ছন্দ। চচ্চংগুট তালের মাত্রা

৥ ৥ ।।।  
বিজ্ঞাস হল : গুরু, গুরু, লঘু, প্লুত। কাব্যিক ছন্দে আমরা পাই : কাঁদে ললন।

৥ ৥ ।।।  
শোকভরণা; এই যে ছন্দ, এ ছন্দ বর্ণগণ নয়, মাত্রাগণ ছন্দ। এর বৈশিষ্ট্য হল ছন্দযুক্ত মাত্রায় বোল-বাণীর ব্যবহার। একটা লঘু মাত্রায় পাঁচটা বা ছটা বর্ণ উচ্চারণ করতে হবে, অথবা ঐ বর্ণদের উচ্চারণকালও একটা মাত্রার স্থিতিকালেই হবে। মাত্রাগণে এ ধরনের মাত্রা সম্ভব নয়; তাছাড়া দ্বিকল ইত্যাদি হলে ছন্দের কাঠামো-পরিবর্তনও মাত্রাগণছন্দে সম্ভব নয়। স্তত্রাং আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রাচীনকালে তালের ছন্দ নিজস্ব পদ্ধতিতেই চলত। তদানন্তরকালে প্রচলিত দেশী তালসমূহের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে কবিতা-ছন্দের অভাব আরও স্পষ্ট হয়। যথা, রাসতালে আছে ১ লঘু; এর ছন্দ খুঁজে পাই না। এক লঘুতে চার বর্ণ ধরলেও দাঁড়ায় “খ দি ঘ ন”; এই বোলটি বারবার আবৃত্তি করে গেলে একটা ছন্দের ধারণা হয়ত আমবে। আবার দেখতে পাই : চতুর্থক তালে আছে ১ লঘু, ১ লঘু, ১ দ্রুত; একে যদি বাণীতে বসাই, তবে ‘ধিননক তক তক তিন’ এই বোলটি পেতে পারি। কিন্তু কাব্যের ছন্দ এখানেও পাই না। এই সকল আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় যে তালের ছন্দ কাব্যাধীন নয়, বা কাব্য থেকে তাঁর জন্ম নয়। কাব্যের দ্বিপদ বা চতুস্পদ ব্যবহারকে গ্রাহ্য না করে যদি একটা পদের মাঝে আমরা ছন্দ খুঁজি, তবে তালের ছন্দের সঙ্গে একটা মোটামুটি মিল আমরা দেখতে পাব।

আমাদের গানে চৌতাল, বাঁপতাল, শূলতাল, কুম্ভা, তেওড়া, আঁড়া-চৌতাল,

তিনতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা ( কহর্বা ) প্রভৃতি তাল-ই আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি । বাংলাদেশে দাদরা ও কাহারবার কয়েকটি রূপান্তর দেখা যায় ; তাদের রূপান্তরিত নাম আড়খেমটা, হুমরী ইত্যাদি । হিন্দুস্থানের অগ্রত্রে এই নামের ব্যবহার নেই ; সেই কারণে আমরা এদের দাদরা ও কাহারবার রূপান্তর বলেই মনে করতে পারি । ছন্দের কথা বেশী বাড়িয়ে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না ; তাই সাধারণভাবে কয়েকটি কাব্যিক ছন্দের সঙ্গে প্রচলিত তালের মিল দেখিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি ।

তিনতালের সঙ্গে মিল দেখানোর জন্ত প্রথমে আমরা বিদ্যাম্বালা ছন্দের আশ্রয় নিলাম । এই ছন্দে আছে ২টি মগন ও ২টি গুরু ; কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে ৮টি গুরুর সমষ্টি দেখা যায় ; যথা—

	}	
বিদ্যাম্বালা লোলান্ ভোগান্		মেঘাচ্ছন্দে চন্দ্রাদিত্যে
	}	
মুক্কা মুক্তৌ যব্জং কুখাং ॥		ভয়াচ্ছন্দে বহ্নিজালে ॥

ধ্যানোৎপন্নঃ নিস্সামাশ্রাং সৌপ্যভোক্তুং যথাকাকুৎক্ষেন্ ॥

ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা—তিনতালের টিমালয়ের এই ঠেকার মিল করা যায় । এটিকে প্রাচীন **বিন্দুমালী** তালের সঙ্গেও তুলনা করা চলে । এটি **অষ্টাক্ষরবৃত্তি ছন্দ** ।

এখন **মস্তা ছন্দটি** আলোচনা করা যাক । ছন্দ হিসাবে মগন, ভগন, সগন ও গুরুর সমষ্টির সঙ্গে **টিমা তিন তাল**-এর মিল করা যেতে পারে :

|| || || || | | | | || || || || || | | | | || ||

নীলা রামে কল কল কুজ্জ জ্বালাশ্বালী গুরু কল কঠে ।

—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধাগে ভক ধিন ধা । ইত্যাদি ।

টিমা তিনতালের সঙ্গে **কণ্ঠা ছন্দটির**ও মিল করা যায় । ( কণ্ঠা ছন্দেও প্রত্যেক চরণে দু'টি করে গুরুবর্ণ আছে । ) উদাহরণ :

|| || || || || || || ||

রাজা | মারে | কেবা | রাখে |

—প্রাচীন **কেন্দুমালী** তালের সঙ্গেও এর সমতা আছে । এই ছন্দটি **দুই অক্ষরবৃত্তি ছন্দ** ।

**তুণক ছন্দ :** রগণ, জগণ, রগণ, জগণ, রগণ—এদের সমষ্টি-প্রয়োগে

দেখা যায় :    ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥  
বীর | পাল | যেন | কাল | ; মাল | সাট | মারি | ছে-এ

৥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥  
বার | বার | মার | মার | ; হান | হান | ডাকি | ছে-এ

ত্রাস | মাই | মান | পাই | এই | ভাব | ভাবি | ছে-এ

অথবা :    ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥  
পঞ্চ | বাণ | বাণ | জাল | পূর্ণ | হেম | তুণ | কন্

—একতালের ত্রৈমাত্রিক ঠেকার সঙ্গে আমরা একে মিলাতে পারি ;

যেমন :    |   |   |   |   |   |   |   |   |  
দিন দিন ধা | ধা খুন না | —ইত্যাদি ।

—এটি পঞ্চদশাক্ষর বৃত্তিছন্দ ।

অথবা দাদ্রার একটি খেমটা প্রকারের সঙ্গে মিলাতে পারি ; যেমন :

ধী গ্ ধা | ধা তি না | তী ক্ তা | তা তি না |

### ভ্রমিত গতি

**মানবক ছন্দ :** তিসাবে ভগণ, তগণ, লঘু ও গুরু সমষ্টি ।

৥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥  
বার   বধু | কেলি ময়ীং | বাণ্ড | রিকাং | প্রাপ্য | জনঃ |

—এর সঙ্গে আমরা দাদ্রার মিল দেখাতে পারি ; যেমন—

ধি গ ধা | ধা তি ন্ | ইত্যাদি ।

### সমানিকা

**বৃহতী :** হ্রদ তট নিকট ক্ষৌণী ভুজগ শিশু ভূতা বা সীং ।

চৌতাল প্রকারের সঙ্গে মিল আছে । সামগানের একটি প্রধান ছন্দ ।

**শশীকলা :**    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
কলকল | মুখরিত | মণিময় | বলয়ং

৥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥   ॥  
পুলকিত | তনুঘন | মনসিজ | বিসরম্ ॥

—একে আমরা তিনতাল বা কাহারবা উভয় তালের সঙ্গেই মিলাতে পারি ।

ধা ধিন্ ধিন ধা. অথবা ধাগি নাতে নাগ ধিন্ ।

আমরা এখানে আরও ২১টি ছন্দের সঙ্গে তালের মিল দেখিয়ে কথা শেষ করছি ।

শৌক্তিকমালা ছন্দ : এর প্রয়োগ হল চার মাত্রার :

শশিবদনা পংক্তি কল কল কাঞ্চী কঙ্কন জালং  
 মধুর বিহারং মানস চোরম্ ॥

—এর সঙ্গে আমরা কাঁহারবা তালের সাদৃশ্য দেখাতে পারি : যথা :

ধাগি তেটে | নক্ ধিন্ |

আগিনী : গো | রসং | চো | রয়ন্ | গো | পিকা | মন্দিরে

সতী, গজগতি সখি | বলে | সচ | কিতে |

—এর সঙ্গে মিল দেখানো যায় ঝাঁপতালের ; যথা :

ধিনা | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না |

সুমুখী : প্রয়োগ হিসাবে মিশ্র ছন্দের অন্তর্গত :

মম | রুদয়ে | সততং | স্কুরণং |  
 তল্লু | রতসী | কুম্ভম | প্রতিমা |

—আড়া চৌতালের সঙ্গে পাই এর মিল ; যথা :

ধা গে | ধা গে দিন তা | কং তাগে দিন তা |  
 তেটে কতা গদি ঘেনে |

ধি ন | ধা গে থু না | তে টে তা ধি | না ধি ধি না | ইত্যাদি ।  
 ছন্দ সঙ্কে বিশদ ব্যাখ্যার ইচ্ছা রইলো ।

## ॥ তাল ॥

মাত্রার ছন্দোবন্ধ নিয়মাত্মক সমষ্টিকে বলে তাল ।

তাণ্ডব নৃত্যের 'তা' ও লাস্ত্র নৃত্যের 'লা' থেকে 'তাল' শব্দটি পাওয়া যায় এবং নৃত্য থেকেই তালের সৃষ্টি । বৈয়াকরণিকেরা বলেন, 'তল্' ধাতুতে ঘঞ্ ও প্রত্যয় নিম্পন্ন করলে 'তাল' শব্দ পাওয়া যায় । পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, পঞ্চানন তালের আদি স্রষ্টা : শিবের তাণ্ডবনৃত্য ও পার্বতীর লাস্ত্রনৃত্য থেকে তালের জন্ম ।

আবার শোনা যায়, স্বরপতি ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্সরাদের নৃত্য থেকে তালের জন্ম। যে ভাবেই হোক না কেন, একথা সহজেই বুঝা যায় যে আদিম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ থেকে যে নৃত্যের উদ্ভব হত, তার বিভিন্ন ছন্দ ও গতির ফলে তালের জন্ম।

শাস্ত্রপাঠে পৌরাণিক কাহিনীতে আরও জানা যায় যে পঞ্চাননের পাঁচ মুখ থেকে পাঁচটি তালের সৃষ্টি। অমরাপুরীতে স্বরমুনিগণের একান্ত নিজস্ব ছিল এই পাঁচটি তাল। বর্তমানে মর্তলোকে এই তালের প্রচলন নেই। মার্গ সঙ্গীতে চচ্চংপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পক্ষেষ্ঠাক ও উদঘট—এই পাঁচটিই মার্গতাল নামে প্রচলিত এবং এই পাঁচটি তালই এখন অমর্তলোকের বাসিন্দা। আমরা মনে করি এরা সমস্ত তালের জনক, যদিও মার্গ সঙ্গীতের মত এরাও আজ লুপ্ত।

স্বর্গলোকের এই তাল সকল মর্তলোকে আজও বেঁচে আছে, কেবলমাত্র মার্গ নামে ও তাদের মাত্রা সমষ্টির বিভাগে। অথচ অতীতে এমন একদিন ছিল যখন এই সমস্ত তাল-ই আমাদের ভারত-ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। সংখ্যাবাচকভাবে তিন-চারশো বা ততোধিক হতে পারে, এমন বহুসংখ্যক দেশী তালের সমৃদ্ধ হ'ল মাত্র এই পাঁচটি তাল থেকেই। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ অমরলোকবাসী। যাদের গতি ও ছন্দ আমাদের ভাল লাগে, কেবলমাত্র তারাই ব্যবহার-সৌজন্মে আমাদের মনোমাবে প্রতিষ্ঠিত রয়ে গিয়েছে তাদের ছন্দমাধুর্যে। কালশ্রোতে সবই ভেসে যায়; শুধু স্মৃতির মর্মে যারা দোলা দিয়ে চলে, তাদের ভোলা যায় না, এবং মাত্র তারাই রয়ে যায়। আজ যে সব তাল প্রচলিত, হয়তো পাঁচশো বছর পরে তাদের সবাইকে স্মরণ করতে আমরা পারবো না। ভাঙ্গা-গড়ার চিরন্তন রীতিতে তলিয়ে যাবে পুরাতন, এগিয়ে আসবে নূতন। আমাদের এগিয়ে চলতে হবে বর্তমান যুগের শ্রোতে; যা সামনে পাচ্ছি, তাকে কী করে স্মরণরত্ন করে তোলা যায়, তারই সাধনায় লেগে পড়তে হবে। ইতিহাসকে চবিত্-চর্ষণ করার জগ্ন বা মাত্র পরিচয়ের খাতিরে অতীতকে জানার প্রয়োজন নয়; তাকে সম্মান নিবেদন করার জগ্নই তাকে জানা দরকার; কিন্তু তার জগ্ন আক্ষেপ করে লাভ নেই। সৃষ্ট তাললিপি না থাকায় অতীতের তালের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত তালদের মিলানো যাবে না, মিলন-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাতে কোন ক্ষতি নেই; বর্তমানকে নিয়েই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। স্মরণ নীহারিকার আবরণ ভেদ করে অতীতকে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে যদি আমরা মিলাতে না পারি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের

আজ বিশেষ উপকার হবে না ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না।' গভীর দুঃখের কথা এই যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা কেহই পৃথকভাবে পারস্পর্ষ-অনুযায়ী সঙ্গীতের দিশদ ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস রচনা করে যাননি ; তাই বর্তমানের মধ্যে বসে অতীতের সঠিক বিবরণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেকাল ও একালের মধ্যে স্থবিস্তীর্ণ দুর্ভেদ্য যবনিকা : এ যবনিকা উত্তোলন অতি কঠিন। অল্প প্রকারে বলা যায়, এই দুই কালের মধ্যে হিল্লোলিত অস্পার সমুদ্র ; এ সমুদ্র দুস্তর ; পারাপার হওয়া কঠিন। একমাত্রার পর আর এক মাত্রার লয়ের ব্যবধান অননুমময়।

তালের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের উপপাণ্ড বিষয় নয়। তথাপি শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিষয় জানার কৌতূহল-উদ্দীপনার কারণে ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু বলেই এর আলোচনা করছি।

**তালের দশ প্রাণ :** আমাদের জীবন অনন্ত, কিন্তু প্রাণ মাত্র একটি (সেটি মহাপ্রাণ)। তাল অসংখ্য, কিন্তু তার প্রাণ দশটি। তালের এই দশ প্রাণের নাম ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হল : (১) কাল, (২) মার্গ, (৩) ক্রিয়া, (৪) অঙ্গ, (৫) গ্রহ, (৬) জাতি, (৭) কলা, (৮) লয়, (৯) যতি, (১০) প্রস্তার। একে একে এদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

গান, বাজনা বা নাচের সঙ্গে তাল অপরিহার্য। সঙ্গীতে এক্ষেত্রে ভাব কাটিয়ে উঠার জগ্ন যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে তালের। সঙ্গীতের যে কাণ্ডেই আপনি জ্ঞানলাভ করতে চান, আপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তালের সম্বন্ধে জ্ঞানাপিকারের। একমাত্র সেই প্রয়োজনের খাতিরেই যন্ত্রের কথা লিপিতে গিয়ে আমরা শেষের দিকে তালের কথায় এসেছি। সঙ্গীতের যে কোন ভাগে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের উচিত তালের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাল সম্বন্ধে রচনা বিস্তারিত না করে সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ হল এখানে।

(১) **কাল :** মাত্রা-প্রসঙ্গে বলেছি, তালের প্রথম প্রাণ হচ্ছে **কাল**, অর্থাৎ **এককাল** কাল। মাত্রার সময় নিরূপণ করা হল কালের কাজ।

(২) **মার্গ :** তালের চলার পথকে (অর্থাৎ, তার বিভিন্ন গতিপথের নিয়মকে) বলা হয় **মার্গ**। শাস্ত্রোক্ত মার্গ পাঁচ প্রকার : (ক) চার মাত্রায় **বার্তিক**, (খ) দুই মাত্রায় **চিত্র**, (গ) এক মাত্রায় **ক্রবক**, (ঘ) আধ-মাত্রায় **চিত্রতর** ও (ঙ) সিকি মাত্রায় **চিত্রতম**। এই **পঞ্চমার্গই** তালের **দ্বিতীয় প্রাণ**।

তালের পদ নিরূপণ ও বিভিন্ন পদাশ্রিত গতিকে তালাঘাত দিয়ে প্রদর্শন করাই মার্গগুলির আসল কাজ।

(৩) **ক্রিয়া** : বলা হয়েছে ক্রিয়া দ্বিবিধ : (ক) **নিঃশব্দ ক্রিয়া** ও (খ) **সশব্দ ক্রিয়া**। হাতে তালি বাজিয়ে দেখানোকে বলা হত “সশব্দ ক্রিয়া”; বিনা শব্দে ফাঁক দেখানোকে বলা হত “নিঃশব্দ ক্রিয়া”। নিঃশব্দ ক্রিয়ার নামান্তর ছিল **কলা** : এই কলা চতুর্ধা বিভক্ত : (ক ১) হাত তোলা অবস্থায়, (অর্থাৎ যে হাত উপরে রাখা হয়েছে, সেই হাতের) **আঙ্গুল গুটানোকে** বলা হত **আবাপ** : (ক ২) নীচে রাখা বা হাতের আঙ্গুল ছড়ানোর নাম ছিল **নিষ্ক্রাম** ; (ক ৩) উপরে রাখা ডান হাতের আঙ্গুল ছড়ানোকে বলা হত **বিক্ষেপ** ও (ক ৪) বা হাতের আঙ্গুল গুটানোকে বলা হত **প্রবেশ**।

নিঃশব্দের নাম যেমন ছিল কলা, সশব্দের নাম তেমনি ছিল **কলাপাত\*** বা **পাতকলা**।

(খ) **সশব্দ ঘাত** : যেমন নিঃশব্দ ছিল চার রকমের, তেমনি সশব্দও ছিল চার রকমের। যথা : (খ ১) তুড়ি দিয়ে হাত নামানোকে বলা হত **ক্রব** ; (খ ২) ডান হাতের (পাতনকে) তালকে বলা হত **শম্পা** ; (খ ৩) বা হাতে তাল দেওয়ার নাম ছিল **তাল** ও (খ ৪) উভয় হাতে তাল দেওয়াকে বলা হত **সম্মিপাত** ॥

তালের বিভিন্ন পদ বুঝানোর কারণে এই বিভিন্ন ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রতিচ্ছিন্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হত। এই **ক্রিয়াই** তালের **তৃতীয় প্রাণ**। ক্রিয়ার আরও যে আটটি বিভাগ আছে, তাদের আলোচনা বর্তমানে মূলতুর্বি রইলো।

(৪) **অঙ্গ** : তালের **চতুর্থ প্রাণ** হল **অঙ্গ**। অঙ্গের অর্থ তালের মাত্রাবিভাগ। শাস্ত্রে মাত রকম মাত্রার কথা লিপিবদ্ধ আছে : (১) অঙ্কুরত, (২) দ্রুত, (৩) দ্রুত বিরাম, (৪) লঘু, (৫) লঘু বিরাম, (৬) গুরু ও (৭) প্লুত। এই সপ্ত মাত্রার গতির ব্যাখ্যায় শাস্ত্রে পাই অঙ্কুরতে দেড়, দ্রুতে তিন, লঘুতে ছয়, গুরুতে বার ও প্লুতে আঠারো আঙ্গুল দূর থেকে আঘাত করলে গতির তকায় বুঝা যাবে ; কিন্তু এটি যে কত কঠিন, তা সংক্ষেপেই অঙ্গমেয়। এখানে আমরা সংজ্ঞা উপায়ে বিভিন্ন নামধারী মাত্রার বিভিন্ন পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে ভেবে নিতে পারি।

\* রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।

এক অক্ষর উচ্চারণকালকে, অথবা খুব তাড়াতাড়ি সময়কে, এক আঘাত ধরা পলে,—

অনুক্রমতে	এক	আঘাত	ধরা	হল	( অতি সূক্ষ্মাঘাত ) ;
ক্রমতে	দুই	"	"	"	( সূক্ষ্মাঘাত ) ;
ক্রম বিরামে	তিন	"	"	"	"
লম্বিতে	চার	"	"	"	( পূর্ণাঘাত )
লম্ব্য বিরামে	ছয়	"	"	"	"
গুরুতে	আট	"	"	"	( পূর্ণাঘাত এবং উৎক্ষেপ )
প্লুততে	বার	"	"	"	( পূর্ণাঘাত, উৎক্ষেপ ও করভ্রমণ )

এ ভাবে ধরলে সহজে আমরা একটা হিসাব অনুমান করতে পারি। মাত্রার কথা আমরা আগে বলেছি।

(১) গ্রহ : শাস্ত্রমতে গ্রহ চতুর্বিধ : **সম, অতীত, অনাগত ও বিষম**। যে স্বরটি থেকে রাগ আরম্ভ হয়েছে, রাগের বেলায় তাকে যেমন গ্রহস্বর বলা হয়, এখানে ৭ টিক সঙ্গীতক্রিয়ার আরম্ভ স্থানকে **গ্রহ** বলা হয়। তালে সমকে স্থির স্থান ধরে ৭ মিলন স্থান ধরে বলা হয়েছে :

(ক) সম : সমের ছায়গা থেকে গান বা গং ও তাল আরম্ভ করা হলে, তাকে বলা হত **সমগ্রহ**।

(খ) অতীত : গানের পর ধে কোন মাত্রা থেকে তালের আরম্ভ স্থানের নাম **অতীত**।

(গ) অনাগত : তাল আগে থেকে আরম্ভ করা হলে, তাকে বলা হত **অনাগত**।

(ঘ) বিষম : অনাঘাত থেকে পরে অসমান গতিতে চলতে চলতে এসে সূক্ষ্মভাবে সমে মিলানোকে বলা হত **বিষম**। ( বিষম শব্দটি এখানে কঠিন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। )

এই চার গ্রহ হল তালের **পঞ্চম প্রাণ**।

(৬) জাতি : শাস্ত্রে আছে জাতি পাচ প্রকারের : **চতুরশ** ( বা **চতশ্র** ), **ত্রিশ্র**, **খণ্ড**, **মিশ্র** ও **সংকীর্ণ**। ( পাচটি মার্গতালকে এখানে ত্রিশ্র ও চতুরশ জাতিতে ভাগ করা হয়েছে। চতশ্রের মাঝে কেবলমাত্র চচ্চপুটকে ধরা হয়েছে ; চাচপুটকে ত্রিশ্র জাতির মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, অগ্রণ্ডলি ত্রিশ্রের ভেদে। তখন আট

মাত্রায় চতুশ্চ, ছয় মাত্রায় ত্রিশ্চ, দশ মাত্রায় ষণ্ড, চৌদ্দ মাত্রায় মিশ্চ ও আঠার মাত্রায় সংকীর্ণ জাতি করলনা করা হত ।

এই জাতি হল তালের ষষ্ঠ প্রাণ ।

৭। **কলা** : তালের তৃতীয় প্রাণ ক্রিয়ার কথায় বলেছি যে নিঃশব্দ ক্রিয়াকে **কলা** বলা হত ; আবার ‘কলা’ বলতে বিলম্বিত লয়ও বুঝাত । শাস্ত্রমতে কলা অষ্ট প্রকারের । “সঙ্গীত-রত্নাকর” গ্রন্থে যে আটটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, অনেকে সেই অষ্টক্রিয়াকে **অষ্টকলা\*** বলে থাকেন :—

- |      |                                      |                         |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| (১০) | শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হলে মাত্রার নাম | <b>ধ্রুবক</b> ;         |
| (২০) | বামদিক-গামিনী মাত্রার নাম            | <b>সর্পিণী</b> ;        |
| (৩০) | দক্ষিণ “ “ “                         | <b>কৃষ্ণা</b> ;         |
| (৪০) | অদেগতি “ “                           | <b>পদ্মিনী</b> ;        |
| (৫০) | বহিঃগতা “ “                          | <b>বিসর্জিতা</b> ;      |
| (৬০) | কক্ষিতা “ “                          | <b>বিক্ষিপ্তা</b> ;     |
| (৭০) | উর্দ্ধগামিনী “ “                     | <b>আয়তা বা পতাকা</b> ; |
| (৮০) | চম্পতান “ “                          | <b>পতাকা বা পতিতা</b> ॥ |

—এই কলাকে বলা হয় তালের **সপ্তম প্রাণ** ।

“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ( উত্তর ভাগ )” গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায় কলা সম্বন্ধে ভারতের উজ্জ্বল ব্যঞ্জন! প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন :—“নিঃশব্দ ক্রিয়াকেই কলা বলে ; সেই কলা আবাপাদি ভেদে চার রকম । আবার **মানকেও** অনেক সময় কলা বলে । চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণাভেদে কলা আবার তিন রকম । অনেকে ধ্রুবকলা স্বীকার করে কলা চার রকমও বলেন ।”

আবাপ, নিষ্ক্রাম প্রভৃতি ক্রিয়াকে যখন আমরা ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে ধরেছি, তখন কলা-অর্থে বাজাবার একটি বিশেষ কায়দা বলে আমরা ধরে নিতে পারি ।

৮। **লয়** : তাল, মাত্রা এবং নানা ছন্দকে সমভাবে স্থানবদ্ধ করার উপযুক্ত নির্দিষ্টকালের অবিচ্ছেদ্য গতির সমতাকে বলে **লয়** ।

সঙ্গীতে ৩৪ প্রকার লয়ের ব্যবহার আছে : (১) **বিলম্বিত**, (২) **মধ্য**,

\* **অষ্টকলা** : রাজা সুর দৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত “সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা” গ্রন্থে উপরিলিখিত আট প্রকার ক্রিয়াকে কলা বলা হয়েছে ।

(৩) **ক্রমত**—এই তিন প্রকার লয় চিরাচরিতভাবে প্রচলিত। তবে বর্তমানে (৪) **অতিক্রমত** লয় বলে আর এক প্রকার লয় চালু হয়েছে; একে শুধু মাত্র ক্রমতলয় বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। আবার **অতিবিলম্বিত** নামক এক লয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে গানে; “বিলম্বিত” বলে একে অভিহিত করে আমরা সন্দেহ থাকতে পারি না। এই হিসাবে লয়ের গতি অনেক রকমের হতে পারে। তবে সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সহজে বুঝাবার জগ্ন লয়কে মাত্র তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

বর্তমান যুগ হল অতিক্রমত গতির যুগ; প্রতিটি যান-বাহনের বেলায় বা জীবনের অগ্রাগ্র প্রতি পদক্ষেপেই গতি একমাত্র প্রাণ, গতির গুরুত্বেই তার মান। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে যন্ত্রে, অতিক্রমত লয়ের প্রচলন হয়েছে। এই অতিক্রমত গতির গতগুলির বাধনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারবো এর বাধনে কঠিন বোলের চিহ্নমাত্র নেই। কোন কঠিন বোল, এমন কি ডার, ডেরে প্রভৃতি বোলও এর রচনায় বাদ দিয়ে চলা হয়। আমাদের লয়ের মাপকাঠি হল মাত্রা, একথা আগেই বলেছি। মাত্রার বিলম্বিত, মধ্য ও ক্রমতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ না থাকায় আমাদের বিলম্বিত, ক্রমত প্রভৃতিরও কোনও নির্দিষ্ট সময়মান আমরা দিতে পারি না। (এ কথা ‘মাত্রা’ লেখার ক্ষেত্রে বলেছি।) বাজারে প্রচলিত নিয়মকে ধরে নির্দিষ্ট ধারায় আমাদের চলতে হবে এগিয়ে। প্রয়োজনবোধে লয়ের বাধনের বিভেদকরণে “মেট্রোনোমে”র সাহায্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শাস্ত্রমতে ক্রমতলয়ের দ্বিগুণ ঠায়ে (নিম্নগতিতে) মধ্য ও মধ্যলয়ের দ্বিগুণ ঠায়ে বিলম্বিত। কিন্তু এই মতামতসারী হলেও লয়ের হিসাব আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। এই লয়কে বলা হয় তালের **অষ্টম প্রাণ**।

(২) **যতি** : লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে বলা হয় **যতি**। লয়গাতকে নিয়ন্ত্রিত করাই হল যতির কাজ। ভরতের কালে হাতের তিন রকম সংযোগকে “যতি” বলা হত; তাদের নাম ছিল : **রাক্ষ, বিদ্ধ ও শয্যাগত**।

পরবর্তীকালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যতির সংখ্যা পাঁচ :—

(ক) **সমা** : আদি, মধ্য ও অবসানে একই গতিকে বলা হত “সমা” ;

(খ) **শ্রোতোগতা** ( বা **সন্নিক** ) : প্রথমে মধ্য, মধ্য বিলম্বিত ও শেষে ক্রমত গতির নামান্তর ছিল শ্রোতোগতা বা সারং।

(গ) **অজ্ঞা** : প্রথমে দ্রুত, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষে দ্রুত গতিক বলা হত “অজ্ঞা” ।

(ঘ) **পিপীলিকা** : প্রথমে, মধ্য ও অন্তে দ্রুত গতির নাম ছিল “পিপীলিকা” ।

(ঙ) **গোপুচ্ছা** : প্রথমে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্যলয় ও শেষে দ্রুত গতির নামান্তর ছিল “গোপুচ্ছা” ।

অধুনা-প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে এর মিল দেখা যায় না । এই যতিই হল তালের নবম প্রাণ ।

(১০) **প্রস্তার**—ক্রিয়াদির অঙ্গের নানা ছন্দের ব্যবহারের নামান্তর **প্রস্তার** । তালাশ্রিত বোলের বিস্তার করাকে বলতো প্রস্তার । প্রস্তার তালের দশম প্রাণ ।

**গণ** : ছন্দের কথায় আমরা গণের নাম করেছি, কিন্তু গণের মাত্রা ও ছন্দ বিভাগের কথা বলিনি । গণের দুইটি বিভাগ (১) বর্ণ গণ (২) মাত্রা গণ । যথা :

বর্ণ গণ	মাত্রা গণ (ক) (খ) (গ) তিন ভাগে বিভক্ত
নগণ = ৩ লঘু—বিজয়	দগণ = ২ মাত্রা S
মগণ = ৩ গুরু—কেদারী	তগণ = ৩ " S I
জগণ = মধ্য গুরু—মংশ	চগণ = ৪ " S S
তগণ = শেষ লঘু—আলাপ	পগণ = ৫ " S S I
যগণ = প্রথম লঘু—ভবানী	ছগণ = ৬ " S S S
রগণ = মধ্য লঘু—মালবী	
ভগণ = প্রথম গুরু—আসন	
সগণ = শেষ গুরু—কমলা	

(ক) <b>রতিগণ</b>	(খ) <b>কামগণ</b>	(গ) <b>বাণগণ</b>
<b>অভ্যুজ্ঞা</b>	<b>ত্রিবর্ণ মধ্যা</b>	<b>প্রতিষ্ঠা</b>
(১) ২+২ মাত্রা SS	(১) ২+২+২=SSS	(১) SSSS, ISSS, SISS
(২) ১+২ " IS	(২) ১+২+২=ISS	(২) IISS, SSIS, ISIS
(৩) ২+১ " SI	(৩) ২+১+২=SIS	(৩) SIIS, IIIS, SIII
(৪) ১+১ " II	(৪) ১+১+২=IIS	(৪) ISSI, SISI IISI
	(৫) ২+২+১=SSI	(৫) SSII ISII SIII
	(৬) ১+২+১=ISI	(৬) IIII ইত্যাদি ;
	(৭) ২+১+১=SII	
	(৮) ১+১+১=III	

## সংগীতে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ পরিভাষার পরিচয়

**অমুলোম** বা আরোহী ক্রম : অর্থ—স্বরের উর্দ্ধগতি, স্বরের ওঠা বা চড়া, স্বরের আরোহণ (যেমন : স র গ ম প ধ ন স ইত্যাদি) ।

**বিলোম** বা অবরোহী ক্রম : অর্থ—স্বরের নিম্নগতি, নেমে আসা ; স্বরের অবরোহণ (যেমন : স ন ধ প ম গ র স ইত্যাদি) ।

**আঁশ** বা **আঁশ (ঘর্ষণ)** : মেজরাব দিয়ে এক আঘাত করার পর সেই আঘাতের অন্তরণন থাকতে থাকতে বা হাতে আঙ্গুলের ঘর্ষণে এক, দুই বা তিন পর্দায় ক্রমাগত এক বা ততোধিক স্বরধ্বনি-প্রকাশ করাকে **আঁশ** বলা হয়। ছড়ের যন্ত্রে এক ছড়ের টানের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। যন্ত্র-সংগীতের এটি এক অবিচ্ছেদ্য অলংকার। আঁশে মধ্যবর্তী স্বরগুলি পর পর প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

**সূত** বা **সূঁত** বা **ঘষিট** : প্রকৃতপক্ষে আঁশ ও সূঁত একই ধরনের কাজ। পর্দায়ুক্ত যন্ত্রের বেলায় আঁশ কথাটি প্রযুক্ত হয়, আর পর্দাহীন যন্ত্রের বেলায় সূঁত কথাটি ব্যবহৃত হয়। মেজরাব দিয়ে বাজানো যন্ত্রে আঁশের কাজটিকে **ঘষিট**-ও বলা হয়; ঘষিট-কে “সংগীত-রত্নাকর” গ্রন্থে বলা হয়েছে **খশিত**। যারা বলেন ঘষিটে মাঝের স্বরগুলি প্রকাশ পাবে না, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। আঁশ, সূঁত বা ঘষিট—এই তিনটি কাজের বেলাতেই তারকে পর্দার উপর দিয়ে ঘষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনটি কাজের বেলাতেই মাঝের স্বরগুলি প্রকাশিত থাকা উচিত।

**মীড়** : বীণা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে ডান হাতে তারের উপর মেজরাবের ঘা মেরে সঙ্গে সঙ্গে বা হাত দিয়ে তার টেনে পরের যে কোন স্বরে বা তার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছানোকে **মীড়** (টানা) বলা হয়। মীড়ে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়ার সময় মাঝের স্বরগুলিকে প্রকাশ করা হয় না। ঠিক জলের ঢেউ-এর মত এক স্বর থেকে গোলভাবে তুলে অন্য স্বরে গড়িয়ে পড়া হয়। এতে প্রথমে উচ্চারিত স্বরধ্বনির রেশ থাকতে থাকতে পরের স্বরে পৌঁছাতে হয়।

**অমুলোম মীড়** : ঠোকের যন্ত্রে কোন স্বর থেকে এক আঘাতে তার টেনে, এবং ছড়ের যন্ত্রে বা পর্দাবিহীন যন্ত্রে আলগাভাবে ঘষে তার পরের যে কোন চড়ার স্বরে পৌঁছানকে, **অমুলোম মীড়** বলা হয়।

**বিলোম মীড় :** কোন এক স্বর থেকে তার নীচের যে কোন স্বরে ( নিম্নস্বরে ) নেমে আসাকে **বিলোম মীড়** বলে । ( যে স্বর থেকে মীড়টি টানা হবে, আঘাত না দিয়ে আগে সেই নির্দিষ্ট স্বরে তারটিকে টেনে পরে আঘাত দিলে তবেই এই কাজটি সম্পন্ন হবে । ) অনেকে এটিকে **উল্টো মীড়** বলেন ।

**কায়দা :** যন্ত্রে গং বাজানর পর গভের মূল স্বরগুলি যে বাণী ( অর্থে বোল ) দিয়ে বাজান হয়, সেই বোলগুলি বদলে সেই স্বরগুলি ডেরে ডেরে ডেরে ডা, ডা ডেরে প্রভৃতি বোল দিয়ে বাজান হলে এবং সময়ে মুরকী প্রভৃতি নানা রকম ছোট ছোট কাজ দেখান গলে, তাকে **কায়দা** বলা হয় । বলা বাহুল্য, উপরিলিখিত বোলগুলি স্বরাশ্রিত মাত্রার সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ বাদিত হয় । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেতার যন্ত্রেই এই কায়দা বাজান হয় । ছড়ের যন্ত্রে কায়দাটি ঈশং ভিন্ন ভাবে স্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যবহারেই প্রকাশ করা হয় । ( তবলার বিষয়ে আলোচনাকালে তবলার কায়দার কথা আলাদাভাবে লেখা হবে । )

**জমজমা :** ( এই কাজ বাজনাতেই বিশেষভাবে দেখান হয় । ) কোন পদায় তজনী রেখে এক আঘাতের মধ্যে তার পরের স্বরে মধ্যমা দিয়ে তাড়াতাড়ি আঘাত করে আওয়াজ বার করাকে **জমজমার কাজ** বলা হয় । প্রথম আঘাতটি মেজরাব বা জওয়া দিয়ে করতে হয় এবং মাঝের আঙ্গুল জোর করে পদার উপর ফেলে পরের আঘাত বার করতে হয় । অর্থাৎ স্বরের রেশ থাকতে থাকতে মাঝের আঙ্গুলে পর পর আঘাত করে একটা ঘা দিয়েই কাজটা শেষ করতে হয় । টপ্পার মত দানাদার তানের কাজকে গানে “জমজমার কাজ” বলা হয় । জমজমা শব্দের তিনটি অর্থ । (১) কাকু-স্বরের বৈচিত্র্যময় সঞ্চারণ । (২) গান (৩) চড়াই পাখির ডাকের মত শব্দ ।

**চপক :** মাঝের আঙ্গুলটা দিয়ে তার চেপে স্বরোদ, স্বরশৃঙ্গার প্রভৃতি বাজনাতে পটরিতে বা প্লেটের উপর ঘা দিয়ে যে আওয়াজ বা বোল বার করা হয়, তাকে **চপক** বলে ।

**শ্বায় :** গান বা বাজনার রাগের বিস্তারে যে ছোট ছোট রাগরূপ প্রকাশক স্বরগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাকে **শ্বায়** বলে ।

**কুন্তন :** এক পদার উপর আঙ্গুল রেখে তার পরের কোন পদায় মাঝের

আঙ্গুলের ভগা দিয়ে অল্প চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাপা তার পিছলে কেটে নেওয়াকে **কুস্তন** আখ্যা দেওয়া হয়। ছড়ের যন্ত্রে এই সকল কাজ এক ছড়ের টানের মধ্যেই করা হয়।

**স্পর্শ-কুস্তন** : উপরিলিখিত পদ্ধতিতে মাঝের আঙ্গুল (মধ্যমা) পরের পর্দায় জোরে ফেলে সেই পর্দার স্বরধ্বনিটি প্রকাশিত হওয়ার পর (তারটি থেকে) কুস্তনের কায়দায় পিছলে কেটে নিলে তর্জনীর টিপে যে স্বরটি ধরা আছে, তৎপ্রকাশকে **স্পর্শ-কুস্তন** বলে।

**খণক** : সেতারে কুস্তনের কাজের পর তার থেকে ছোট যে ক্লীং-জাতীয় এক প্রকার শব্দ বের হয়, তাকে **খণক** বলা হয়। (শব্দটি উর্দু।)

**বিক্ষেপ** : কোন পর্দায় বা হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার চেপে ধরে ডান হাতে সেই তারে একটি ঘা দিয়ে, সেই আঘাতের রেখ থাকতে থাকতে বা হাত দিয়ে চাপা আঙ্গুল দিয়ে দু-তিন পর্দা ঘষে নেমে যাওয়াকে **বিক্ষেপ** বলা হয়।

**প্রক্ষেপ** : প্রক্ষেপের বেলায় পদ্ধতি ঠিক উল্টো; উপরিলিখিতভাবে নিম্ন স্বরে নেমে আসা হয়। (উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাঝের স্বরগুলি প্রায় অপ্রকাশিতই থাকে। যে স্বরে ঘা দেওয়া হয় ও যে স্বরে এসে শেষ করা হয়, সেই দুটি স্বরই বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে।)

**মূর্কী বা মুরকী** : কেউ কেউ একে “মুড়কী” বলে থাকেন; সেটি ঠিক নয়। মূর্কী শব্দটিই ঠিক। কোন স্বরে দাঁড়িয়ে, এক ছড়ের টানে বা এক আঘাতের মধ্যে বা হাত দিয়ে, মাড় না টেনে, আঙ্গুলের কায়দায় নির্দিষ্ট স্বরটি এবং তার উপরের ও নীচের স্বর নিয়ে (অর্থাৎ তিনটি স্বর একসঙ্গে) প্রকাশ করা হলে তাকে **মূর্কী** বলা হয়। উদাহরণ : ‘গ’ ও ‘ম’-এ পর পর তর্জনী ও মধ্যমা রেখে ঘা-এর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা তুলে নিয়ে তর্জনীকে ‘র’-তে এনে ‘ম-গ-র’ বা ঐভাবে র-স-ন ইত্যাদি করা হয়।

**খটকা** : উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্বর থেকে উপর-নীচে চার স্বরের প্রয়োগকে **খটকা** বলে।

**কণ্ ও স্পর্শ** : কোন স্বর প্রকাশকালে যখন তার আগের বা পরের কোন স্বর ছুঁয়ে অর্থাৎ স্পর্শ করে প্রধান স্বরটি প্রকাশ করা হয়, তখন সেই অল্পস্পষ্ট স্বরগুলিকে **কণ্** বলা হয় (অনেকে এদেরকে **স্পর্শ স্বর**ও বলে থাকেন।) তর্জনী দিয়ে কোন পর্দায় তার চেপে রেখে মধ্যমা দিয়ে তার পরের পর্দা

আলগাভাবে ক্ষণকালের জন্ত ছোঁয়াকে স্পর্শ বলে। কণ্ ও স্পর্শ ছুটি শব্দের অর্থই এক। রাগের মাধুর্য বাড়ানো বা রাগরূপের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার কারণেই এর ব্যবহার।

**ছুট :** একটি স্বর প্রকাশ করে সেই স্বরের রেশ থাকতে থাকতে, খাদে বা চড়ায় তার সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট বা দূর্বর্তী কোন স্বরের দ্রুত প্রকাশকে ছুট বলা হয়।

**পুকান :** উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় এক বা ততোধিক স্বরকে বিভিন্ন সপ্তকে প্রদর্শন করাকে পুকান বলা হয়। (আমাদের কাছে অর্থোজিক বিবেচিত হলেও অনেকে পুকান-কে “লাগডাঁট” বলেন।)

**লাগডাঁট :** শুদ্ধ ভাষায় একে “লগদণ্ড” বলা হয়। স্বরের জমজমাট ভাব প্রদর্শনকে বলে লাগডাঁট। নানা স্বরের ব্যবহার ও তাদের মিলিত স্বরধ্বনিগুলি এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য মধুর স্বরধ্বনিতে প্রকাশিত হলে বা কোন রাগের রাগবাচক স্বরের বহুল প্রয়োগে যে মধুর স্বরের জমজমাট ভাব প্রকাশ পায় তাকে “লাগডাঁট” বলা হয়। লাগডাঁট ভাল হলে গান-বাজনা জমে এবং প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। (আমাদের কাছে বেটিক মনে হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেকে আরোহণের ষষ্ঠি মীড়কে “লাগ” এবং অবরোহণের ষষ্ঠি মীড়কে “ডাঁট” বলেন।) একই স্বরশ্রেণীকে বিভিন্ন সপ্তকে অতিক্রমিত বাজনাতেও লাগডাঁট বলা হয়। যদিও প্রাচীন মত অনুসারে লাগডাঁটের অর্থ এরূপ হয় কিন্তু আমাদের কাছে এটি সমীচীন বলে বিবেচিত হয় না। ফিরোজ ফ্রেমজীর মতে শব্দটি লাগডাঁট। লাগ অর্থে পারস্পর্ষ ও ডাঁট অর্থে—বক্রতা বা বাঁধা। দু-এ মিলে লাগডাঁটের অর্থ দাঁড়ায়, পারস্পর্ষ ও পারস্পর্ষহীনতার স্মৃষ্টি আলাংকারিক প্রয়োগে মাধুর্যময় রচনা।

**কর্তব্য :** (শুদ্ধ ভাষায় এটিকে “কর্তব্য” বলা হয়।) কোন রাগে নানা ভাবে কৌশল করে স্বরবৈচিত্র্য দেখানকে কর্তব্য বলা হয়।

**দম ও খম :** বহুক্ষণ এক দমে এক স্বরধ্বনিকে ধরে রাখাকে দম বলে। লয়ের সঙ্গে স্বরের অল্প অল্প বিরাম প্রদর্শনের নামান্তর খম। এই ধরনের কাজ দেখানোকে দম-খমের কাজ বলে। যন্ত্র সঙ্গীতে ছেঁড়ের সাহায্যে দমের কাজ দেখানো হয়।

**বিড়ান বা বিচাড় বা বিচার :** (একে কেউ কেউ “বিচারের কাজ”-ও

বলে থাকেন।) এই কাজ দেখাতে কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়; রাগের উপর ভাল দখল না থাকলে পারস্পর্ষ-বহির্ভূত অস্বাভাবিক স্বরসঙ্গতি দেখান কঠিন। সাধারণতঃ আলাপের সময় মধ্জোড়ের কাজেই এর ব্যবহার দেখা যায়। যে রাগ নিয়ে এই বিস্তারের কাজ করা হয়, সে রাগটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না; অথচ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেই রাগের-ই কয়েকটা স্বর নিয়ে কাজটা দেখান হচ্ছে।

**বিদারী :** বিচারের কাজকে “বিদারী” বলা ঠিক নয়। আমরা জানি, আলাপে শ্বাস ও অপশ্বাস স্বরের ব্যবহারের সময় যে স্বরে একটি খণ্ড স্বর-বিচ্ছাসের সমাপ্তি ঘটে, তাকেই **বিদারী** বলা হয়। এটি বিভার বা বিচাড় থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

**আন্দোলন :** স্বরটির আগের ও পরের শ্রুতির ছায়ায় ধীরে ধীরে আন্দোলিত করাকে **দোলন** বা **আন্দোলন** বলে। এই আন্দোলন এক স্বরের উপর অতিক্রমিত ভাবে করা হলে এটিও “কম্পন” হয়ে যায়। গমকের\* ক্ষেত্রে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ২।৩ শ্রুতি বা ২।৩ স্বরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়।

**কম্পন :** কোন স্বরধ্বনিকে সেই স্বরের পর্দায় আঙ্গুল রেখে কাঁপানো হলে তাকে **কম্পন** বলে।

**ধুয়া :** গত বা গানের স্থায়ী অংশটির নামান্তর “ধুয়া”। **ধুয়ার কাজ** বলতে অস্থায়ীর কাজকেই বুঝায়। (গতের স্থায়ী অংশে যে কায়দা বাজানো হয়, অনেকে তাকেও “ধুয়ার কাজ” বলেন।) আবার মেন (main) অর্থাৎ প্রধান তারে কাজ করার সঙ্গে চিকারীর তারে লডি ইত্যাদি বাজালে অনেকে তাকেও “ধুয়ার কাজ” বলে থাকেন। ধুয়া “সঙ্গীত-রত্নাকর”-এর ধ্রুব-র নামান্তর।

**মাঠা :** প্রধান তারে ও চিকারীর তারে যদি পরস্পরক্রমে তানের মালা ও বালার হেরফের রচনা করা যায়, তাকে বলা হয় **মাঠার কাজ**। মাঠা “সঙ্গীত-রত্নাকর”-এর **মঠ**-র নামান্তর।

**পরমাঠা :** বর্তমানে যত্নে এই ধরণের কাজ করা হয় না। অনেকের ধারণা “সঙ্গীত-রত্নাকর”-আখ্যাত **প্রতিমঠ** থেকেই এর উদ্ভব। তারপরগের কাজের সময় মধ্যমের তারে তালের ছন্দ (অর্থাৎ পরগের) কিছুটা বাজিয়ে

\* “গমক” ত্রুটব্য।

চিকারীর কাজ দিয়ে পরণের সমগ্রটা শেষ করাকে **পরমাঠা** বলা হত। এই ধরণের কাজ বর্তমানে ক্চিৎ শোনা যায়।

**পদবিদারী** বা **মুখ** : রাগ-আলাপের সময় প্রতি কলির শেষে যে স্থায়ী অক্ষর বাজানো হয়, অনেকে তাকেই বলেন **মুখ**। এটা **মোহড়া** নামে পরিচিত। মোহড়া বলতে আমরা তবলার ফাঁক থেকে বাজানো ছোট ছোট টোকরাকে বুঝি। তবলার মোহড়াকে যদি “মোহড়া” বা “মোড়া” বলা হয় ও আলাপের মুখে যদি “মুখড়া” বলা হয়, তবে কোন গোলমাল থাকে না। গানে অথবা গতে বিস্তার করার পর স্থায়ী তুকে ফিরে আসা ( অর্থাৎ গান বা গতের ধরার জায়গায়, অর্থাৎ মুখে ফিরে আসার জায়গাটিকেও ) “মুখ” বলা হয়।

**গং বা গত্ :** নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্দি অভিধানে গত শব্দটির অর্থে লেখা হয়েছে : (১) ‘বাজেঁকে কুছ বোলোঁ কা ক্রমবন্ধ মিলান।’ (২) ‘নাচনে কা এক টংগ।’ গত শব্দটিকে অনেকে হিন্দি বা পারসিক শব্দ বলেন। কিন্তু আসলে সংস্কৃত গতি শব্দ থেকেই গতের উৎপত্তি। রাগাশ্রিত স্বরের কোন একটি তালে বাঁধা ছন্দবদ্ধ স্বর-সমষ্টিকে গত বলা হয়। এই গতকে শুদ্ধ ভাষায় **স্বর-নিবন্ধনী** বলা হয়। গতে বিভিন্ন বাণী যন্ত্রে বাদনোপযোগী বাণী অর্থে বিভিন্ন ধরণের কাল্পনিক বোল ব্যবহার করা হয়। এসরাজ, বেহালা, সারঙ্গী প্রভৃতি ধ্বন্যন্ত্রে বাদিত গতকে অনেকে “**লেহারা**” বলেন। তাঁদের মতে লেহারা শব্দটি পারসিক শব্দ। গত সব সময়ে তালের সঙ্গে চলে। তাল-বাণী তার লয় বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য প্রাধান্য পেলেও বাণীটিকে থাকে অধীন হয়ে। ভারতের প্রকৃতি বা গত-এর তিনটি অবস্থাকে **ত্রিগত** বলা হত। কাজেই গং গত-এর বিবর্তন হতে পারে।

অনেকের ধারণা বোলহীন গং, গং পর্যায়ভুক্ত নয়। কথাটি বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমস্ত বাণী যন্ত্রের গতের ক্ষেত্রে খাটে না। ধ্বন্যন্ত্রে বাদিত অথবা হারমোনিয়ামাদি যন্ত্রে বাদিত অধিকাংশ গতেই কোন কাল্পনিক বোল অর্থে বাণী ব্যবহার করা হয় না অথচ তাদের গত বলা হয়। সেতারাদি যন্ত্রে মসীদখানি ও রেজাখানি গত প্রচলিত হবার আগেও রূপদের ও খেয়ালের তুকের অঙ্করণে গত বাজান হত ও তরানার অঙ্করণে অতি দ্রুত গতও বাজান হত। সেতারের গত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু তুকের ( তুক অর্থে চরণ বা বিভাগ ) হত। (১) স্থায়ী ও (২) অন্তরা। স্থায়ী বিভাগের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভোগাভোগ

যুক্ত হত। মসিদখানি ও রেজাখানি গতেও আমরা এ নিয়ম দেখতে পাই। বর্তমানে মসিদখানি ষ্টাইলের সেতারের গতে স্থায়ী ও অন্তরার মাঝে মানকা বা মাঞ্জা নামে একটি তুক দেখতে পাই। স্থায়ীর দীর্ঘত্ব কমানোর কারণেই এর প্রচলন বলে আমাদের ধারণা। এটা প্রাচীনকালের মেলাপকের কায়দায় রচিত। ঢুই বা তিন আবৃত্তির অথবা তিন চার সমযুক্ত গত আজকাল কচিং কাউকে বাজাতে শোনা যায়। কিছু দিন আগেও দেড়মুখী গং, আড়াইমুখী গত, আস্থায়ীর গত প্রভৃতি নানা ধরণের গত বাজান হত, আজকে সে সব কম শোনা যায়। সাজ্জাদ মহম্মদ, গোলাম মহম্মদ, প্যার খা প্রভৃতির রচিত বা বাদিত গতে এই লম্বা বড় মুখের গতের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে রেজাখানি গতে বোল বেশী থাকায় অতিদ্রুত বাজান অন্তবিধা হওয়ায় অনেকে বোল কম করে দিয়ে অতিদ্রুত গত বাজান। বর্তমানে ঢুনী গতের ষ্টাইল আগেকার ফিরোজখানি গতের নকল বলা যায়।

পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতির ঠেকা ও ঠেকার কায়দাকেও অনেকে গং বলেন। নাচের বিশেষ কায়দা বা বোলের উপর নাচকে অথবা বোল বাতলানকেও গত বলা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে গতের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত-ভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

**তোড়া :** তানের নামান্তর। যন্ত্র সঙ্গীতে গং বাজাবার সময় স্থায়ী বা অন্তরা অথবা বিস্তারের সময় যে সব বোলদার তান বাজান হয় তাদের তোড়া বলে।

**জরব :** কোন যন্ত্রে আঘাতজাত বোলকে জরব বলা হয়।

**ছেড় :** হিন্দী ছেড়না শব্দের অপভ্রংশ ছেড়। নায়কীর তারে ( যেন তারে বা বাজের তারে ) আঘাতে কোন স্বর প্রকাশের পর, সেই স্বরের দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনির সময়ের মধ্যে চিকারীর তারে ধ্বনি উৎপাদন অর্থাৎ আঘাত করাকে ছেড় বা ছেড়-বাদন বলা হয়।

**উপজ :** রাগাঙ্ঘ্যায়ী ছোট ছোট তান করাকে উপজ বা উপেজ বলা হয়। গান বা গত আরম্ভ করার পরই উপজ বা উপেজ বাজাইবার রীতি। উপজের পরে গান বা গতের অস্থায়ীতে ফিরে আসার নিয়ম আছে।

**মাতু :** গানের ভাবার নাম মাতু।

**ধাতু :** (১) গানের স্বর ও স্রুতি বা স্বর। (২) গানে বা গতের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিটি অঙ্গকেও আলাদা আলাদা ভাবে ধাতু বলা হয়, অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গই এক একটি ধাতু।

**তুক :** গানের বা গতের এক একটি কলি অর্থে এক একটি অংশ বা চরণকে তুক বলে। খাতু ও তুক দুইটিই প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**বোল :** বিভিন্ন বাণ্য যন্ত্রের আঘাতের তারতম্য অর্থে বিভিন্নতা বোঝাবার জগ্বে যে কাল্পনিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারই নাম **বোল**।

**বাঁট বা বাট :** বন্টন শব্দ থেকেই বাট কথাটি এসেছে, অর্থ ভাগ করা। গানের ভাষা বা গতের বাণীকে ছ-এক ফেরের মাঝে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে তালের মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার নাম **বাট**। বলা বাহুল্য বাটের সময় মাত্রার হেরফের করা হলেও লয়কে একভাবে রাখা হয়।

**আবর্ত :** কোন তালের সম থেকে আরম্ভ করে পরের সম পর্যন্ত গ্রহণ করে একটা পূর্ণমঞ্চকে এক **আবর্ত** বলা হয়। কোন তালের যেগান থেকে ( অর্থাৎ যে মাত্রা বা তাল ) কোন গত্ বা গান আরম্ভ করা হয়, একটি পূর্ণ তালের মাত্রা সমষ্টির মধ্যে সেখানে ফিরে আসাকেও এক **আবর্ত** বলা হয়। ঙ্গকের সময়, বিরাম নেওয়ার ব্যবস্থা আগের দিনে ছিল; এই বিশ্রামস্থলকে বলা হত **মান**। তখন সম থেকে বিরাম স্থান পর্যন্ত সময়কে এক “আবর্ত” ( অর্থাৎ একটি “পূর্ণমঞ্চ” ) বলা হত; বর্তমানে এ নিয়মটি খাটে না। শুদ্ধ ভাষায় একে **আবর্তন** বলা হয়। অনেকে একে “আওরাদ” বা “আওরাত” বলেন; অনেকে আবার নামকরণ করেন “আওয়ল্লা”। কিন্তু এই নামকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল; “আবর্ত” বা “আবর্তন” শব্দটিই যথাযথ। এর চলতি নাম **ফের**।

**ঝালা :** এশ্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রে নায়কীর তারে ষা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাশের সুরের তারে আলাদা আলাদা ভাবে বা যুক্তভাবে ষা দিয়ে বাজানোকে বলা হয় **ঝালার কাজ**। সঁতার প্রভৃতির নায়কী তারে ও চিকারীর তারে ক্রমানুযায়ী বোল বাজানোকে বলা হয় **ঝালা**। যন্ত্র-সংগীতে ঝালা এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

**শুধ্ ঝালা ( উলট ঝালা ) :** নায়কীর তারে ‘ডা’ বোল দিয়ে আরম্ভ করে চিকারীতে রা-রা-রা ইত্যাদি বাণী বাজানোকে অনেকে হিন্দীতে **উলট ঝালা** বলেন। এটি হল **সিধা ঝালা** বা **শুধ্ ঝালা**; ভিন্ন মতে স্লট ঝালা।

**স্লট ঝালা :** নায়কীর তারে ‘রা’ বোল দিয়ে বা ‘রা-ডা’ বোল দিয়ে ঝালা আরম্ভ করলে অনেকে তাকে **স্লট ঝালা** বলেন। আমরা একে **উলটি ঝালা** বলি। আমাদের মতে সিধা ঝালাকেই **স্লট ঝালা** বলা উচিত।

**বোলদার ঝালা** বা **বোল ঝালা** : নায়কী তারে ডা-বু-ডা বা ডেরে-ডেরে ইত্যাদি বোলের সঙ্গে চিকারীতেও অতি ক্ষুভভাবে ডি-রি-ডি-রি বা রা-রা-রা-রা বোলের ব্যবহারযোগে সৃষ্ট ঝালাকে **বোলদার ঝালা** বলে ।

**মীড় ঝালা** : ঝালা বাজানোর সময়ে সঙ্গতি বজায় রেখে বিভিন্ন পর্দায় মীড় সহযোগে যে ঝালা বাজানো হয়, তার নাম **মীড় ঝালা** ।

**কস্তোর ঝালা** : যন্ত্রে ঝালা বাজাবার সময় পাখোয়াজের কং-যুক্ত বোলের অঙ্গকরণে যে ঝালা বাজানো হয়, তার নাম **কস্তোর ঝালা** । বীণ, রবাব, সুরশৃঙ্গার যন্ত্রেই সাধারণতঃ এগুলি বাজানো হয় । আজকাল এর নকল চলছে সেতার ও স্বরোদে । অনেকে তারপরণের সময় এই কায়দায় ঝালা বাজিয়ে থাকেন ।

**ঠোক ঝালা** : নায়কীর তারে এক মাত্রায় ডা-ডা বা রা-রা টোকা দিয়ে পরে চিকারীর তারে ঝালা বাজানোকে বলে **ঠোক ঝালা** । অনেকে বোলদার ঝালাকেও বলেন “ঠোক ঝালা” ;

**তান ঝালা** : ডা-রা ডা-রা বাণী দিয়ে ৩৪ স্বরের ছোট ছোট তান নিয়ে তারপর চিকারীর তারে ঝালা নেওয়া, আবার ছোট তান ও ঝালা পর পর বাজানোকে বলা হয় **তান ঝালা** ।

**কমছড় ঝালা** : এই ঝালা অনেকটা শুধু ঝালার মতই ; মাঝে মাঝে বাণীর হেরফের করে বাজানো হয় ।

**লমছড় ঝালা** : তান ঝালারই প্রকারান্তর মাত্র ।

**তারপরণ** : মধ্যমের তারে ( অর্থাৎ নায়কী তারে ) পাখোয়াজের পরণ-এর বোলের অঙ্গকরণে যে বোল ও বাণী সংগতের সাথে বাজানো হয়, তাকে বলে **তারপরণ** । সাধারণতঃ বীণায়, সেতারে বা সুরবাহারে আলাপ বাজাবার পর পাখোয়াজের সঙ্গে এটি বাজাবার রীতি । বলা বাহুল্য যে, রাগের কাঠামো ঠিক রেখেই এই ছন্দবন্ধন করা হয় । পাখোয়াজের পরণের অঙ্গকরণে বাজান হয় বলেই এর নাম তার-পরণ রাখা হয়েছে ।

**জটিল্য**—দ্বিতীয় খণ্ডে উপরিলিখিত সকল রকম ঝালা ও তারপরণের বোলের সহিত স-র-গ-ম ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়ার ইচ্ছা রইলো ।

## সংযোগ অলংকার

দুই বা তিনটি অবিরোধী স্বর এক সঙ্গে বাজালে মিশ্রিত যে আওয়াজ প্রকাশ পায়, তাকে বলে **সংযোগালংকার**। কোন যন্ত্রে কোন রাগ বাজানোর সময় বৈচিত্র্যের কারণে মাঝে মাঝে এই **সংবাদন অলংকার** ব্যবহার করা হয়। সেতার, এশ্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রে ঝালা বাজাবার সময় নায়কীর তারে এবং খাঁদের বা চিকারীর তারে এক সঙ্গে বা পর পর যে আঘাত করা হয়, সেটি এই অলংকারের অঙ্গবিশেষ। কোন কায়দায় এক সঙ্গে দুইটি স্বরকে একই তারে যদি প্রকাশ করা হয়, সেটিকেও এই অলংকারের অঙ্গীভূত করা হয়। একেই ইংরাজীতে বলে “কনকর্ড” (**concord**) ; এর নামাস্তর **harmony chord** বা **pluritone**। সমষ্টিগতভাবে একাধিক স্বর যেখানেই এক মধুর ধ্বনি হিসাবে প্রকাশ পায়, সেখানেই আমরা এটিকে বলি “সংবাদন অলংকার” বা “সংযোগ অলংকার”।

এই স্বর-সংযোগকে ভাগ করা হয়েছে চার রকমে ; যথা :

(১) বাদী সংযোগ ; (২) সমবাদী সংযোগ ; (৩) অল্পবাদী সংযোগ ও (৪) বিবাদী সংযোগ।

(১) **বাদী সংযোগ** : দ্বিধা বিভক্ত ; যথা—(ক) “স্বজাতীয় বাদী সংযোগ” :—যেমন উদারার ‘র’, মূদারার ‘র’ ও তারার ‘র’ ; উদারার ‘গ’, মূদারার ‘গ’ ও তারার ‘গ’ ; ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামে একই স্বরের সংযুক্তি।

(খ) “বিজাতীয় বাদী সংযোগ” : এতে সমান স্রুতির পরের স্বর বা আগের স্বর ছাড়া যে কোন দুটি স্বর সংযোগ করা হয় ; যথা :—

৪-স্রুতির ‘স’ ও ‘প’-এর মিলন,

৩- ” ‘র’ ও ‘ধ’-এর ” ,

২- ” ‘গ’ ও ‘ন’-এর ” , ইত্যাদি।

(২) **সমবাদী সংযোগ** : সমবাদী স্বরের পরস্পরের যোগ ৭, ৮ বা ১০ স্রুতির ব্যবধানের যে কোন দুই স্বরের একক যুক্ত ধ্বনির ব্যবহারকে **সমবাদী সংযোগ** বলা হয়। উদাহরণ :

‘স’ ও ‘গ’-এর যোগ ,

‘গ’ ও ‘প’-এর ” ,

‘ম’ ও ‘ন’-এর ” , ইত্যাদি।

(৩) **অনুবাদী সংযোগ :** অনুবাদী স্বরের পরস্পরের যোগ বাদী, সমবাদী এবং ঠিক আগের ও পরের স্বরটি ছেড়ে যে স্বর সংযোগ করা হয়, তাকে **অনুবাদী সংযোগ** বলা হয়। যথা : কড়ি 'ম' ও 'ন'-এর যোগ। কোন রাগে তার অনুবাদী স্বর বিবেচনা করে তবেই এর ব্যবহার করা উচিত।

(৪) **বিবাদী সংযোগ :** কোন স্বরকে তার ঠিক পরের বা ঠিক আগের স্বরের সঙ্গে যুক্ত করে এক সাথে কোন সুরধ্বনি প্রকাশ করলে, তাকে বলা হয় **বিবাদী সংযোগ**। এরূপ মিলিত ধ্বনি শ্রুতিকটু হয় বলেই এ ধরনের সংযোগ শাস্ত্রে দোষনীয় বলে গণ্য হয়েছে। যদি একান্তই এ ধরনের সংযোগের প্রয়োজন ঘটে, তবে সবিশেষ বিচারে ও অতি সাবধানে ব্যবহার করা সঙ্গত।

## সঙ্গীতগুণীদের উপাধির পরিচয়

**নায়ক :** যিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রচলিত লোক সঙ্গীত সবই নিজে কাষত: করে দেখাতে পারেন, প্রবন্ধাদি রচনা করতে পারেন, এবং সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। গান, নাচ ও বহু রকমের বাজনা ( বাণ্যযন্ত্র ) যিনি ভালভাবে তালিম ( শিক্ষা ) দিতে পারেন, নিজে ভাল অভিনয় করতে পারেন, সঙ্গীতের বিভিন্ন রস ও অলংকারের উদ্দেশ্য কী সেগুলি জানেন, সমস্ত রকম গুণ ও দোষের পরীক্ষক, পরের মনের অভিপ্রায় বোঝেন, যশোভিলাষী, ক্ষমাশীল ও দাতা ; যার আত্মা পবিত্রভাবে পূর্ণ, যিনি এরকম শাস্ত্রস্বভাবের এবং সমস্ত গুণের অধিকারী তাঁকেই সঙ্গীতনায়ক বলা হয়।

**পণ্ডিত :** যিনি সঙ্গীতের ঔপপত্তিক্যাংশে ( Theory-তে ) অর্থাৎ সঙ্গীতের ব্যাকরণে পণ্ডিত, কিন্তু কাষত: করে দেখাতে পারেন না তাঁকে সঙ্গীতপণ্ডিত বলা হয়।

**গায়ক :** যিনি দেখে শুনে শিক্ষা নিতে পারেন, অনুকরণ করতে উস্তাদ, সুরসিক ও লোকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম, এইরূপ ভাবুক গায়কদের গায়ক বলা হয়, অর্থাৎ জিয়াসিদ্ধিকদের গায়ক বলা হয়।

**উপাধ্যায় :** যিনি অতি সুপুরুষ, নাচের কায়দা ভাল রকম জানেন, এবং নিজে নাচতে পারেন, নানা রকমের বাজনা বাজাতে পারেন, তাল ও লয় সখন্দে

ভাল জ্ঞান আছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ শিল্পীদের সঙ্গীত উপাধ্যায় বলা হয়।

**গন্ধর্ব :** যারা প্রাচীন ও আধুনিক দেশী রাগ-রাগিণী অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং প্রচলিত মতের সঙ্গীত কার্যতঃ করে দেখাতে পারেন ও এইসব শেখাতেও পারেন, তাঁদের গন্ধর্ব বলা হয়।

**শুণী বা শুণকার :** কেবলমাত্র প্রচলিত গান বাজনা বা নাচের ক্রিয়া-সিদ্ধাংশে ভাল জ্ঞান আছে (অর্থাৎ practical side-এ ভাল জ্ঞান আছে) তাঁকে শুণী বা শুণকার বলা হয়।

**কলাবন্ত বা কলাবৎ :** যারা ধ্রুপদ, ত্রিবিট প্রভৃতি ভালভাবে গাইতে পারেন, কিন্তু বাজনা বা নাচের নিয়ম ভাল জানেন না, তাঁদের কলাবৎ বলা হয়। চলিত ভাষায় কলাবৎকে কালোয়াত বলা হয়।

**কওয়াল, কবাল বা কুশল :** যারা কেবল পেয়াল, তেলেনা ইত্যাদি গাইতে পারেন, তাঁদের কওয়াল বলা হয়।

**টাড়ি বা ধারী :** যারা কড়া টপ্পা খেয়াল প্রভৃতি গান গাইতে পারেন, তাঁদের টাড়ি বলা হয়। টাড়িয়া সবই গাইতে পারতেন। নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গীত ব্যবহারী বলে তাঁদের মান অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল।

**মার্দঙ্গী :** যিনি বীর, বাণবিশারদ, মিষ্টভাষী, বাজনার বোলগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ভালভাবে তাল দিতে পারেন, গমক প্রভৃতি অলংকারের জ্ঞান আছে, বহুরকম বাজনা ভালভাবে বাজাতে পারেন, বহু রকম গানের নিয়ম যার জানা আছে, বাজনার বোল মুখে তাল দিয়ে ভালভাবে বলতে পারেন, এই রকম সন্তুষ্টচিত্র অতি চতুর সঙ্গীতজ্ঞকে মার্দঙ্গী বা মার্দঙ্গীক বলা হয়।

**সঙ্গীত শাস্ত্রকার :** সঙ্গীত-পণ্ডিতদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকার বলা হয়। শাস্ত্র-কারেরা সকলে ভাল গাইতে বা বাজাতে না পারলেও ব্যাকরণগত দোষগুণ ধরে দেন ও সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারেন।

**অতাই, আতাই :** গুরুর কাছে যথাযথ শিক্ষা না পেয়ে যিনি নানাজনের সঙ্গীত শুনে বা দেখে নকল করে শেখেন, তাঁকে অতাই নামে অভিহিত করা হয়।

**কস্বী :** যিনি উপযুক্ত গুরুর কাছে যথাযথ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা পেয়েছেন, তাকে কস্বী বলা হয়।

**ঘরাণা :** কোন শুণী গায়কের প্রতিভাদীপ্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই ঘরাণার জন্ম। ঘর শব্দটি থেকেই ঘরাণা কথাটি এসেছে। প্রতিভাধর কোন গায়কের

শিল্পীদের মধ্যে যখন একই রকম গায়কীর প্রকাশ ঘটে তখন গায়কীর ভঙ্গিমার কারণে সেই উস্তাদের নামে অথবা সেই দেশ বা স্থানের নামে ঘরাণার নামকরণ করা হয়।

## রাগ লক্ষণ

প্রাচীন শাস্ত্রে রাগের যে ১৩টি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই, আগে তাদের কথা বলছি। ( বর্তমানে বহু স্থলেই এই নিয়ম মেনে চলা হয় না। )

১ ॥ **গ্রহ** বা **গ্রহস্বর** : যে স্বর থেকে রাগের মুছনা আরম্ভ করা হত, তাকেই “গ্রহস্বর” বলে।

২ ॥ **অংশ** বা **অংশস্বর** : যে কয়েকটি স্বরকে কেন্দ্র করে একটি রাগের প্রকাশ ও যাদের বহুল ব্যবহার এবং ব্যাপকত্ব রাগের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাদের “অংশস্বর” বলে।

আবার অংশস্বরের অর্থ ‘জীবস্বর’ বা ‘বাদীস্বর’ বলা হয় ; সেক্ষেত্রে অংশের বিশেষ স্বরসৃষ্টিকেই বাদীস্বর বা অংশস্বর বলা হয়। “বদনাং বাদী”, অর্থাৎ একজন লোকের ( বদন ) মুখ দেখে যেমন চেনাশায়ায়, তেমনি অংশের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান স্বর, সেই বহুব্যবহৃত স্বরটিই “বাদী” ; এবং তার দ্বারাই রাগকে চেনা সম্ভব হয়।

৩ ॥ **গ্রাস** : যে স্বরে রাগটি শেষ করা যায়, অর্থাৎ একেবারে শেষ করা হয়, অথবা যে স্বরে এসে দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়া হয়, তাকে “গ্রাস” বলে।

৪ ॥ **অপগ্রাস** : রাগের প্রথম অংশ যে স্বরে এসে থামে, তাকে “অপগ্রাস” বলে।

৫ ॥ **সংগ্রাস** বা **সগ্রাস** : রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো স র গ ম দ্বারা অলংকৃত করে প্রকাশ করার পর যে স্বরে থামে বা যেখানে এসে তার প্রথম অথবা শেষ কলি শেষ করা হয় তাকে “সংগ্রাস” বা “সগ্রাস” বলে।

৬ ॥ **বিগ্রাস** : রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো সরগম দ্বারা অলংকৃত না করে যে স্বরে এসে থামে, তাকে “বিগ্রাস” বলা হয়।

অপগ্রাস, বিগ্রাস প্রভৃতিতে যে স্বরে এসে রাগটি শেষ করা হয়, সেটি **বিদারী** নামে পরিচিত।

৭ ॥ **বহুত্ব** : রাগে যে স্বর বারবার অর্থে বহুবার ব্যবহার করা হয়, “বহুত্ব” বলে তাকে ।

বহুত্ব দু’ রকমের : (ক) **অলংঘন** ও (খ) **অভ্যাস** বা **আবৃত্তি** ।

(ক) যে স্বরটির প্রয়োগ খুব প্রয়োজনীয়, সেই স্বরের বার বার স্পর্শের নাম “অলংঘন” বা **অলংঘনমূলক বহুত্ব** । এই অলংঘন-জনিত বহুত্ব প্রায় বাদীর মত । (খ) **অভ্যাস** অথবা **আবৃত্তি** : রাগে যে স্বরের আবৃত্তি বারংবার করা হয় অথচ ঠিক অলংঘনের মত অত বেশীবার নয়, কিন্তু প্রায় সমবাদী স্বরের মতই ব্যবহৃত হয়, তাকেই “অভ্যাস” অথবা “আবৃত্তি” বলে । এটিকে **অভ্যাস-মূলক বহুত্ব**ও বলা হয় ।

৮ ॥ **অল্পত্ব** : রাগে যে স্বর অল্প ব্যবহৃত হয়, তাকে “অল্পত্ব” বলা হয় ।

এই অল্পত্বও দুই রকমের : (ক) ‘**লংঘন**’ ও (খ) ‘**অনভ্যাস**’ ।

(ক) কোন রাগে কোন স্বর অতি অল্প স্পর্শ করাকে বা লোপসাধন করাকে **লংঘন** বা **লংঘনমূলক অল্পত্ব** বলে । (খ) রাগে যে স্বরের ব্যবহার নাই বললেই চলে, তাকেই **অনভ্যাস** অথবা **অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব** বলে ।

৯ ॥ **মন্দ্র** : অংশ-স্বর ভেদে উদারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর পঞ্চম স্বররোহণের নিয়মকে **মন্দ্র** লক্ষণ বলে ।

১০ ॥ **তার** : অংশ-স্বর ভেদে তারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর ব্যবহারের নিয়মকে “তার” লক্ষণ বলে । রাগের যে সকল স্বর মন্দ্র ও তার মপ্তকে নিয়ে যাওয়া যেত রাগে তাদের ব্যবহার বেঁধে দেওয়া নিয়ম ছিল ।

১১ ॥ **ষাড়বত্ব** : নির্দিষ্ট কোন কারণে কোন রাগে ব্যবহৃত কোন একটি স্বরকে যখন বর্জন করা হয়, তখনই সেটি “ষাড়বত্ব” নামে পরিচিত হয় ।

১২ ॥ **ওড়বত্ব** : বিশেষ কোন কারণে যখন রাগে ব্যবহৃত কোন দুটি স্বরকে বর্জন করা হয়, তখন সেটি “ওড়বত্ব” নামে আখ্যাত হয় ।

১৩ ॥ **অস্তরমার্গ** : গ্রাস, অপগ্রাস প্রভৃতির জায়গা ছেড়ে রাগের মাঝে বিশেষ স্বরগুচ্ছ সৃষ্টি করে যখন চমক লাগান হয়, তখন তাকে “অস্তরমার্গ” নামে বিভূষিত করা হয় । আগের দিনে স্বরের পাশের কমাগুলিকেও অস্তরমার্গ বলা হত ।

**হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ লক্ষণে** বর্তমানে যে সব আইন-কানুন মানা হয়, তাদের কথা বলছি ।

(ক) এক মপ্তকের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে এবং শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে পাঁচ স্বরের

কম থাকলে, সেটি রাগ-পদবাচ্য হয় না। কচিং এর ব্যতিক্রমে চার স্বরের রাগ দেখা যায়; কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয়।

(খ) মধ্যম স্বরটি ছাড়া কোন রাগেই একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর ব্যবহার করা হয় না। কদাচিং এরূপ ঘটলেও সেটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

(গ) প্রতিটি রাগের আরোহণ ও অবরোহণ থাকা চাই, এবং তার স্বরশৃঙ্খল কোন-না-কোন ঠাঁটের অন্তর্গত হওয়া দরকার। সব সময়েই আরোহণ-অবরোহণের এক নিয়ম মেনে চলতে হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। সেই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এক নিয়ম মেনে চলাই বিধি।

(ঘ) যে কোন রাগেই হোক, 'স' স্বরটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়া চলবে না; আবার 'ম' ও 'প' এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে রাখতেই হবে। অর্থাৎ, কোন রাগে এক সঙ্গে 'ম' ও 'প'-কে বাদ দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম বজায় রেখে অল্প যে কোন পর পর দুটি স্বর বাদ দেওয়া চলতে পারে।

(ঙ) প্রত্যেক রাগেই একটা নির্দিষ্ট বাদী ও একটা নির্দিষ্ট সংবাদী স্বর থাকা চাই।

(চ) বিভিন্ন রাগের জগ্ন বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই নির্দিষ্ট সময়েই রাগের পরিবেশন হওয়া উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ("রাগের সময়" দ্রষ্টব্য।)

(ছ) রাগ শ্রুতিমধুর ও রসভাবযুক্ত হওয়া চাই। ("রাগরস" দ্রষ্টব্য।)

**রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব:** রাগের আলাপ বা বিস্তার করার সময় রাগকে "আছোপ" (অর্থাৎ গোপন) রাখার জগ্ন বা মাধুষের কারণে অথবা রাগের উপর পরিবেশকের কতটা দখল আছে, শ্রোতাকে সেটি বুঝাবার জগ্ন রাগকে নিয়ে এইভাবে লুকোচুরি খেলা হয়। প্রায় অধিকাংশ রাগেই অপর রাগের সংক্রমণ দেখা যায়। সেই সংক্রমণ স্থানের স্বরশৃঙ্খলের উপর জোর (stress) দিয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আসল রাগটিতে ফিরে আসাই এর বৈশিষ্ট্য। নিপুণভাবে ফিরে আসা কঠিন। ঠিক ভাবে পরিবেশিত রাগে ফিরে আসতে না পারলে রাগভ্রষ্ট হওয়ার ভয় থাকে।

যে রাগটি আপনি পরিবেশন করছেন (অর্থাৎ মূল রাগটি থেকে যখন অল্প রাগের ভাবের দিকে যেতে চাইছেন), তখনই আসলে হবে তিরোভাব। আবার সেখান থেকে যখন মূল রাগে ফিরে আসবেন, তখনই আপনার মূল রাগের

আবির্ভাব হবে। সাধারণতঃ সমপ্রকৃতির রাগেই এই ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকলে অন্যান্য রাগেও এই কায়দা দেখান চলে।

**প্রাচীন কালের দেশী রাগ :** মার্গরাগকে এদের “জনক” রাগ বলে কল্পনা করা হত।

**রাগাঙ্গ :** গ্রাম রাগের ছায়া যে রাগে থাকতো তাকে রাগাঙ্গ বলা হত। রাগাঙ্গে আটটি রাগকে ধরা হত, পরে আরও ১৩টি যুক্ত করা হয়। শুধু শাস্ত্রীয় রাগদেরই রাগাঙ্গ বলা হত। স্বতরাং আমরা এদের তখনকার দিনেব ক্ল্যাসিক্যাল রাগ বা প্রথম শ্রেণীর রাগ বলে মনে করতে পারি। তখনকার দিনে শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করার উপায় হলে না, নিয়মভঙ্গ হলে রাগাঙ্গ থাকত না। তাই নিয়ম মার্কিক বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া হলে তবেই তাকে রাগাঙ্গ রাগ বলা হত। রাগের অন্তর্গামী ও সহায়তাকারী কতকগুলি পরিপোষক ক্রিয়াকেও রাগাঙ্গ বলা হত।\*

**ভাষাঙ্গ :** ভাষার ছায়ায় যারা আশ্রিত, তাদের বলতো ভাষাঙ্গ। আদিতে ভাষাঙ্গের অধানে ১১টি রাগ প্রসিদ্ধ ছিল; পরে আরও ৯টি রাগ ভাষাঙ্গে প্রচলিত হয়। শাস্ত্রীয় তন্ত্রের উপর এরা প্রতিষ্ঠিত নয়। এরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নিয়মের অন্তর্গত ছিল। রাগাঙ্গ রাগের খুব নিকটবর্তী অথচ গানের চালে যাদের কিছু ভিন্নতাব লক্ষিত হত, সেই রাগদের ভাষাঙ্গ বলা হত।\*

**উপাঙ্গ :** কোন অংশে ছায়া লাগলে তাকে “উপাঙ্গ” বলা হত। উপাঙ্গে আগে ৩টা রাগ ও পরে ২৭টা রাগ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উপাঙ্গ-জাতীয় রাগে বিশুদ্ধ নষ্ট করে অনেক সময়ে রাগের মূল স্বরগুলিকেই পাল্টে ফেলা হত।\* এতে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের ছায়া থাকত।

**ক্রিয়াঙ্গ :** করণ ৭ উৎসাহাদি রস যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকত, তাদের বলা হত “ক্রিয়াঙ্গ”। সেকালে ক্রিয়াঙ্গের অধানে ১২টা রাগ ছিল; পরে আরও ৩টি রাগ ক্রিয়াঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিবাদী সুরের প্রয়োগে ক্রিয়াঙ্গ রাগকে মধুরতর করে তোলা হত; তাতে রাগ ভ্রষ্ট হত। কিন্তু উপাঙ্গের মত ক্রিয়াঙ্গে অনেক স্বর একেবারে বদলে ফেলা হত না। রাগের বিশুদ্ধতা এতেও নষ্ট করা হত। তবে সম্পূর্ণভাবে নয়; সামান্য ইতর-বিশেষ ঘটত।\*

\* পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির ১ম ভাগে পণ্ডিতজী এই রূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

**গ্রাম রাগ :** আগেকার দিনে গ্রামরাগ জনকরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এরা সবাপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু দেশী রাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এতে পাঁচটি ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, যথা—**রাগালাপ, রূপকলাপ, করণ, বর্ডনী ও আক্ষিপ্তিকা**। “সংগীত-রত্নাকর” পুস্তকে বহু প্রকার গ্রাম রাগের নাম পাওয়া যায়। গ্রাম রাগ পাঁচ রকমের ছিল : (১) শুদ্ধ ৭টি, (২) ভিন্ন ৫টি, (৩) গোড় ৩টি, (৪) বেসর ৮টি, (৫) সাধাবণ ৭টি।

**ভাষা, বিভাষা ও অন্তর ভাষা :** ভাষা রাগের জনকরাগ ছিল গ্রামরাগ। গ্রামরাগের মত ভাষারাগও অনেক রকমের ছিল। ভাষার আশ্রয়ে মূল রাগ থেকে ভাষা রাগেরা কিছু বদলে যেত। গ্রাম রাগের আলাপযোগ্য **জন্তু** রাগগুলিকে ভাষা রাগ বলা হত। এদের স্বরগুলি কোমল ও মৃদু হত।

ভাষারাগের এই বিরুতির কলেই বিভাষাদের উদ্ভব। কোন গ্রামরাগের শেষের দিকে যদি স্বরবৈচিত্র্যাদি দেখিয়ে তাদের বিশেষ ভঙ্গিতে গায়রা হত, তবে তাদের বলা হত **বিভাষা**। ভাষার লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম করা হত। স্বরগুলিকে গমকযুক্ত ও উঁচু দিকে মোলায়েম ভাবে লাগান হত।

**অন্তর ভাষা :** বিভাষার ‘জন্তু’ রাগদের অন্তর ভাষা বলা হত; বেগুলি জনকের সামান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতো। রঙ্গকতা গুলকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হত।

**কাণ্ডারণা :** রাগ বিস্তারে গমকাদি অলংকার দিয়ে তিন সপ্তকে অনায়াস গতিতে চলাফেরা করাকেই আগের দিনে “**কাণ্ডারণা**” বলা হত।

**আক্ষিপ্তিকা :** বাণী ও সব দিয়ে আলাপ ও তালে বাঁধা শেষ অংশের গানকেই “**আক্ষিপ্তিকা**” বলা হত।

একটি রাগকে প্রকাশ করতে, সেই রাগে স্বরের ব্যবহারের তারতম্য বোঝানার কারণে তাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চার ভাগ নিয়ে বর্ণিত হল :

(১) **বাদী স্বর :** কোন একটি স্বরের রূপ-বিন্যাসক স্বরের মধ্যে যেটি প্রধান স্বর তাকে “**বাদী স্বর**” বলা হয়। রাগে অন্যান্য সমস্ত স্বর ব্যবহারের উপর এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে রাগের বাদী স্বরকে বলা হয় **রাজা স্বর**। তার পরিচয়েই রাগের পরিচয়।

(২) **সংবাদী স্বর :** বাদীর পরেই সংবাদীর স্থান। রাগে এর ব্যবহার বাদীর থেকে কিছু কম, তবে অল্প সব স্বর থেকে বেশী। যে রাগে বাদী স্বরের

ঠিক আগের বা পরের স্রটি ছাড়া বাদীস্বরের সমশ্রুতি-স্রবিশিষ্ট যে কোন এক স্বর সংবাদী স্বর হতে পারে, এরকম একটা নিয়মও আছে। অথবা বাদীস্বর থেকে আট বা বার শ্রুতির ব্যবধান থাকবে সংবাদী স্বরে, এ কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন কোন রাগে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। বলা হয়, রাগের স্বররাজ্যের মন্ত্রী হল **সংবাদী স্বর** : আর রাজা হল বাদী স্বর।

(৩) **অনুবাদী স্বর** : বাদী, সংবাদী ও বিবাদী স্বর ছাড়া রাগে ব্যবহৃত অল্প সমস্ত পরকেই বলা হয় “অনুবাদী স্বর”। এদেরকে বলা হয় রাগের স্বররাজ্যের “অহচর”।

(৪) **বিবাদী স্বর** : যখন রাগে কোন স্বর মিসমিতভাবে কাজে লাগে না এবং তার অন্যথা প্রয়োগে রাগটি অশুদ্ধ হতে পারে, তখন তাকেই বলা হয় **বিবাদী স্বর**। ক্ষেত্রবিশেষে এই বিবাদী স্বরকেও কাজে লাগান যেতে পারে; রাগকে মধুরতর করে তোলার জন্য কোন কোন রাগে আমরা মাঝে মাঝে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করে থাকি। এখানে মনে রাখতে হবে যে বিবাদী স্বর রাগের “বর্জ্য স্বর” নয়। উদাহরণের খাতিরে ভূপালিতে শুদ্ধ মধ্যমের উল্লেখ করা যায়; একে আমরা মধ্যমের খাতিরে ভূপালি রাগে কোন রকমেই ব্যবহার করতে পারি না, কারণ ভূপালিতে শুদ্ধ ‘ম’ একটি বর্জ্য স্বর। মধুরতার কারণে কেদারাতে কোমল ‘ম’-এর পরশ আমরা লাগাতে পারি, যদিও কেদারাতে সেই বিবাদী স্বর কিন্তু বর্জ্য স্বর নয়। এই রকম অনেক রাগেই বিবাদী স্বর আছে এবং তাকে পুষ্টিমানের মত ব্যবহার করা যায়।

যার সঙ্গে আপনার বিবাদ আছে, তাকেও আপনি কারদা করে কাজে লাগিয়ে নিতে পারেন। অবশ্য এই নিয়োগ অনেক ভেবে-চিন্তেই করা উচিত। এখানেও ঠিক তেমনি। বিশিষ্ট রাগের স্বররাজ্যের শক্রব সঙ্গে এদের তুলনা করা হয়েছে।

**বক্র স্বর** : রাগের আরোহণ বা অবরোহণে যখন কোন স্বর সোজাভাবে লাগে না,—একটু ঘুরিয়ে দেখাতে হয়,—তখন তাকে সেই রাগের “বক্র স্বর” বলা হয়।

**রাগের পকড় ও উঠান ( বা উঠাও )** : রাগ-প্রকাশক কয়েকটি স্বর নিয়ে যে স্বরবিজ্ঞাস গড়া হয়, তাকেই আমরা **পকড়** বলি। এটি হিন্দী শব্দ।

রাগপ্রতিষ্ঠা করার সময় অল্প রাগ এসে পড়ার ভয় থাকে। রাগের পকড় জানা থাকলে, রাগরূপ-প্রকাশে আর কোন বাধা আসে না। পকড় রাগের মূখ্য অংশ।

তবলার ঠেকে ধরার আগে যে বোল বাজান হয়, তাকে আমরা **উঠান** বলি। কিন্তু অনেকে “উঠাও”-কে “উঠান” বলে থাকেন : আবার যে স্বরটি থেকে গং বা গান আরম্ভ করা হয়, তাকেও অনেকে “উঠান” বলেন।

কিন্তু প্রকৃতপ্রভাবে “উঠাও” কথাটি ব্যবহার করা হয় রাগের রূপপ্রকাশক বিছাসের ক্ষেত্রে। যেটি বাদী-সমবাদী যুক্ত হয়ে রাগের চলনটিকে আলাপের চণ্ডে প্রকাশ করে এবং যে স্বর-বিছাস শুনলেই রাগের স্বরূপটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, সেটিই “উঠাও”। এই উঠাও-কে আবার অনেকে ভাগে ভাগ করে “আস্থায়ীর উঠাও” ও “অস্তরার উঠাও” বলে থাকেন। যে রাগে যেখান থেকে অস্তরার ধরার নিয়ম, সেইখান থেকে আরম্ভ করে তারার স-তে শেষ করা হয়, বা সময়ে নীচে নেমে আসাও হয়। এখানে রাগের রূপপ্রকাশক বিছাসটিকে স্পষ্ট করে দেখান হয়।

**জনক রাগ, আশ্রয় রাগ, জন্ম রাগ** :—ঠাটের প্রসঙ্গে বলেছি যে এক একটি ঠাটকে সেই ঠাটে ব্যবহৃত এক একটি বিশিষ্ট রাগের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। যে রাগের নামে ঠাটটি ব্যবহৃত হয়, তাকেই **জনক রাগ** বলা হয়। কিন্তু ঠাটই জনক, কারণ ঠাট থেকেই রাগ উৎপন্ন হচ্ছে বলে ধরা হয়।

যে রাগটির নামে ঠাটটি প্রচলিত, সেই রাগটি আবার **আশ্রয় রাগ**-ও হচ্ছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও ঠাটই জনক, তবুও জনক রাগ এবং আশ্রয় রাগ বললে আমরা সেই রাগটিকে বুঝবো, যেটির নামে ঠাটটি প্রচলিত। আশ্রয় রাগের বৈশিষ্ট্য এই যে সে ঠাটের স্বরারোহণের সঙ্গেই বহুলাংশে মিলে যায়।

আশ্রয় রাগের অধীনস্থ যে সব রাগ, অর্থাৎ ঐ ঠাট থেকে আর যে সব রাগ প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাদের বলা হয় **জন্ম রাগ**।

**সন্ধিপ্ৰকাশ রাগ** :—“রাগের নির্দিষ্ট সময়” প্রসঙ্গে সন্ধিপ্ৰকাশ রাগের একটু আভাষ আমরা দিয়েছি। এখানে সে সঙ্ক্ষে আরও কিছু বলছি। চতুর পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজ সাধারণতঃ ভৈরো, পূর্বা আর মারওয়ী ঠাটের সন্ধিপ্ৰকাশ রাগের কথা বলেছেন। সন্ধিপ্ৰকাশ রাগগুলি বিচার করবার সময় তিনি বলেছেন যে সন্ধিপ্ৰকাশ রাগে আমরা সাধারণতঃ কোমল ‘র’, তীব্র ‘গ’ ও শুষ্ক ‘ন’-র ব্যবহার দেখতে পাই। এটা যে একটা সহজ উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও আমরা এ নিয়মটি সাধারণভাবে মেনে নিতে পারি।

**পূর্বা ও উত্তরায়-প্রধান রাগের লক্ষণ** : এ সঙ্ক্ষে আমরা আগেই

বলেছি যে, যে সমস্ত রাগের স র র গ গ ম ম এর মধ্যে কোন একটি স্বর বাদী হয় এবং যাদের বিস্তারে খাদের ও মাবোর স্বরসমষ্টির ব্যবহারই বেশী দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় “**পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগ**”। অর্থাৎ, যে সমস্ত রাগে প প দ ন ন স-এর মধ্যে কোন একটি স্বর বাদী হয় এবং যাদের বিস্তার মধ্যসপ্তক ও তারা স্থানেই বেশী চলাফেরা করতে দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় “**উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ**”।

## রাগের নির্দিষ্ট সময়

সঙ্গীত শাস্ত্রকাব ভারত, মতঙ্গ প্রভৃতি পণ্ডিতদের সময়ে রাগ-রাগিণী গীত হওয়ার বিশেষ সময় ছিল বলে জানা যায় না। রাগদের গাইবার কোন বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবস্থা থাকলে তাদের পুস্তকে যে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকত।

আমরা নারদ-কৃত “সঙ্গীত মকরন্দ” পুস্তকেই সবপ্রথম রাগ পরিবেশনের সময় সম্বন্ধে নির্দেশ দেখতে পাই। সকালে, দুপুরে বা রাতে গাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ রাগের ব্যবস্থা সে পুস্তকে ছিল। তদানীন্তন কালের অত্যাণ্ড পুস্তকেও রাগের সময়-নির্দেশ পাওয়া যায়। মুসলমান আমলে অর্থাৎ বাদশাহদের রাজত্বকালে তখনকাব শাস্ত্রীদের রচিত গ্রন্থমালায় ও উস্তাদদের ব্যবহারিক নিয়মে আমরা রাগের সময়-নির্দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাই। এই সময়-নির্দেশ সম্বন্ধেও মতভেদ ছিল। গোয়ালিয়র ঘরাণা, রামপুর ঘরাণার উস্তাদেরা সময় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সময়-নির্দেশ কোন রাগে বাদীস্বরের উপর নির্ভর করে, কোথাও বা রাগে ব্যবহৃত কড়ি-কোমল স্বরের উপর বিচার করে, আবার কোথাও বা পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ বিভেদের উপর চিন্তা করে, অর্থাৎ এই সব বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখেই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, রাগের স্বর ব্যবহার সম্বন্ধেও মতভেদ ছিল। কাজেই সময় সম্বন্ধে কোন নির্ভুল সমাধানে পৌঁছান কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

প্রাচীন মতে সংগীতশাস্ত্রে সময়কে যাম, দণ্ড ও প্রহর হিসাবে ভাগ করা হতো।\* দেখা যায়, দণ্ড = ১৫ মিনিট এবং যাম বা প্রহর = দিবা বা রাত্রির

\* ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে অষ্টাবিধ এই ত্রিধা বিভাগ মনে চলা হয়।

এক চতুর্থাংশ কাল, অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা সময়। তখনকার দিনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অল্পরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কিন্তু এ নিয়ম গ্রাহ্য করেন নি। রাত বারোটা থেকে দুপুর বারোটা এবং দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটা—এই দু'ভাগে দিবারাত্রির ২৪ ঘণ্টা সময়কে তিনি পাশ্চাত্য নিয়মানুসারে ভাগ করেছেন। তিনি দিন বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সময়কে **পূর্বার্ধ** ও রাত বারোটা থেকে দিন বারোটা পর্যন্ত সময়কে **উত্তরার্ধ**—এই দুই নামে চিহ্নিত করেছেন; এবং তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে “স র গ ম প ধ ন স” এই অষ্টককেও দু'ভাগে ভাগ করেছেন : ‘স র গ ম’-কে তিনি **পূর্বার্ধ** এবং ‘প ধ ন স’-কে **উত্তরার্ধ** বলেছেন। এই পূর্বার্ধের, অর্থাৎ ‘স র গ ম’-এর মধ্যে কোন একটি স্বর যখন কোন একটি রাগে বাদ্যীর স্থান অধিকার করেছে, তখন সেই রাগটি দিনের পূর্বার্ধের আওতায় আসছে। অল্পরূপভাবে উত্তরার্ধ অর্থাৎ ‘প ধ ন স’-এর মধ্যে কোন একটি স্বর যখন কোন একটি রাগে বাদ্যীর স্থান অধিকার করেছে, তখন সেই রাগটি সময়-বিভাগে উত্তরার্ধের আওতায় আসছে।

এই ভাবে সন্ধিপ্ৰকাশ সময়ে (উষাকালে) ভৈরো ও নলিতান্দ রাগদের এবং পরে বেলা বারটার মধ্যে বিলাবল, ভৈরবী ও আসাবরী জাতীয় রাগদের এবং বেলা চারটে পর্যন্ত সারং, কাফী ও টোড়ী জাতীয় রাগদের গাইবার বা বাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন। পুনঃ সন্ধিপ্ৰকাশ সময়ে (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে) মারবা পূবী ও শ্রী জাতীয় রাগদের, এবং সন্ধ্যার পর থেকে রাত বাঁচটা পর্যন্ত কল্যাণ, খাম্বাজ, কাফী, বিলাবল ও আসাবরী জাতীয় রাগদের গাইবার বা বাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভাতখণ্ডেজীকৃত এই বিভাগটি অনেকের পছন্দ নয়, তাই তাঁর মত সকলে মানতে চান না। বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় রাগের সময় নির্দেশে একটা নির্দিষ্ট মত মেনে চলা হয় : এই মত বা নিয়ম ভাতখণ্ডেজী-প্রবর্তিত নিয়ম থেকে কিছুটা ভিন্ন।

ডাঃ বিমল রায় এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দিবারাত্রকে চটি প্রহরে বিভক্ত করে এক-একটি প্রহরের দুটি অংশ স্বীকার করেন।

তাঁর মতে ২৪ ঘণ্টায় ২২টি শ্রুতির ব্যবহার হচ্ছে অতএব প্রতি ৩ ঘণ্টার প্রহরে ২৪ শ্রুতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি ৬টা থেকে ৯টা বা শূঁখা উদয় থেকে ৩ ঘণ্টাকে

প্রথম প্রহর বলেছেন। ঘণ্টার গতির সঙ্গে ১ম প্রহরে সকারী, অতিকোমল ও কোমল র ব্যবহৃত হচ্ছে, জন্মাচ্ছে ভৈরব, বিলাসখানি টোড়ী, টোড়ী ১ম অংশে ; এবং ভৈরবী ২য় অংশে।

২য় প্রহরে কোমল র, শুদ্ধ র, অতি কোমল ও কোমল গ ব্যবহারে আসে। অতএব ১ম অংশে জন্মায় কোমল দেশী, আসাবরী, জৌনপুরী, সিকু ভৈরবী, বেলাবল জাতীয় রাগ এবং ২য় অংশে জন্মায় বৃন্দাবনী সারং, মুখারী দেশাখ্য জাতীয় রাগ।

৩য় প্রহরে কোমল ও শুদ্ধ গ এবং শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়। মধ্যাহ্নে শুদ্ধ ম কড়ী ম-র দিকে ঝোঁকে। অতএব ১ম অংশে জন্মায় ধানী, ধন্যাসী, স্নহা, স্নহরাই জাতীয় রাগ, বেলাবল জাতীয় রাগ, দুই ম যুক্ত বেলাবল, সারং গোড় সারং এবং ২য় অংশে শুদ্ধ সারং মালশ্রী প্রকৃতির রাগ।

৪র্থ প্রহরে ম, তীব্র, তীব্রতর ম ব্যবহৃত হয়। অতএব প্রথম অংশে জন্মায় ভীমপলাসী, পটমঞ্জরী, প্রদীপকী, হংসকন্দনী প্রকৃতি এবং ২য় অংশে জন্মায় মধুবন্তী, মূলতানী, ধনাশ্রী, মূলতানী-ধনাশ্রী, শ্রী, গৌরী।

৫ম প্রহরে তীব্রতর ম, প, সকারী ধ ব্যবহৃত হয়। অতএব প্রথম অংশে জন্মায় (গোধুলিতে) শ্রী জাতীয় রাগ, পূবী, পুরিয়াধনাশ্রী, দিনকী-পুরিয়া, পুরিয়া, মারবা, সাজগিরি, পূবা এবং শেষ অংশে জন্মায় পূর্বকল্যাণ, পুরিয়া-কল্যাণ, মানিগৌরা, কেসর-পুরিয়া, ইমন, কল্যাণ। কড়ী ম শুদ্ধ ম-র দিকে নামবার চেষ্টা করলে জন্মায় ইমনকল্যাণ জাতীয় রাগ।

৬ষ্ঠ প্রহরে সকারী, অতিকোমল, কোমল ও শুদ্ধ ধ ব্যবহৃত হয়। ম নিজের জায়গায় ফিরে যায়, প কড়ী ম-র দিকে ঝোঁকে। অতএব জন্মায় কামোদ, কেদার জাতীয় রাগ এবং শেষ অংশে বেলাবল জাতীয় রাগ। পূর্বদিকে আলোড়নের জগ্ন শুদ্ধ ন কোমল ন-র দিকে প্রসরণ হবে বলে নট, খাষাজ জাতীয় রাগ জন্মায়।

৭ম প্রহরে 'ধ' অতিকোমল, কোমল ও শুদ্ধ 'ন' ব্যবহারে আসে। অতএব ১ম অংশে খাষাজ, কাফী জাতীয় রাগ জন্মায় এবং ২য় অংশে কাফী ও কানরা জাতীয় রাগ সৃষ্ট হয়।

৮ম প্রহরে শুদ্ধ, তীব্র ন, স ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব ১ম অংশে শুদ্ধ ম গ-র দিকে প্রসরণ করে বলে চল স্বরগুলি স্থানচ্যুত হয় এবং বসন্ত, পরজ, পঞ্চম, সোহিনী জন্মায়। ২য় অংশে অর্থাৎ উষায় তীব্র ন স-র ব্যবহার সীমিত

করে; ললিত জাতীয় রাগ সৃষ্ট হয়। উষার শেষ দিকে স প্রাধান্য লাভ করে, জন্মায় ভংগার, তাঁটগার। তারপর প্রকৃতির শাস্ত পরিবেশে বেলাবল দেখা দেয়— যে রাগে স-র নিকটবর্তী স্বরগুলির প্রাধান্য থাকে।

“গীত সূত্রসার” গ্রন্থে সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “আসলে রাগ-রাগিনীদের গাইবার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, ভ্রমসঙ্কল সংস্কারের বশেই আমরা চালিত হয়ে থাকি।” সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর “রাগ-রূপায়ণ” পুস্তকে এ বিষয়ে একটি যুক্তি দেখিয়েছেন; তিনি বলেছেন, “সকাল বেলাকার রাগে স্বাভাবিক শাস্ত্যভাব, আর সন্ধ্যাবেলাকার রাগে কর্মচঞ্চল ভাব প্রতিফলিত হওয়া চাই।” সকালের রাগে ‘স’ স্বরের বিশেষ উল্লেখন কোথাও নাই। ন র গ অথবা ন কোমল, র গ সকালের কোন রাগেই প্রযোজ্য নয়। স্বেচার সন্ধ্যাবেলার কোন রাগেই এই স্বরবিন্যাস ছুটি বর্জনীয় নয়। আমরা দেখি সকালের রাগে একটা শাস্ত্য ভাবের আমেজ পাওয়া যায়। রাগের সময় বিভাগ কঠোরভাবে মানার পক্ষপাতী আমরা নই; তবে দিনের রাগকে রাতে গাওয়া আমরা পছন্দ করি, সেটি আমাদের বক্তব্য নয়।

আমরা দেখতে পাই গাড়েব মত জড় জীবও প্রাকৃতিক নিয়ম ও সময়-পরিবর্তন অনুসারে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীই সময়ের নিয়মের অধীনে স্বাভাবিক ভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করে চলে। কারণে-অকারণে অনেক নিয়মই সমাজবন্ধজীবেরা মেনে চলে। এই মানার ফলে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি ব্যর্থতা করা সম্ভব হয়। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একটা স্বাভাবিকতা সংস্থাপনের কারণে রাগের সময় সঙ্ক্ষে একটা নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ নিয়ম মেনে চলা অঙ্গুত বা অসমীচীন নয়। তবে এ সঙ্ক্ষে কোনও কঠিন বাঁধন না থাকাই শ্রেয়ঃ, এই কথাই আমরা বলতে চাই। যেখানে রাজাজ্ঞায় বা অভিনয়কালে যে কোন রাগ যে কোন সময়ে গীত হলে দৃষ্ট হয় না, বা কোন রাগ ভ্রমবশতঃ অকালে গীত হলে, স্বরসা গুঞ্জরী রাগের গানে সে দোষ খণ্ডন করা যায় (এ ধরণের প্রতিকার-ব্যবস্থা প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়), তখন আমরা সময়ের বাঁধন কিছু আলগা করতে পারি। অসময়ে গীত হলেই কোন রাগ অপাংক্ত্যে হবে, এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবুও সাধারণভাবে আমরা সময়ের নিয়ম অঙ্গুত করে চলাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

আজকের দিনে বিভিন্ন মতের পরিপোষকতা না করে রাগের সময় সঙ্ক্ষে বিচার করে একটি সর্বসম্মত নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করি। এই

প্রয়োজন সিন্ধু হলে নানা মুনির নানা মতের চাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে এবং এ বিষয়ে যথেষ্টাচার করা ও সম্ভব হবে না।

## রাগের রসভাব

শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে “রস্মতে আশ্বাভুতে ইতি রসঃ”। গান, বাজনা, নাট, অভিনয়, কবিতাপাঠ, আবৃত্তির মাধ্যমে স্তম্ভ-ক্রম প্রভৃতি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় বা দর্শনে আমাদের মানসপটে যে ভাব জেগে উঠে আমাদের মনকে কোন এক রসভাবে সিদ্ধিত করে তোলে, তখন সেই ভাবাবেগজনিত অচলভক্তিকে আমরা **রস** বলি। কাব্যকারণভেদে কাব্যরস, সঙ্গীতরস বা অভিনয়াদিজনিত রসের ভোগ পৃথক হলেও মূলতঃ রস বস্তুটি একই।

সঙ্গীতশাস্ত্রে মাাত্র পেয়েছে রসের আট রকম ভেদ। রাগরসের ক্ষেত্রে ও এই আট রকম রসের কথাই বলা হয়েছে; তাদের নামকরণ নিম্নরূপ : ‘শঙ্কার’, ‘হাস্য’, ‘করুণ’, ‘দীর্ঘ’, ‘রৌদ্র’, ‘ভয়ানক’, ‘বীভৎস’ ও ‘অদ্ভুত’। বাখ্যায় বলা হয়েছে—শঙ্কারের অর্থ ‘রতি’, হাস্যের অর্থ ‘হাসি’, করুণের অর্থ ‘শোক’, দীর্ঘের অর্থ ‘উৎসাহ’, রৌদ্রের অর্থ ‘ক্রোধ’, ভয়ানকের অর্থ ‘ভয়’, বীভৎস ( বা জগুপ্সা )-র অর্থ ‘দুঃখ’, অদ্ভুতের অর্থ ‘বিস্ময়’। কাব্যের বেলায় ‘শাস্ত্র’ নামে আর একটি রস যুক্ত হবার ফলে মাকুল্যে ‘নবরস’ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ‘বাৎসল্য রস’, ‘ভক্তিরস’ প্রভৃতি যোগ করলে রসসংখ্যা প্রায় বারটি দাঁড়ায়।

কাব্যের পরিধিতে আমরা চাঁদের আলো, কোকিলের ডাক, বিরহ, মিলন, শঙ্কারাদি নানা বিনয়ের শ্রবণ-স্পর্শন-মনন প্রভৃতি দ্বারা এক এক রকম রসভাব সঞ্চারে প্রয়াসী হই। কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় আমাদের হাতে থাকে একটিমাত্র বস্তু; সেটি হল রাগ; তাকে নানা চন্দ্রে, বর্ণে, তালে ও অলংকারে ভরিয়ে আমরা রসভাব জাগাতে সচেষ্ট হই।

ভরত-বর্ণিত উক্ত আট রস আসলে নাট্য-সঙ্গীতেই প্রযোজ্য; তবু ও রাগসঙ্গীতে সে এগুলি অপ্রযোজ্য, সে কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিটি স্বর এবং প্রতিটি স্বরাশ্রিত শ্রুতিকে এক একটি বিশেষ রসের ধারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোন রাগ আমাদের মনে গভীর দাগ কাটে তাতে আমরা কোন এক রস অনুভব করি। তবে কোনও একটি বিশেষ স্বর বা স্বরাশ্রিত কোনও একটি শ্রুতি যে একটি বিশেষ রসভাব বহন করে বা তার প্রতিক্রিয়ায় বা ফলশ্রুতিতে যে আমাদের মনে রস সঞ্চারিত

হয়, এরূপ বোধ করি না ; কোন স্রষ্টা দ্বারা সেটি প্রমাণও করতে পারি না । কতকগুলি স্বরের ব্যবহার-পরম্পরায় আমাদের মনে কোন এক রসভাব জাগিয়ে তুলতে পারে, সে কথা মানা যায় ।

এ কথা জোর করে বলা যায় যে শুধু রাগ বা কোন একটি বিশেষ স্বর প্রকৃতভাবে রাগরস সৃষ্টি করে না । সংযুক্তভাবেই রসভাব ফুটিয়ে তোলে, এমন কিছু উপাদান তার সঙ্গে থাকে । গানের ক্ষেত্রে তার বাণী ও কণ্ঠস্বর, যন্ত্রের ক্ষেত্রে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বায়ুস্তম্ভ । রসসৃষ্টিতে আধার হল এক প্রধান উপাদান । তা ছাড়া রাগের রচনা-কৌশল, তার মধুর ভাব, রাগাশ্রিত কোন বিশেষ স্বরের বিশিষ্ট প্রয়োগ ও পরিবেশনের নিপুণতাই আধারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রস-সৃষ্টি করে ।

বর্তমানে অনেকের ধারণা সঙ্গীতরস এক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বস্তু ; এই বস্তু পূর্ববর্ণিত আট রসের আওতার বাইরে ও একটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন রস । একান্তভাবে অতীতের যে বস্তু হৃদয় রসের গভীরতার মতো আমাদেরকে অবগাহন করায় এবং যাকে লৌকিক ভাষায় বোঝান যায় না, এমন এক রসভাব আমাদের রাগে আছে । এই রস সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক, বাজার চলতি রস নামে একে ধরা যায় না, বা অভিহিত করা যায় না । এটি কেবলমাত্র উপলক্ষের দ্বারাই লাভ করা যায় ।\*

## রাগের সংজ্ঞা ও তার ইতিহাস

পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় যে আদি ছয় রাগের জন্মদাতা হলেন স্বয়ং মহাদেব ও দেবী পার্বতী । দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চানন : তাঁর পাঁচটি আনন থেকে জন্ম হল 'শ্রী', 'ভৈরব', 'পঞ্চম', 'বসন্ত' ও 'মেঘ' এই পাঁচটি রাগের, আর পার্বতীর মুখ থেকে জন্ম হল নট-নারায়ণ রাগের । সৃষ্টির আদি বৃগু থেকেই রাগ রাগিণী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায় : যেমন **ব্রহ্মার মতে** গিরিজাপতির সন্তোজাত ( উর্দ্ধ ) মুখ থেকে বেরোলেন 'শ্রীরাগ' ; বামদেব ( পূর্ব ) মুখ থেকে 'বসন্ত' ; অঘোর ( দক্ষিণ ) মুখ থেকে 'ভৈরব' ; তৎপুরুষ ( পশ্চিম ) মুখ থেকে 'পঞ্চম' এবং ঈশান ( উত্তর ) মুখ থেকে 'মেঘ' । আবার **ভরত মতে** বলা

\* গ্রন্থকারের "সঙ্গীতে রসসৃষ্টি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : "মাসিক তৈর্ঘ্যাত্মক" পত্রিকা, পূজা-সংখ্যা, ( ১৯৬৭ ) ।

হয় যে শব্দের অর্থের ( দক্ষিণ ) মুখ থেকে 'ভৈরব' ; তৎপুরুষ ( পশ্চিম ) মুখ থেকে 'শ্রী' ; সত্ত্বোজাত ( আকাশ বা উর্দ্ধাঙ্গ ) মুখ থেকে 'মেঘ' ; বামদেব ( পূর্ব ) মুখ থেকে 'দীপক' ; ঙ্গশান ( উত্তর ) মুখ থেকে 'হিন্দোল' ; এবং পার্বতীর মুখ থেকে 'মালকোশ' রাগের জন্ম হয় । কোন মতটি ঠিক, কোন মতটি বেঠিক, এ নিয়ে তর্ক করে বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের কোন নতুন অধ্যায় আমরা রচনা করতে পারব না । মহাদেবের কোন মুখ থেকে কোন রাগের জন্ম হয়েছিল সেটা ভেদে আজকের দিনে বিশেষ লাভ নেই ; কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণেই জানার প্রয়োজনীয়তা । এই ধরণের নানা পৌরাণিক কাহিনীই আমাদের রাগের আদি ইতিহাস ।

শাস্ত্রে রাগ মাত্রকেই গণ্ডীর প্রকৃতির পরিচায়ক বলা হয়েছে ; এদের গতি মন্থর, চটুলত। এদের মধ্যে মোটেই দেখা যাবে না । এরা শুদ্ধ জাতিবিশিষ্ট, এবং নিজস্ব স্বাভাব্য এদের থাকবে, এসব বলা হয়েছে । রাগিণীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এরা রাগেরই অংশ-বিশেষ, এরা চটল ভঙ্গীর ধারক এবং শৃঙ্গারাদি রস-প্রকাশের উপযুক্ত । রাগ ও রাগিণীর আর বিশেষ কোন তফাৎ কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না । একমাত্র রাগাদির ধ্যানের বাণীর মধ্যেই রাগ ও রাগিণীর বিভেদ পরিলক্ষিত হয় । বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া বর্তমানে কোন কিছু বোঝানো শক্ত ।

বর্তমানে নট-নারায়ণ রাগিণী বলে তার রূপদ বা খেয়াল কেবলমাত্র করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক করে পাওয়া হয়, এমন কোন নজীর পাওয়া যায় না । মালকোশ রাগের গান কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর বীর রসাত্মক হবে এমন কথাও নয় । অবশ্য তখনকার দিনের রাগরাগিণীরা অনেকেই ভিন্নরূপে নতুন সাজে সেজে আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । প্রাচীনের সঙ্গে তাই বর্তমানে প্রচলিত রাগরাগিণীর মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত ।

শাস্ত্র পাঠে দেখা যায় যে ভরত মুনির আমল থেকেই এদের বেশী প্রচার । ভরতের আগে প্রাচীনকালে 'রাগ' নামে কোন শব্দ আমরা দেখতে পাই না । সেকালের গ্রাম রাগ বা জাতি গানের কথা যা পাওয়া যায় সেগুলি বর্তমানের রাগ গাইবার রীতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল । মতঙ্গের বৃহদেঙ্গীতেই প্রথম আমরা রাগ নামটি পাই । প্রচলিত এই সমস্ত রাগরাগিণীর স্রষ্টা যে প্রকৃত কারা ছিলেন তার সঠিক কোন হৃদিস পাওয়া যায় না । আজকের মত তখনকার দিনেও বিশেষ বিশেষ মতবাদ ছিল একথা আগেই বলেছি, যথা—ভরত মত, কল্লিমাধ মত, ব্রহ্মা মত, হনুমন্ত মত ইত্যাদি এবং কোন একজন শিল্পীর দ্বারা গীত কোন

একটি রাগ অপরের দ্বারা অগ্রভাবে গীত হত। নিচেকার পৌরাণিক গল্পটিই তার প্রমাণ।

নারদ মুনিকে তখনকার দিনে একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং ঔপপত্তিক তৌর্ষত্রিকে তার বিশেষ জ্ঞান থাকায় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাকে একজন মত-গ্রাহ ব্যক্তি অর্থাৎ Authority বলে মাগ্ন্য করা হত। রাগ-রাগিণীদের সঠিকভাবে গাইতে পারেন, এ গর্বও তার ছিল। একদিন বিষ্ণুর দরবারে গাইবার সময়ে নারদ মুনির সেই অহঙ্কার কুটে উঠে। অস্থর্মামী বিষ্ণু নারদের অহঙ্কার খব করার মানসে সভাভঙ্গের পর মুনিকে নিয়ে গন্ধবলোকে বেড়াতে বেরলেন। পথে যেতে যেতে দেখা গেল কয়েকটি স্তম্ভাক্ষ যুবক ও স্ত্রী যুবতী হাত-পা ভাঙ্গা অবস্থায় পথের ধারে পড়ে আছে। নারদ তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের এমত অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, “আমরা হতভাগ্য রাগ-রাগিণীর দল, নারদ নামে এক অবাচীন গায়ক অনুরূপভাবে ভিন্নরূপে আমাদের গাওয়ার ফলে আজ আমাদের এই হাল। আমরা নারায়ণের কাছে এই মুনিকে বাগ গাওয়া থেকে বিরত থাকার চন্ড আজি জানিয়েছি, কবে তার দয়া হবে জানি না।” মুনির অহঙ্কার মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বিষ্ণুর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি সরে পড়লেন। এই গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হতে পারে। নারদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে সঙ্গীতশাস্ত্রে। নারদ ১৩ জন আছেন, ইনি কোন নারদ তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। আসলে এমন ঘটনা ঘটেছিল কিনা, তাও জানা নেই। তবে তখনকার দিনেও যে রাগরাগিণী সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাগ গোষ্ঠী-কল্পনের উপায় হিসাবে প্রত্যেক রাগের সঙ্গে কয়েকটা রাগিণী জুড়ে তাদের রাগভাষা নামে চালানো হয়েছিল। রাগ-রাগিণীদের মনে রাখার জগ্গে যখন ‘মেল’ সৃষ্টি হয়নি, তখন এটাই তারা রাগ বিভাগের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেছিলেন। তখনকার দিনে সমাজে বহু-বিবাহ গণ্য ছিল; প্রত্যেক উচ্চকুলশীলসম্পন্ন ব্যক্তির বা রাজা মহারাজাদের সকলেরই একাধিক ভাষা ছিল। অতএব সহজে মনে রাখার জগ্গ রাগ মহারাজদের প্রত্যেকের ছয় ছয়টি করে স্ত্রী ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল, এরকম ভাবে আপত্তি কি? রাগের কাঠামোর সঙ্গে রাগিণীর কাঠামোর মিল প্রায় বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় না। তার কারণ তখনকার দিনে তাদের ঠাট হিসেবে ভাগ করা হয়নি।

রাগের সংজ্ঞা সঙ্গীতশাস্ত্রে আমরা যা পাই, সেটি হচ্ছে—

“যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ ।

রঙ্গকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ ॥”

—অর্থাৎ যে ধ্বনি বিশেষ স্বর ও বর্ণে ভূষিত হয়ে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে, পঞ্জিতরা তাকেই ‘রাগ’ বলে থাকেন। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে রাগ এবং রাগিণী উভয়কেই এক ‘রাগ’ আখ্যায় বর্ণিত করা হয়েছে, অতঃপর আমরাও রাগ-রাগিণী উভয়কেই ‘রাগ’ নামে ডাকব। অবশ্য রাগের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা রাগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণায় পৌছাতে পারব না। আজকের দিনে নিত্য নব নব সৃষ্টির উদ্দীপনায় নানা ধরনের স্বর-মিশ্রালীতে, নানা চপ্পের ও চালের নিত্য নতুন গানে রাগের দিশা সঠিকভাবে পাওয়া না গেলেও অনেকের চিত্তরঞ্জন করতে এরা যে সমর্থ, একথা অস্বীকার করতে পারি না। রং ও মেজাজে ভরপুর এই ধরনের গান গোড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতিক ব্যাতিরেকে অনেকেরই চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ। রাগের সংজ্ঞায় যদিও ‘রঙ্গয়তি’ কথাটা রয়েছে, তবুও এই ধরনের চলতি গানের স্বরবিন্যাসকে নিশ্চয়ই আমরা রাগ বলতে পারব না, তাছাড়া রাগের রঙ্গকত্ব গুণ সম্বন্ধেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কোন রাগ গীত হলে তাতে সকলের মনোরঞ্জন হবেই, একথা হালফ করে বলা যায় না। একের কাছে যা ভালো লাগে, অন্দের কাছে তা নাও লাগতে পারে। রাগের যে দশবিধ লক্ষণ বখা—গ্রহ, অংশ, ত্রাস, অপত্ৰাস, ষাড়বদ্ধ, ঔড়বদ্ধ, অল্পবদ্ধ, বহুবদ্ধ, মস্ত্র ও তার, এগুলোর যথাবিধি প্রয়োগ বা বিশেষ বিশেষ রাগ-রূপ প্রকাশক স্বর-বিন্যাস, বাদী, সঙ্গীতাদী, লঙ্ঘন ইত্যাদি নানা নিয়মকানুন বজায় রেখে কোন রাগ গীত হলেই যে সেটি সকলের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রাগ বস্তুটি তাহলে কি? রাগ হচ্ছে বহুগুণসম্পন্ন এমন একটি বিশেষ স্বর-মিল ( melody ), যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ; তার প্রশস্ত বিস্তারে, তার নিজস্ব বিকাশের মাঝে আছে নানা খুঁটিনাটিযুক্ত ব্যাকরণ, অথচ সেই নিয়মগুলিই তার চরম কথা নয়। রাগ সম্বন্ধে কোন ধারণায় আসতে হলে ধৈর্য ধরে অতুলন করতে হবে, তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কোন স্বর কোন ‘কন্’-এর আশ্রয় নিচ্ছে, কোনটি কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে, কোথায় রাগটি এসে শেষ হচ্ছে,—এসব দিকে বিশেষ

লক্ষ্য রাখলে তবেই রাগকে চেনা যাবে। রাগ তার সংজ্ঞার বহু উর্দ্ধে বিচরণ করে; অল্পতবের জিনিষকে ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়, তাই রাগের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করা চরুচ। তবুও সাধারণভাবে এখন আমরা রাগের সংজ্ঞা এইভাবে ধরতে পারি—কয়েকটি স্বরধ্বনি যখন বিশেষ বিশেষ বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে একটি নিজস্ব ধারায় ও আবেদনে আমাদের প্রাণে বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ এক বিশেষ রসভাবে ভরপুর সেই স্বর মিলকে আমরা “রাগ” বলতে পারি।

“সঙ্গীত দামোদরে” রাগের জন্মকথার পৌরাণিক কাহিনীর নিদর্শনস্বরূপ এক শ্লোক পাওয়া যায় :

“গোপীভিগীতমারুৎ এতৈক\* কৃষ্ণস্নিধৌ।

তেন জাতানি রাগানাং স্তত্রানি তু যোডশঃ ॥”

রাগ-সৃষ্টির ইতিহাসে তার উৎপত্তির কথায় এটিকে প্রামাণ্য বলে না ধরতে পারেন তবে বাগ রচনা যে এক একজনের চেষ্ঠায় এক একটি করে রচিত হয়েছিল, এবং বলর চেষ্ঠাতেই বহু রাগ রূপ নিয়েছিল, সে কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আগেই বলেছি রাগরচনার সত্যাকারের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কাজেই এই ধরনের ইতিহাসেই আমাদের সম্বন্ধ থাকতে হবে।

## স্বরলিপি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অতি প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯ শতকের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে কোন স্বরবিজ্ঞাস অর্থাৎ স্বরকে লিপিবদ্ধ রাখার উচ্চ মানের কোন স্মৃষ্টি সাংকেতিক চিহ্ন ছিল বলে জানা যায় না। প্রকৃত স্বরলিপির অভাবে আমাদের অতীত সঙ্গীতের বহু মূল্যবান ( সংগ্রহ ও রচনা ) সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কিছুদিন পূর্ব থেকে স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁদের সঙ্গীতের ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির প্রমাণ পাওয়া যায়। অতিপ্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব কালে ভারতবর্ষে স্বরলিপি প্রথা প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে ১৮শতাব্দীর গোস্থামী তার “সঙ্গীত সার” পুস্তকের ২য় সংস্করণে ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন - “অতি প্রাচীন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রমাণ আছে, ভারতবর্ষে পূর্বে স্বরলিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। গমক, মুচ্ছনা, তাল, বাঁট, মাত্রা প্রভৃতি জ্ঞাপক চক্র গবাক্ষাকৃতি প্রভৃতি নানা জাতীয় চিহ্ন, ও বিশ্রাম জ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন তৎকালে ব্যবহৃত হইত।” স্বরলিপির বিষয় বিশদভাবে জানার জন্ত তিনি Asiatic Researches Vol. III দেখতে বলেছেন। আমাদের হাতে সঠিক কোন প্রমাণ না থাকায় বর্তমানে আমাদের দ্বারা এই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। গ্রীক ইতিহাসের উপর নির্ভরে জানা যায় যে বিখ্যাত দার্শনিক গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস দ্বারাই ইউরোপে স্বরলিপি প্রথা প্রথম সংস্থাপিত হয়। পোকক সাহেবের লেখা India in Greece নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে পিথাগোরস সাহেব ভারতবর্ষ থেকে বহুবিধ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই সকল বিষয় প্রবর্তন করেন। Barney সাহেব তাঁর বিখ্যাত History of Music গ্রন্থে বলেছেন—খৃঃ দশম শতাব্দীতে ওজ নামক একজন রোমীয় মনক কর্তৃক রৈখিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথম সৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বন্ধে লেখা আমাদের উপপাণ্ডব বিষয় নয়, অতএব আমরা আমাদের স্বরলিপি সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ করছি। অতীতে আমাদের কোন স্বরলিপি চিহ্ন ছিল না এরূপ নয়, তবে কোন স্মৃষ্টি সাংকেতিক চিহ্ন ছিল না বলেই আমাদের ধারণা। কিছুদিন আগে থেকে আমাদের দেশে এই বিষয়ে নানা গবেষণা চলছে। পণ্ডিতেরা এখন ভাষার বর্ণমালার মত উচ্চতর মানের কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে আমরা সেই কারণে আমাদের অধুনা প্রচলিত হরেক রকমের স্বরবিজ্ঞাসকে যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে

লিপিবদ্ধ করতে পারছি। আমাদের স্বরলিপিতে আমরা গানের চলাফেরা ও তার প্রকৃত কাঠামো পাই, কিন্তু স্বরলিপিকৃত গানের ভাব, স্বরের স্রুতির বাহার ও নানা টং-এর দোলনকে ধরতে পারি না। আমাদের গানে গায়কের নিজস্ব বা ব্যক্তির বিকাশের একটা সুযোগ আছে, যেটি কোন বিশেষ গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবহারে ফুটে ওঠে। গানের প্রতিটি স্বরের বল, প্রশ্বন, গমকভঙ্গী, কম্পন, মীড়, গীটকারী প্রভৃতির বিচিত্রতা, যা কোন একজন কুশলী শিল্পী তার গানে বা বাজনায়ে প্রকাশ করেন সেই স্বর-বৈচিত্র্য বুঝবার মত ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রকাশের যোগ্য স্বরলিপি আজও আমরা তৈরি করতে পারিনি। আমাদের গানকে স্বরলিপির যুগকালে বলি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় সঙ্গীতে স্বরগাথক (Composer)-এর স্বরসঙ্গতি (Composition) মতই গায়ক বা বাদককে গাইতে বা বাজাতে হয়, তাই তাঁদের গান বা বাদনভঙ্গিমা স্বরলিপি দেখে অনুধাবন করা কঠিন নয়। আমাদের সঙ্গীতের প্রতিটি স্বরবিজ্ঞানের বল, প্রশ্বন, স্বরের দোলন, মাত্রা বিভাগ প্রভৃতি বজায় রেখে সঠিক স্বরলিপি লেখা খুবই কঠিন। স্বরলিপি দেখে সম্ভবমত স্বরলিপিকৃত গান বা গানের সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা যাতে আমাদের হয় ও সাধারণভাবে সেটি পুনঃপ্রকাশ করতে পারি সেরকম একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি।

এইবার খৃষ্টপূর্ব কাল অর্থে বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত স্বরলিপির ধারাবাহিক ইতিহাস, যাতে সহজেই স্বরলিপি প্রথার ক্রমোন্নতির বিষয় ও কোন ধরনের স্বরলিপি কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি জানা যায় নিই লিখছি।

**খৃষ্টপূর্ব কাল :** সালতারিখের হিসাব ১৫০০ খৃঃ পূঃ ধরা যায়।

১। **লেখাভিত্তিক স্বরলিপি :** বেদের কালে ভাষা বর্ণের মাথার উপর, ও নাচে লম্বা ও তীর্থক রেখা ব্যবহার করে উদাত্তাদি স্বর বোঝান হত। খৃঃ পূঃ ১০০০-৭০০-র মাঝামাঝি সময়. **সংখ্যাভিত্তিক স্বরলিপি**—ভাষা বর্ণের মাথায় ১, ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে অছন্দাত্তাদি স্বর বোঝান হত। এবং সংখ্যার সঙ্গে (র) অক্ষর যুক্ত করে দীর্ঘ স্বায়ীভ্রও বোঝান হত। পরবর্তী কালে যখন প্রথমাদি স্বরের ব্যবহার আরম্ভ হয় তখন ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা স্বরগুলিকে প্রকাশ করা হত। সে সংখ্যা ভাষার মাথায় বা পাশে ব্যবহৃত হয়ে স্বরের স্থানিধ, দীর্ঘত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করত। বেদের কালে কোন স্বরলিপি চিহ্নটি আগে,

আর কোনটি পরে তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। আন্দাজমত একটিকে আগে ও অন্যটিকে পরে লেখা হয়েছে। সাম গানের বা বেদ গানের আগে মহেঞ্জোদাড়োর খননে আবিষ্কৃত নানা ভাস্কর্ষের মাঝে সঙ্গীতের উৎকর্ষতার নিদর্শন শেলেও আমরা স্বরলিপির সঙ্কেতের সন্ধান পাই না। এই শিল্পকলা প্রায় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগের অর্থাৎ বৈদিক যুগেরও আগে বলে অনেকের ধারণা।

### খৃষ্ট পশ্চাত্‌কাল :

১। **সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি :** প্রথম দেখা যায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে কিছু প্রাচীন, মতঙ্গের দ্বারা প্রচারিত। এতে স্বরাক্ষরের সাহায্যে অর্থাৎ স র গ ম প ধ ন-র সাহায্যে গান বা গত্ বোঝান হত। সা রা গা ইঃ লিখে দীর্ঘত্ব বা স্থায়ীত্ব বোঝান হত। মতঙ্গ প্রণীত বৃহদেদীতে মঙ্গ ও তার স্বর বোঝাবার কারণে কোন বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হত কিনা সেটি সঠিক ভাবে জানা যায় না। কারণ দুই একটি মঙ্গ চিহ্ন ছাড়া বৃহদেদীতে আব কোন চিহ্নই দেখা যায় না। বৈদিক যুগে সামবেদ প্রভৃতিতে যে সব গানের কথা জানা যায়, সে সব আজ লুপ্ত।

২। **অক্ষরচিহ্নযুক্ত সরগম স্বরলিপি :**—হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর পদ্ধতির প্রসঙ্গে আমরা কুদিমিয়ামালাইয়ের পাথরে খোদা স্বরলিপি অর্থে শিলালিপির কথা বলেছি। এর বয়স ৭০০ খৃঃ ধরা হয়। এখানে স র গ ম প্রভৃতির সঙ্গে আকার ইকার উকার লাগিয়ে প্রসৃত ও বিরক্ত স্বর প্রকাশ করার নমুনা দেখা গেলেও এটি সম্পূর্ণ নয়, কারণ তাল মাত্রা প্রভৃতির চিহ্ন এতে নাই।

৩। তেরশো খৃষ্টাব্দের অল্প কিছু আগে শাক্তদেবের আবিষ্কৃত উচ্চতর মানের স্বরলিপি আমরা দেখতে পাই। এটিও সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি। স, রি, গ, ম=লঘু স্বর, সা, রী, গা, মা=গুরু স্বর, স্বরের নীচে বিন্দুযুক্ত ( স ) মঙ্গ স্বর

ও স্বরের উপরে দাঁড়ি যুক্ত ( স ) চিহ্ন দ্বারা তার স্বর বোঝান হত। সরি ইত্যাদি জোড়া থাকলে লঘু মাত্রিক স্বর বোঝাত। স্বরের নিম্নে ভাষাক্ষর না থাকলে, যথা—রগ=ভাব্য বর্ণের অ-প্রয়োগ, বিলোপ বা টান। শাক্তদেবের স্বরলিপির তিনশো বছর আগেই তালের লঘু-গুরু মাত্রা বোঝাবার জন্ম অবশ্য। S O প্রভৃতি চিহ্নগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই রেখাদের মধ্যে আজ আমরা দ ও '।' বা ঋঙ্ রেখাটিকে দ ও মাত্রিক স্বরলিপিতে '৯' এই অবগ্রহটিকে ভাতখণ্ডজীর স্বরলিপিতে,

‘০’ শূন্য চিহ্নটিকে বিষুদিগম্বরজীর স্বরলিপিতে ও আকার মাত্রিকে দেখতে পাই। শাঙ্গদেবের কালে আমরা প্রকৃত বা বিকৃত স্বরের পৃথক চিহ্ন দেখতে পাই না।

৪। পনেরশো শতকে অর্থাৎ ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রাণা কুন্ড শাঙ্গদেবের অঙ্ককরণে প্রায় একই প্রকারের স্বরলিপি প্রকাশ করেন (সঙ্গীতরাজ—মহারাণা কুন্ড। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নেপাল রাজ্য সংস্কৃত গ্রন্থমালা—৫)

৫। সতেরো শতকে সোমনাথ রাগবিবোধে ( ১৬০২ খৃঃ ) বীণাবাতের বিষয়ে লিখতে গিয়ে কিছু অলংকার চিহ্ন যোগ করেন ( সু সু সু সু সু ) কিন্তু তবুও স্বরলিপি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। জনক মেল ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ উন্নত ধরণের কোন স্বরলিপি আমরা সে কালের কোন পুস্তকেই দেখতে পাই না। উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বাংলা দেশেই প্রথম বিশেষ ধরণের স্বরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলি জনক মেল প্রভৃতি ছাড়াই সম্পূর্ণ। নানা গ্রন্থ থেকে সাল তারিখ ও আবিষ্কারকর্তার নাম আমরা বেরূপ পেয়েছি সেইরূপই লিখছি।

৬। ১৮৫৮ সালে প্রথম তিন রেখার **দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি** ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ঐক্যতানে ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়।

৭। ১৮৬৭ খৃঃ—ষ্টাফ নোটেশন পাশ্চাত্যের অঙ্ককরণে রুক্ষধন বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত। ( বঙ্গৈকতান গ্রন্থ )

৮। ১৮৬৮ খৃঃ—তিন লাইনের **রৈখিক-দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি**—“ঐক্যতানিক স্বরলিপি”—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজনে সংগৃহিত )

৯। ১৮৬৯ খৃঃ—**কাঁষ বা তির্যক মাত্রিক স্বরলিপি**—“তত্ত্ববোধিনী”—ষিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর। তিন লাইন দণ্ডমাত্রিক পাকাপাকি ভাবে প্রকাশিত হল—( “সঙ্গীত মার”—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী )।

১০। ১৮৭২ খৃঃ—**সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি**—১=শুদ্ধ ম ( অর্থে কোমল ম ) ২=কড়ি ম ( অর্থে তীব্র ম ) ইত্যাদি পাশ্চাত্য ট্যাবলেচারের অঙ্ককরণে গঠিত। ( বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদর্শন )।

১১। ১৮৭৩ খৃঃ—**কর্ণাটিক সর্গম স্বরলিপিতে** অব্যবহৃত লঘু স্বরের পরিবর্তে কমার ( , ) ব্যবহার করা হয়েছিল। ( History of Indian Music by Sambomurthy ) এটিকে কর্ণাটকের প্রাচীন পদ্ধতির

মেল ভিত্তিক স্বরলিপিও বলা চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বরলিপির ভিত্তির উপর নির্ভর করেই এটি রচিত হয়েছিল। কমা (,) = এক অক্ষরকাল।

১২। ১৮৭৬ খৃঃ—পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি— অর্থাৎ এক লাইনের দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা স্মার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১৩। ১৮৭৭ খৃঃ—অমৃত সেনের ঘরাণাদ্বারেরা প্রকাশ করলেন হিন্দী সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি। ০ = ম, ১ = কড়ি ম-ইঃ।

১৪। ১৮৮০ খৃঃ—কষিমাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে আরও নতুন গবেষণা আরম্ভ করলেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ কষিমাত্রিককে বিবর্তিত করা হয়েছিল।

১৫। ১৮৮০ খৃঃ—শ্রীযুত আলাদারপুরে মারাঠি ভাষায় প্রথম স্বরলিপি প্রকাশ করলেন। (আলাদারপুরে স্বরশাস্ত্র)

১৬। ১৮৮৩-৮৫ খৃঃ—সার্গম স্বরলিপি অর্থাৎ আমরা যাকে বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপি বলে থাকি। ইংরাজি টনিক সলফা স্বরলিপির অনুকরণে শ্রীযুত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটিকে বাংলা টনিক সলফা বলা হয়। এই একই সময়ে আসাম গৌরীপুরের বাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ষ্ট্রাক্ নোটেসন কায়দার স্বরলিপি প্রচার করেন।

১৭। ১৮৮৫ খৃঃ—রেখামাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশিত হল। সা, রি, রে, গ, গা, ম, মা, পা, ধ, ধা, নি, নী,—বার অক্ষরের রেখা ও ড্যাস মাত্রিক স্বরলিপি বলা চলে। শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী (বালক ১১২২)

১৮। হিন্দী স্বরলিপি প্রকাশ করলেন দণ্ডমাত্রিকের অনুকরণে মৌলা বকস। ঘিষে খার ঘরানার ধারক। (স, ঋ, ঋ, গ, গ, ম, ম, প, দ, দ, নি, সা) (সঙ্গীত প্রকাশিকা)

১৯। ১৮৮৮ খৃঃ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংখ্যা মাত্রিক স্বরলিপির নবীন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এটিও দ্বাদশাক্ষর—স, রো, র, গো, গ, ম, মী, প, ধো, ধ,

নো, ন, স ; স বা র্গ = ১ মাত্র। (১২২৫,—ভারতী ও বালক)

২০। ১৮৯১ খৃঃ—প্রথম আকার মাত্রিক স্বরলিপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুর আবিষ্কার করেন। এই ধরণের স্বরলিপির ইনিই প্রথম প্রকাশক। স ল র  
ক গ ম ক্ষ প দ ধ ঞ ন ; স। = ১ মাত্রা, ঈ চড়া ইঃ।

২১। ১৮২২—২৩ খৃঃ—দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ ঘটলে  
পণ্ডিত বেঙ্কটেশ শাস্ত্রীর প্রকাশে। এদিকে উত্তর ভারতের বাংলাদেশে তখন  
হিতৈশ্বনাথ ঠাকুর ও সরলা দেবী সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে নূতনভাবে  
গবেষণা করছেন। ১৮২৩—আকারমাত্রিক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক  
বিবর্তিত হল। (তত্ত্ববোধিনী)

২২। ১৮২৭ খৃঃ—আকারমাত্রিক স্বরলিপিকে পাকা করে মাজালেন—  
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৩। ১৯০০—৪ খৃঃ—তিরুবোত্তিউরত্যাগৈয়র এবং স্বকারাম দক্ষিতার  
দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ সাধন করলেন। (History of  
Indian Music by Sambomorthy) ; = ২ অক্ষর কাল, তারার  
স্বরচিহ্নে \* বিন্দুচিহ্ন। মাত্রার অংশ বোঝাতে কষিচিহ্ন (—) এবং বিকৃত স্বর  
বোঝাতে ইউরোপীয় accidental #, b, ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন।

২৪। ১৯০৫ খৃঃ—মারাঠি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতগণ্ডের স্বরলিপি  
প্রকাশিত হল।

২৫। ১৯১০ খৃঃ—মারাঠি পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর কর্তৃক ত্রি-রেখা ভিত্তিক  
স্বরলিপি প্রকাশিত হল।

২৬। ১৯২৩ খৃঃ—বেনারসের পণ্ডিত স্বদর্শনাচার্যের দ্বারা হিন্দুস্থানী  
সংখ্যাস্বরিক স্বরলিপির ব্যবহার প্রচলিত হয়। (—সঙ্গীত স্বদর্শন, পণ্ডিত  
স্বদর্শনাচার্য—দেখুন)

২৭। ১৯৩১ খৃঃ—পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের ত্রি-রেখা স্বরলিপি—একরেখায়।  
(তাঁর ছাত্রদের দ্বারা বিবর্তিত)

২৮। ময়মনসিং গোঁরীপুরের জমিদার আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—  
স্বরদণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি—

২৯। সঙ্গীভাষাঙ্গী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল, মহাশয় রুত স্বরপদমাত্রিক  
স্বরলিপি—

৩০। ১৯৩৫—৩৭ খৃঃ কর্ণাটক কলামাত্রিক স্বরলিপি-র সরগম রোমান

অক্ষরে তৈরী, এক মাত্রার চিহ্ন নাই। s, r, g, m, etc ১ অক্ষরকাল  
S R G M etc. ২ অক্ষরকাল।

৩১। ১৯৪৪—৪৫ সঙ্গীতাদ্যাপক শ্রীমত্যািকঙ্কর বন্দ্যোপাশায় প্রবর্তিত  
লেখা-স্মারিক স্মরলিপি।

৩২। ১৯৫৩ খুঃ—ডাঃ বিমল রায়, এম. বি. প্রবর্তিত প্রতীক স্মরলিপি—  
১৯৫৩, “সঙ্গীত” মাসিক পত্রিকা হাথরাস।

বহু ব্লক ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় সকল প্রকার স্মরলিপির উদাহরণ  
দেওয়া সম্ভব হ'ল না বলে আমরা একান্ত চঃপিত।

আকারমাত্রিক, দণ্ডমাত্রিক ভাতখণ্ডেজী ও বিষ্ণুদিগম্বরজীর স্মরলিপির পূর্ণাঙ্গ  
পরিচয় পৃথক ভাবে দেওয়া হ'ল। উত্তর ভারতে বর্তমানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও  
বিষ্ণুদিগম্বরজী প্রবর্তিত স্মরলিপি প্রায় সর্বত্র চলছে। বাংলাদেশে আকারমাত্রিক  
প্রধান ও দণ্ডমাত্রিক স্মরলিপিই বেশী ব্যবহৃত হয় বলে এই চার প্রকারের স্মরলিপির  
চিহ্ন এখানে দেওয়া হ'ল।

(এই প্রবন্ধের অধিকাংশ পুস্তকই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও গ্রামনালা  
লাইব্রেরীর সৌজ্ঞে সংগৃহিত।) স্মরলিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখা মাসিক তৌর্ষত্রিকে  
শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। (তৌর্ষত্রিক)

### বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী প্রণীত হিন্দুস্থানী স্মরলিপি পদ্ধতি :—

স্মর স্মর : সা রে গ ম প ধ নি।

কোমল স্মর : রে গ ধ নি।

তীব্র স্মর : ( কড়ি ) ম।

উদারার স্মর : খাদের স্মর মঙ্গল সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি

মুদারার স্মর : মাঝের স্মর, মধ্য সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি কোমল  
চিহ্ন থাকে না।

তারার বা তার সপ্তক : চড়ার স্মর সা রে গ ম প ধ নি

এক মাত্রার এক একটি স্মর :—সা রে এইরূপে আলাদা ভাবে লিখতে হবে।

এক মাত্রায় একাধিক স্বর হলে একত্রে লিখতে হবে ও তলদেশে এই চিহ্ন দিতে হবে। যথা—দীর্ঘানিধনিধ - দীর্ঘ সারে সারেগম

এক স্বর একাধিক মাত্রা স্থায়ী হলে স্বরের পাশে ড্যাশ — চিহ্ন দিতে হবে। যথা, গ —, ম — —, প — — —

ক্রমান্বয়ে ২, ৩ ও ৪ মাত্রা বুঝাবে।

গানের কোন অক্ষরকে যদি একাধিক মাত্রা বোঝাতে হয়, তবে অক্ষরের পর s অবগ্রহ চিহ্ন দিতে হবে। যথা : যা s s s s। যা চার মাত্রাকাল স্থায়ী হবে।

মোং s s s। মোং ঠু দিকি মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হয়ে আরো ঠু কাল স্থায়ী হবে।

স্পর্শ স্বর, কণ্, বা ভূমিক। বোঝাতে হলে স্বরের পাশে উপরের দিকে কোন স্বরের কণ্ লাগে সেটি লিখতে হবে।

ম স র

যথা : গ গ. গ ইত্যাদি।

স্বরলিপির মাঝে বক্র বন্ধনী থাকলে, বন্ধনীর মাঝের স্বরটি তার আগের ও পরের স্বরের সঙ্গে যুক্তভাবে এক মাত্রার মধ্যে বলে বুঝতে হবে।

যথা : ( ম ) = গমপম ইত্যাদি।

মীড়ের ক্ষেত্রে স্বরের মাথায় এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

যথা : সাম, রেপ ই:

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ-বিভাগ দাঁড়ি দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হয়।

× দ্বারা সমের স্থান চিহ্নিত করা হয়। ফাঁকের ক্ষেত্রে ০ চিহ্ন দেওয়া হয়। সম চিহ্নকে প্রথম তাল ধরে ও ফাঁকটিকে তালের বিশ্রাম স্থান ধরে তালের প্রতিটি বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাল চিহ্নগুলি তালের বিভাগের প্রথম বোল বা প্রথম স্বরটির নিচে রাখা হয়। যথা :

মাত্রা সংখ্যা :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	S	ধি	ন্	ম	ক	ধি	ন্	ম	ক
×		০		২		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তি	টে	ক	তা	গ	দি	ষে	নে
		ে		ঙ		ণ	

**বিনুদ্দিগম্বর পালুস্বরজী প্রণীত স্বরলিপি পদ্ধতি ( পরিশোধিত )**

স্বর স্বর : সা রে গ ম প ধ নি

কোমল স্বর : রে গ্ ধ্ নি

তীব্র স্বর : ( কডি ) ম

উদারার স্বর : খাদের স্বর মন্ত্র সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি ।

মধ্য সপ্তক : সা রে গ ম প ধ নি । ( মাঝের স্বর )

তার সপ্তক : সা রে গ ম প ধ নি । ( চড়ার স্বর )

এক মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ চিহ্ন থাকে । সা রে ।

অর্ধমাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ০ চিহ্ন থাকবে । সা

সিকি মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ৷ চিহ্ন থাকবে । সা

ঠ মাত্রায় স্বরের নিম্নে এইরূপ ৡ চিহ্ন থাকবে । সা

কোন স্বর যদি ১ই মাত্রা কাল স্থায়ী হয় তবে সেই স্বরের নিচে ড্যাশ ও পাশে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয় । যথা, সা = ১ই মাত্রা ।

কোন স্বরের পাশে s অবগ্রহ চিহ্ন ও গানের বাণীর পাশে “o” শূন্য চিহ্ন থাকলে যথাক্রমে সেই স্বরের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব ও বাণী অর্থে অক্ষরের স্থায়ীত্বকাল বোঝায় । যথা গ ম র s s s তোমারি o o o ।

কণ্ বা স্পর্শ স্বর বুঝাতে হলে স্বরের পাশে উপর দিকে স্পর্শ স্বর লেখা হয় ।  
 র ম  
 যথা : সা গ ইত্যাদি

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ বিভাগ, অর্থে ( বার ) তাল বিভাজক বা তাল-নিয়ামক রেখা অর্থাৎ দাঁড়ি দিয়ে তাল ভেদ বুঝান হয় ।

সমের চিহ্নে “১” সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ফাঁকের বেলায় ষোগ চিহ্ন

+ ব্যবহার করা হয়। সম ও কঁক চিহ্ন ছাড়া তালের অগ্রাঙ্গ ভাগগুলিকে মাত্রার সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

	১	২	৩	৪	৫	৬
মাত্রা সংখ্যা যথা :	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	তিন্	না
তাল বিভাগ মাত্রা	—	—	০০	~~~~~	—	—
	১		৩		৫	

৭	৮	৯	১০	১১	১২
কং	তা	ধাগে	তেরেকেটে	ধি	না
—	—	০০	৩৩৩৩	—	—
+		২		১১	

### আকারমাত্রিক

শুদ্ধ স্বর : স র গ ম প ধ ন।

কোমল স্বর : র=ঋ গ=ঞ্জ ধ=দ, ন=ঞ

কড়ি স্বর বা তীব্র : ম=ক্ষ

উদারার স্বর চিহ্ন—স্বরের নীচে হসন্ত যথা : স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্

মুদারার স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা : স র গ ম প ধ ন।

হারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ্। যথা : স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্

এক মাত্রার চিহ্ন ( আকার চিহ্ন ) যথা : ‘।’

যথা—সা = ১ মাত্রা।

চুটি অথবা ততোধিক স্বর এক মাত্রায় হলে যথা : রগা = ১ মাত্রা।

মপধা = ১ মাত্রা।

মপধনা = ১ মাত্রা।

চুটি বা ততোধিক স্বর আধ মাত্রায় হলে যথা—সর = ½ মাত্রা।

সরগম = ½ মাত্রা বুঝায় ইত্যাদি।

দেড় মাত্রার চিহ্ন ( ½ ) যথা—সা : = ½ মাত্রা, সা : + গ : ½ মাত্রা দিলে দুই মাত্রা বুঝায়।

কণ্ স্পর্শ বা ভ্রমিকা : মূল স্বরের উপরে বাঁপাশে ছোট আকারে স্পর্শ স্বরটি লেখা হয়।

যথা—গা স্তা ইত্যাদি।

মৌড়ি চিহ্ন—স্বরের নিচে বসে। যথা—সামা, সাপা, সাধা।

বিরামের চিহ্ন ও মাত্রার চিহ্ন একই স্বরের গায়ে লেগে না থাকলেও হাইফেন বজিত হলে সেটি হবে বিরাম= †।

স্বরের মাথায় জোড়া দাঁড়ি দেখলে বুঝতে হবে এখানে থেমে গানের অগ্র কলি ধরতে হবে অথবা গানটি শেষ হবে। যথা : গা।

পুনরাবৃত্তির চিহ্নে গুন্ফ বন্ধনী থাকে। যথা—{স র গ ম} এই অংশ দুইবার গাইতে হবে।

পুনরাবৃত্তির মধ্যে বক্র বন্ধনী চিহ্ন থাকলে বন্ধনী মধ্যস্থিত স্বরগুলি পুনরাবৃত্তি-কালে বাদ দিতে হবে।

যথা :—{র গ ম (প ধ)} ন ধ এতে গুন্ফ বন্ধনীস্থিত অংশটুকু দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করার সময় অর্থাৎ (প ধ) অংশটুকু বাদ দিয়ে একেবারে ন ধ অংশটি ধরতে হবে।

সরল বন্ধনী দিয়ে কোন স্বরের পরিবর্তন বোঝান হয়। এই পরিবর্তিত স্বর পূর্ব স্বরের মাথার উপর ত্রাকোটের মধ্যে রাখা হয়।

যথা—[সা রা গা মা]<sup>[মপা]</sup> অর্থাৎ সা রা গা মা | গা রা গা মপা |

আবৃত্তির শেষে একটি দণ্ড রাখা হয় I, প্রত্যেক কলির শেষে জোড়া II (দণ্ড) দাঁড়ি বসে। কলির শেষে আস্থায়ীতে ফিরতে হলে আস্থায়ীর যেখান থেকে ধরতে হবে তার আগেও এই যুগল দাঁড়ি অর্থে দণ্ড চিহ্ন বসান হয়। কোন স্বরের মাথায় বিন্দু চিহ্ন থাকলে স্বরগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথক বোঝাতে উচ্চারণ করতে হবে।

যথা—সা̇ রা̇ গা̇ মা̇।

কোন মূল স্বরের রেশ যখন অগ্র স্বরে এসে দাঁড়ায় তখন শেষের স্বরটি ক্ষুদ্রাক্ষরে মূল স্বরের ডান দিকের উপরে লেখা হয়। যথা—ধ<sup>ম</sup>

স্বরের নিচে গানের বাণী অর্থে অক্ষর না থাকলে স্বরের মাঝে হাইফেন বসে ও গানের লাইনে অক্ষর স্থানে শূণ্য বসান হয়। যথা—

পধা পমা গরা -গরা সা সা -া সা  
দ.১ র০ শ০ ০০ ন আ ০ শে

যদি স্বরের নিচে গানের হসন্ত যুক্ত অক্ষর থাকে তবে স্বরের পরিবর্তে মাত্রা বসান হয়।

যথা—রা -া -া সা

চ ৩ ন ত্র

তালের চিহ্ন :

স্বরের উপর সমের চিহ্নে ১, ২, প্রভৃতি সংখ্যার মাথায় রেফ্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—১; ফাঁক বা খালি চিহ্নে ০ শূন্য ও অগ্ৰাণ্ড তাল চিহ্নে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

### দণ্ডমাত্রিক

শুদ্ধ সাতটি স্বর—স ঋ গ ম প ধ নি।

উদারার স্বরের চিহ্ন স্বরের নিচে বিন্দু—নি ঋ প ম গ ঋ স।

মুদারার স্বর সহজ কোন চিহ্ন নাই—স ঋ গ ম প ধ নি।

তারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথায় উপর বিন্দু—স ঋ গ ম প ধ নি।

কোমল স্বরের চিহ্ন ত্রিকোণ। স্বরের মাথায় উপর এটি বসান হয়। যথা—

△ △ △ △ এই চারটি স্বরই কোমল। কোমল ঋ, অতি কোমল ঋ

স্বরের মাথায় পতাকা চিহ্ন দিয়ে কড়ি বা তীব্র স্বরকে বোঝান হয়। যথা—ম স্বরের স্থায়িত্ব বুঝানর কারণে স্বরের মাথায় দণ্ড চিহ্ন দ্বারা মাত্রা নির্দিষ্ট করা

হয়। যথা ১ মাত্রা = স, ২ মাত্রা = স, ৩ মাত্রা = স, ৪ মাত্রা = স ইত্যাদি।

অর্দ্ধ মাত্রায় স্বরের মাথায় চন্দ্র চিহ্ন = স

সিকি মাত্রায় স্বরের মাথায় ডমরু চিহ্ন = স

এক অষ্টমাংশ ট্র মাত্রা বুঝাতে স্বরের মাথায় নেত্র চিহ্ন বসান হয়। যথা : স

স্বর কম্পন অর্থে গমক বুঝাতে স্বরের মাথায় গজকুম্ভ চিহ্ন এইরূপ। যথা : স

যতবার গমক হইবে স্বরের মাথায় ততগুলি চিহ্ন বসিবে। যথা : স মানে ২ বার গমক।

স্বরের নিচে সরল রেখা দিলে আশ বুঝায়। যথা—রগমপ

স্বরের নিচে দুইটি সরল রেখা দিলে মীড় বুঝায়। যথা : রম

কণ্ বা ভূষিকা আকার মাত্রিকের মতনই। যথা : গ, ম ই:

গান বা গতের শেষে যুগল ছেদ চিহ্ন রাখা হয়।

মুর্ছনার ক্ষেত্রে তরঙ্গিত রেখা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা সা ঋ  
যেখানে বিলম্বিত গতিতে মুর্ছনা যায় সেখানে বিন্দু রেখা ব্যবহৃত হয়।

যথা : ঋ গ  
.....

ছেড় বাদনে ধমুচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : 

's' অবগ্রহ চিহ্নটি যতি বা বিরাম চিহ্ন। স্বরের উপর এই চিহ্ন থাকলে চিহ্নিত স্থানে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হয়।

আকার মাত্রিকের মত এখানেও দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাৎ গুফ বন্ধনীর (2nd Bracket) মাঝের স্বরগুলি দুইবার গাইতে হয়। যথা : { গ ম প দ }

দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে প্রথম বন্ধনী (1st Bracket) থাকলে প্রথম বন্ধনীর মাঝের স্বরগুলি দ্বিতীয়বার গাইবার সময় বাদ দিতে হবে।

প্রথমে তাল চিহ্নে মোট তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হত।

তালের চিহ্ন :

+ যোগ চিহ্ন=সমের চিহ্ন

o শূন্য চিহ্ন=ফাঁকের চিহ্ন

১=সম ও ফাঁক ছাড়া প্রতিটি তালের ক্ষেত্রেই তাল বিভাগের প্রথম স্বরের বা প্রথম মাত্রার উপর এই ১ সংখ্যাটি লেখা হত। বর্তমানে সম ও ফাঁক চিহ্ন ছাড়া প্রতিটি তালের কয়টি করিয়া বিভাগ আছে তাহা নির্দিষ্ট করার কারণে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যা, তাল বিভাজক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা : ১=প্রথম তাল, ২=দ্বিতীয় তাল, ৩=তৃতীয় তাল, ৪=চতুর্থ তাল ইত্যাদি।

প্রতিটি তালের বিভাগের মাঝে ( Bar ) দাঁড়ি অর্থে তাল বিভাজক ( তাল নিয়ামক ) রেখা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামের তাল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদের সমষ্টিতে বিভক্ত থাকে। যথা :

তিন তাল :—

+            |            ৩            |            ০            |            ১            ||

ঝাঁপতাল :—

+            |            ৩            |            ০            |            ১            ||

## অনিবন্ধ গীত

তালবন্ধন-মুক্ত রাগ আলাপ অথবা গীতকেই **অনিবন্ধ গীত** বলা হয়।

(ক) **আলাপ** : আলাপ শব্দটির অর্থ পরিচয় বা জানাশুনা। রাগের আলাপের ক্ষেত্রেও অর্থ ঠিক একই। রাগের আলাপে আমরা প্রকাশ করি রাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতটা। কোন রাগ সম্বন্ধে জানাশুনা যত বেশী থাকবে, সেই রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান যত গভীর হবে ততই সেই রাগকে আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করতে পারব। রাগের আলাপ পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। একটি রাগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় সহকারে তাকে বিশেষভাবে চর্চা করতে পারলে তবেই সেই রাগের স্তূষ্ট আলাপ করা সম্ভব হয়।

আলাপের কায়দায় প্রাচীন পন্থার। রূপদাঙ্গীয় আলাপই পছন্দ করেন। আলাপে ফিকরাবন্দীর কায়দা, মুকীর ব্যবহার, ঠুংরীর চাল, বা চটল তান প্রভৃতির ব্যবহার উচিৎ বলে বিবেচনা করেন না। কিন্তু আজকের দিনের আলাপে এসব নিয়ম সঠিক ভাবে মেনে চলা হয় না। অবশ্য রূপদাঙ্গীয়কদের মধ্যে অনেকেই এখনও এ নিয়ম মেনে চলেন। অধিকাংশ যন্ত্রীরাই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে থাকেন। যন্ত্রের খাস (অর্থে দম) কম বলে অনেকেই আলাপে স্বরের দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতি বিশেষ খেঁচা না দিয়ে মাথুয়ের কারণে আলাপে নানা চটল অলংকার ব্যবহার করেন, ও জোড়ে এসে তাঁনের ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরাও গান আরম্ভ করার পূর্বে অল্প বিস্তার চটলাঙ্গের আলাপ করে থাকেন। খেয়ালীরা তাঁদের টিমা গানে সুর বিস্তার জুড়ে রাগ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় দেন ও নানা অলংকারে রাগটিকে মধুর ভঙ্গিমায় ভরিয়ে তোলেন। খেয়াল গানে গানের আগে আলাপের প্রয়োজন তাই অল্প। আলাপের প্রথম দিকে মুকী, ফিকরাবন্দীর কায়দা, চটল তান প্রভৃতি কোন কোন মতে দৃশ্য হলেও যন্ত্রের আলাপে সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণে আজকের দিনের যন্ত্রীরা অনেকেই এগুলির ব্যবহার করে থাকেন। আলাপে এগুলির ব্যবহার প্রচলিত হলেও এদের ব্যবহার সীমিত থাকাই যুক্তিসঙ্গত। কাল-বিবর্তনে নানা পরিবর্তন আসে, তাকে মেনে নেওয়া স্বাভাবিক। পরিবর্তনের মাঝেই নৃতনের আগমন ঘটে সেটি ঠিক তবে

পরিবর্তনের স্বযোগে যথেষ্টাচার না ঘটে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথেষ্টাচার নিন্দনীয়।

### আলাপের অঙ্গ :

(১) **স্বায়ী :** বর্তমানে আলাপ বিলম্বিত লয়ে আরম্ভ করা হয়। সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের ষড়্জ অথবা রাগ প্রকাশক কোন একটি স্বর বা বাদী স্বর থেকে আরম্ভ করা হয়। আলাপের প্রথম অংশ অর্থে স্বায়ী বিভাগ বিলম্বিত রাখা হয় এবং মূদারার “স” স্বর থেকে উদারার “ম” “প” পর্যন্ত গিয়ে এবং রাগ বিশেষে মূদারার “ম” “প” বা “ন” অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে তারার “স” স্বরটি পর্যন্ত পৌঁছে আবার মূদারার “স” স্বরে ফিরে এসে স্বায়ী শেষ করা হয়। বলা বাহুল্য আলাপের প্রত্যেক কলির শেষে মুখড়া বাজিয়ে কলিটি শেষ করা হয়।

(২) **অস্তুরা :** মূদারার “ম” বা “প” স্বর থেকে অস্তুরা আরম্ভ করা হয় এবং রাগ বিশেষে তারার “র” “গ” “ম” “প” প্রভৃতি স্বরে পৌঁছে তারার “স” বা মূদারার “ন” স্বরের উপর এসে দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে নানা স্বর ঘুরে মূদারার “স” স্বরে ফিরে এসে মুখড়া বাজিয়ে অস্তুরা শেষ করা হয়।

(৩) **সঞ্চারী বা ভোগ :** অস্তুরার পর সঞ্চারী হবে না ভোগাভোগ হবে এসব নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। ভোগ কথাটির অর্থ বিস্তার করা। এবং সঞ্চারীর অর্থ গমনশীল কাজেই ভোগ বা আভোগ কথাটি অধিকতর প্রয়োজ্য বলে মনে হয়। যাই হোক এখান থেকেই আলাপের লয় দ্রুত হতে থাকে, গমক ও নানা অলংকারের ব্যবহারে, উদারার ও মূদারার স্বর সংযোগ ও স্বরবৈচিত্র্য প্রদর্শনে রাগটিকে প্রকাশ করা হয়। আবার একসঙ্গে রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রদর্শন করে তিন গ্রামে সংযোগ অলংকারের প্রয়োগ-চাতুর্থে, তিন গ্রামের স্বরবৈচিত্র্য দেখান হয়ে থাকে ও পরে মূদারার “স”-এ ফিরে এসে মুখড়া বাজিয়ে সঞ্চারী বা ভোগ শেষ করা হয়। নামভেদ থাকলেও উভয় তুকের কাজ একই ধরণের।

(৪) **আভোগ বা মুক্তায়ী :** টিমা আলাপের শেষ অংশ। এই অংশে রাগটির অলংকৃত রূপ তারার সপ্তক থেকে ধীরে ধীরে এক একটি স্বরে স্থিত হয়ে অবরোহী স্বরের সংযোগে মূদারার দিকে বিস্তৃত হয়।

(৫) **জোড় :** এবার জোড় বিস্তার আরম্ভ হয়, এখানে আলাপের লয় দ্রুততর হতে থাকে। এখানে স্বায়ী অস্তুরা মিলিয়ে জোড় বাজান হয় আবার

স্বনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্থায়ী জোড় ও অন্তরার জোড় পৃথক ভাবেও দেখান হয়। জোড় শব্দটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না। মধ্যলয়ের সঙ্গে দ্রুতলয়ের সংযোগ ঘটায় বলে জোড় বা স্থায়ী ও অন্তরা বিভাগের জুড়ি হিসাবে বাজান হয় বলে জোড় অথবা জোড়া জোড়া স্বর বাজানর কারণে জোড় সেটি বলা শক্ত। মধ্য জোড়ের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা গ্রামের স্বরের ব্যবহার অতি অল্প। সাধারণতঃ মুদারার ও উদারার স্বর বিস্তারেই আবদ্ধ। জোড়ের সঙ্গে কিছু অলংকারও মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হয় তবে মীড়ের কাজ এখান থেকেই মিটে যায়। এটিকে আমরা মধ্য জোড় বলি। মধ্য জোড় সাধারণতঃ মুদারার মধ্যস্থান থেকে আরম্ভ করা হয়, অনেকে উদারার স্বর থেকে মধ্য জোড় আরম্ভ করেন। মধ্য জোড়ের পর আসে দ্রুত জোড়।

**দ্রুত জোড় :** সাধারণতঃ পঞ্চম থেকে আরম্ভ করা হয় ও পরে তারার স্বরে বিস্তার চলতে থাকে। রাগ বিশেষে এসবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জোড় শেষে দ্রুতলয়ে মুখড়া বাজিয়ে মুদারার “স”-এ এসে জোড় শেষ করা হয়। গানের আলাপ এখানেই প্রায় শেষ হয় এবং যন্ত্রের দ্রুততম কাজগুলি আরম্ভ হয়। গায়কেরাও অনেকে যন্ত্রের অঙ্করণে কণ্ঠ স্বরের ব্যবহারে নানা ছন্দে তেলনার বোলে অতিদ্রুত কাজ দেখিয়ে আলাপ শেষ করেন।

**ঝঙ্কার, ঝার বা ঝালা :** জোড়ের পর আসে ঝালার কাজ। চিকারীর ভাবে ঘা দিয়ে নানা ছন্দে ঝালা চলতে থাকে। ঝালার নানা প্রকার ভেদ রয়েছে। গুণী শিল্পীদের বাজনা শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। নানা ছন্দ দিয়ে ঝালার শেষ দিকে বিভিন্ন বোল বাণীর ব্যবহারে লড়ি, লড়-গুথা ও লড়ন্ত প্রভৃতি ঝালার সঙ্গে বাজিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। ঝালার সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গতে অনেকে ভারপন্ন বাজিয়ে আলাপ শেষ করেন।

### (খ) আলাপ প্রাচীন প্রকার।

**প্রাচীন স্বস্থান ও স্থাপনামুক্ত আলাপ :** বর্তমান আলাপে আমরা চারটি তুক দেখতে পাই। প্রাচীন কালের স্বস্থান আলাপেও চারটি বিশেষ স্থান থেকে আলাপের পদ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। তখনকার দিনে কঠিন ভাবে এই সব নিয়ম পালন করে চলা হত। এই চারটি স্থানের নাম ছিল (১) মুখচাল, (২) দ্বার্দ, (৩) অর্ধস্থিত, (৪) দ্বিগুণ।

(১) মুখচাল বা স্থায়-স্থান : এই স্থায় হল রাগের বাদীস্বরযুক্ত স্বরগুচ্ছ, এবং বাদীস্বর থেকেই আলাপ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। বর্তমানেও অনেকে বাদীস্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করে থাকেন। বাদীস্বর থেকে সংবাদী স্বর পর্যন্ত মুখচালের বিস্তার সীমিত থাকত।

(২) দ্ব্যর্থ স্বর : দ্ব্যর্থ স্বরটি ছিল সংবাদী স্বরের মত। এই স্বরটি স্থায়ের চতুর্থ স্থানস্থিত স্বর। দ্বিতীয় ভাগের আলাপ সেইভাবে মঙ্গ্র সপ্তকের বাদীর হিসাবে চতুর্থ স্বর থেকে মধ্য সপ্তকের সম্বাদী অর্থে বাদীর চতুর্থ স্বর পর্যন্ত বিস্তারিত হত।

(৩) অর্ধস্থিত স্বর : তৃতীয় ভাগের আলাপে অর্ধস্থিত স্বরগুলিও ব্যবহৃত হত। এই অর্ধস্থিত স্বর বলতে দ্ব্যর্থ ও দ্বিগুণ স্বরের মাঝের স্বরগুলিকে বোঝাত। (যেমন বাদী স্বর 'স' হলে তার অর্ধ স্বর 'প' থেকে 'ন')।

(৪) দ্বিগুণ স্বর : দ্বিগুণ স্বর অর্থে বাদীর অষ্টম স্বর অর্থাৎ দ্বিত্ব স্বর। অতএব দ্বিগুণ স্বর অর্থে সাধারণতঃ চড়ার স্বরকেই বোঝায়। তৃতীয় ভাগের আলাপ তাই বাদীর অষ্টম স্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করার রীতি ছিল।

(গ) আলাপ : রামপুরের স্বর্গীয় উস্তাদ ছন্মন খাঁ সাহেবের মতানুযায়ী আধুনিক আলাপের প্রকারভেদ। এঁদের ঘরে আলাপ চার ভাগে বিভক্ত।

১. রাগ আলাপ : প্রথমেই রাগের গ্রহ স্বর থেকে আরম্ভ করা নিয়ম। গ্রহ অর্থে বাদী স্বরটির বহুল প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে বাদী স্বরের সঙ্গে অগ্রাগ্র স্বরগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে সব সময় রাগের আবির্ভাব প্রকাশিত থাকে। এইভাবে রাগকে আবির্ভাবযুক্ত রেখে এক একটি তুকে ভাগ করে আলাপ করা হয়। স্থায়ী তুকে তিন চার আবৃত্তিতে রাগের স্থায়ী শেষ করে, পরে অন্তরা দেখান হয়। অন্তরার পর আসা হয় সঞ্চারীতে; এটিও দু-তিন আবৃত্তিতে শেষ করে আভোগে আসা হয়। দু-এক আবৃত্তি আভোগ দেখিয়ে আলাপ শেষ করা হয়।

২. রূপ-আলাপ : রূপ-আলাপে এক আবৃত্তি স্থায়ী ও এক আবৃত্তি অন্তরা দেখিয়ে, সঞ্চারী ও আভোগ পর পর এক এক আবৃত্তি দেখিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। কেবলমাত্র সাধারণভাবে রাগের রূপ দেখান হয় বলেই এঁদের ঘরে এই ধরনের আলাপকে রূপ-আলাপ বলা হয়।

৩. সম-আলাপ : এটি বিস্তৃত আকারের আলাপ। রাগ-আলাপের

মকল কাজ বিস্তারিত ভাবে এবং তার থেকে আরও কয়েক আবৃত্তি বেশী করে দেখান হয়। এর পর নানা অলংকার ও জোড় দেখান হয়। অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার তুকের কাজ বিস্তৃতভাবে দেখাবার পর জোড়ে এসে আলাপ শেষ করা হয়।

৪। **থাই-আলাপ** : এই আলাপ প্রাচীন স্বস্থান ও স্থাপনায়ুক্ত রাগ-আলাপের মতই।

(ঘ) **সেনী ঘরানার আলাপ** : বর্তমানে সেনী ঘরাণাতেও তিন চার রকমের আলাপের পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলাপ বিস্তারের কায়দার প্রভেদের কারণেই এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

১। **বিস্তার আলাপ** : এই ধরনের আলাপকে **রাগ-আলাপও** বলা হয়। এই আলাপে প্রথম থেকেই রাগ প্রকাশক সমস্ত স্বরের সাহায্যে রাগের রূপটি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোন স্বরকে কেন্দ্র করে এতে রাগের বাড়ত করা হয় না। অথবা কোন স্বর বা স্বরগুচ্ছের গভী বেঁধে রাগের বিস্তার করা হয় না। রাগের বিস্তারে গমক, মীড়, আশ প্রভৃতি অলংকারের সামান্য ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন রাগ-আলাপ পদ্ধতির সঙ্গে সঠিক মিল নাই। সেনী ঘরের আওচার আলাপ থেকে এটি বিস্তৃত বলেই এর নাম বিস্তার আলাপ রাখা হয়েছে।

২। **আওচার আলাপ** : এই ধরনের আলাপকে **সম-আলাপও** বলা হয়। এই আলাপে বিস্তারআলাপের মত রাগের বিস্তৃতি বা বাড়ত দেখান হয় না। কেবলমাত্র রাগের রূপ প্রকাশক বিছাসে রাগটিকে প্রকটিত করা হয়। এটি পরিপূর্ণতার আলাপ নয়। চলতি কথায় খোঁটা আলাপ বলা হয়। কণ্ঠে কোন গান বা যন্ত্রে কোন গতকারী করার আগে এই ধরনের আলাপ করে সামান্য ভাবে রাগের পরিচয় দেওয়া হয়।

৩। **কয়েদ-আলাপ** : কৈদ শব্দের অর্থ কারারাস বা বন্দন। আলাপের ক্ষেত্রে এটি স্বর-বন্দন অর্থাৎ কোন স্বরকে কেন্দ্র করে রাগের আলাপ আরম্ভ করা হয়। সাধারণতঃ “স” অথবা বাদী স্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপের বাড়ত করা হয়। কয়েদ আলাপের বিস্তারে প্রথমে ছোট ছোট স্বরগুচ্ছের গভী থেকে ক্রমাগত বড় বড় বিস্তারে কেন্দ্রীয় স্বরটিকে হৃদয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা এর অপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন কালের রূপক-আলাপের সঙ্গে অনেকে এ জাতীয় আলাপের তুলনা করে থাকেন, এবং সেই কারণে একে **রূপক-আলাপও** বলা হয়।

৪। **বন্ধান-আলাপ :** বন্ধান আলাপকে বাঁধি আলাপ বলা হয়। বন্ধান শব্দটির অর্থ বাঁধা। তাই বাঁধি স্বরবিস্তার দিয়ে এই আলাপে রাগের রূপকে প্রকাশ করা হয়। এই বাঁধি তান দিয়ে রাগের রূপপ্রকাশ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিবিস্তারেই রাগটিকে চেনা যায়, এবং এইভাবে বাঁধি তান বিস্তারের পরিধি বাড়িয়ে ঘরাণাগত বন্দেজী বাঁধি তানের কায়দায় রাগের আলাপ করা হয়।

### (৬) সঙ্গীত রত্নাকর মতে প্রাচীন আলাপের নিয়ম।

**রাগালাপ :** যে আলাপে শাস্ত্রোক্ত রাগের দশটি নিয়মকে মেনে রাগকে বিস্তারিত করা হত, আগের দিনে তাকেই রাগালাপ বলা হত। এই আলাপে স্কুরিত, কম্পিত প্রভৃতি গমকের ব্যবহারও ছিল। রাগের স্থূল আলাপকেই বলা হত রাগালাপ। (রাগের দশবিধ নিয়ম দেখুন।)

**রূপকআলাপ :** এই আলাপে রাগের রূপকে ছোট ছোট ভাগ করে দেখান হত। রাগালাপের নিয়মেই আলাপ চলতো তবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রাগের রূপ প্রকাশ করা হত।

**আলপ্তি :** একাদশ শতাব্দিতে সোমেশ্বর লিখিত মানসোল্লাস নামক গ্রন্থে আমরা আলপ্তির কথা পাই। সঙ্গীত রত্নাকরে বিস্তৃত বিবরণ তেরশো শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। রাগকে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হত এই আলপ্তি আলাপে। নানাভাবে বিস্তার করে রাগের বৈচিত্র্য দেখান হত। রাগালাপ ও রূপকআলাপের সমস্ত নিয়ম পালন করার পর আরও বিস্তৃতভাবে রাগকে প্রকাশ করা হত এই আলাপে।

(চ) নগমাতে আসরফীর লেখক মহম্মদ রজ্জা তাঁর গ্রন্থে চার প্রকার তানের অর্থাৎ বিস্তারের কথা লিখেছেন। (১) **অস্থাই বরণ :** 'দ' থেকে আরম্ভ করে খাদে গিয়ে মাবেক মধ্যম পঞ্চম পর্য্যন্ত নিয়ে স্থায়ী মত, একটি চক্র তৈরী করা। (২) **সঙ্কাই বরণ :** অন্তরার মত তারার স পর্য্যন্ত যায়। (৩) **আভোগ বরণ :** খাদ মাবেক মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মাবেক ম, প, ধ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করার নিয়ম। (৪) **ঝুলতি বরণ :** যে কোন স্বর থেকে বিস্তার আরম্ভ করা হয়। প্রাচীন আলাপের ক্ষেত্রেও এই বিভাগ ব্যবহৃত হয়েছে এবং নগমাতের লেখক হিন্দুদের প্রাচীন স্বস্থান আলাপের বিভাগই এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

## নিবন্ধ গান

বিভিন্ন শৈলীর বা প্রকারের মাত্রায়ুক্ত ছন্দবদ্ধ তাল লয়ের গানকেই **নিবন্ধ গীত** বলা হয়।

প্রাচীন কালের তালবদ্ধ গীতে আমরা প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক এবং সালগ-সুড় প্রভৃতি প্রবন্ধের নানা বিভাগের বিষয় জানতে পারি। প্রবন্ধ গীতে পাঁচটি তুকের নাম পাই। তুক গুলিকে বলা হত ধাতু। পরিভাষা পরিচয়ে ধাতুর বিভাগের কথা বলা হয় নি। ধাতু বিভাগে পাঁচটি ধাতুর নাম **উদগ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তর ও আভোগ**।

(১) উদগ্রাহ : এটি রাগের প্রথম অংশ বিশেষ। রাগটি কিরূপ সেটি বোঝা যায় এইরূপ প্রথম অংশকেই উদগ্রাহ বলা হয়।

(২) ধ্রুব : গানের ঢুটি চরণ অর্থে পদ থাকলে সাধারণভাবে দ্বিতীয় চরণটিকে বলা হয় ধ্রুব। ধ্রুব, উদগ্রাহ, স্থায় এই তিনটি শব্দ প্রায় একই অর্থবাচক। যদিও স্থায় বলতে বর্ণ বিশেষকেও বুঝায়।

(৩) মেলাপক : উদগ্রাহ ও ধ্রুবকে মিলিত করার কারণে এর নাম মেলাপক। এটি রাগের খাদের অংশ থেকে মধ্য সপ্তকের বাদীস্বর পর্যন্ত আসে এবং বাদী স্বরে এসেই এটি শেষ হয়।

(৪) অন্তর : সালগ-সুড় প্রবন্ধে এটির ব্যবহার ছিল।

(৫) আভোগ : গানের শেষ চরণ বা অংশই আভোগ নামে পরিচিত ছিল এখন বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন গীত-শৈলীর কথাই আসে।

## ধ্রুপদ

পদ্ম কোরকের প্রতিটি উল্লসিত পাপড়ির বিকাশে পদ্মটি যেমন ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্য স্বেমায় ভরে ওঠে, ধ্রুপদে রাগের প্রতিটি বিস্তারিত কলিতে তেমনি ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে তার রাগরূপ। ধ্রুপদ ধীরগদী, খেয়ালের মত জোয়ারের বেগ বা ঠুংরীর মত চপলতা তাতে নেই। নানা কায়দার তান, টঙ্গার দানা, বা ঠুংরীর মিশালি মসলা তার নেই। ধ্রুপদ ধীর গভীর—ধ্যানস্তিমিত, অচঞ্চল, অন্তর্মুখী সম্পদে ভরা;—শাস্ত, সংযত, সংগীতের সমাহিত মূর্তি। এ এক বিরাট শৌধ, যার অন্তঃপুর থেকে জন্ম নিয়েছে বহুপ্রকারের গীত-শৈলী।

ধ্রুপদের আর একটি নাম ধ্রুবক। জানা যায় ধ্রুব-প্রবন্ধ থেকেই ধ্রুপদ এসেছে। সঙ্গীতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা সালগম্বুড় প্রবন্ধের নাম পাই। প্রায় আটশো বছর আগে এই সালগম্বুড় প্রবন্ধ প্রচারিত ছিল এবং ধ্রুব-প্রবন্ধ সালগম্বুড় প্রবন্ধের প্রধান বিভাগরূপেই বিরাজিত হত। সালগম্বুড় প্রবন্ধের বিশেষ কায়দা অবলম্বন করে ধ্রুব-প্রবন্ধ নাম ভেদে ধ্রুবক, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ নামে জন্মগ্রহণ করে। তেরশো খৃষ্টাব্দে বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদকে পাচ্ছি না। তখন ছিল নিবন্ধ গীত যার মধ্যে প্রবন্ধ রূপক প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পনেরশো খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ধ্রুপদ একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে বলে জানা যায়। এই সময় থেকে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কিছু রদবদল ঘটে থাকে ; এর তুক ও তালের নামেরও পরিবর্তন ঘটে এবং চারণ-গীতি ধ্রুবপদার কিছু কায়দা সে গ্রহণ করে।

অনেকের মতে গোয়ালীয়ারের রাজা মানসিংহ তোমরই ধ্রুবপদের অর্থাৎ ধ্রুপদের স্রষ্টা। ইনি ধ্রুপদের ভাষা চলিত শব্দে ও সরল বাক্যে রচনা করে এর প্রচার ও উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন।

শ্রীযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের লেখা “মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা” বইটিতে (গীত সম্বন্ধীয় বিবরণ পৃ: ৫৩৫৪) তিনি লিখেছেন : রাগ দর্পণকার প্রথমে রাজা-মানকে ধ্রুপদের রচয়িতা বলেছেন। ধ্রুপদ—উদগ্রাহ, মেলাপক, ধূয়া ও আভোগ এই চার কলিতে নিবন্ধ হত। বখ্‌শ, মামুদ, কিরণ ও লোহক প্রমুখের সাহায্যে এই গীত-পদ্ধতি রচিত হয়েছিল, এই রচনা অতি উত্তম ছিল। ধ্রুপদের দুই প্রকার পদ্ধতির কথা এখানে লেখা হয়েছে।

“প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদে, রাগ ও গীত মার্গ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। অপরটিতে রাগ সঙ্গীত অন্ততর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি এবং এই জাতীয় সঙ্গীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে।”…… “দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্রুপদে গায়ন বৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের মিশ্রণে প্ৰস্তুত। সবকিছু থেকে সামান্য সামান্য গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত সৃষ্টি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তথাপি সেই প্রতিষ্ঠার গোরব অক্ষুন্ন রয়েছে।”……“দেশী ভাষায় অচলিত ধ্রুপদ সমগ্রায়সারে বা স্থানায়সারে খরোড়া (সং উর্ ভাষায়) ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায়

অহুষ্ঠিত ঋপদ গোয়ালীয়ার থেকে আকবরাবাদ (অর্থে আগ্রা) ও বারী অঞ্চলে প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যন্ত এর সীমা। পূর্বে এটোয়া, দক্ষিণে উনুছ এবং পশ্চিমে ভূরাও ও বয়ানা পর্যন্ত এর সীমা নির্দিষ্ট। “রাগ দর্পণকার” ফকিরুল্লা সাহেব তানসেনকে “আতাই” বলেছেন। তখন অত্যাগ্ন সঙ্গীত সম্প্রদায়ের গুণীরা তানসেনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। দেখা যায় এই সময়ে তানসেনের প্রভাবে রাজা মান বখশ প্রভৃতি ঋপদীদের রচিত গান ও তাদের ঘরাণাগত চাল লোপ পেতে থাকে। তাঁর ধারণা এতে সেনী ঘরাণার অত্যাগ্ন শিষ্যদেরও হাত ছিল। যে কারণেই হ’ক পরবর্তীকালে তানসেনের প্রাধাণ্য প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ফকিরুল্লা সাহেবের কথায় কিছুটা সত্য থাকতে পারে কারণ সম্রাটের আশ্রিত লোকের প্রভাব যে বেশী হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তানসেনের ঋপদে গান আরম্ভের পূর্বে আলাপের রীতি ছিল, গান, তিন চার তুকের হত এবং গানের স্থায়ী ও অন্তরায় গমকী বিস্তার থাকত। তার আগের প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতির মত ঋপদে দু’গুণ তিনগুণ দেখাবার রীতিও ছিল তবে চপল লয়কারীর কাজ কম ব্যবহার করা হত। রাগের অনুকূলে বাণী ও ভাবের অনুকূলে তালের ব্যবহার ছিল। অলংকার ও গমক প্রভৃতির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান দিনের ঋপদে অবশ্যই কিছু তারতম্য ঘটেছে কিন্তু প্রধানত তানসেনের ষ্টাইলই বজায় রয়েছে।

ঋপদের বাণীতে আমরা দেবতাদের লীলা বিষয়ক বর্ণনা, রাজা বা গুণী ব্যক্তির প্রশংসা, যুদ্ধের বিষয়, নাদ ও রাগের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা প্রভৃতি এবং কচিং নর নারীর আকৃতি প্রকৃতি ও প্রেম-বৈচিত্র্যের বর্ণনা দেখতে পাই। গোয়ালীয়ার, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেই ঋপদের বিস্তার, তাই বাণীতে হিন্দী ও শুদ্ধ ব্রজভাষার শব্দ পাওয়া যায়। সং উর্দু ভাষাতেও ঋপদ রচিত হত, এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ঋপদকে মার্গ রীতির ঋপদ বলা হত। চৌতাল, আড়াচৌতাল, পটতাল, তিনতাল, ব্রহ্মতাল, শূলতাল প্রভৃতি প্রাচীন তালগুণি ঋপদে ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে তেওড়া, বাঁপতাল প্রভৃতির নিদর্শনও দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ঋপদে তালের কায়দায় ধামারের বাট, বাটোয়াবাও নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ঋপদে ছয়প্রকার বিভাগের কথা শোনা যায়, (১) গীত ও (২) সঙ্গীত—এদের ব্যবহার বর্তমানে লুপ্ত। (৩) \* ছন্দ—এই রীতির গানের মধ্যে ‘ছন্দ’ শব্দের উল্লেখ থাকে। (৪) যুগলবন্দ—দুইজনে একসঙ্গে গান করার রীতি। (৫) ধারু—এই জাতীয় গীতে ধারু শব্দের উল্লেখই বৈশিষ্ট্য।

**রূপদের বাণী :** রূপদ গানে চার রকমের বাণীর ব্যবহারের কথা শোনা যায়। প্রথম, গওহার, দ্বিতীয়, নওহার, তৃতীয়, ডাঙর, ও চতুর্থ, খাণ্ডার। রূপদের এই বিভিন্ন গীত-পদ্ধতির (style) ঘরাণার প্রচলন-কর্তার নাম এবং কীভাবে এদের জন্ম সে বিষয়ে মতভেদ খেঁখা যায়। আমরা প্রথমে বাণী শব্দটির কথা বলছি, পরে ঘরাণার কথায় আসবো। সঙ্গীতে এই শব্দটির প্রচলনের সাল, তারিখ এবং কী অর্থে এটি ব্যবহৃত হ'য়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না, কারণ কোন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। মুসলিম যুগের শেষ দিকে শব্দটি ঘরাণাদার গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হ'তে শোনা যায়। বাণী শব্দটির অর্থ আমরা তিনরকম ভাবে কল্পনা করতে পারি যাতে আমরা এর আভিধানিক অর্থের সঙ্গে শব্দটির মিল দেখাতে পারি।

(১) বাণী—ভাষার সাদৃশ্যিক রূপ। কোন বিশেষ দেশের ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমা যেটি সেই দেশের গানে ব্যবহৃত হ'ত; যেমন গোয়ালীয়রের ভাষায় রচিত ও সেই ভাষার বাচন ভঙ্গিকে আমরা গোয়ালীয়রের বাণী বলিতে পারি।

(২) বাণী—শব্দটি বান্ শব্দের অপভ্রংশ, যার মানে প্রকৃতি বা ঢং (ষ্টাইল) এই অর্থে গোয়ালীয়রের গান গাইবার পদ্ধতিকে আমরা গোয়ালীয়রী বাণী বলেই মনে করবো।

(৩) বাণী—বর্ণ শব্দের অপভাষা এই বাণী। সঙ্গীতে বর্ণ বলতে আমরা “গীতক্রিয়া” অর্থে গানের বিস্তারিত রূপায়ণ বলে মনে করতে পারি। সোজা কথায় কোন দেশের গানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা বাণী বলতে পারি। যেমন খণ্ডার নামক স্থানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা খণ্ডার-বাণী বলতে পারি।

আমাদের ধারণা যে বাণ শব্দটি থেকেই বাণী শব্দটির ব্যবহার সঙ্গীতে এসেছে। কোন স্থানের গাইবার ঢং (style)-কেই বাণী বলা হয়।

অনেকের ধারণা যে মুসলিম যুগে যে চার রকম বাণীর প্রচলন হ'য়েছে সেটি তানসেনের কাল থেকেই চলে আসছে। “মাদনুল মোসিকী” গ্রন্থে লেখা আছে—তানসেন, নো'বাং খাঁ, বুজ্জন্দ ও ত্রীচন্দ এই চারজনই চারবাণীর সৃষ্টি-কর্তা। তানসেনের নিম্নলিখিত গানটি প্রমাণ করে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। “বাণী চারোঁকে বেওহার সুন লিজে হো গুণীজন” \* যখন আমরা খণ্ডার ও ডাঙর

\* সঙ্গীত চল্লিকা-গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী প্রকাশন—১৩৭৪, পৃ ৪৩৪  
( ভূপালী চৌতাল—তানসেন )

বাণী খণ্ডার গ্রাম ও ডাঙুর গ্রাম থেকে উৎপত্তি বলি, আবার সেখানেই গৌরহারের বেলায় বলি গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ স্বে ও নৌহারকে সিংহের লক্ষণ গতির সঙ্গে তুলনা করি সেখানে আমরা ভুল করিনা কী? বাণী যখন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে জড়িত তখন সব বাণীই কোন না কোন স্থান থেকে উৎপন্ন বলাই উচিত। আমাদের মনে হয় গৌরহার বাণীটি এসেছে গোয়ালীয়ার থেকে, খাণ্ডার রাজপুতানা প্রান্ত থেকে এবং ডাঙুর ও নৌহার পাঞ্জাব প্রান্ত থেকে। পাঞ্জাবে এরকম নামের দুটো গ্রাম আছে সম্ভবতঃ এই গ্রামের নাম থেকেই এই বাণীর উৎপত্তি।

ঋগ্বেদ গান বহুকালের, স্মরণ্য বাণীগুলিও যে প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যারা শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গোড়ী প্রভৃতির সঙ্গে এই বাণীগুলির তুলনা করেন তাঁরা ঠিকই বলেন বলে আমাদের ধারণা। রাগের প্রকৃতি ও চলন হিসাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ গৌরহারেই প্রশস্ত। সারঙ্গ, খট্ প্রভৃতিতে খাণ্ডারের চলন, ভূপালী, মারবাতে ডাঙুরের চাল এবং কামোদ, শংকরা প্রভৃতিতে নৌহার বাণীর ভাব প্রকাশিত। রাগের গতি প্রকৃতি থেকে বাণীর ব্যবহার এসেছে একথা ভাবাও খুব অসম্ভব হবে না।

এখন প্রতিটি বাণীর উৎপত্তির সম্বন্ধে যেসব মত প্রচলিত, সেগুলি বলছি।

(১) **গওহার** (ক) প্রাচীন ভিন্না জাতীয় গীতি পদ্ধতির অঙ্গকরণ। (খ) তানসেন গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত বাণী হিসাবে এটি গোঁড়হার, গওহার, গওরার বা গোবরহাব নামে প্রচলিত। (গ) নায়ক কুন্ডন দাসের বংশ থেকেই এই চালের প্রবর্তন। (ঘ) স্থান হিসাবে গোয়ালীয়ার থেকে উৎপন্ন। (ঙ) গীত পদ্ধতির চাল ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বলে দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগের চাল থেকে উৎপন্ন।

(২) **নওহার** (ক) প্রাচীন বেসরা জাতীয় পদ্ধতি জাত। (খ) নওহার গ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র প্রবর্তিত। (গ) নবরসের একত্র মিলন ঘটানর কারণে নবহার বা নওহার। (ঘ) হিন্দী 'নাহর' শব্দের অর্থ সিংহ। সিংহের গতির মত এই পদ্ধতির গান দ্রুত লক্ষন (অর্থে ছুট) যুক্ত বলে ধারণা করা হয়, এটি নাহর শব্দ থেকে এসেছে। (ঙ) অনেকে সূজান থাকে এর প্রবর্তক বলেন। (চ) কামোদ, শংকরা প্রভৃতি রাগাঙ্গসারী।

(৩) **ডাঙুর** (ক) প্রাচীন শুদ্ধা জাতীয় পদ্ধতির অঙ্গকরণ। (খ)

ডাঙর গ্রাম নিবাসী বৃজচন্দ্র প্রবর্তক। (গ) ডাঙর ঘরাণার হরিদাস ডাঙর প্রবর্তক। (ঘ) পাঞ্জাব প্রান্তের ডাঙর গ্রাম থেকে উৎপন্ন। (ঙ) ভূপালী-মারবা প্রভৃতি রাগের চাল থেকে জন্ম নিয়েছে।

(৪) খাণ্ডার বাণী—(ক) প্রাচীন গোড়ী জাতীয় পদ্ধতির অন্তর্করণ। (খ) খাণ্ডার গ্রাম জাত। অনেকের ধারণা এই স্টাইলে রুম্বভাব প্রকাশিত হয় ও স্বরগুলি কাটা কাটা ভাবের হয়। (গ) সারং, খট প্রভৃতি রাগের চাল-জাত।

### ধ্রুপদ ঘরাণা

১। গোয়ালীয়ার ঘরাণা : প্রথমেই গোয়ালীয়ার ঘরাণার উল্লেখ প্রয়োজন। এটি তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) রাজা মানসিংহকে এর প্রবর্তক বলা হয়। প্রবন্ধাদি প্রাচীন গীত শৈলী অবলম্বনে ইনিই ধ্রুপদ প্রচলিত করেন। মানসিংহের দরবারে ( ১৪৮৬ থেকে ১৫১৮ সাল ) বৈষ্ণু, ভানু, বখশ্ব, চরজ, ভগবানু, রামদাস প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়কেরা ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় রাজা মানের পক্ষে ধ্রুপদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়েছিল। রাজা মানকৃত “মান-কুতুহল” গ্রন্থটি সঙ্গীতের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে পরিচিত। ফকিরুল্লা সাহেব মানসিংহের এই অপূর্ব আবিষ্কারের প্রশংসা করেন ও তাঁর পুস্তকের ফার্সী অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ফার্সী গ্রন্থের নাম “রাগ দর্পন”। রাজা মানরচিত ধ্রুপদের ( style ) চালের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল বর্তমানে তা জানার উপায় নাই। ( “হামারে সঙ্গীত রত্ন” পৃ: ৫৫ ) (খ) পরবর্তীকালে তানসেনের পুত্র তানতরঞ্জের বংশধরেরা গোয়ালীয়ার ঘরাণার সৃষ্টি করেন। লাগ-এর সৃষ্ট প্রয়োগের সঙ্গে মীড়, আশ ও গমকের ব্যবহার দ্বিতীয় গোয়ালীয়ার ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ছিল। (গ) এরপর আমরা চিন্তামনি মিশ্রের নাম পাই। দুর্ন, চৌদুর্নের ব্যবহার মিশ্র ঘরের এক বৈশিষ্ট্য।

২। সেনী ঘরাণা : তানসেনের সৃষ্টি। সেনী ঘরের লাগ ও তার সঙ্গে আশ, মাঁড় এবং প্রাচীন গমকের সংযোগে বিস্তারের ভাঁজ লক্ষণীয়। স্বরের মাধ্যমে ভাবের উচ্চারণ ভক্তিমা, ভাবের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা প্রভৃতি রক্ষা করার প্রাচীন পদ্ধতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। বিস্তারে দুর্ন চৌদুর্নের দাপট জেমন দেখা যায় না।

৩। তিলনগুণী ঘরাণা : অনেকে ধারণা করেন খৈরাবাদী ঘরাণার প্রবর্তক চাঁদ খাঁ ও স্বরজ খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। অনেকের ধারণা দৌলত খাঁ

খণ্ডারের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা এই ঘর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ধারণা এই ঘর পাঞ্জাব ঘরাণা থেকে জন্ম নিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন।

৪। **বেতিয়া ঘরাণা :** বেতিয়া নামে বিহার প্রদেশে এক সামন্ত রাজ্য ছিল। বেতিয়া রাজ্যের নামেই এই ঘরাণা বেতিয়া ঘরাণা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেতিয়া ভারতের বিহার অঞ্চলের সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বেতিয়ার মহারাজা আনন্দকিশোর সিং এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন। মহারাজা আনন্দকিশোর তানসেনবংশজ হাইদার খাঁর কাছে রূপদ শিখে নিজ বৈশিষ্ট্যে এই ঘরাণার ইতিহাস রচনা করেন।

গৌরহাট ও ডাগর বাণীর মিশ্রণে বাণীগুলির অল্প ব্যবহারে স্বর-বিস্তার এই ঘরাণার বিশেষত্ব। (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তৌর্যাত্মিক নভেম্বর— ১৯৫৫ দ্রষ্টব্য)

৫। **ডাগর ঘরাণা বা উদয়পুর ঘরাণা :** বাবা গোপাল দাস (ইমাম খাঁ) থেকে শুরু। বৈরাম খাঁ এই ঘরাণার বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। উস্তাদ জাকিরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁ এবং পরে নাসিরুদ্দীন খাঁ প্রমুখ গুণীরা এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। ময়নুদ্দীন (স্বর্গত) ও আমিরুদ্দীন এই দুই ভাই ভারতের বাইরে ইউরোপ, জার্মান প্রভৃতি স্থানে এই ঘরাণার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘরে প্রাচীন অলংকার ও ডাগর বাণীর ব্যবহার লক্ষণীয়। বানকারের কায়দায় প্রাচীন মেরুগুণ্ড পদ্ধতি অবলম্বনে এঁরা বর্তমানে এঁদের ঘরের রূপদাঙ্গীয় আলাপের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছেন। রহিমুদ্দিন ডাগর, তানসেন-পাণ্ডে ফহিমুদ্দিন ডাগর প্রভৃতি গুণীদের নাম উল্লেখযোগ্য।\*

৬। **অত্রৌলী ঘরাণা বা আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা :** আল্লাদিয়া খাঁর পূর্ব-পুরুষেরা এই ঘরাণার প্রবর্তক হলেও মানতোল খাঁর সময় থেকেই এই ঘরাণা প্রতিষ্ঠা পায়। শোনা যায় এই ঘরাণায় রূপদের সব কয়টি বাণীর ব্যবহার শোনা যেত। ডাগর ও নোঁহার বাণীর বিশেষ ব্যবহার এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ছিল। (খ্যাল ঘরাণা দেখুন)

৭। **বেনারস ঘরাণা :** মনোহর ও হরপ্রসাদ মিশ্র (পরসাদ, প্রসাদ) বা

\*১ জুনিয়ার ডাগরদের মধ্যে জাহির ও কৈরাজ ভাতুয়রের নাম উল্লেখযোগ্য।

\*২ "To whom dhrupad owes its renaissance" booklet Published by Dagar sangeet siksha mandir.

তাদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আড়ি কুয়াড়ির ব্যবহার দূন চৌদুনের প্রয়োগ এই ঘরাণার একটি বিশেষ অঙ্গ। ( “হামারে সঙ্গীত রত্ন” )

৮। **বিষ্ণুপুর ঘরাণা :** বিষ্ণুপুরই বাংলায় ঋপদের সব থেকে পুরাতন ঘরাণা। “দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর” নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “দিল্লী হইতে যে সকল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ গুস্তাদ বিষ্ণুপুরে আসিয়া বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাতুরাগী অধিবাসীগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাহাহুর খাঁ ও পীরবন্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাহাহুর খাঁকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দানে দিল্লী হইতে বিষ্ণুপুর আসিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন”। দ্বিতীয় রঘুনাথের কালে বাহাহুর খাঁর বিষ্ণুপুর আগমন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যেরা সন্দেহ পোষণ করেন।

আঠারো শতকেই বাংলা দেশে প্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শিক্ষা বিষ্ণুপুর থেকে আরম্ভ হয়। বাহাহুর খাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। ঐ মতে গদাধর চক্রবর্তী মহাশয় এই ঘরাণার প্রবর্তক। অপর মতে এই ঘরাণায় আদি সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ইনিই প্রথমে বাংলা ভাষায় ঋপদ রচনা করেন এবং ঐকৈই প্রথম ঋপদের প্রচারক বলা হয়।

এই ঘরাণায় ৩নৌলমনি চক্রবর্তী, ৩অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঐদের শিষ্য মঞ্জুরী মধ্যে ৩ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৩দীনবন্ধু গোস্বামী, ৩রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ৩রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘরের সঙ্গীতগুণী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও এই ঘরের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। \*

বিভিন্ন ঘরাণার সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইল।

**ধমার বা ধামার :** ধা-মার বললেও ধা মারবার উপায় নাই কারণ ধামারের সমে ধা নেই। ধা কে মেরেই ধামারের জন্ম। ঋপদে ধা থাকে সবেও এত ধুমধাম নেই, বাট বাটোয়ারার এত কায়দা নেই যা আছে ধা বিহীন ধামারে। ধামারের সমে লঘুবর্ণ ক রয়েছে যেটি ধামার তালের বৈশিষ্ট্য। তালের নাম

\* অমৃতকিঙ্কর পাঠকেরা দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “বিষ্ণুপুর ঘরাণা” বইটি পড়লে এই ঘরাণার সম্বন্ধে অনেক বিষয় আরও বিশদভাবে জানতে পারবেন।

ধামার এবং সেই তালের নামেই এই গীতি পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে। ঋপদের ছোঁয়া থাকলেও ধামার তার সঙ্গে রক্তরস সঙ্কে সম্পর্কিত নয়। এখন এর আসল নাম ধমার শব্দের কথা বলি। ‘ধম’ মানে কৃষ্ণ এই অর্থে ধমার কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান এরূপ অর্থ করা হয়। ধমার হচ্ছে ধর্মতাল বা ধর নামক তাল এমন অর্থও শোনা যায়, কিন্তু সবই কল্পনা। আসলে ধমারের নামকরণের রহস্য বা নামোৎপত্তির বিষয় কিছুই উদ্ঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আমরা বুন্দাবনে হোরী নামের গান পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি চচ্চরী অর্থে চাঁচরবে। আমাদের ধারণা হোলী নামক তৎকালীন লোক-সঙ্গীতই রূপ বদলে রাগ-সঙ্গীতের সহায়তায় চাঁচর নাম পেয়েছিল। চাঁচর এক জাতীয় তালের নাম যেটি সমস্ত গাইয়ে বাজিয়েরাই জানেন। সেটি ৭ মাত্রার যতেরই নামান্তর নয় কি? বলা হয় চচ্চরী তাল থেকেই চাঁচর তালটি এসেছে, রত্নাকরে চচ্চরী নামে এক প্রবন্ধের নামও দেখা যায় যাতে অনেকগুলি পদ ও ছন্দ থাকতো। এই প্রবন্ধ রূপ বদলে চাঁচর তালে পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা কে বলতে পারে? এই চাঁচরের সঙ্গে ধমারের একটা সঙ্ক রয়েছে বলেও আমাদের মনে হয়। হোলী কোনও তাল নয়, চাঁচর তালটি হোলীর গানের মধ্যেই বেঁচে রয়েছে। আমরা সঙ্গীত রত্নাকরে এ প্রমাণ পাচ্ছি, যে তখনকার দিনে বসন্তোৎসবের গান গ্রাম্য ভাষায় রচিত হত ও সেগুলি যথাক্রমে চৌদ্দ, বোলো, বা ছয় মাত্রাদির বিভাগীয় তালে গীত হত।

আমাদের অস্বীকৃতি আমরা ধমার, চাঁচর, হোলী এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না, তবে তিনটিই বসন্ত উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, এদের ভাষা, বিষয়বস্তু, পরিবেশ সবই বসন্তকে লক্ষ্য করেই গড়া, তা ছাড়া তালের ঝোঁকেও একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। যৎ বা চাঁচরের সমের ধাতো প্রশ্নের অভাব বোধ করিনা কি? সেই অভাবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় ধমারের সমের বিস্বনবর্ণ “ক” কে। কিন্তু ধমারের গম্ভীরতা মনে জাগায় সন্দেহ। তবে আমরা ধমারে যৎ-এর প্রকাশনায় গম্ভীর ছাপ দেখতে পাই।

রাগের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা মালকোষ বসন্ত, হিন্দোল, বাহার, খাম্বাজ, ধানী, তিলং প্রভৃতি রাগকেই দেখতে পাই, অর্থাৎ মধ বা পঞ্চ সঙ্গত যুক্ত রাগই বসন্ত কাণ্ডয়ার গানে বেশী প্রচলিত। হোলীর গানে অবশ্য কান্দী, তিলোককামোদ, সিদ্ধু প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায় যাদের চচ্চরী বা ধমারে কমই দেখা যায়। কাণ্ডয়ার হোলী গান অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে

এসেছে কাজেই লোক-গীতি হোলী উন্নত হবার চেষ্টায় কোন্ বিশেষ স্থানের রাগ সঙ্গীতের সহায়তায় চচ্চরী নামক বিশিষ্ট ধারা পেয়েছিল সেই স্থানটির সঠিক সন্ধান আমরা পাইনি তবে জানতে পেরেছি যে ফাগুয়া যখন কৃষ্ণলীলায় পরিবর্তিত হল তখন বৃন্দাবনেই এর প্রচলন বেশী হল আর এখানেই সে তার আগেকার আদি রসাত্মক রূপের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ কৃষ্টি-মিশ্রিত রূপ পেলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে চচ্চরী ও হোলী ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি—বৃন্দাবনের বা তার আশ-পাশে কোন জায়গা থেকে হোরী নামের মাধ্যমে আভিজাত্য পেলো।

আমাদের মনে হয় পরবর্ত্তীকালে বৃন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হোরীকে ধ্রুপদের সমপর্যায়ের আনার জন্তে তালটির নূতন নামকরণ করেন ও প্রবন্ধটিকে ধমার নামে প্রচারিত করার চেষ্টা চালান। “ধম” মানে হৈ চৈ। হোলীর দিনের হৈ চৈ বা বহুজনের মিলিত উৎসব হিসাবে হোলী ধমার নামে প্রবর্ত্তিত হয়েছে এ কথাও ভাবা যায়। চৌদ্দ মাত্রার বোধরা থেকে উচ্চারণ ভেদে ধমারের উৎপত্তি এ কথাও শোনা যায়। বঙ্গভ সম্প্রদায়ে ও হরিদাস সম্প্রদায়ে হোলীর গানের সমধর্মী এক রকম গানের প্রচলন ছিল। এমনও হতে পারে যে পরবর্ত্তীকালে সাধারণ্যে এই ধরণের গান প্রচারিত হয়ে ধ্রুপদী গুণীদের দ্বায় রূপ পাল্টে ধমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে গান বাজনার যে সব নথিপত্র পাওয়া যায় তার মাঝে আমরা ধমার নামটি পাই না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে মীর্জা খাঁর বিখ্যাত তুহাফতুল হিন্দু গ্রন্থেও ধমার নামটি পাওয়া যায় না। ধমারের ভাষায় আমরা কিছু উন্নত ধরণের চলতি ভাষা দেখতে পাই যা ধ্রুপদে ব্যবহার করা হয় না। যদিও আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারি না তবু আমাদের বিশ্বাস যে ধমার ব্রজধামের হোলীর উন্নত সংস্করণ, লোক-সঙ্গীতেরই উন্নত অবস্থা, এটি ধ্রুপদের অহুসরণ নয়।

সাধারণতঃ ধ্রুপদ গাইয়েরাই ধমার গেয়ে থাকেন। অতীতে কয়েকজন ধ্রুপদী ধমার গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করায় ধামারী নামে পরিচিত হন, যথা, বিশ্বনাথ ধামারী, শুকদেব মিশ্র ধামারী। বিশেষভাবে ধমার ঘরাণা বলে কোন ঘরাণার নাম আমরা পাই নি।

**খেয়াল বা খ্যালা :** খেয়ালে রাগের বাঁধন থাকলেও ধ্রুপদের মত রাগ বিভ্রান্তের ধরা বাঁধা নিয়ম সে মেনে চলে না। খেয়াল হল দুর্ভঙ্গ, দুর্ভার, তরলতাই হল গুর ধর্ম ; ও উচ্ছ্বল কিন্তু প্রাণোচ্ছল। কখনো স্বরের পাখনা মেলে অসীম।

আকাশে উড়ে চলে, কখনো পাখনার তান ঝাপটায় ওর দাপট দেখা যায়, কখনো চঞ্চল, কখনো স্থির, কিন্তু ধীর নয়, ধ্রুপদের মত গভীর, শাস্ত সমাহিত মূর্তি নয় তবে স্থির লক্ষ্যে রাগকে স্বীকার করে নানা ছন্দে রস সৃষ্টি করে চলে।

খ্যাল শব্দটি আরবি শব্দ, \* অর্থ কল্পনা, বিচার বা ধ্যান। রাগের ধ্যান মূর্তি কল্পনা করে তাকে বিচার পূর্বক বিস্তারিত প্রকাশ করার নামই খ্যাল। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ খ্যাল মানে যথেষ্টাচার বোঝেন সেটি ঠিক নয়।

মুঘল দরবারের ইতিহাসের পাতা থেকে ও সমসাময়িক অত্যাগ্ন গ্রন্থ থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে আমাদের খুসরোকেই এর প্রচলন কর্তা বলে জানতে পারি। পরবর্তীকালের প্রচারক হিসাবে নাম পাই হুসেন সর্কার। সম্রাট সাজাহানের (১৬২৮-৬৬) দরবারে এই দুই পদ্ধতিই চালু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে আকবর বাদশার আমলেও (১৫৪৮-১৬০৫) খেয়ালের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন খেয়ালীও সে দরবারে ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ খেয়াল গাইতেন। আকবরের দরবারে খেয়ালীরা বিশেষ নাম করতে না পারলেও সেখান থেকেই খেয়াল স্টাইল রূপ বদলে সাজাহানের দরবারে এসে আসর জমায়। ধ্রুপদের সময়ে খেয়াল গান প্রচলিত থাকলেও কোন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাসরে খেয়ালীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত না। এতৎ সত্ত্বেও উপেক্ষা ও অবহেলার মাঝে খেয়াল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে তার মধ্যদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তার মৌকুমারের ও লালিত্যের বৈশিষ্ট্যে। ঔরংজেবের সময় থেকেই খেয়াল বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্রাটের ছেলেরা বা নাতিরা গান শিখতেন এরকম নজীরও পাওয়া যায়। সঙ্গীত-শুণী সদারঙ্গই প্রথমে তৎকালীন চলতি বিভিন্ন ঢং-এর সমন্বয়ে এক বিশেষ চালের খ্যাল প্রবর্তন করেন। আমাদের খুসরো বা হুসেন সর্কার খ্যালের বিশেষ বিশেষ কায়দা যদিও কোন কোন ঘরে প্রয়োগ করা হত, তবুও সদারঙ্গ-এর খেয়ালকে অনুসরণ করেই বিশেষ ভাবে এক খ্যালি রীতি গড়ে উঠেছিল ও সাধারণের কাছে সেই কায়দাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। বিখ্যাত বীণকার নিয়ামৎ খাঁরই ছদ্ম নাম ছিল সদারঙ্গ, এই ছদ্ম নামেই তিনি বহু খ্যাল গান রচনা করে যান। খ্যালে এঁর সময় থেকেই বীণের জোড় ও বাণীর উপর জোর দিয়ে স্বর বিস্তারের সাহায্যে বোলতান যুক্ত হয়। ধ্রুপদের বাণীর মত খেয়ালেও নানা বাণী প্রচলিত হল যেগুলি রাগভাব,

ভাষা ও তালের কায়দায় ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সদায়ঙ্গ-এর খেয়াল দুই তুক বিশিষ্ট ছিল। প্রথম হল স্থায়ী অঙ্গ ও দ্বিতীয় অন্তরা—এই অন্তরা ধ্রুপদের আভোগের কায়দায় রচিত হত এবং অন্তরায় গীত রচয়িতার নাম থাকত। আস্থায়ী অন্তরা গাইবার পর প্রথমে স্থায়ীর ও পরে অন্তরার বিস্তার করা হত। বিস্তারে গানের কোন একটি পদ অথবা আকারের ব্যবহার করা হত ও নানা অলংকার এবং গমকের ব্যবহারও থাকতো। গানের ভঙ্গী তার ভাষা ও ভাবের উপর নির্ভর করেই বিস্তার করা হত এবং সবশেষে দ্রুত গতিতে নানা ছন্দ ও অলংকার প্রকাশ করা হত। আজকে এই ধরণ সম্পূর্ণ বর্তমান নাই, এখন বোলতান, আকার যোগের তান, নানা ধরণের তেহাই, গমক, অতি দ্রুত তান ও সরগম ব্যবহার করা হয়।

খেয়ালের ভাষায় পূর্ব কি হিন্দি, ব্রজভাষা, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষা এবং খড়ি বোলি অর্থে উর্দু ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ব্রজবুলিতে ভাষার আধিক্যই বেশী, ভাষার বিষয়বস্তুর মধ্যে নায়কের প্রশংসা, নায়িকাভেদ, প্রেম-কাহিনী ও প্রকৃতির বর্ণনা প্রভৃতি থাকে। এ ছাড়া প্রার্থনার বাণী, নাচ ও রাগের ধ্যানাদির বর্ণনাও দেখা যায়। খেয়ালের তালে তিনতাল, একতাল, রুমরা, পাঞ্জাবীঠেকা, নানা ধরণের সওয়াদী এবং ঝাঁপতাল, আড়াচোঁতাল প্রভৃতি তালের প্রচলন দেখা যায়। যে সব রাগ গস্তীর ওজঃযুক্ত অর্থাৎ যাতে Incitement আছে, বিস্তারের বেশী সুবিধা আছে বিদারী বা অপন্যাসের বহুল প্রয়োগ সম্ভব, সেই সব রাগই খেয়ালের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। চটুল চপল জাতীয় ক্ষুদ্র রাগেরা খেয়ালের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়।

**খ্যাল ঘরাণা :** খ্যাল গানের ঘরাণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের আমীর খুরোর কথা বলতে হয়। আমীর খুরো সঙ্ক্ষে 'বাদশাহ নামায়' বলা হয়েছে :

কৌল, কাবালি, তারানা ও খ্যাল এই চার রকমের গীতি-পদ্ধতি আমীর খুরো আরবী ও পারস্যীয়ান সঙ্গীতের মিশ্রণে তৈরী করে প্রচার করেন। এই কারণেই খ্যালের জন্মদাতা হিসাবে আমীর খুরোকেই **দিল্লী ঘরাণার** প্রবর্তক বলা হয়। এর শিষ্যবর্গের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবে (হমারে সঙ্গীত রত্ন—পৃ: ১০৪) দিল্লী ঘরাণার বিভাগে তাই পাঞ্জাব ঘরাণা ও কবাল ঘরাণাকে ধরা হত। দিল্লী ঘরাণা মূলত: দুই ভাগে বিভক্ত হলেও পঞ্জিতেরা মনে করেন এর চার পাঁচটি বিভাগ ছিল। দিল্লী ঘর তার আস্থাই ও ফিকরাবন্দীর কায়দায়

বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য ও দ্রুত লয়ের প্রচলন বেশী ছিল। আত্মাই চট্টল ৫-এ ভরা হত। বহিলবা অঙ্কের আলাপ এতে শোনা যেত না। ঠেকায় তিন-তাল, ফরদোস্ত প্রভৃতি তালই বেশী ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে সিধারখানি ঠেকার বেশী ব্যবহার দেখা যায়। কন্মু খাঁ, আলিরেজা, শফিউল্লা, ইমাম বক্স, হসীর খাঁ প্রভৃতি গুণীদের নাম পাওয়া যায় দিল্লী ঘরাণায়। এঁরা সকলেই পৃথক পৃথকভাবে ঘরাণা রচনা করেছিলেন শোনা যায়। বর্তমানে বাহাহুরশার দরবারের গুণীদেরও দিল্লী ঘরাণা বলা হচ্ছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই গুণীরা অত্র স্থানের। অচপল এই ঘরাণার আদি প্রবর্তক। প্যাল গানে ও কবিতা রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। ইনি আঠারো শত শতকের লোক ছিলেন বলে বলা হয়। (হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃ: ২৪)। বড়ে ছংগে খাঁ, শাদী ও মুরাদ খাঁ, বহাহুর ও দিলবার খাঁ, নাসির আহমদ, নূর খাঁ, আলি বকস্ খাঁ প্রভৃতিকেও দিল্লী ঘরাণার গায়ক বলে "সঙ্গীতজ্ঞকে স্মরণ" দিল্লী নাটক একাদেমি প্রকাশনে বলা হয়েছে (পৃ: ৭৫)। অচপলের শিষ্য তানরস খাঁ (তানদ্রজ খাঁ) ও এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তানরস খাঁ ভাসনা গ্রামের গায়ক ছিলেন। বলদার স্থায়ী ভরণে এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। তানরস খাঁকে অনেকে শ্রীচন্দ্রের ঘরাণার লোক বলেন। তারাণায় তানরস খাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল ("হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃ: ২১)। শোনা যায় শ্রীচন্দ্র পাঞ্জাব ঘরাণার ঋপদীয়া ছিলেন। এই পাঞ্জাব ঘরাণাও আমীর খুসরোর শিষ্য বংশ থেকেই জন্ম নেয়।

**কবাল বাচ্চা ঘরাণা :** হুর্ছন্দা সেপ্টেম্বর ১২৭৩ শারদীয়া সংখ্যায় কবাল ঘরাণার সম্বন্ধে ডা: রায় লিখেছেন "খ্যালের ঘরাণা বলতে গেলেই কবালদের মনে পড়ে যায়। অমীর খুসরোর গান-রীতিতে যে কজন কবাল দিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজন নাকি চারটি ঘরাণার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের নাম পাওয়া যায় না, এমন কি বংশাবলীও মেলে না।"

আমরা বিলায়েৎ হুসেন খাঁ লিখিত "সঙ্গীতজ্ঞ কে স্মরণ"—দিল্লী সঙ্গীত নাটক একাডেমি দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থে যা পেয়েছি সেটির সারাংশ নিম্নরূপ :

সুলতান সামসুদ্দীন আল্‌তামাশের রাজত্বকালে দিল্লীতে সাবস্ত আয় বুলি নামে দুই ভাই বাস করতেন। এঁরা একজন কালা ও অপরজন বোবা ছিলেন। দরবারের সঙ্গীতাসরে এঁদের আনার পরে ঈশ্বরের কক্ষণায় রাজাজায় এঁরা হঠাৎ বিশেষ শক্তির প্রভাবে অস্তুত খ্যাল গান করেন। এঁদের হৃজনকেই কবাল বাচ্চা ঘরাণার আদি পুরুষ বলা হয়। পরে মিঞা সঙ্কর খাঁ ও মথখন খাঁ, জদ্দু খাঁ

প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। তারও পরে বড়ে মহম্মদ ( নাজীকাবাদ ঘরাণা বলে পরিচিত ) হন্দু ও হস্‌স খা ( গোয়ালীয়ার ঘরাণা দেখুন ) আহমদ খাঁ, রহমত খাঁ, মহম্মদ খাঁর পুত্র আমন আলি, বাকর আলি ( দিল্লী ঘরাণার বলা হয় ) বারিস আলি, ইনায়েৎ হুসেন, ( সহসোয়ান ঘরাণা ) তথা স্বনামধন্য ভাইয়ানাব গণপত রাও, সাদিক আলি প্রভৃতির নামও উপরোক্ত গ্রন্থে এই ঘরের ঘরাণাদার বলে লেখা হয়েছে।

**খৈরাবাদী ঘরাণা :** এই ঘর পঞ্জাব ঘর থেকে এসেছে। বোলশো শতাব্দীতে চাঁদ খাঁ ও স্বরজ খাঁ এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা পাঞ্জাবে খৈরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পূর্বে এই দুই ভাই হিন্দু ছিলেন তখন এঁরা দিবাকর ও স্বধাকর নামে পরিচিত ছিলেন। এই ঘরাণার চাল বর্তমানে বিলুপ্ত। অনেকে এঁদের তিলমণ্ডী ঘরাণার প্রচারক বলেন। এঁরা “খৈরাবাদী ভেদ” বলে এক বিশিষ্ট চালের জন্ম দেন। ( “হমারে সঙ্গীত রত্ন—পৃ: ১৭২। )

**গোয়ালীয়ার ঘরাণা :** নখন পীরবক্স আঠারোশো শতকের লোক ছিলেন। ইনি লখনৌ-এ থাকতেন। ঘরাণার বাদবিসম্বাদের কারণে লখনৌ ছেড়ে ইনি গোয়ালীয়ারে এসে পৃথক ঘরাণার সৃষ্টি করেন। লখনৌ-এ তখন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী তথা খৈয়ালী গুলাম রহুল থাকতেন। যতদূর জানা যায় নখন পীরবক্স গুলাম রহুলের কাছেই তালিম পান। এই গুলাম-রহুলের পুত্র শোরীমীয়া টপ্পা গান আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করেন। এই ঘরাণায় পরবর্তীকালে হন্দু খাঁ বড়ে মহম্মদ খাঁর অনুরোধে বোলতান, ফিরকৎ, চক্রাদার তান প্রভৃতির চালন আনেন। হন্দু হস্‌স খাঁ এই ঘরের বিশেষ সম্মান এনে দেন। ( “হমারে সঙ্গীত রত্ন” পৃ:—১৫২, ২১৫, ৩১২। )

**লখনৌ ঘরাণা :** গোলাম রহুলের কথা আগেই বলেছি। ইনি সদারঙ্গের শিল্প ও লখনৌ ঘরের আদি কলাবস্তু। এই ঘরে প্যাচদার মুকীযুক্ত জুত বিস্তার এবং কবাল ঘরের ফিক্রাবন্দী ও বহিলবা টং এর ব্যবহার ছিল। একতাল, তিনতাল ও ঝুমরা প্রভৃতি সরল তালই এঁদের গানে বেশী ব্যবহৃত হত। অনেকের ধারণা লখনৌ ঘর জোয়ানপুর নিবাসী হুসেন সর্কার সময় থেকেই চলে আসছে। লখনৌ ঘরে পূর্ব দেশীয় মধ্যলয়ের খ্যাল প্রচলিত ছিল।

**তিলমণ্ডী ঘরাণা :** বা **তলবণ্ডী ঘরাণা :**—

আল্লানুর খাঁ এই ঘরের প্রধান প্রবর্তক। শোনা যায় শফীউল্লার সময় থেকেই এই ঘরে খ্যালের চর্চা শুরু হয়। অনেকে বলেন শফীউল্লার শিক্ষাও

কবাল ঘর থেকে। আদিতে এটি ধ্রুপদ ঘর ছিল। এই ঘরাণার শেষ প্রতিনিধি হলেন মিঠঠু খাঁ।

**অত্রৌলী ঘরাণা :** মানতোল খাঁর সময়ে ধ্রুপদ ঘরাণাই ছিল। আল্লা-দিয়া খাঁকে এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক বলা হয়। আল্লাদিয়া খাঁ তাঁর পিতা মরহুম খাজা আহমদ খাঁর ও মুবারক আলীর কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায় এই ধ্রুপদ ঘরাণা ইমাম বক্স থেকে চলে আসছে যদিও এর সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অত্রৌলী ঘরাণার মেহেবুব খাঁ ও পুত্রন খাঁকে লোকে তোলে নি। ঘরাণার ধারক হিসাবে অজীজুদ্দীন খাঁ কোলাপুরেরও নাম করা হয়। এই ঘরাণায় মানতোল খাঁ, গুলাম গোস খাঁ, করিম বক্স, চিশ্ম খাঁ, ইমাম বক্স, দৌলত খাঁ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। **আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা** বলেও এই ঘরাণা পরিচিত। এই ঘরাণার গায়কী কঠিন ও তান জাটল। আল্লাদিয়া খাঁ বরোদা দরবারে সভাগায়ক ছিলেন। শিখা শিখাদের মধ্যে শঙ্কর রাও সরনায়ক, গোবিন্দ রাও টোম্বে, মঘুবাদি কুরদীকর, ভাঙ্কর বুয়া, মসুবাদি, কেশরীবাদি কেরকার ও খাঁ সাহেবের সুপুত্র তুর্জী খাঁ এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেছেন। হিন্দোল, মালশ্রী, মারবা, বসন্ত-বাহার, মারু-বিহাগ, নায়কী-কানাডা, গোরক্ষ-কল্যান, খট-তোড়ী, ললিত-মঙ্গল, জয়ন্ত-মঞ্জার প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক কঠিন রাগ গায়নে খাঁ সাহেব সিদ্ধ ছিলেন। (‘‘হামার সঙ্গীত রত্ন’’ পৃ: ১০৬)

**কিরাণা ঘরাণা :** সিকিন্দাবাদ ঘরাণার হিঙ্গারঙ্গ এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক। জানা যায় আগে ধ্রুপদ ঘর ছিল এবং তখন সেনী ঘরের প্রভাব ছিল এই ঘরে। আব্দুল করিম খাঁর ভায়েরা হিঙ্গারঙ্গের কায়দা গ্রহণ করেন। কিন্তু রহমৎ খাঁর প্রভাবে দক্ষিণী কায়দার অগ্রকরণে আব্দুল করিম এক নিজস্ব টং গড়ে তোলেন। ভাগিনেয় বাহরে বহীদ খাঁ কবাল ওহীতুল্লার নকল করে এক নূতন চালের সৃষ্টি করেন। বহীদ খাঁর চালে অতি টিমা লয় দেখা যায়। এই ঘরাণায় আল্লাদিয়া, নখন খাঁ প্রমুখ জয়পুর দরবারের বিশেষ গুণীদের প্রভাব পড়ে।

নবীন কিরাণা ঘরাণার বিস্তার আলাপের টং-এ হয়। চমকদার গমকী তান এর এক বৈশিষ্ট্য। হীরাবাদি বরদেকার, গঙ্গুবাদি হাঙ্গল, সরস্বতী রাণে, রোশনারা বেগম প্রভৃতি শ্রীমতীরা এবং সাওয়াই গঙ্কর্ব, বহরেবুয়া, সুরেশ বাবু মানে, ভৌমসেন যোশী প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেছেন। বর্তমানে ইন্দোরের আমীর খাঁ এই ঘরের যথেষ্ট নাম করেছেন।

**সহসোয়ান ঘরাণা :** হদ্দু খাঁর জামাতা ইনায়েৎ হুসেন খাঁ থেকে এই

ঘরাণার প্রারম্ভিক সূচনা। ইনায়েৎ হুসেন সেনী ঘরাণার বহাদুর হুসেনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা মহবুব খাঁ ও দাদামশাই ফতবুদ্দৌলার কাছে ইনায়েতের প্রথম শিক্ষা হলেও হদ্দু হস্নখাঁদের কাছেই ইনি বেশী শিক্ষা লাভ করেন। রামপুরের উস্তাদ মুস্তাক হুসেন, ফিদা হুসেন খাঁ ( বরোদা ), হাইদার হুসেন খাঁ ( রামপুর ), হাফিজ খাঁ ( মহীশূর ), অমান আলি খাঁ ( পূনা ), ভাইয়া-সাব গণপতরাও, প্রভৃতি নাম করা শিষ্যদের ইনায়েৎ হুসেন খাঁ রেখে গেছেন। অনেকের ধারণা মুস্তাক হুসেন সহসোয়ান জেলার লোক ছিলেন এবং তাঁর নামেই এই সহসোয়ান ঘরাণা গড়ে ওঠে। মুস্তাক হুসেন অত্রৌলী ঘরাণার পুত্রন খাঁ, মহবুব খাঁ, রামপুরের উজীর খাঁ প্রভৃতি নানা গুণী ব্যক্তির কাছে তালিম নিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। ( “হামারে সঙ্গীত রত্ন” পৃ: ১২০ )

**আগ্রা ঘরাণা :** প্রথমে রূপদ ঘরাণা ছিল। হাজি হুজান খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। অনেকের ধারণা ঘগ্গে খুদাবকস গোয়ালীর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগ্রায় এসে এই ঘরাণা গড়ে তোলেন। নোম্ তোম্ প্রভৃতি বোল দিয়ে আলাপ করে গান আরম্ভ করা এই ঘরের এক বৈশিষ্ট্য। ধমারের কায়দায় ছন্দ, বাট, বোল বানানা প্রভৃতি লক্ষণীয়। এই ঘরে বিলায়েৎ খাঁর পিতা নখন খাঁ বিলম্পত লয় ও দানেদার লপেটতান জোড়েন। সদারঙ্গ ঘরের শিষ্য বদল খাঁ ও ফৈয়াজ মহম্মদ খাঁ এই ঘরাণার গুণী গায়ক ছিলেন। স্বনাম ধন্য ফৈয়াজ খাঁকে আগ্রা ঘরাণার রত্ন বলা হত। ফৈয়াজ খাঁ সম্ভবতঃ নখন খাঁর প্রভাবে গায়কীতে নূতন ঢং এনে এই ঘরাণার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্যবর্ষের মধ্যে দিলীপচাঁদ বেদী, নিসার হুসেন, বোখাইয়ের অজমত হুসেন, পণ্ডিত রতন বানকার, বশীর খাঁ, আতা হুসেন, মহতাব হুসেন, মালিকাজান, কলিকাতার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রথীন চট্টোপাধ্যায়, দীপালী নাগ, অর্পণা চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ( “হামারে সঙ্গীত রত্ন” পৃ: ২৪২ )

**পাঞ্জাব ঘরাণা বা পাতিয়ালা ঘরাণা :** দিল্লী ঘরাণার তানরস খাঁর কাছে আলিয়া ফতু ( ফতে আলি ও আলি বকস ) তালিম নেন। এই তানরস খাঁ নিজেকে শ্রীচন্দের ঘরাণার বলতেন। অত্রৌলী ঘরাণা লেখার সময় এঁদের কথা বলেছি। আসলে এঁরাই পাতিয়ালা ঘরের জন্ম দেন। অনেকের ধারণা বড়ে মিঞা কালু খাঁর শিষ্য এবং বড়ে গুলাম আলীর

কাকা কালে খাঁ পাঞ্জাব ঘরাণার প্রবর্তক। বর্তমানে বড়ে গুলাম আলি এই ঘরাণার নাম উজ্জল করেন। বড়ে গুলাম আলির পুত্র মুনব্বর আলি এই ঘরাণার একজন ধারক। এই ঘরাণার গায়ক নজাকত ও সলামত খাঁও যথেষ্ট সুনাম করেছেন। গুলাম আলি খাঁ সাহেবেব শিষ্ণু-শিষ্ণাদের মধ্যে কলিকাতার মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ;

**বেনারস ঘরাণা :** ঠাকুর দয়াল মিশ্র থেকে শুরু। ইনি সদারঙ্গ অদারঙ্গের কাছ থেকে খেয়াল শিখেছিলেন। এই ঘরে মনোহরজী ও হরপ্রসাদজী ( যিনি আপনার খ্যাতির কারণে প্রসিদ্ধ মিশ্র নামে খ্যাত ) ছিলেন। এই দুইজন গুণীই এই ঘরাণার প্রধান প্রচারক হিসাবে সম্মান পান। প্রসিদ্ধজীরা ( অনেকে বলেন প্রসাদ থেকে প্রসাদজী ও পরে প্রসিদ্ধজী হয়েছে ) শাদী মিঞার কাছে টপ্পাও শেখেন। এই দুই ভাই কালী নরেশ আয়োজিত ৪১ দিন ব্যাপি বিশাল সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে নির্বাচিত হন। এঁরা কথক ঘরের লোক বলে এঁদের ছন্দ চাতুর্য্য অপরূপ ছিল। এঁদের গানের চালে বহিলবার চালও দেখা যায়। ( “হামারে সঙ্গীত রত্ন” পৃ: ২৩৮ ) এই ঘরাণার পশুপতি সেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র লয়কারীর বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষ গুণী ভানু মিশ্র ও রামকৃষ্ণ মিশ্রের নাম এই ঘরাণাকে উজ্জল করে। রামকৃষ্ণজীর ছোট ভাই বিষ্ণু মিশ্র বর্তমানে মালদহে থাকেন, ইনিও এই ঘরের একজন ধারক। এরপরে বেনারসের ঘরে নানা বিভাগ এল। রামু মিশ্র, ছোটেরাম দাস, শ্রীচন্দ্র মিশ্র, বড়ে রাম দাস প্রভৃতি অনেক গুণীরা বেনারসেব বিশেষ গায়করূপে পরিচিত হন।

**রামপুর ঘরাণা :** বিভিন্ন ঘরাণার উস্তাদেরা রামপুরে এসে এক বিশাল সঙ্গীত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। তাই রামপুরের নিজস্ব ঘরাণা বলতে কিছু ছিল না। সেনী ঘরাণার বাহাদুর হোসেন, আমীর খাঁ, ছম্মন খাঁ, বজীর খাঁ, কবাল ঘরের বাকর আলি খাঁ প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণার নাম শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। কলিকাতার উস্তাদ দবীর খাঁ, মেহেদী ছসেন খাঁ প্রভৃতি গুণীরাও রামপুর ঘরাণার বলে পরিচিত হন। যদিও প্রথম জন সেনী ঘরাণা ও দ্বিতীয় হলেন কবাল বাচ্চা ঘরাণার ঘরাণেদার।

**বিষ্ণুপুর ঘরাণা :** ঙ্রপদের ঘর হলেও খ্যাল গানেও এঁদের দক্ষতা আছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাল গানে এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের বাহক। (ধ্রুপদের ঘরাণা দেখুন)

ঘরাণা স্বয়ং অনেক সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান খণ্ডে সম্পূর্ণ লেখা সম্ভব হল না।

**টপ্পা :**—মধুর ভঙ্গী, কিন্তু যেন কালচার-মুক্তাদানার কঙ্গী। জৌলুয ওর কিছু থাকলেও লালিত্য তেমন নেই। সাঁচা মতির হারের কাছে ওর পরাজয় ঘটে, অবশ্য ধনীর ঘরে ওর সামান্য কিছু মান আছে, ও একেবারেই খুটে নয়। ধ্রুপদ খেয়ালের মত গভীর রসসৃষ্টি ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওর দানাদার তানগুলো একঘেয়ে, একই ধরনের পুনরাবৃত্তি, প্রকৃতরস উপভোগ করা যায় না। যে রস ওর আছে তা আমাদের মনকে গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। ওর জমকালো জরীর সাজ আমাদের হঠাৎ চমকে দেয়, কিন্তু মরমে পরশ লাগাতে পারে না। শোনা যায় আগে পাঞ্জাবের গ্রাম্য সঙ্গীতের মাঝেই ওর ঠাই ছিল, গ্রাম্য চালেই পাঞ্জাবের উষ্ট্রপালকেরা ওকে হৃদয়ে পালন করতো। বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পাঞ্জাবী রমণীরা সকলে মিলেমিশে ওর সুপ্রিয়তা বজায় রাখতো। \*

আজকের দিনের প্রচলিত এই টপ্পা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা অষ্টাদশের প্রথমদিকে চালু হয়েছে। পাঞ্জাবের শেরী মিয়া এর প্রকৃত উন্নতি সাধন করে এতে রেরক মুরকের কায়দা ও ফিকরাবন্দীর চলন দিয়ে সাজিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দরবারে একে নিয়ে আসেন। টপ্পা, রাগের বাঁধনকে সর্বতোভাবে মেনে চলে, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঠাই পেয়েছে। তাছাড়া ওর নিজস্ব একটা ধরণ বা চলন আছে যেটা ওর আভিজাত্য বলে ও দাবী করতে পারে। এইসব কারণেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ও একটা আসন পেল, পেল না কোন উঁচু আসন, কেবল আসরে বসবার একটা অল্পমতি পেল।

টপ্পা শেরী মিয়াগর নামে চালু হলেও এর প্রচলন-কর্তা আসলে গুলাম নবী রহুল, তিনি নিজের ছদ্ম নামে এটা চালু করেছিলেন। অনেকের ধারণা তাঁর প্রণয়িনীর নামেই তিনি এটি চালু করেন কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে সেটিও ঠিক নয়। শেরী শব্দের অর্থ স্বন্দর। আমরা গুরদজ্জেরের রাজত্বকালে

• “নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্দী অভিধানে লেখা আছে যে টপ্পা এক প্রকার চলতি পাঞ্জাবী গান এবং আরও লেখা আছে যে এক প্রকার ঠেকা যা তিলবাড়া জ্বালে বাজান হয়। ঠেকার কথাটি আমাদের ঠিক বলে মনে হয় না।

টপ্পার নাম দেখতে পাই, সেটি তখন 'ডপ্পা' এই বিকৃত নামে চালু ছিল, তবে তার চলন আজকের দিনের টপ্পা থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। পাঞ্জাবী কবাল ঘরাণার খ্যাল গায়কদের ঘরেই এর জন্ম হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। বাংলাদেশে ১৭১৫ খৃঃ স্বর্গীয় রামনিধি গুপ্ত বাংলা ভাষায় টপ্পা চালু করেন, যেটি নিধু বাবুর টপ্পা নামে আজও প্রচলিত। অনেকের ধারণা তিনি শোরী মিঞার নকল করেছিলেন, অনেকে বলেন যে তিনি শোরী মিঞার কোনও আত্মীয়ের বা ছাত্রের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

টপ্পা গানে আমরা পাঞ্জাবী ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। যে সব রাগে খেয়াল গান তার স্বভাবিক স্ফুর্তি পেত না, যেমন ভৈরবী, কাফী প্রভৃতি ঠুংরী গানের উপযুক্ত সেই সব রাগেই সাধারণতঃ টপ্পার গান বাঁধা হত। এইসব রাগ খেয়ালের থেকে ভিন্ন ধরণের। রাগের চটুলতা, কোমলতা ও বিচিত্রতা দেখানোই টপ্পার বৈশিষ্ট্য। গম্ভীর প্রকৃতির রাগে টপ্পা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বলেই ঐ সব রাগে টপ্পার চলন নেই। ছুটি মাগ্‌ষের অন্তরের প্রেম ও বন্ধুত্বের বিষয় প্রভৃতির ভাব নিয়েই টপ্পার গান রচিত। কখনও কখনও ভগবানের কথা অথবা কিছু কাল্পনিক বিষয়ের রচনাও দেখা যায়। টপ্পার ভাষা পাঞ্জাবী একথা আগেই বলেছি, তালে পাঞ্জাবী তালই নানা রূপ ভেদে ব্যবহার করা হয়। এই টপ্পার সঙ্গে মিশে টপ্প-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। টপ্পাই ঠুংরীর প্রথম সোপান, তার আবিষ্কারের উৎস। আজকের দিনে টপ্পার চলন নেই বলেই চলে।

(১) লখনৌ ঘরাণা :—শোরী মিঞা থেকে এসেছে। শোনা যায় কবাল ঘরেও টপ্পা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতি বিশেষ ঝোক থাকায় টপ্পাদার হিসাবে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

(২) রামপুর ঘরাণা :—আসরফ্ খাঁর শিক্ষাতেই সৃষ্টি হয়।

(৩) বনারস ঘরাণা :—মনোহর ও পরসদু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

(৪) বাংলা ঘরাণা :—দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঘরাণা গড়ে উঠে ইমাম বাঈ ও রমজান খাঁর সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ঘরাণা গড়ে ওঠে বেনারসের মিশ্র বংশের সহায়তায়।

ঠুমরী :—ঠুং শব্দ থেকে ঠুমরী আসেনি। ঠুনকো অর্থে ক্ষণভঙ্গুর সেই হিসাবে আমরা ঠুনকো গীত, বা ছোট ছোট গীত এই মনে করতে পারি। নৃত্যের একপ্রকার বিশেষ স্ফুর্ পদক্ষেপকে হিন্দীতে ঠুমক বলা হয়। এই

ঠুমক্ শব্দ থেকেই ঠুমরী নামটি এসেছে। নাচিয়েদের ঘর থেকেই ঠুমরী চালের গানের জন্ম এবং সেই কারণে কালকা-বিন্দাদিনের ঘর থেকে ঠুমরী প্রকাশ পেয়েছে বলা হয়। আমরা কালকাবিন্দার নামে গাঁথা কিছু ঠুমরী গানের রচনা দেখতে পাই। যারা ঠুমরীর জন্ম নাচিয়ের ঘর থেকে বলেন তাঁদের মতকে আমরা অমান্য করতে পারি না, তবে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। জন্মের কথায় পরে আসছি, আসলে ঠুমরী হল সোনার কাঠি, ওর পরশে হাজার হাজার যায় খুলে। তানের টানে, মীড়ের মোহে, নানা রং মেশান স্বরের জানে ও রচে স্বর-স্বর্গের ইন্দ্রজাল। প্রাণের মাঝে জ্বালায় রং মশালের রঙ্গীন আঙুন। বিচিত্রতায় ভরা, যেমনি মধুর তেমনি লাবণ্যময়ী। ও হল সুন্দরী তিলোত্তমা, তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে ওকে ভরিয়ে তোলা হয়। ঠুমরী হল ধ্রুপদের দৌহিত্রী, তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে জড়িত থাকলেও ওর নবীন বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব। ওর পিতৃদেব খেয়াল রাগরূপকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি. সে স্বাধীনতা চেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় নি, ওর বোন টপ্পাও এ ব্যাপারে হার মেনেছে। কিন্তু ঠুমরী তার স্বরস্বষ্টির চাতুরীতে পেয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, রাগমুক্তি। ও অসবর্ণা, তাই রাগের জাত মানে না, যখন যেমন খুলী মিশিয়ে চলে নানা রাগের সৌন্দর্য্যকে। ও জড়োয়ার নেকলেশ, বসিয়ে দেয় মুক্তার পাশে চুর্ণা ও পান্না, আবার হীরার দ্যুতির বলকণ্ড দেখা যায় ওর গাঁথুনীতে। ও পাঁচফুলের সাজী, সেখানে রয়েছে রজনীগন্ধার পাশে গোলাপ, আবার তারি পাশে দেখা যায় স্বর্ণচম্পা, মাঝে মাঝে ছোট নানা বাহারী পাতা, এক অপূর্ব মিশ্রণ, অফুরন্ত উচ্ছলতা। প্রাণশক্তিতে মহীয়সী এই ঠুমরী। নিত্য নব নব রূপে ও ভয় করে চলেছে শ্রোতার হৃদয়। ওর সম্পূর্ণতা নেই, ওর সম্পদ বেড়েই চলেছে নানা জনের নানা দানে।

শোনা যায় ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকেই ঠুমরী গান চলে আসছে, তবে সেকালের কোন ঠুমরী গায়কের নাম ধাম আমরা এ পর্যন্ত পাই নি। ইংরাজ রাজত্বের সময় লর্ড ডালহাউসী ১৮৫৬ খৃঃ লক্ষ্মোয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যখন মেটেক্রপজে নির্বাসিত করেন তখন থেকেই ঠুমরীর চলন প্রাধান্য লাভ করে। নবাব ওয়াজিদ আলিশার সভায় একশো-দশ জন সভা-গায়ক গায়িকা ছিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই ঠুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই ছিলেন না, নাট্যগীতি বা কাব্যগীতির রচনাও তিনি উৎসাহী ছিলেন, অনেক গীতিকাব্য রচনাকে তিনি ঠুমরী নামে প্রচার করেছিলেন। তাঁর

এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলি কদর তাঁকে এই রচনার বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, “কদরপিয়া” এই ছদ্ম নামে তিনি ঠুমরীর জন্ম অজস্র গান রচনা করেছিলেন। এই ঠুমরীতে ব্রজভাষা বা পূর্বাভাষা ব্যবহার করা হত। এতে দুই থেকে ছটা আটটা পর্যন্ত তুক চালু ছিল। বিস্তারে কিছু খেয়ালের শুদ্ধীও থাকতো। এই সময়ে “লখনৌ ঠুমরী তাল” বলে একটি তালও চলেছিল যা ঠুমরী গানের সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া তিনতাল, একতাল ও পাঞ্জাবী ঠেকাতে ঠুমরী গাওয়া হত। ঐ সময়ে আরও দু এক জনের ঠুমরী গান রচনার কথা শোনা যায়। তাঁরা হলেন ইয়াশপিয়া, চাঁদশা প্রভৃতি। এঁদের অনেক গান লিপিবদ্ধ আছে, তবে এঁরা কোথা থেকে ঠুমরী গান শিখেছিলেন তার ঠিক ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। ঠুমরীর জন্মস্থান লক্ষৌ, দিল্লীর আশে-পাশে বা অন্য কোথাও হতে পারে, সেটি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।

লক্ষৌ ঠুমরী থেকে জন্ম নিল বেনারসী ঠুমরী, যাকে অনেকে পূর্ববা ঠুমরী বলেন। শোনা যায় আলীবক্স খাঁ, মুন্সে খাঁ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্যাল গায়কেরা ঠুমরী অপূর্ব গাইতে পারতেন, তবে তাঁরা কোন সঙ্গীতগরে তা পেশ করতেন না। কলকাতায় ষাঁরা ঠুমরীকে চালু করেন, তাঁদের মধ্যে ভাইয়া-সাব গণপংরাও এবং মৈজুদ্দিনের নাম সকলেই করেন। শামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব ঠুমরীতে উস্তাদ ছিলেন। তাছাড়া মোতী বাদ্গ, অচ্ছন বাদ্গ, জর্দন বাদ্গ, গহর বাদ্গ, মালকাজান, প্রভৃতি বাদ্গদের দানও কম নয়। এইসব বাদ্গরা অনেকেই মইজুদ্দিনের কাছ থেকে তালিম পেয়ে ছিলেন। আর একজন বাদ্গালী গুণী স্বর্গীয় উস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর দানও অস্বীকার করা যায় না। মৈজুদ্দিন ঘরাণার এবং ভাইয়া সাহেবের ঠুমরীর তিনি একজন ধারক ও বাহক ছিলেন। অনেক সাগীর্দকেই তিনি যত্ন করে ঠুমরী শিখিয়ে গেছেন। ওয়াজীদ আলির ঠুমরী যখন চলছে, তখন কবাল ঘরের সাদেক আলি লচাঁও ঠুমরীর প্রচলন করেন। অনেকের ধারণা যে বর্তমানের এই ঠুমরী সাদেক আলির ঠুমরীর অল্পসরণ। বর্তমানে উস্তাদ গোলাম আলি প্রভৃতির ঠুমরীকে পাঞ্জাবী ঠুমরী নাম দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবী “খড্ডা” তাতে মেশান আছে। ঠুমরী পরিবর্তনশীল, সবরকমের ষ্টাইল, সবরকমের সুন্দরতার মিশ্রণেই ওয় বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রতাই ওয় শ্রাণশক্তি। আজকাল হোলীর গান, দাঁদরার গান, এমন কি কাজরী, চৈতী প্রভৃতি জাতীয় গানকেও অনেকে ঠুমরী বলেন, সেটা ঠিক নয়।

আধুনিক ঠুমরীতে ছুটি তুক থাকে, কখনও কখনও তিন চারটে তুকও দেখা যায়। কিছু লচাও ভাব থাকে স্থায়ীর শেষে লগ্গীর ব্যবহার হয়, এবং লড়ীর মত তান দিয়ে বা মুখে এসে শেষ করা হয়। ঠুমরী সাধারণতঃ পাঞ্জাবী তালে, আটমাত্রা এবং সাত মাত্রার ষংতালে, বিলম্বিত অথবা মধ্য লয়ের তিন তালে কিম্বা ছেপকা অথবা আন্ধায় গাওয়া হয়। দাদরা তালের ঠুমরীকে দাদরা বলা হয়, অনেকে এটিকে ভিন্ন এক জাতের ঠুমরী বলেন। ক্চিং ঠুমরী অল্প দু একটি তালেও শোনা যায়। ( দাদরা দ্রষ্টব্য )

**দাদরা :** ঠুমরীর সহোদরা এই দাদরা। দুই বোন একই ঘরের একই শিক্ষায় গড়ে উঠেছে। তাই ওদের চলাফেরা একই রকমের। জন্ম উত্তর প্রদেশে বলে মনে হয়, তবে জন্মের সাল তারিখ আমাদের জানা নেই। অনেকে বলেন দাদর শব্দটি থেকে দাদরা কথাটি এসেছে। আমাদের ধারণা ধমারের মত এই গীতি পদ্ধতিরও নামকরণ হয়েছে তালের নামে। দাদরা তালে গীত হয় বলেই এর নাম দাদরা। ( ক্চিং কাহারবা তালেও শোনা যায়। )

দাদরা গানে একটি দোলন আছে যার প্রকাশ সঙ্গী ঠুমরীর থেকে হালকা, লয় অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও ছন্দবৈচিত্রে সমৃদ্ধ। ঠুমরীর মত বোল বিস্তার বা 'বোল বানানা' দাদরায় বেশী করা হয় না। ঠুমরীর মত এতেও রাগের জাত মানা হয় না। কথা দিয়ে স্বরের কাজে নানা চটুল ছন্দ রচনাই এর বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবী ঠুমরীর মত 'খড্ডা' মিশিয়েও রং ভরা হয়। রচনায় দেশীয় ভাষা, মৈথিলী, উর্দু অথবা হিন্দী ভাষার পরিচয় মেলে।

**ঠুমরী ঘরাণা :** (১) **লক্ষ্মী ঘরাণা :** - ওয়াজেদ-আলি-শা ও কদর পিয়া এই ঘরাণার প্রবর্তক! খেয়ালের লঘু চালের সঙ্গে ভাও বা অভিনয়ের ভঙ্গিমা যুক্ত করে এর সৌন্দর্য বাড়াই হয়েছে। পরে সাদেক আলি এই ঘরে লচাও ভাব ও টপ্পার সূক্ষ্ম কাজের ব্যবহার আনেন।

(২) **বনাল্লস ঘরাণা :** মৈজুদ্দীনের প্রভাবে এই ঘরাণা, খ্যাতনামা বাঈজী-দের সহায়তায় গড়ে উঠে। দাদরা ও লোক-সঙ্গীতের মিশ্রণই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। দানেদার টপ্পার তানও শোনা যায়।

(৩) **বাংলা ঘরাণা :** গণপত রাও ও ওয়াজেদ-আলি-শার প্রভাবে এই ঘরাণা গড়ে ওঠে। এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যে লচাও ভাবের আধিক্য দেখা যায়।

(৪) **পাঞ্জাব ঘরাণা :** স্বর্গীয় বড়ে গুলাম আলি খা সাহেব এই ঘরাণার প্রবর্তক। পাঞ্জাবী খড্ডা এর বৈশিষ্ট্য।

**সাদরা :** ঋপদের সহোদরা এই সাদরা ঋপদের মত অত গম্ভীর না হলেও চটল বা চপল-মতি নয়। খ্যালের সামাগ্র কিছু কায়দা এতে দেখা যায় ঋপদের ভাবে। এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে ঋপদ বলাও চলে না আবার খ্যাল বলে ধরলেও ভুল করা হবে। প্রায় আটশো বছর আগে সুলতান হোসেনের আমলে যখন জোঁনপুরে 'চুটকলা' জাতীয় খ্যালের প্রচলন ছিল, তখন দু-লাইনের একধরণের গান সুলতান যুদ্ধের গান বলে সৃষ্টি করেন এবং সেই গানের নাম দেন সাধু চুটকলা।<sup>১</sup> মির্জা খাঁর গ্রন্থ থেকে জানতে পারি যে সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে সাধুরা চুটকলার কদর ছিল। ঐ পুস্তকেই সাধুরাকে যুদ্ধবিষয়ক গীত বলা হয়েছে। গানটি কোন্‌ টং-এ গীত হত সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে আমাদের ধারণা টাড়ী ও কাবালদের হাতে সাধুরা চুটকলাই নানা পরিবর্তনে বর্তমানের সাদরা।

এর ভাবায় সরল ব্রজভাষার আধিক্যই নজরে পড়ে। যুদ্ধের গান থেকে উৎপত্তি হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে ঋপদের মত ভগবৎ প্রার্থনাদিই দেখা যায়।

অনেকের মতে খ্যাতনামা সঙ্গীত-নায়ক বৈজু বাওয়ার শিষ্যদ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথই এই ধরণের গীতপদ্ধতির স্রষ্টা ও প্রবর্তক।<sup>২</sup> দিল্লীর কাছে শাহাদারা গ্রামে তাঁরা বাস করতেন এবং সেই গ্রামের শাহদারা নাম থেকে এই সাদরা নামটি চালু হয়েছে। আমরা ঋপদের বাণীর বেলায় যেমন তাদের এক একটি স্থানের নামের সঙ্গেই জড়িত দেখতে পাই এটিও সেইরূপ।

ঋপদাঙ্গের বিষয় গ্রহণ করলেও এর বিস্তারে খেয়ালের ভাব দেখা যায়। তানকে বাদ দিলেও এর দ্রুত অঙ্গে ফিকরাবন্দির কাজ করা হয়। আবার ধামারের বাট বাটোয়ারার কাজও এতে সামাগ্র থাকে। ঝাঁপতালেই বেশী গাওয়া হয়, কচিং রূপক বা শূলতালেও সাদরা শোনা যায়।

**তেলেনা, তরানা বা তিল্লানা :** 'তরানা' ফার্সি শব্দ এবং এক প্রকারের গান। তিল্লানা শব্দটিও ফার্সি "তিলা" শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় তরানাকে তেলেনা বলা হয়। আমীর খসরোকেই এর আবিষ্কারক বলা হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তরানা ও তেলেনা এই দুই প্রকার গানে ভিন্ন ভাবে ভাষার ব্যবহার

১। মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা—শ্রীযুক্ত রাক্ষসধর মিত্র—পৃঃ ৫৪।

২। সঙ্গীতকোষ—শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।

ছিল। আমরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময় নির্গীত\* নামের গীত পাই যাকে বহির্গীত বা নিরর্থক গীতও বলা হত। এই ধরণের নিরর্থক শব্দ ( বাণী ) যুক্ত গান প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলে গুণীরা মনে করেন। এই নির্গীতই বর্তমানের তরানা একথা অনেকে প্রমাণ করেছেন। দেবর্ষি নারদকে এই ধরণের গীতের রচয়িতা বলা হয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে এটি ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রাচীন গীতশৈলী। আমীর খুসরোকে এর আবিষ্কারক বলা যায় না। খেয়াল গায়কেরা প্রায়শঃই তেলেনা বা তরানা গেয়ে থাকেন। তরানাতে নে, তে, রে, দৌম, তানা, না ইত্যাদি অথবা আদানি, তাদানি, তানি, আলা, আলি, আলালুম প্রভৃতি নিরর্থক বোল ব্যবহার করা হয়, পণ্ডিতেরা বলেন যে এগুলি কেবলমাত্র নিরর্থক বোল নয়, এগুলির দ্বারা ভগবানের নাম ও কথাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। কঠে আলাপের দ্রুত লয়ে তেলেনার ভাব প্রকাশ পায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও দ্রুতের সময় তেলেনার আভাষ মেলে। খ্যালের মত তরানায় রাগের সমস্ত বীধন মেনে চলা হয়, নানা ধরণের তান, ছোট ছোট দাঁড়া বিস্তারও করা হয়। তরানা অধিকাংশ সময়েই দ্রুত চালে গাওয়া হয়। কচিং মধ্যলয়ের তরানাও শোনা যায়। অনেকেই টিমা বা মধ্যলয়ের খেয়াল গানের পর দ্রুত তরানা গেয়ে থাকেন। মুঘল যুগে তরানায় কিছু কাব্যাংশ থাকত কিন্তু তেলেনায় শুধু অর্থহীন বোলই ব্যবহৃত হত। দ্রুত তিনতাল, দ্রুত ঝাঁপতাল বা দ্রুত একতালেই তরানা বেশী গাওয়া হয়। ছোট বড় প্রায় সকল রাগেই তরানা গাওয়া হয়। যন্ত্রের চালে অতিদ্রুত লয়ে গাওয়া ও লয়কারীর কাজ দেখান তরানার এক বৈশিষ্ট্য। তরানার টিমা গান কচিং শোনা যায়।

**ত্রিবিট :** আমাদের প্রাচীন স্তোত্র জাতীয় গীতই আমীর খুসরোর সময়ে ত্রিবিটে রূপান্তরিত হয়। Rev. Popley সাহেব তাঁর Music of India নামক বইটিতে লিখেছেন—“It is a song beloved of Bcatmen and Dhooly bearers as they take Sahib to his destination” ত্রিবিট বা তেলেনা কোনটিই ঢুলি, পালকিবাহক, বেয়ারা বা নৌকার মাঝীদের গান ছিল

\* ভারত নাট্য শাস্ত্র ( গায়—সংস্ক—অঃ e ) এতে দেখা যায় যে লয়তালযুক্ত নির্গীত গান গর্ভ সত্যয় গাওয়া হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রে স্তোত্রাকর ব্যবহৃত হত। নির্গীতেও স্তোত্রাকর ও শুকাঙ্করের ব্যবহার দেখা যায়। দেবর্ষি নারদকে নির্গীতের স্রষ্টা বলা হয়। আমীর খুসরো নির্গীতের সঙ্গে কোন ফার্সী গানের চালের মিল দেখে, এই জাতীয় গানকে তরানা বলে চালিয়ে দেন।

না বা এখনও নাই। তাঁর এই ধারণা সম্পূর্ণ অর্থোক্তিক। ত্রিবিট তিনতুকবিশিষ্ট একপ্রকারের তেলেনা জাতীয় গান। এর প্রথম চরণে আলাপের বোল, দ্বিতীয় বা তৃতীয়ে তবলা পাখোয়াজের বোল এবং সরগম যুক্ত থাকে। বর্তমানে ত্রিবিট কচিং শোনা যায়। তিন তুকের কারণেই এটি ত্রিবিট নাম পেয়েছে। মুঘল যুগে এটিতে চারটি পর্যন্ত কলি থাকত এবং এই গানের সঙ্গে পখাবজ ব্যবহৃত হত।<sup>১</sup>

**চতুরঙ্গ :** তরানা জাতীয় এই ধরণের গানে চারিটি তুক থাকে। প্রথম তুকের বাণীতেই আমরা চতুরঙ্গ শব্দটি পাই, দ্বিতীয় তুকে থাকে সরগম, তৃতীয়ে তরানার মত নিরর্থক বোল ও চতুর্থে তবলা পাখোয়াজের বোল থাকে। চারটি তুকে চার প্রকার বিশেষ বিশেষ বোলই এর বৈশিষ্ট্য, বাকী সব তরানারই মত।<sup>২</sup>

**গুলনকুস :** আমীর খুরোর সময়েই গজিয়ে উঠেছিল এই ধরণের গান। কোন সঙ্গীতাসরে বর্তমানে এই গান শোনা যায় না। আমরা বেনারসের উস্তাদ শ্রীচন্দ্র মিশরের কাছে গুলনকুস শুনেছি। আরবী অথবা ফার্সী ভাষায় তৈরী এই বিশেষ চালের খ্যালে “গুল” এই শব্দটির উল্লেখ থাকে। অনেক উস্তাদের কাছে এইরূপ কিছু কিছু পুরাতন চালের জিনিস গুপ্ত থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত, এই জাতীয় গানকে যত্ন করে সংগ্রহ করে রেকর্ড করে রাখা, কারণ এগুলি জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এই গান থেকেই আমীর খুরো ছোট খেলার সৃষ্টি করেন। মুঘল যুগে নকুস বলে তরানা জাতীয় এক ধরণের গীত প্রচলিত ছিল।

**লক্ষণগীত :** কোন রাগের গতি-প্রকৃতি, তার ঠাট-পরিচয়, তাতে কোন স্বর ব্যবহৃত হয়, তার বাদী, সখাদী, সেটি গাইবার সময় প্রভৃতি বিষয় যে গানের বাণীর মধ্যে বর্ণিত থাকে তাকেই লক্ষণগীত বলা হয়। প্রায় সকল রাগেই লক্ষণগীত ভিন্ন ভিন্ন তালে পাওয়া হয়।

**স্বরবর্ত, স্বরমালিকা, সরগম বা বন্দিশ :** রাগোচিত নানা স্বর স্বন্দর করে সাজিয়ে তালে বেঁধে মধুর ভাবে পরিবেশন করা হয়। রাগকে ও স্বরকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে তালের বিভেদ বোঝানর জগ্গেই এগুলির সৃষ্টি। যন্ত্রে বাজলে

১। সঙ্গীত রত্নাকরের ত্রিগণ ও ত্রিভঙ্গী শব্দের সঙ্গে ত্রিবিটের মিল আছে। উচ্চারণের দিক থেকে ত্রিগণের সঙ্গে ত্রিবিটের মিল দেখা যায়। (স: র: ৪র্থ অধ্যায়)

২। পার্শ্বদেবের “সঙ্গীত সময় সার” গ্রন্থে বর্ণিত চতুরঙ্গ শব্দের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।

এগুলি বোলহীন গতের মতই শোনায়। প্রায় সমস্ত রাগের সরগমেই ভিন্ন ভিন্ন তালে বাঁধা বন্দিশ আছে।

**রাগমালা বা রাগসাগর :** কোন গান, তাতে যে বিষয়েরই বর্ণনা থাকুক, পরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাগ ও তালে বেঁধে গাওয়া হয়। প্রথমে যে রাগে গানটি আরম্ভ করা হয় তার থেকে পরের সময়োচিত রাগ, এবং তার পরের সময়ের রাগ এইভাবে পর পর উপযুক্ত সময়ের রাগ গেয়ে পুনরায় যে রাগে আরম্ভ করা হয়েছিল তাতে শেষ করাই বিধি। অনেকে যে কোনও পাঁচ বা দশটি রাগ গেয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত রাগে ফিরে এসে রাগমালা বা রাগসাগর গেয়ে থাকেন।

**বিষ্ণুপদ :** বিছাপতি রচিত ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান এবং যে সকল গানে ভগবান বিষ্ণুর কীর্তন থাকতো সেগুলিকে বিষ্ণুপদ বলা হত। স্বরদাস প্রভৃতি গুণীরা বিষ্ণুপদ শৈলীর গানের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। এই গান ধ্রুপদের কায়দাতেই রচিত হত। এই গানের কোন নির্দিষ্ট পদসংখ্যা স্থির থাকতো না, যত ইচ্ছা তত পদই গান করা হত। বর্তমানে বিষ্ণুপদ লুপ্ত বলা চলে।

**কণ্ডল-কালবান :** এই গান বর্তমানে কাওয়ালী বা কবাল গান বলে প্রচলিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গান প্রায় সীমাবদ্ধ। জগদীশ্বরের স্তুতি ও মুসলিম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের গুণকীর্তনই এই গানের একমাত্র বিষয়বস্তু। কবালেরাই এই গান গেয়ে থাকেন।

**জাত বা জট :** বর্তমানে এই ধরনের গানের প্রচলন দেখা যায় না। এই গানের এক একটি পদ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হত। গানের প্রতিটি পদ-ও ভিন্ন ভিন্ন রাগে বাঁধা হত। গুণী পরিবেশকেরা কখনও কখনও প্রতিটি পরে তালফেরতা ( তালের বিভিন্নতা ) দেখাতেন।

**কড়খা :** ৬শ্বেত্রমোহন গোস্বামী কৃত সঙ্গীতসারে লেখা আছে, "স্তুতি-পাঠক বন্দীবর্গ যে সকল গান সহকারে রাজাদের গুণকীর্তন বা স্তুতিবাদ করে তাহার নাম কড়খা।" এই গান রাজপুত্র ভাষায় রচিত হয়। কড়খা-গায়ক ব্যবসায়ীদের **টাড়ী** বলে। রাগদর্পণে লেখা আছে—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। ৪৮টি কলি থাকে। ছটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গীত হয়।

**জিগর :** এক ধরণের অব্যাক্ত বিষয়ের গানকে মুসলমান উস্তাদগণ জিগর বলে থাকেন। এই জিগর জাতীয় গান বর্তমানে প্রচলিত নাই। গুজরাটি গায়ক কাজি মামুদ এই জিগর গানের স্রষ্টা ছিলেন। ৩শ্বেত্রমোহন গোস্বামী রুত সঙ্গীতসারে এই জাতীয় গানের উল্লেখ আছে।

**ভজন :** ভক্তিমূলক গানকে ভজন গান বলা হয়। এই গান ভাবপ্রধান। ভক্তিরসে ডুবে শ্রীভগবানের চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করার ভাবই এই গানে থাকে। যুক্তিসঙ্গত এবং সেই মনোভাব নিয়েই এ গান পরিবেশন করা উচিত। সাধারণতঃ এই গানের ভাষা ও স্বর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। স্বরদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতির গানগুলির রচনাতে আমরা এই সহজ সরল ভাবের বিকাশ দেখতে পাই। এই গান পরিবেশন কালে এর ভাবার উচ্চারণভঙ্গীর শুদ্ধতার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ভজন গানকে পূজার একটি অঙ্গ বলে মনে করে শ্রীভগবানকে একান্ত ভাবে পাবার জ্ঞান ও তাঁর জগুই এই গান, এরূপ মনোভাব রেখেই ভজন পরিবেশন করা উচিত।

**চৈতী :** বিহার প্রদেশে এটি চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলেই এর নাম চৈতী। এটি বিহারের লোকসঙ্গীত বলেই প্রচলিত। চৈতী আদি রসাত্মক বিরহের গান। সাধারণতঃ রাম-সীতাব লীলা-মাহাত্ম্য নিয়েই এই গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ও গীত হয়ে থাকে।

**গজল :** গজল শব্দটি আরবি শব্দ, শব্দটির অর্থ প্রেমিকার সহিত কথোপকথন, তাই গজলকে প্রণয়-সঙ্গীত বলা হয়। আসলে একে কাব্যসঙ্গীত বলাই ভাল। গজলের জন্মস্থান পারস্য। ইরানীরা ফার্সী ভাষায় এই গান গিয়ে থাকেন। এর কবিতায় প্রতি স্তবকে ছুটি করে চরণ থাকে সেই ছুটি চরণের মাঝেই এক একটি ভাব প্রকাশ পায়। স্তবকগুলি দ্ব্যর্থ বোধক, সাধারণতঃ পাঁচ থেকে এগারটির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। গজল যেমন একদিকে প্রণয়-সঙ্গীত অত্রদিকে আবার ভাব-সঙ্গীত। গজলের কবিতার “শের”গুলির অর্থ (শের অর্থে চরণ) দুভাবেই করা যায়। প্রেম যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তখন সে হয় ভাগবৎ-প্রেম; আবার সেই একই প্রেম যখন কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে তখন সে হয় জাগতিক-প্রেম বা মানবী-প্রেম। ওর শেরগুলির অর্থ দুভাবেই করা যায়। ভারতে

গজল উর্দু ভাষাতেই গাওয়া হয়। চলতি উর্দু গজলের ভাবে সস্তা প্রেম জানানোর মামুলি কায়দা। কয়েকটি উর্দু দার্শনিক গজল ছাড়া উর্দু গজলে আমরা স্বরুচীহীন ছেবলামি দেখতে পাই। গজলের স্বর একঘেয়ে লাগে। সব গজলের প্রকাশভঙ্গিও প্রায় একই ধরণের হয়, দু-চারটি গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইরানীরা ফার্সী ভাষায় গজল গেয়ে থাকেন, আমাদের এখানেও দু-একজন ফার্সী ভাষার গজল গান, এই ফার্সী ভাষার গজলকে আমরা উর্দু ভাষার গজলের কোঠায় ফেলতে পারি না। ফার্সী গজলে আমরা গভীর কাব্য রসের সন্ধান পাই। ওর কবিতার ভাবার্থ আমাদের অতীন্দ্রিয়-লোকে নিয়ে যায়। আমাদের অন্তরে জাগায় গভীর অহুভূতি। এর ছন্দে একটা দোলা আছে, ধ্বনিতে আছে লালিত্য, তা ছাড়া বর্ণবন্ধারের সমাবেশ প্রভৃতি এতে যেমন দেখা যায় সে ভাব আমরা উর্দু গজলে পাই না।

ভারতে গজলের প্রবর্তক বলতে আমাদের আমীর খুসরোর নামই মনে পড়ে। আকবর বাদশার দরবারে ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী সঙ্গীতকারগণ, হিন্দু ও মুসলিম সঙ্গীতকারদের সাথে সাথে দরবার গায়ক হিসাবে ছিলেন। এই দরবারের ইরানী কলাকারেরা যে গজল গাইতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সে সময়ে সৈয়দ খাঁ নোহার ও দৌলত আফজু প্রভৃতি গজলের গুণীদের নাম পাওয়া যায়।

বাংলা গজলের অবস্থা বড় দীন। বাংলা ভাষায় প্রথম গজলের প্রবর্তক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু গজল লোকপ্রিয় করে তোলেন কবি কাজী নজরুল, স্বরারোপ করেছিলেন তিনি নিজেই। স্বরকার হিসাবে কাজী নজরুলের খ্যাতি কম নয়, স্বরমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য তাঁর কাছে শেখার মতই ছিল কিন্তু তবুও বাংলা গজলের স্বর তেমন সজীব হয়ে ওঠে নি।

গজলের রচনা শৃঙ্খারসাত্মক। গজলের প্রথম 'শের' অর্থে প্রথম চরণটি স্থায়ী বলে গাওয়া হয়। পরের সব চরণগুলি এক সুরেই অন্তরাতে গাওয়া হয়। গজলে 'জবান' (অর্থে বাণী) খুব সাফ (পরিষ্কার উচ্চারণভঙ্গি) হওয়া দরকার। গজল সাধারণতঃ ভৈরবী, পাহাড়ী, মাগড, বি'বিট, কাফি, খাযাজ, পিলু প্রভৃতি রাগেই গাওয়া হয়। শোস্ত, দীপচন্দ, দাদরা প্রভৃতি তালই এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## কীর্তন

“নামলীলা বিহারাণাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্”

কীর্তন শব্দের আভিধানিক অর্থ গুণকথন বা যশঃখ্যাপন। কোন মহাজনের গুণ, যশ ও কীর্তিগাথাই কীর্তন গান। সাধারণ ভাবে কীর্তন বলতে আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলার মহিমাপ্রকাশক গানকেই বুঝে থাকি। কীর্তনকে কীর্তন-রতন ভাবে আমরা সঙ্গীতের কীর্তি বিশেষ রত্ন এর মাঝে লুকায়িত আছে সে কথাটি ভাবতে পারি। কীর্তনীয়া ও ভাবুক শ্রোতা মাঝেই জানেন যে কীর্তনে সঙ্গীতের কোন বিশিষ্ট রত্ন রয়েছে। কীর্তনের কথায় আমরা সংকীর্তন কথাটিও পেয়ে থাকি। কীর্তন ও সংকীর্তন প্রায় একই অর্থ-বাচক। সংকীর্তনকে ‘সমবেত-গুণগাথা-সঙ্গীত’ বলা যায়। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন তখন তাকে বলা হয় **সংকীর্তন**। বহুজনে একত্রে কীর্তন করতে করতে যখন নগর পরিক্রমা করেন তখন এই সমবেত কণ্ঠের কীর্তনকে **নগর-সংকীর্তন** নামে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত কীর্তিলহরী গান থেকেই বর্তমানের কীর্তন গান এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ভেবে থাকেন, আবার অনেকে একথা স্বীকার করেন না। মহাপ্রভুর রূপায় বাংলাতেই কীর্তন গানের প্রচলন বেশী। সেই কারণে অনেকে কীর্তনকে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সঙ্গীত বলে মনে করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

“কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত।”...

“কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলার। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্তব্ধ করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিম্মোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়।”—সংগীতচিন্তা।

“বাঙ্গালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ ও ফোক ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুর্লভ, তার পরিসর হিন্দী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্যরস আছে, তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।” সুর ও সংগীত—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব উচ্চাঙ্গ ও বৃহদঙ্গ এই সঙ্গীতকে কাব্য-সঙ্গীত, নাট্য-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ভাব-সঙ্গীত প্রভৃতি নানা

নামে অভিহিত করা হয়। স্বর ও ভাবের সুষমায় ভরা, কথার ওপর কথার জাল বুনে একে আবেগে ভরিয়ে তোলা হয়। তালকে মাণ্ড দিয়ে রাগকে সম্মান জানিয়ে, হৃদয়াবেগ ও গভীর ভাবাহুভূতিতে ভরা এই ভাব-সঙ্গীত, লীলা কীর্তনে মহান নাট্য-সঙ্গীতের আকারেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কীর্তনে রাগ মানা হলেও রাগের নিজস্ব মেজাজকে বিশেষ প্রাধাণ্য দেওয়া হয় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ওপর নির্ভর করে ভাব রসে ডুব দিয়ে এখানে আমরা রাগ-রসকে গোঁন করি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি না থাকলে, তাকে একান্ত আপনজন বলে ভাবতে না পারলে কীর্তনে সত্যকার রস সঞ্চার করা সম্ভব হয় না। কীর্তনের মতিগতি, তার প্রাণ, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের। গভীর হৃদয়াবেগই এর সর্বস্ব। সেই আবেগের স্রোতে রাগ নিজেকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। রাগ এখানে গোঁণ, প্রেমাশ্রিত ভাষাই এখানে মুখ্য। কীর্তনের গায়ককে ভাবাহুয়ায়ী ভাষার প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই গায়কের এই অধিকার নাই। কীর্তনের ভাষা, তার স্বর, তার আবেগ, তার ধর্মভাব প্রভৃতি সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশও পৃথিবীর কোন দেশের কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। এটিই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

অনেকের ধারণা যে কীর্তনের জন্মকাল শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব কীর্তনের এক বিশেষ ভাবধারার স্রষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তাঁর আগে সকলের সামনে কীর্তনকে এভাবে কেউ তুলে ধরতে পারে নি। আর কোন মহাজনই বাংলার সর্বসাধারণকে কীর্তনের ভাবে এমন মতিয়ে তুলতে পারেন নি, তাই শ্রীচৈতন্যদেবকেই সকলে কীর্তনের স্রষ্টা বলে মনে করেন। প্রাক-চৈতন্যযুগেও কীর্তন গানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেব, বিষ্ণুপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা হত। ষড়দূর জানা যায় ষাটশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই বাংলা দেশে কীর্তন গানের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

কীর্তনের দুটি বিভাগ, প্রথমটি হল নাম-কীর্তন বা নাম-সংকীর্তন, আর দ্বিতীয়টি হল লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন। “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে”; “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ, প্রভৃতি নাম-গানকেই নাম-কীর্তন বলা হয়। দীনতাসুচক গান, আত্মনিবেদনাদি বিষয়ক গান বা প্রার্থনাদিকে নাম-

সংকীৰ্তনের মধ্যে ধরা হয়। নাম কীর্তনে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তাই বৈষ্ণব সাধক মাতেই নাম কীর্তনের অভিলাষী, এখানে রাগ, তাল, সুর, লয়ের অপেক্ষা নামই প্রধান, যদিও এগুলি বিভিন্ন তালে বা ভিন্ন ভিন্ন সুরে গাওয়া হয়। এটি সাধনার সহজ অঙ্গ, তাই সাংগীতিক মূল্যে নাম-কীর্তনকে যাচাই করা যায় না।

দ্বিতীয়টি হল রস-কীর্তন—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তাঁদের রূপগুণ বর্ণনা, তাঁদের প্রেমলীলা প্রভৃতির বর্ণনা বা প্রশংসাদির বিষয়ই লীলা-কীর্তনের অঙ্গ। এই লীলা-কীর্তনের উচ্চতর গীতশৈলীর ঐতিহাসিক বিকাশ প্রথম ঘটে খেতরির রাজা শ্রীমন্তোষ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় খেতরির মহোৎসবে। শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ সম্বন্ধে তাঁহার “কীর্তন গীত প্রবেশিকায়” (১৩৪৮) লিখেছেন “খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্তনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেব’, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। এরূপ সাধু সজ্জন ভক্ত ভাবুক রসিক গায়কগণের সমাবেশ বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে এই উৎসবে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং খেতরি যে ভাব-বহা আনিয়া দিল, তাহার প্রেরণায় অগণিত ভক্ত কবি, গায়ক, বাদক এই নূতন ভাবের মাদকতায় এক শতাব্দীর অধিক কাল মগ্ন হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবৈতাচার্যের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপনা আর হয় নাই। কীর্তন-সঙ্গীতের উচ্চতম শিখর এই খেতরিতেই অগণিত গুণীগণ সমাবেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানকালেও তাহারই ধারা চলিয়া আসিতেছে”। আবার বিশ্বভারতীর প্রকাশনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহে তাঁর লেখা “কীর্তন” বইটিতে ২৫ পৃষ্ঠায় খেতরির মহোৎসবের কথায় আরও লিখিয়াছেন “গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে গণ্য হন……তিনি তাঁর জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র সন্তোষ দত্তের অছুরোধে গ্রাম প্রান্তে কুটির নির্মাণ করিয়া সেখানে ভজন সাধনে জীবনান্তিপাত করেন”। এই নরোত্তম দাস ঠাকুরই খেতরির মহোৎসবের প্রধান উদ্বোধক ছিলেন। এখানে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পরই বৈষ্ণব জগতের সমস্ত মাহাত্ম্য মহাপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গৌরচন্দ্রিকা অর্থে গৌরানন্দ বন্দনা সহ প্রাচীন রূপদ গানের ভিত্তিতে লীলা কীর্তনের এক নূতন ধারা ঠাকুর নরোত্তম দাস কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়।

ঋগ্বেদ বা খ্যাল গানের ঘরাণার মত কীর্তনেও চার পাঁচটি ঘরাণার নাম পাওয়া যায়। এগুলি বাংলা দেশের এক একটি স্থানের নামেই নাম পেয়েছিল।

(১) **গরাণহাটি** ঠাইল—রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে এসেছে।

(২) **মনোহরসাহী**—বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণা থেকে এসেছে। এই দুই ঠাইলই সবাপেক্ষা প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ ধরণের, এই মনোহরসাহী ঠাইল শ্রীনিবাস আচার্যের আবিষ্কৃত বলা হয়। মনোহরসাহী ঠাইলে নানা কাজ, মীড়, তান, মধুর বিস্তার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য শোনা যায়।

(৩) **রেনেটি ঠাইল**—রাণীহাটি পরগণা থেকে এসেছে। মনোহরসাহী ও রেনেটি একই সময় থেকে প্রচলিত।

(৪) **মন্দারিণী**—মেদিনীপুর জেলার গড় মান্দারণ থেকেই এয় জন্ম। এই চার রকমের ঢঙ আজকের দিনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রচলিত নাই। কোন গায়কই আজ কোন একটি ঢঙে আবদ্ধ থাকেন না। পূজাপাদ পণ্ডিত অম্বৈত দাস বাবাজী, যিনি কীর্তন জগতে “পণ্ডিত বাবাজী” বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বিশেষ বিশেষ ঘরানার চাল নানা জায়গায় ঘুরে শিখে এসেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশিমবাজার রাজভবনে রেখে কীর্তনের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কীর্তনের আর এক ঘরাণা “**ঝাড়খণ্ডী**” নামে পরিচিত, মেদিনীপুরের ঝাড়খণ্ড গ্রাম থেকেই এই চালের উৎপত্তি, বর্তমানে এই ঘরানার গান আর শোনা যায় না।

**কীর্তনে ময়নাডাল :** “আজকাল ময়নাডালের কীর্তন” কথাটি শোনা যায়। ময়নাডাল বীরভূমের একটি গ্রামের নাম, সেই নাম থেকেই ময়নাডাল কথাটি এসেছে। এটি কীর্তনের একটি ঘরানার নাম। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রসরাজ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ই এই ঘরানার প্রবর্তক। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখানেও রসরাজ মিত্র ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কীর্তনের বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু ছাত্রকে কীর্তন শিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকের ধারণা অম্বৈত দাস বাবাজীও মিত্র ঠাকুরের ঘরে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরানার ধারক ও বাহক নবগোপাল ও গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয়েরা এই ধারার কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন।

**কীর্তনের কাব্য :** কীর্তন গানের কবিতাকে “পদাবলী” বলা হয়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে আমাদের অমর মহাকবি জয়দেবই সরল সংস্কৃতে প্রথম পদাবলী রচনা করেন। তাঁর লেখা গীত-গোবিন্দে পদাবলীগুলি পাওয়া

যায়। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলী ও বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। তৎপরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির অনুল্লকরণে “ব্রজবুলি” ভাষায় ও চণ্ডীদাসের অনুল্লকরণে বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত (গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম, বাসু ঘোষ প্রভৃতি) বহু পদাবলী রচয়িতারা কীর্তনের অসংখ্য পদাবলী রচনা করেছেন।

**কীর্তনের রাগ ও সুর :** কীর্তনের সুর এক বিশেষ চণ্ডে রচিত। কামোদ, গৌরী, ভামপলশ্রী, ধানশী বা মাযুর প্রভৃতি বিশেষ রাগের নাম কীর্তনের সুরে পাওয়া যায়। এর মধ্যে “মাযুর” কীর্তনের এক বিশেষ মিশ্র সুর, যাতে বেহাগ, ধামাজ ও ঝিঝিটের মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে বলেন শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় থেকেই এই বিশেষ সুর প্রচলিত হয়েছে। এই সব রাগে রচিত কীর্তনের সুরগুলির একটি বিশিষ্ট ধরণের রূপ আছে।

**কীর্তনের জাত সুর :** আগের দিনের নামকরা কীর্তন গায়ক ও সুর রচয়িতা মহাজনেরা কয়েকটি গানে অনেক চিন্তা করে যে ভাবের সুরারোপ করে গেছেন সেগুলি “দাগী” গান বলে চলে আসছে এবং সেই বিশিষ্ট গানের বিশিষ্ট সুরগুলিকে “জাত সুর” বলা হয়। অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদত্ত সুরগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোন কীর্তনীয়া যদি এই সব দাগী গানের জাত সুর লংঘন করেন, তবে তাঁরা কীর্তন সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। কোন কীর্তন সমাজই দাগী গানের সুরের অদল বদল অমুমোদন করেন না। স্বর্গীয় ডাক্তার অমিয় সান্যাল মহাশয় বলেছেন যে—কীর্তনের এই জাত সুরগুলি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত জাতিরাগের কায়দার অন্তর্ভুক্ত।

**কীর্তনের তাল :** কীর্তনে বহু প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দশবুদী (ছোট ও বড়), ডাঁশ পাহিড়া, দাদপ্যারী বা ডাঁশ পেড়ে, জপতাল, ধামালি, দোঠুকা, ছোট দোঠুকা, তেওট, কাটা ধরা, একতাল, দোজ, কাঁতি, লোফা প্রভৃতির নামই শোনা যায়।

**কীর্তনের সঙ্গতে বাণ্ড যন্ত্র :** কীর্তনে শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত আর কোন বাণ্ডযন্ত্র অমুমোদন করা হয় না। কঠিনিঃসৃত সুরকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

**কীর্তনের আখর :** হিন্দুস্থানী উচ্চারণ সঙ্গতে উপস্থিত মত সুর রচনা করে

রাগের বিস্তার করা হয় রাগের সৌন্দর্য বাড়ানোর কারণে; কীর্তনেও স্বর বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অঙ্গকূলে, বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে উপস্থিত মত বাক্য রচনা করে ভাবকে গভীরতর করা হয়। গানে এইভাবে ভাবার অর্থে অক্ষরের বিস্তারকেই আগের আখ্যা দেওয়া হয়। এতে গায়কের স্বতন্ত্রতা, তার কবিত্ব শক্তি, তার রসজ্ঞান এবং লয়-বোধ প্রভৃতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের বিস্তারে ও তানে গায়কের গুণপনার পরিচয় মেলে, কীর্তনের আখরে তেমন কীর্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

**কীর্তনের সহিত সঙ্গতের ধারা :** হিন্দুস্থানী সঙ্গাতের মত অতি কঠিন ভাবে লয় মেনে চললে কীর্তনে কখন কখন তাল লয়ে ছোট বড় হতে দেখা যায়। আগেই বলেছি কীর্তন ভাবপ্রধান গান, ভাবের আভিষ্যে সময় সময় এতে তাল কাটা অসম্ভব নয়। কীর্তনের সঙ্গতে তাই দক্ষ খোল বাজিয়ের দরকার, যিনি সহজেই গাইয়ের ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে যথাস্থানে ঘা দিতে পারবেন। গভীর ভাবাবেশে গোল বাজিয়ে “লহর” বাজাবেন। অক্ষরে অক্ষরে ভাবের পরিপূর্ণতার সময় মাতান বাজিয়ে মান পাড়বেন এবং আখরের সময় বাজাবেন “কাটান”, গানের সঙ্গে এই ভাবের সঙ্গত হলে তবেই শ্রোতার আনন্দ পাবেন, গানটি রসভাবে ভরপুর হয়ে উঠবে, কীর্তনীয়ার আনন্দে মেতে উঠবেন এবং নূতন নূতন আখরে ও সুরের সূক্ষ্ম জাল বুনে গানকে উচ্চস্তরের করে তুলবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বাণ হবে গীত অঙ্কনীয়, তার ভাব হবে ভাবার অঙ্গকূল এবং গীতের অঙ্গসরণকারী, তবেই গানের মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে।

**ঢপ কীর্তন :** বাংলার যশোর ( যশোহর ) জেলার মধুসূদন ( কিয়র ) কান নামে এক প্রতিভাবান গায়কই এই চালের প্রবর্তক। উনিশ শো শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢপ কীর্তনের জন্মকাল। এটিও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। গানে কীর্তনের ছাপ থাকলেও এর প্রকাশভঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী থাকে যে কারণে একে সহজেই কীর্তন থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এতে রাগের ব্যবহার ও চলন রক্ষা করা হয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে সুরে কথা বলার রীতিও রয়েছে। বর্তমানে এ গান আর বিশেষ শোনা যায় না। এটিকে কীর্তনের এক প্রকার সরল রীতি বলা চলে।

**বাউল :** বাউল শব্দটি বাতুল শব্দ থেকে বা হিন্দি বাওরা শব্দ থেকে এসেছে। বাতুল বা বাওরা শব্দের অর্থ পাগল। বায়ুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে

মিশে থাকে বলে বাউল এরূপ অর্থও অনেকে করে থাকেন। যাই হোক বর্তমানের প্রচলিত বাউলের জন্মকাল সতের শতকের শেষের দিকে ধরা হয়, তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ই বাউলের আদি উৎপত্তি কাল বলে জানা যায়। একতারা হাতে বৈরাগীরাই বাউল গান গেয়ে থাকেন, তাই অনেকের ধারণা যে ঘরছাড়া বাউঙেলেরাই বাউলের স্রষ্টা এবং এই বাউঙেলে শব্দ থেকেই বাউল শব্দটি এসেছে।

ছোট বয়স থেকে অনেক বাউল গান শুনে এসেছি, তখন এই কলকাতা শহরে একতারা বা ঋগ্নীহাতে মাথায় পাগড়ীবাঁধা অনেককেই দেখা যেত ঝারা বাউল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। সরল সহজ ভাষার গান, মাহুশগুলিও তেমনি সরল, নরম স্বভাবের, অল্পেই সন্তুষ্ট, এঁরা রাজরাজড়াদের দরবার, বড় ধনীদেব বাড়ি এড়িয়ে চলতেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুয়ারেই ছিল এঁদের আনাগোনা। বাউল গানের সুর ও ভাষা খুব সহজ সরল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাপে ওকে যাচাই করা চলে না। বাউল তাই (Folk songs) লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে এবং লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। ওর গানের বাণীতে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, না পাওয়াকে পাবার কথা, তারই চিন্তা, তারই জগ্রে ওর সুর করে কেঁদে চলা। এই ধরণের গানে ভাবই একমাত্র সম্বল, তাই মেঠো বাউলকে আমরা ভাব-গীতি বলতে পারি। এই গানের মধ্যে বিরাট সুরৈশ্বর্য নেই বা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ভাষার ব্যবহার নেই তাই বিদ্বানের সভায় বা গণ্যমান্যদের আসরে এর তেমন মান নেই। তবু এর গানের ভাষা অতি সহজ সরল ভাবেই হাঁজ্রিয়কে নিয়ে যায় অতীজ্রিয়লোকে। সহজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বাউলের জন্ম এবং সুরফীদের গজলের মতন বাউল গানও দ্যর্থবোধক। এই বিখ্যাত বাউল গানটির বিষয় চিন্তা করলেই সে কথা বোঝা যায়। “আমার মনের মাহুশ যে রে কোথায় পাব তারে। হারিয়ে সেই মাহুশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।” এই মনের মাহুশের কথাটি ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বলা চলে আবার কোন প্রেমিক প্রেমিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপও বলা চলে। মাহুশের নামেই এবং তার মাঝেই ওরা মাহুশের ভগবানকে পেতে চায়, তাই বাউল গানের বাণীতে সবত্রই প্রায় একই ধরণের ভাব। বাউল গানে তাই আমরা পাই “মনের মাহুশে এই মাহুশ আছে লও চিনে, তারে দেখরে মন জ্ঞান নয়নে”। আবার—“এই মাহুশে মাহুশ আছে করণ ধরে নাওগো বেছে, অটল মাহুশ যে

ধরেছে তার কি আছে তুলনা”। আত্মানং বিদ্ধি অর্থে এদের গানে পাই “বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা, দেখ আপন ঘরে”।

বাউল গানের স্বর এক বিশেষ ধরণের ( type-এর ), স্বরগুলি উদাস করণ, এর কাব্যও তাই সাধারণের জীবনের বেদনা, অপূর্ণতা, দুঃখ কষ্টের কথাকে আশ্রয় করে আত্মিক উন্নতির কারণে সাধারণের উন্নতি কল্পনায় সরল ভাষায় গড়ে উঠেছে। বাউলেরা মনে করেন “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” এই মানুষের অন্তরেই আছেন শ্রীভগবান এই তাঁদের বিশ্বাস, আর সেই কারণে নিজেকে সঠিক ভাবে জানার জন্তে আপনাকেই একান্ত আপন করে পাবার জন্তে তাঁরা আকুল। এঁদের কবিতা হল ( Mystic ) গুপ্ত রহস্যপূর্ণ আর মূল প্রেরণা হল ( Psychic ) আত্মিক। বাউলের গানে লালন ফকীর ও দীন বাউলের পদ রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলি লালন ফকীরের গান ও দীন বাউনের গান নামেই প্রসিদ্ধ।

**“উল্টা-বাউল” :** উল্টা বাউল বলে এক ধরণের বাউল গান শোনা যায়। এর সঙ্গে বাউলের স্বরের বা চালচলনের কোন তফাৎ মেলে না। উল্টা বাউলে একই আসরে দুই দল বাউল গানের মাধ্যমে বাদামূল্যবাদ চালায়, এটাকেই উল্টা বাউল বলা হয়। অনেকে থেকে উল্টা সাধনের অঙ্গ বলে মনে করেন।

**শ্রামা-সঙ্গীত :** কীর্তনে যেমন কৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনা দ্বারা বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে মনে কৃষ্ণ ভাবের সঞ্চার করে ও মনকে অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়, শ্রামা-সঙ্গীতেও তেমনি মা জগদম্বা কালিকার বর্ণনা দ্বারা শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে অন্তরে শক্তিময়ী জননীর প্রতি ভাবের বিকাশ ঘটায় ও মনকে সেই ভাবে ডুবিয়ে দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই এই সঙ্গীতের বিশেষ প্রচার বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। ১৭০০ শতাব্দীতে মহাসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনই শ্রামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে এই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শ্রামা বিষয়ক সঙ্গীত আজও “রামপ্রসাদী স্বর” বলে চলে আসছে, কথায়, ভাবে, স্বরে, এগুলির বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রয়েছে। তিনি মা জগদম্বার স্তম্ভ ছিলেন। ইনি ১৭২৩ সালে হালিসহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৫ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করে জগন্মাতার কোলে চিরশান্তি লাভ করেন। শ্রীমত্নহাপ্রভু যেমন কীর্তনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক

বলে গণ্য, কবি ও সাধক রামপ্রসাদ সেনকেও তেমনি আমরা শ্রামা-সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলে মান্য দিয়ে থাকি। রামপ্রসাদী সুর ছাড়াও শ্রামা সঙ্গীত অগ্র সুরের রাগ তালের আশ্রয়ে গাওয়া হয় তবে প্রসাদী সুর শ্রামা-সঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রামা-সঙ্গীত চৌতাল, তিনতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, যৎ প্রভৃতি তালে, এবং ভৈরবী, সিন্ধু, দেশ প্রভৃতি মানা সুর ও মিশ্র রাগে গীত হয়। কবি রামপ্রসাদ ছাড়াও দাশরাথ রায়, হরু ঠাকুর, এণ্টনি সাহেব, কালী মিজা, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির দান অনস্বীকার্য। শ্রামা-সঙ্গীতে বাংলার কবি কাজী নজরুলের দানও কম নয়। বাংলাদেশে প্রায় একশো দেড়শো কবি চার-পাচ হাজারের মত শ্রামা বিষয়ক গান লিখে গেছেন। বাংলার সাধকেরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করে সহজেই তাঁকে নিজের আপনজন বলে ধরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী পড়লে জানা যায় যে তিনি মা কালীকে মানবী দেহধারী মার রূপে দেখতে পেয়েছিলেন ও পুত্রভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মাতৃভাবে এই সাধনা বাংলাদেশের এক অভিনব সাধনা, এই সাধনার ধারা আমরা ভারতের অগ্র কোন প্রদেশেই বড় একটা দেখতে পাই না। এই মাতৃসাধনাই শ্রামামায়ের সাধনা, তার মায়ের সাধনা, এই সাধনার অঙ্গ হিসাবেই শ্রামা-সঙ্গীতের জন্ম, সেই কারণে শ্রামা সঙ্গীতকে আমরা ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত বলি।

**ভাটিয়ালি :** এক ধরণের উদাস অশ্রুসজল সুর, গ্রামের মানুষের বিরহ, মিলন প্রভৃতি অন্তর্বেদনা ছুটে ওঠে ভাটিয়ালিতে। পূর্ববাংলার নদী-নালায়, খাল-বিলে, এই ভাটিয়ালি সুর আচ্ছন্ন এখনও শোনা যায়। সেই কারণে একে মাঝি-মাল্লাদের গান বলা হয়। ফাঁকা মাঠে গাছতলায় বসে পথ-চলার মাঝেও ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয় এবং সেই হিসাবে একে মেঠো গানও বলা চলে। সব গানেই ভাটিয়ালির এক নিজস্ব কায়দার দীর্ঘস্বরী তান। তাল, লয়, কঠিন চন্দ বা বাক্য-স্বষমার বাহাতুরী অথবা রাগদারীর কায়দা এতে নাই। সহজ সরল আড়ম্বরহীন সাধারণ এই গান অশিক্ষিতদের মাঝে প্রাণের আবেগে গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সাল তারিখ নিয়ে মাথা ঘামালেও সঠিক জন্মতারিখ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে আন্দাজ করা যায় যে হয়তো পনেরশো শতাব্দীতে গজিয়ে উঠেছিল এই গান বাংলার কোন এক নিভৃত নদীর ধারে। রচনাকারের বা সুরকারের নামের কোন দিশা মেলে না। হয়ত কোন এক

সাধারণ মাঝির কণ্ঠেই গীত হয়েছিল, ও পরে ছড়িয়ে পড়েছিল মাঝি-মাল্লাদের জলে ভাসা নৌকার ঘরে ঘবে ও মাঠের ধারে ধারে। পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশে) পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর ধারে ধারেই এই গীতিপদ্ধতি জন্ম নেয়। এ ধরণের পল্লীগীতিতে বিজাবুদ্দিব বাহাদুরী না থাকলেও প্রাণের পরশ পাওয়া যায় এর বাণীতে; সুরের পাওয়া যায় করুণ কান্নার অশ্রুসজল ভাব। ভাটিয়ালি গায়কদের গানের ভাষা বদলাবার ও সুরের সামান্য রদবদলের অধিকার আছে। প্রাণের আবেগে সহজ ছন্দে জন্মেছে এই গান, এর সুরে তাই গ্রামা ঢং আছে। আনন্দের বিষয় আজকের দিনের শিক্ষিত সমাজ, সাধারণ নিরক্ষর পল্লীবাসীরা অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রাণের তাগিদে রচিত এই ধরণের রচনা ও সুরকে সম্মান দিতে আরম্ভ করেছেন। মেঠো সঙ্গীতকে সুর ভাল মানে বেধে শিক্ষিত মহরবাসীদের কাছে শিক্ষার জন্ম পরিবেশন করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রাণময় রূপ যেটি নদীর ধারে স্নান-প্রসারী দিগন্ত মাঠে গাছতলায় গায়কের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ও তার উপযুক্ত পরিবেশ পায়, সেটিকে 'ইন্টার পাজের' স্বরলিপির যুগ-কাঠে বসিয়ে দেওয়া কি ঠিক ?

**সারিগান :** বাংলাদেশের এক ধরণের প্রচলিত লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশ নদ-নদী খাল-বিল জলাশয়ে-ভরা, এখানে গাভী-পালকির থেকে নৌকাও বড় কম নেই। এই নৌকা চালাবার সময় সারবেঁধে একসঙ্গে যে গ্রাম্য গান গাওয়া হয় বা নৌকা নিয়ে "বাচ" (Race) খেলার সময় দাঁড়ের টানের সঙ্গে ভাল রেগে একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয় সাধারণতঃ তাকেই সারিগান বলা হয়। এটির সুর ও ভাটিয়ালির মতই, তবে কিছু জলদ (জুত) চালের, ভাটিয়ালির মত দীর্ঘস্বরী তান এতে দেয়া যায় না। তাছাড়া ভাটিয়ালি একক সঙ্গীত, কিন্তু সারিগান চন্দ্রযুক্ত-সমবেত-সঙ্গীত। সারিগান স্বভাবতঃই করুণ সুরের গান এবং পুরুষরাই এ গান গেয়ে থাকে। ছাদপেটা, ধানকাটা, ঢোঁকতে ধান কোটার সময়, পাটকাটার সময় সমবেত কণ্ঠে যে গান গীত হয়, কোন ভারী জিনিস তোলার সময় একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, সে সমস্ত গানকেও আমরা সারিগানের কোঠায় ফেলতে পারি। অর্থাৎ গানের ছন্দে একসঙ্গে সমবেত ভাবে কোন শারীরিক প্রকাশিত হলে ও সমবেত কণ্ঠে সেই শারীরিক ক্রিয়ার তালে তালে গীত হলে তাকেই সারিগান বলা যায়। সার অর্থে শ্রেণী, সারবেঁধে (বালাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে) গান করা থেকে সারিগান কথাটি এসেছে। প্রধানতঃ নৌকাতে দাঁড় টানার সময়ের সমবেত সঙ্গীতকেও সারিগান বলা হয়। সারিগানে ভাল

অপরিহার্য, ভাটিয়ালিতে তালের প্রাধান্য নেই বা তাল নেই বললেও চলে কিন্তু সারিগান তালযুক্ত ত বটেই, তালের নানা বৈচিত্র্যও এতে দেখা যায় তাই সারিগান ও ভাটিয়ালি সমন্বয়ী হলেও তালের প্রাধান্যই সারিগানের বৈশিষ্ট্য।

**জারীগান :** বাংলার মুসলমানদের প্রিয় গান, এটিকে বাংলার মুসলমানদের ধর্মসঙ্গীতও বলা চলে। এই গানের স্বর অতি করুণ, কারবালায় ইমাম হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করেই এই গান গড়ে উঠেছে। সারিগানের মত এটিও সমবেত সঙ্গীত। এই গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার জগ্ন ঢোল বাজাবার রীতি প্রচলিত।

**ভাওয়াইয়া :** উত্তরবাংলার এক বিশেষ ধরণের লোকসঙ্গীত। ভাটিয়ালির মতই এর ছন্দে কাটা কাটা ভাব, গাইবার কায়দার (style) কিছু তফাৎ আছে, যাতে সহজেই একে ভিন্ন রীতির গান বলে চেনা যায়। সাধারণ মানুষের বিরহ ও নৈরাশুর বেদনাটি করুণ স্বরে এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ভাবের আতিশয্য ও গানের সঙ্গে ভাও বাতলানো অর্থে অঙ্গসঙ্গীর কায়দা এতে আছে। আমাদের ধারণা এই ভাও-এর কারণেই এর নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে। উত্তরবাংলায়, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এই গান বেশী প্রচলিত। “দোতারা” এর একমাত্র যন্ত্রসঙ্গী—দোতারা ছাড়া এ গান প্রায় শোনাই যায় না। সাধারণতঃ পুরুষেরাই এ গান গেয়ে থাকেন, নারীঘটিত নৈরাশু ও প্রেমের কথাই এর উপপাদ্য বিষয়। অগ্গাণ্য অনেক লোকসঙ্গীতের মত এতেও রাগরাগিণীর বাঁধন নাই।

**চটকা :** সংসারের তুচ্ছ কথা ও ঘরোয়া ব্যাপারই এর বিষয়বস্তু। এটিও উত্তরবঙ্গের এক ধরণের লোকগীতি। সহজ স্বরে দ্রুত গতিতে চটল ছন্দে এই গান গাওয়া হয়। পুরুষেরা নারীর জবানীতেই এগুলি গেয়ে থাকেন। ভাওয়াইয়া ও চটকা প্রায় একই ধরণের গান।

**গঙ্গীরা গান, গাজনগান ও নীলের গান :** আমাদের দেশে শিবের তিন রকম গান প্রচলিত, সেগুলি হল গঙ্গীরা, গাজন আর নীলের গান, সাধারণতঃ শিব পূজার অঙ্গ হিসাবে গাওয়া হয়। যতদূর সম্ভব দশম শতাব্দীর শেষে ধর্মপালের রাজত্বের সময় থেকেই এই গানের প্রচার হয়।

১। **গাজনগান :** পশ্চিমবাংলায় বছরের শেষদিনে চৈত্রমংক্রান্তিতে গাজনের পূজাকে উপলক্ষ করে চড়ক বসান হয়। চড়কতলায় শিবের গাজন উৎসব হয়।

গাজনে কাঁটারূপ, বঁটিরূপ, আঙুনকাঁপ প্রভৃতি বীরত্ব এখনও কোথাও কোথাও দেখান হয়। এখানেই ধর্মপূজার অঙ্গ হিসাবে গাজন গাওয়া হয়। শিব ও পার্বতীর নামে নানা স্তবস্ততি এতে থাকে। এই সব গানে শিবকে একান্ত আপনজন হিসাবে মনে করা হয়। গাজনগানে তর্জার মত কাটান চাপান দেওয়া হয়, এগুলিকে “বোলান” বলা হয়। এই বোলানে অনেক সময় রাখারুক্ষের লীলাদির বর্ণনাও শোনা যায়। ২। **নীলের গান** : পূর্ববাংলায় বর্ষশেষে নীলষষ্ঠীর দিনে পশ্চিমবাংলার গাজনের গানের মত শিবের গান গাওয়া হয়, এই গানে শিবের বিষয়ে, গৌরীর শাখাপরা, শিব-পার্বতীর ঘরোয়া ঝগড়া, শিবের বন্দনা প্রভৃতি থাকে, এটি গাজনগানেরই অনুরূপ। এটিও শিবঠাকুরের গান। ৩। **গম্ভীরা গান** : এটি উত্তরবাংলার বর্ষশেষের গান। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরের আভাস পাওয়া যায় বলেই একে গম্ভীরা বলা হয়। মালদহে এই গান বেশী প্রচলিত বলে “মালদার গম্ভীরা” নামেই গম্ভীরা গান পরিচিত। এর স্বরের মাঝে বাউল, শ্রামাসঙ্গীত প্রভৃতি স্বরের আভাস পাওয়া যায়। যদিও এটি শিবের গান তবুও শিবের বন্দনা স্তুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জাতির সমাজব্যবস্থার দোষ-গুণ, জাতির দুঃখ, লাঞ্ছনা, তার উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি নানা বিষয় এর বিষয়বস্তু। এই ধরণের গান মনে যেমন ধর্মভাব জাগায় তেমনি সমাজ-সংস্কারেও সাহায্য করে। এর শোভাযাত্রায় নানা সং বার করা হয়। ঝাঁরা কলকাতার জেলেপাড়ার সং বা গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গাবন্দনার সং প্রভৃতি দেখেছেন তাঁরা এই ধরণের সং সাজানো ও তাদের মুখে সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ও প্রচলিত ব্যবস্থার কথা কী ভাবে বলা হত তা জানেন। দুঃখের বিষয় আজকাল সমাজের প্রতিটি নিন্দনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তার দোষ-গুণ সর্বসাধারণের সমক্ষে গানের মাধ্যমে নানা টং-এ প্রকাশ করা হয় না।

**ঘেঁটুর গান** : গম্ভীরা প্রভৃতি গান যেমন উত্তরবঙ্গের বলে পরিচিত, ঘেঁটুর গান তেমনি দক্ষিণ-বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত। এই ধরণের গানগুলিকে গোষ্ঠী-সঙ্গীতের কোঠায় ফেলা হয়। পুরাকালে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক অস্তর ছিলেন, তিনি কৃষ্ণনাম শুনবেন না বহু কানে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন, তাঁকে উদ্বেগ করেই এই গান গড়ে উঠেছিল। দেশের নানা দুঃখ-কষ্টের কথা, রাজনীতির কথা, নানা উপদেশ, ঘরোয়-নীতিকথা ইত্যাদি এই গানের উপপাদ্য বিষয়। পূর্ববাংলার মাগন গানের মত ছেলেরা এই গান গেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে।

**ঘাটুগান :** ময়মনসিং শ্রীহটে আর এক রকম গান শোনা যায় যাকে বলে ঘাটুগান। এই গান ঘেঁটুর গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ ঘাটুগানের বাণীও ঘেঁটুর মত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন আবেদনপূর্ণ ও নীলতাহানিকর বাণীই শোনা যায় ঘাটুগানে। যদিও আসলে এটি কৃষ্ণ-বিষয়ক গান। যমুনার ঘাটকে উদ্দেশ্য করেই রচিত বলে অনেকে মনে করেন এই গানের জন্মস্থান যমুনার তীরে এবং ঘাটের গান বলেই একে ঘাটু বলা হয়।

**ভাতুর গান :** মানভূম জেলার অস্তর্গত আদ্রা স্টেশনের কাছে কাশীপুরে, পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমনি সিং দেও বাহাদুরের আদরের স্তন্দরী মেয়ে ভদ্রেস্বরীর বিবাহের আগেই পানিপ্রার্থী বরের অকালমৃত্যুতে ও স্বেচ্ছায় বাগদত্ত পতির জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জনকে উদ্দেশ্য করেই ভাতুপূজা ও তার গান প্রচলিত হয়েছিল। মানভূম, সিংভূম, ধলভূমে ও বাংলার অগ্রাগ্র দেশে আজও এই গান প্রচলিত রয়েছে। ভাদ্রমাসভোর ভাতুপূজা ও তার সঙ্গে ভাতুর গান চলতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে দুদলের বাদ্যত্ববাদ চলতে দেখা যায়। বিষয়বস্তু নানা ধরণের ঠাট্টা-তামাসা, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ, নানা সমস্যা প্রভৃতি। মানভূম জেলায় ভাতুর মত এক সুরেই আর এক রকম গান প্রচলিত আছে যাকে বলা হয় **টুসুর গান**। এই টুসুর গান টুসুর পূজাও ভাতুপূজার মতই কুমারীদের মনোমত স্বামী পাবার ব্রত ও পূজা।

**ঝুমুর গান :** মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমে সাঁওতালদের এবং কোলভীলদের এক ধরণের গোষ্ঠীসঙ্গীত। সাঁওতালি ছেলেমেয়েরা বনফুলে সেজে মাদলের সাথে দল বেঁধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে। গানের ভাষায় ও নাচের ভঙ্গিমায় যথেষ্ট সুরচির অভাব দেখা যায়। সুরগুলি একঘেয়ে, একই ছন্দে ও তালে চলতে থাকে।

**ভরজা গান :** **কবির গান ( কবির লড়াই ) :** কবিগান ও ভরজাগান একই শ্রেণীভুক্ত। কবিগানে দুটি দল থাকে। কোন বিষয়ে একদল একটি গান রচনা করে গাইলে, অগ্নিদল কবিতায় গানের সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর রচনা করে দেয়। পরে একদলের দলপতি অগ্নিদলের দলপতির সঙ্গে **চাপান** ও **উত্তোর** পাড়ে। অর্থাৎ আসরের মাঝে, কবিত্ব শক্তির বলে ভাষার চটকদারিতায় কোন পৌরাণিক, সামাজিক ও কোন তত্ত্ব বিষয়ে একজন অপরকে কাব্যছন্দে নাচের তালে তালে ঢোল ও কঁাসি বাজনার সহযোগিতায় চাপান দেন অর্থাৎ তাঁর জিজ্ঞাস্তা বিষয়ের উত্তর দিতে বলেন। অপরজন কাবিত্য

ঠাঁয় প্রশ্নের ( উত্তোর ) জবাব দিয়ে আবার একটি প্রশ্নের চাপান দেন । এই ভাবে দুজনের মাঝে আসরে কবিতা সৃষ্টি করে নানা ছন্দে সুর করে তালে তালে গান গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব কাটাকাটি চলে । এই বচসাকেই কবিরা লড়াই বলা হত । কবি বা তরঙ্গা গায়কদের প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির গল্প কণ্ঠস্থ থাকে ও বহু লৌকিক ও সামাজিক আচার প্রভৃতির জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয় । সর্বোপরি তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকার বিশেষ প্রয়োজন । এসব গুণ না থাকলে কেউ কবিয়াল বা তরঙ্গাওলা গায়ক হতে পারে না ।

পল্লীবাংলার নিজস্ব যে সব গানের কথা বলা হয়েছে সে সব ছাড়াও আরও অনেক রকমের গান রয়েছে যেমন আলকাফ গান, হাপুরগান, ক্বারানি বা গাড়োয়ালী গান, মা শীতলার গান, পটুয়াগানের মধ্যে মেছুনীদেব গান, গোমঙ্গল গান, মুস্কিল আসানের অর্থাৎ সত্যপীরের গান, মেয়েদের ছড়াগান, ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় পালাগান, পাচালি, ভাটের গান, একক বা গোষ্ঠীসঙ্গীত যেগুলি বারব্রত পূজা বা নানা উৎসবের দিনে এই বাংলার ঘরে ঘরে একদিন প্রায় বারমাসই শোনা যেত তাদের সকলের বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হল না । এই সব পালপাখানের গান কবে কে প্রচলিত করেছে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না ।

**কজরী বা কাজরী বা কজলী :** কজরী ভারতের উত্তর প্রদেশে লোক-সঙ্গীত । কজরীকে গোষ্ঠীসঙ্গীতের কোঠায় ফেলা যায় না । তবে এই গানের এক একটি দল থাকে । ঠিক আমাদের এখানে কালীকীর্তনের দলের মত । মূল গায়ন একটি পদ বলেন এবং কীর্তনের দোয়ারীর মত বাকী লোকেরা সমবেত কণ্ঠে দোয়ারকী করেন । কজরীর অনেক নামকরা দল আছে, এবং সেই দলের নামেই এঁরা পরিচিত হয়ে থাকেন । ভাদ্রমাসের কুম্বপক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই এই উৎসব বা কজরী ব্রত পালিত হয় । নানা রকমের গহনা ও নূতন শাড়ী পরে হাতে পায়ে মেহেদী পাতার রসে নকসা কেটে মেয়েরা কজলী দেবীর পূজা করেন, এবং ভাইদের হাতে বেঁধে দেন “জরঙ্গ” (অনেকে একে ‘জরব’ বলেন) । প্রধানতঃ এটি বেনারসেই চলে । গানগুলি অধিকাংশই শৃঙ্কার-রসাত্মক । উত্তরপ্রদেশে, রাজপুতানায় ও মারঝাড়ে কজরীর মত আরও অনেক রকমের লোকসঙ্গীত চালু আছে, যেগুলির কথা আমরা এখানে বাদ দিয়ে গেলাম । এই উৎসবে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই কজলী দেবীর পূজায় যোগদান করেন ও সারা রাত ধরে এই উৎসবে মেতে থাকেন ।

**ডি. এল. রায়ের গান :** রুক্ষনগরের কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের পুত্র স্বীজেন্দ্রলাল রায় ইং ১৮৬৩ সালের ১২শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। এই সঙ্গীতপ্রেমী একাধারে সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও সুরকার ছিলেন।

কিশোর বয়সেই তাঁর গান লেখা শুরু হয়। ১৮৮৩ সালে যখন এম. এ. পাশ করেননি তখনই তাঁর কবিতা “শ্মশান সঙ্গীত” ছাপার অক্ষরে “নব ভারত”-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিজ্ঞা শিক্ষার জন্ম বিলাত যান, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তাঁর লেখার সখ এত তীব্র ছিল যে এত কাজের মাঝেও তিনি মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নানা নাটক ও বহু কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর হাস্য-রসাত্মক গীতি রচনাগুলি অপূর্ব এবং আজও প্রসিদ্ধ।

তিনি শ্রুগায়ক হলেও উস্তাদ ছিলেন না, তবে সুরকারীতে যথেষ্ট উস্তাদির পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান তখনকার দিনে বাংলাদেশে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। ‘সকল দেশের রাগী সে যে আমার জন্মভূমি’ আজও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে শোনা যায়। তাঁর গানে ও সুর-সংযোজনায় আমরা বাংলা গানের হাস্যরস ও বীররসের আশ্বাদন পাই নগুহার বাণীর রূপদের চালে বা বিলাতী সুরের কায়দায়। রাগসঙ্গীতকে মাগ্ন দিয়েই তিনি তাঁর গানের সুরে বীররসের ভাব সংযুক্ত করেছিলেন, তখনকার দিনের রাগসঙ্গীতে এটির অভাব ছিল। তাঁর হাসির গানগুলিও যথেষ্ট আনন্দদায়ক। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুল্লকরণে তাঁর কোরাস ( বহু কণ্ঠে একই সুরে গীত সম্বন্ধনি-সঙ্গীত ) গানগুলিও ছিল অপূর্ণ। বাংলা গানের সুর রচনায় নূতন ঢং এনে তাতে নবীন ভাবধারায় তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর নাট্যসঙ্গীতেও তিনি রাগসঙ্গীতকে স্বীকার করে তার উপর নির্ভর করেই রচনা করেছিলেন কোরাস সঙ্গীতগুলি। ‘বন্ধ আমার জননী আমার’ প্রভৃতি তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলি কালের কবলে আজও বিলীন হয়ে যায় নি। তাঁর রচনা ও সুর-যোজনায় মধ্যে একটি স্বকীয় ভাব ছিল যা থেকে তাঁর রচনাকে সহজেই চেনা যায়।

ভারতবর্ষ নামে তৎকালীন একটি প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভগবদ্ বিষয়ক গানও কবির রচনায় পাওয়া যায়, একটি উদাহরণ

দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। 'আমি প্রভাতের ফুলে সাবের মেঘেতে হেরি তোমার রূপরাশি ; আমি চাঁদের আলোতে তারার হাসিতে নিরখি তোমার হাসি। ১৯১৩ সালের ১৭ই মে বাংলার এই কৃতি সন্তান মরদেহ তাগ করে স্বরলোকে চলে যান।

**রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত :** কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ঠাকুর-পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইং ১৮৬১ সালে ৭ই মে তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। কিশোর বয়সেই কবিগুরু ভাষা, স্বর, তাল, মান, ছন্দ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর প্রথম গীতি-কবিতা "সন্ধ্যাসঙ্গীত" প্রকাশ পায় .৮৮২ সালে। ইং ১৯১৩ সালে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হবার সম্মান পান তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের উপর নোবেল পুরস্কারে। সেই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৪ সালে ইংরাজরাজ তাঁকে নাইট উপাধি দেন। ইংরাজের এই উপাধি তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে প্রবীণ কবি চিত্রাঙ্কনেও তাঁর নূতন প্রতিভার পরিচয় দেন। পৃথিবীর সবযুগের কবি-সমাজের অগ্রতম প্রধান কবি, পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতির গৌরব তিনি। তিনি বাংলা ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি নিজস্ব ধারার এক সঙ্গীতে বাংলা সঙ্গীতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তার বহুমুখী প্রতিভার মাঝে "রবীন্দ্রসঙ্গীত" সৃষ্টি আর এক প্রতিভার পরিচয়। বাল্যকাল থেকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, যত্নভট্টের মত-শ্রুতিধর সঙ্গীত-পণ্ডিতকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে। প্রাচীন-ধারার সঙ্গীতকে তিনি বিশেষভাবে বিচার করেছিলেন বৃদ্ধ দিয়ে। বেদ উপনিষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের প্রকাশ ধারা ও তার পরিবর্তনশীল রাগরাগিণীর বিকাশ ধারা, তার বিভিন্ন শৈলীর উন্মেষ, তাঁর অস্তরে বিপ্লব ঘটায়। তাঁর স্বজনধর্মী মন পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় নি, সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সেই কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতি যা তখন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও দুর্লভ ছিল তাকে সহজতর ও সুন্দর করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি এই সঙ্গীতকে নিজস্ব ভাবে এক বিশেষ ভাবধারায় প্রকাশ করতে চাইলেন। সহজ সরল ভাবে কী করে সঙ্গীতকে সাধারণের মাঝে আনা যায় এই

ছিল তাঁর চিন্তা। তিনি গানের ভাষা, স্বর ও কবিতার চন্দকে একই সঙ্গে অসীম নীলাকাশে ডানা মেলবার স্বযোগ দিলেন। অসীমের এই গান দানা বাঁধলো সীমার মাঝে মানুষের কণ্ঠে “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর”। মানুষের মনকে অসীমের পরশ দিল এই গান। প্রাণময়ী ভাষাকে ভর করে সে গানের স্বর ভেসে চললো। মানুষের অন্তরের ভাষা প্রকাশ পেল স্বর ও কথার বাঁধুনিতে। হিন্দুস্তানী গানে কেবলমাত্র স্বরবিহারই প্রধান ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগভঙ্গীমা বজায় রেখে সৃষ্টি করলেন নবান ধারার কাব্যসঙ্গীত। অতীতের নানা গীতশৈলীর ছাপ থাকা সত্ত্বেও স্বকীয়তায় “রবীন্দ্রসঙ্গীত” স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। তাঁর গানে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সবল সরলতার সন্ধানও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও তিনি ভালভাবে বিচার করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পার প্রভূত প্রয়োগের নজীর থাকলেও, সেই স্বরারোপের মাঝে তানতরঙ্গ বা অলংকরণ রাখার প্রয়োজন তিনি অকৃত্রিম করেন নি। তবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের শেষ অঙ্কে দমের কায়দার একটা আভাস সেখানে পাওয়া যায়। ধ্রুপদ খেয়ালের ঢং-এর প্রবণতা তাঁর গানে পাওয়া গেলেও তিনি খেয়ালের তানের ষ্টীম-রোলার ও ধ্রুপদের মীড় ও গমকের জাঁকজমক বর্জন করে গ্রহণ করেছিলেন সবল সরলতাকে। এটাই তাঁর গানের এক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বহু বলার থাকলেও, নানা খুঁটিনাটির কথা বোঝার থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকচি। এখানে আমরা কেবলমাত্র বলবো যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন এক নিজস্ব ধারা বহন করে যে সেই গানকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সহস্র সহস্র গান রচনা ছাড়াও, অজস্র কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখে গেছেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিজ্ঞালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি; এই মহান সাধক ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট মরদেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন।

**অতুলপ্রসাদ ও তাঁর গান :** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে এই গীতিকার ও স্বরকারের কথা আরম্ভ করি।

“দিল বন্ধ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ

তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ”।

রবীন্দ্র-স্মরণ্য অতুলপ্রসাদ সেন ইং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭১, ঢাকা সহরের

চিকিৎসক রামপ্রসাদ সেনের পুত্ররূপে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক লক্ষ্মী সহরে থাকতেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার। এই দরদি কবি তাঁর সহৃদয় ব্যবহার ও স্থললিত গান রচনার জ্ঞান আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে লক্ষ্মী থাকতেন, তখন লক্ষ্মীতে খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, চৈতী, কজরী ও গজলের লীলা চলছে পুরাদমে। অতুল-প্রসাদ এই সুরে আরুঠ হয়েছিলেন, তাঁর অন্তরে সাড়া জেগেছিল, তাঁকে অতপ্রাণিত করেছিল লক্ষ্মীর এই সঙ্গীত ধারা। এই সময়ে তাঁর সব রচনার মধ্যে তাই লক্ষ্মীর ঢং পাওয়া যায়। তিনি কোন গান শোনার পর সেই গানের কায়দা প্রাণে গেথে রাখতেন, তারপর সেই কথা ও সেই সুরকে নিজস্ব চিন্তাধারায়, নিজের ভাষায় লিখতেন এবং সুর যোজনা করতেন। আবার বার বার নিজের রচনা তাঁর নিজেরই ভালো না লাগলে ছিঁড়ে ফেলতেন। এই ভাবে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা অনেক কম যেত। অতুলপ্রসাদ ব্যারিষ্টারি ছাড়াও কংগ্রেসের কাজে এবং নানা অগ্ৰঠানে নিজেকে এত ব্যস্ত রাখতেন যে এই কর্মবীর শিল্পী সঙ্গীত চিন্তার নিরালা অবসর খুবই কম পেতেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও রাগ সঙ্গীতকে তাঁর অচপম বিদগ্ধতায় কাব্য-সঙ্গীতে পরিবর্তিত করেছিলেন। “কি আর চাইব বল,” “ক্ষমিও হে শিব,” “আমার পরাণ কোথা যায়,” “নিদ নাহি আখিপাতে” প্রভৃতি গান তাঁর উদাহরণ। কাজরীর কায়দায় বাংলা গান রচনা করলেন “শ্রাবণ ফুলাতে বাদল রাতে,” “কেন এলে মোর ঘরে” প্রভৃতি গানে। এছাড়া বাংলায় থাকার সময় বাংলা কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী গানের অল্পসরণে তিনি কিছু গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানলাল প্রভৃতি তৎকালীন রচয়িতাদের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। লক্ষ্মী-এর কায়দায় প্রভাবিত হলেও মনে প্রাণে তিনি রবীন্দ্র ভাবধারায় রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েই ছিলেন। তবে সুরের Composer হিসাবে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রাখতেন। উত্তরা পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর “কয়েকটি গান” নামক বইটি উল্লেখযোগ্য। এই অমর সুরকার ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

**কাস্তকবি রজনীকান্ত ও তাঁর গান :** বাংলা দেশে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র রূপে তিনি ইং ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই জন্মলাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে ও কবিতায় তাঁর অহুরাগ ছিল। ১৮৯১ সালে বি. এল পাশ করার পর রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করতে থাকেন।

মধুর শাস্ত্র রসাস্রিত ভাষার তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু কবিতা ও গান লিখে গেছেন। “বাণী, কল্যাণী” প্রভৃতি কবিতা তাঁর রচনা শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাগ সঙ্কেত তাঁর গভীর জ্ঞানের কোন বিশেষ পরিচয় আমাদের নজরে পড়ে নি। তাঁর গানের স্বরে রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ রায়চৌধুরীর বাংলা গানের প্রভাব দেখা যায়। রজনী সেনের গান বলে কোন বিশিষ্ট ধারার গান তাঁর স্বর রচনায় আমরা দেখতে পাই না, তবুও তাঁর গানের ভাষায় ও স্বরের আবেদনে তাঁকে চিনতে খুব অস্ববিধা হয় না। স্বরের সাথে চন্দ্রের অঙ্গাঙ্গি মিলনে এক লীলায়িত ভঙ্গীর পরিচয় তাঁর গানের মাঝে পাওয়া যায়। তাঁর গানের সরল সুন্দর গতি ও স্নিগ্ধ ভাব লক্ষ্য করার মত। “তুমি নির্মল কর,” “সেখা আমি কি গাহিব গান,” “কে রে হৃদয়ে জাগে” ইত্যাদি গানের সমাহিত ভাব দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে অনন্ত হয়ে থাকবেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবে ভাই” প্রভৃতি বিখ্যাত গান লোকের প্রাণে অপূর্ব জাতীয়তা ভাবের সাড়া জাগিয়েছিল। এই সব রচনার স্রষ্টাকে বাঙ্গালী কোন দিন ভুলতে পারবে না। বাণীর এই সেবক ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর চিরকালের জগ্ন অমরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

**কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর গান :** কবি কাজী নজরুল ইং ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকীর আহমেদ, মাতার নাম জাহীদা খাতুন। আট বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটে। এগারো বছর বয়সে এঁর কবিতা লেখা ও গান বাঁধা শুরু হয়, তখন লেটোর দলে গান বাজনা করতেন। গান খুব ভালই গাইতেন। একদিন আসানসোলার গার্ড সাহেব ওঁর গান শুনে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে যান। তখন সব সময়ই গান ছিল ওঁর সাথী। ১৯১৬।১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈনিকের কাজে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে বোরার স্বযোগ পান। এই সময়ে ভাল করে ফার্সী শেখেন, হাফিজের কাবিতার অম্ববাদ করেন। করাচীতে থাকা কালে যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই গান ও কবিতা লেখা বিশেষ ভাবে শুরু করেন। তখনকার প্রবাসীতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাই ওঁর লেখা ছাপিয়ে দেন। সৈনিক থেকে ক্রমে উনি হাবিলদার হন। যুদ্ধ শেষে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে যেতে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর নবযুগ, ধূমকেতু, লাজল প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রাজরোষে পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় ও তাঁকে এক বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই সময়ে বিদ্রোহী নামে কবিতা

লেখায় বিদ্রোহী কবি নামে তাঁর নামডাক চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে ইনি প্রমিলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। হেমেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার পবিত্র গাঙ্গুলী, নলিনীরঞ্জন সর্কার ও গায়ক দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি গুণী ব্যক্তির এঁর গানের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কবির গান গাইবার ক্ষমতায় ও নিজস্ব সুরারোপের বৈশিষ্ট্যে তাঁর নাম সহজেই গানের জগতে একটা বিশেষ স্থান লাভ করে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তাঁর খুব ভাল জ্ঞান থাকায়, গানের সুরযোজনায় তাঁর রাগবোধ ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নজরুলই প্রথম ফার্সী ও উর্দু ভাষার বিশিষ্ট রচনা বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

১৯৩৭ খৃঃ গ্রামোফোন কোং-র ট্রেনার হন। এই সময়ে তাঁর গান রচনা ও প্রচার খুব বেড়ে যায়; ইনি মুসলমান হয়েও শ্রীমা মায়ের ভক্ত ছিলেন ও বহু শ্রীমাসঙ্গীত রচনা করে শ্রীমাসঙ্গীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ইনিই প্রথমে বাংলা ভাষায় গজল গান চালু করেন। ১৯৪২ সালের ২ই জুলাই কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে ইনি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন; এবং আজ পর্যন্ত সেই ব্যাধি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর রচনার মধ্যে উপন্যাসে—বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষণ, নাটকে—আলেয়া, ঝিলিমিলি, ছোট গল্পে—ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, কবিতায়—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, ছায়া নট ও গীতি গ্রন্থের মধ্যে—বুলবুল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনা থেকে আমরা বঞ্চিত।

## বাদ্যকাণ্ড

বহু প্রকার ভারতীয় বাণ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আকৃতি-  
বর্ণন এবং তৎসহ বেহালা, গীটার, হারমনিয়ম, ক্ল্যারিনেট  
প্রভৃতি অতি প্রচলিত কয়েকটি ভিন্নদেশাগত যন্ত্রের বিবরণ ।

## যন্ত্রবিভাগ

স্মারতীয় বাণ্য যন্ত্র মূলতঃ চার ভাগে বিভক্ত ।

“ততানপঞ্চ শুযিরং ঘনমিতি চতুর্বিধং” ।

১। **তত** : বীণা, সেতার, এসরাজ, সারেস্বী প্রভৃতি তার ও তাঁত দিয়ে বীণা অর্থাৎ যে সব যন্ত্র বাজাতে তাঁত বা তার ব্যবহৃত হয় ।

২। **আনন্দ** : (এ গুলিকে বিতত যন্ত্রও বলা হয়)—পাখোয়াজ, ঢোল কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি চর্মাচ্ছাদিত বাণ্যযন্ত্র ।

৩। **শুযির** : বঁশী, সানাই, শঙ্খ, শিঙ্গা ইত্যাদি ফুঁ এর দ্বারা বাদিত যন্ত্রাদি ।

৪। **ঘন** : ধাতুর তৈরী বাঁবর, ঘণ্টাদি বাণ্যযন্ত্র ।

তত, আনন্দ (বিতত), শুযির (শুযির) ও ঘন এই চার প্রকারের বাণ্য প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ।

(ক) **সভ্য** : (Drawing room Instruments) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ মিঠে ও দুর্বল ও যাদের ঘরের মধ্যে বাজান হয়, যেমন সেতার, এসরাজ, তবলা প্রভৃতি ।

(খ) **বাহির্দ্বারিক** : (Outdoor Instruments) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ জোরদার ও যাদের বাড়ীর বাহির দরজার (ফটকে) বা রাস্তায় বাজান হয় ।  
যথা : সানাই, ঢোল, রেশন চৌকি, কলম-বঁশী প্রভৃতি ।

(গ) **সামরিক** : (Instruments used in war) তুধী, রণশৃঙ্গ, শিঙ্গা, জয়ঢাক ইত্যাদি ।

(ঘ) **গ্রাম্য** : (Rural Instruments) গোমুখ, বেণু, তুবড়ী-বঁশী, একতারী খঞ্জনী প্রমুখ যন্ত্রাদি ।

(ঙ) **মাজল্য** : (Pastoral Instruments) শঙ্খ, রামশিঙ্গা, কঁাসর, ঘণ্টা ইত্যাদি ।

পাশ্চাত্য বাণ্যযন্ত্রগুলিও এইরূপ ভাবেই বিভক্ত ।

(i) **কর্ডোফোনস্** : (Chordophones) তার ও তাঁত ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ ।  
সেতার, এসরাজ প্রভৃতি তার যন্ত্রদের Sweet String Instruments বলে ।

(ii) **এয়ারোকোনস্** : (Aerophones) ফুঁ-এ বাজানো নানা বাণ্যযন্ত্র ।

(iii) **ইডিওফোনস্ :** ( Idiophones ) খাতুর তৈরী যন্ত্রাদি ( যেগুলি ঘা দিয়ে বাজান হয় ) ।

(iv) **মেমব্রোনোফোনস্ :** ( Membronophones ) সকল প্রকারের চর্মাচ্ছাদিত বাণ্যযন্ত্র ।

(v) **ইলেকট্রোফোনস্ :** ( Electrophones ) তড়িৎবীণা, ইলেকট্রিক গীটার প্রভৃতি তড়িৎ-প্রবাহ চালিত বাণ্যযন্ত্র ।

এবার ভারতীয় তত যন্ত্রদের বিশেষ বিশেষ বিভাগের কথা বলি—প্রথম : **ধনুস্তত** বা **ধনুযন্ত্র** অর্থাৎ যাদের ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়, যেমন এশ্রাজ, সারেকী, সারিন্দা, দিলরুবা ইত্যাদি । দ্বিতীয় : **অঙ্গুলিক্রতত** বা **মিজরাব-যন্ত্র** অর্থাৎ যাদের মিজরাব অথবা জওয়ার সাহায্যে বাজান হয় যথা বীণা, রবাব, সুরবাহার, সেতার, শরোদ প্রভৃতি । এই ধনুযন্ত্র এবং মিজরাব যন্ত্রের আবার দুটি বিভাগ রয়েছে ।

(১) **স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র :** ( Soloperforming Instruments ), অপরের সাহায্য ছাড়া যে সব যন্ত্র একক ভাবে বাজে, যথা : বীণা, সেতার, এশ্রাজ প্রভৃতি ।

(২) **অনুগতসিদ্ধ যন্ত্র :** ( Accompanying Instruments ), যারা পরাশ্রিত হয়ে বাজে বা রুতাহসরণ করে, যথা : সারেকী, তানপুরা, গোপীযন্ত্র ইত্যাদি ।

### তত যন্ত্রের কথা

সকল প্রকার তত জাতীয় যন্ত্রের আদিম উৎপত্তি স্থান এই ভারতবর্ষ । ইউরোপীয় সঙ্গীত ঐতিহাসিকেরাও একথা অস্বীকার করতে পারেন নি । এই ভারতবর্ষের বহু বাণ্যযন্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে সেখান থেকে রূপান্তরিত হয়ে নামভেদে আবার এদেশে ফিরে এসেছে । আদিম তত জাতীয় যন্ত্রের ইতিহাস এত প্রাচীন যে এদের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ তা নির্ণয় করা দুঃসহ । আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে “পিনাক” যন্ত্রটি দেখে আমাদের ধনুস্তত যন্ত্রের প্রাচীনত্বের কথা সহজেই চিন্তা করতে পারি । ধনুযন্ত্র “রাভানা”-ও প্রমাণ করে যে ত্রেতাযুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে এই যন্ত্রের প্রচলন ছিল ভারতবর্ষেই । পিনাক-বীণা, রাভানা, অমৃতি প্রভৃতি বাণ্য যন্ত্রদের আকৃতি প্রমাণে ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিচারে এই যন্ত্রগুলি ভারতীয় হিন্দুদের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলে জানা যায় । আমাদের ঐতিহাসিক ও

প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গীত ইতিহাস সম্বন্ধে অকরণ অবহেলায় সঙ্গীতের আদিম ইতিহাস অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সেদিনের ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই যেমন ছিল সমস্ত দেশের দিগদর্শক ও পথপ্রদর্শক, তেমনি সঙ্গীত এবং তার বাণ্যযন্ত্রাদির উদ্ভাবনায় ও উৎকৃষ্টতায়ও সে ছিল তুঙ্গে। এখন বর্ণাঙ্কমিকভাবে তারযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি।

**অচল ঠাট বীণা বা অচল বীণা :** অচল বীণার অপর নাম ধ্রুববীণা। প্রচলিত মহতীবীণাকে অচলবীণা বলা যায়। কারণ এই বীণার পর্দা সরিয়ে কড়ি বা কোমল করার প্রয়োজন হয় না। উদারী সপ্তকের কড়ি মধ্যম থেকে কোমল ও কড়ি স্বর মিলিয়ে তারার গাঙ্কার পর্যন্ত বাইশটি পর্দাই এতে রাখা থাকে। মাত্র ১৬ খানি পর্দা স্বতা দিয়ে বাঁধা সচল ঠাট বীণাকে অনেকে **চলবীণা** বলে থাকেন। সেতারেও অল্পরূপ ২২ খানি পর্দা বাঁধা থাকলে অচল ঠাটের সেতার এবং ১৬ খানি পর্দা থাকলে সচল ঠাটের সেতার বলা হয়। ঠাটের আর এক নাম পর্দা, কারণ পর্দার হিসাব থেকেই ঠাটের স্বষ্টি। কোন যন্ত্রে কড়ি কোমল স্বর ব্যবহার কালে যন্ত্রের পর্দাগুলি প্রয়োজনমত স্বরে সাজিয়ে নিতে হলে তাদের চল বা সচল ঠাটের যন্ত্র বুঝতে হবে। ভারতের কালে দুইটি একই প্রকারের বীণাতে সাতটি করে তার বাঁধা হ'ত। এর একটিতে সাতটি শুদ্ধ স্বরে সাতটি তার বাঁধা হ'ত (যে তারগুলি চড়ান বা নামান হ'ত না) সেটিকে বলা হত অচলবীণা বা ধ্রুববীণা। অপরটির সাতটি তার নামিয়ে বা চড়িয়ে কড়ি কোমল স্বরের সঙ্গে মেলান হ'ত এবং এই দ্বিতীয়টিকে বলা হ'ত চল বীণা। বর্তমানে পর্দার অবস্থানকে কেন্দ্র করেই চলবীণা বা অচলবীণা নিরূপিত হয়ে থাকে।

**অম্বুতি :** অতি প্রাচীন ধর্মযন্ত্র বিশেষ। রাজা শ্রীর ট্যাগোরের যন্ত্রকোষ নামক পুস্তকে বলা হয়েছে—সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাস লেখক ফেটিস সাহেব বলেন “ভারতবর্ষই যাবতীয় ধর্মযন্ত্রের জন্মস্থান। ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে ধর্মযন্ত্র প্রচলিত হয়েছে। আমি যখন রাবণ ও অম্বুতি এই দুই হিন্দু যন্ত্রের (হিন্দুদের বাণ্যযন্ত্রের) সঙ্গে আরবীয় ‘কেমানগে অঙ্কুজ’র তুলনা করি তখন শেখোক্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অল্পকৃতি মাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না।” আমাদের সংগ্রহে এই অম্বুতি নামক বাণ্যযন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় এর সঠিক আকৃতি আপনাদের সামনে রাখতে পারছি না। এই যন্ত্রটি বহুদিন পূর্বেই ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে। যতদূর জানা যায়, এ যন্ত্রে পর্দা

রাখা হত। আন্দাজ আড়াই হাত লম্বা একটি ফাঁপা সরু গোল দান্ডির উপর দিকে একটি তুষ রাখা হত এবং যন্ত্রটিতে একটি মাত্র লোহার তার ব্যবহৃত হত।

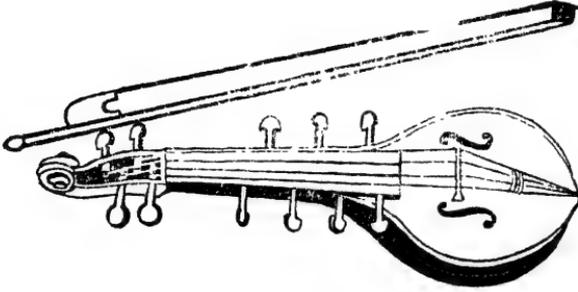
**অলাবনী বীণা :** আলাপিনীর কথায় আমরা বলেছি যে রত্নাকরে ও সঙ্গীত দামোদরে অলাবনীর বিষয় বিশদভাবে লেখা রয়েছে। হরিনায়কের মতে অলাবনী ও আলাপিনী একই বাগ্গযন্ত্র। শুভকরের দামোদরে আমরা আলাপিনীর পরবর্তীকালের পরিবর্তিত অবস্থা দেখতে পাই। এখানে অলাবনীর দান্ডি ১০ মুষ্টি বলা হয়েছে। ধয়ের কাঠ বা বেগুর তৈরী দান্ডির দৈর্ঘ্য ৪০ আঙ্গুল। পরিধির মাপ দুই কড়ে আঙ্গুল। দান্ডির ওপর দিকে ছত্রাবলী। দান্ডির নীচে করভ। মনে হয় করভ শব্দটি, পন্থ বা লেজাড়ির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কুকুভ মানে অলাবু বা লাউ বলা হয় আবার ভিন্ন অর্থে বীণার শেষ প্রান্তের বেকান কাঠটিকেও বলা যায়। তাই প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন। দান্ডির ৯ আঙ্গুল নীচে তুষ থাকে, দান্ডির ফুটোর মাঝে আলগা কাঠের টুকরো দিয়ে চূষকায় সাহায্যে তুষ শক্ত করে আটকানো। ঝাঁত ( ছাগল বা ভেড়ার শুকনো নাড়ী ), রেশম বা কাপাস তুলোর শক্ত পাকানো স্ত্রতাই তার বলে ব্যবহৃত হত। কতগুলি তার থাকতো তা জানা যায় না, তারগুলি করভের সঙ্গে আটকানো থাকতো। করভের পাঁচ আঙ্গুল ওপরে আর একটা ছোট লাউ থাকতো। এই যন্ত্রে পদা ব্যবহৃত হত জানা যায়, তবে গ্রন্থ থেকে সেটি সঠিক বোঝা যায় না।

ডান হাত ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বাজান হত। লাউটা বুকের কাছে ধরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তুষটিকে স্থির রেখে বাঁ হাতের চারটি আঙ্গুল ও ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল দিয়ে বিন্দু-বাদনের কায়দায় সাতটি স্বর প্রকাশ করা হত। ১০ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৈলাশনাথ স্বামী মন্দির এবং পুড়ুকোটের সরস্বতীর মন্দিরের দেবীর হাতের সারী বীণার সঙ্গে এই বীণার অনেকটা মিল দেখা যায়।

**অলাবু সারেঙ্গী :** কাঠের তৈরী এই যন্ত্রটি শতবর্ষপুত্রির পূর্বেই পরলোকগমন করেছে ; কোন বাদককেই এই যন্ত্র বর্তমানে বাজাতে দেখা যায় না। অধুনালুপ্ত এই বাগ্গ যন্ত্রটি যাহুঘরে স্থান পেয়েছে। মুসলমান উস্তাদগণ এই যন্ত্রটিকে **কাম্মারচি** বলে থাকেন। যন্ত্রটি সারেঙ্গীর অনুলকরণে গড়ে উঠলেও

(১) করভ = কজ্জি থেকে কড়ে আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত স্থান। এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

বাজাবার কায়দা অনেকটা বেহালাব মত। সেই কারণে ইউরোপীয়েরা এটিকে **ভারতীয় বেহালা** বলে থাকেন। তরকের তার, সুর বাঁধার নিয়ম প্রভৃতি সারেন্দীর মত হলেও, হাঁড়ির শেষ প্রান্ত কাঁধে ঠেস দিয়ে ধরে, ছড় দিয়ে বাজান



অলাবু সারেন্দী

হয়। এর হাঁড়ি লাউয়ের খোলা বা কাঠ থেকে তৈরী। কখনও কখনও বড় নারিকেলের মালার তৈরী খোলও দেখা যেত। রাজা স্মার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে যন্ত্রটির উল্লেখ আছে।

**আদি বীণা বা আছা বীণা** : বর্তমানে লুপ্ত এই যন্ত্রটি আগে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই যন্ত্র কৈলাস, কপিলাস বা কপিলাসিকা নামেও পরিচিত ছিল। তিন চার ফুট লম্বা বাঁশের একটি গোলাকার দানাডির মুক্ত প্রান্তে দুই তিনটি লাউয়ের তুষ থাকতো। দানাডির নীচে তুষা অর্থাৎ ঋনিকোষটি তিত লাউয়ের খোলায় তৈরী হ'ত। হাঁড়িটি অনকাংশে একতারার আকারের ও সম্ভবত একটি তন্দ্রীই জোয়ারীর উপর দিয়ে দানাডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। তাই এটিকে একতন্দ্রী বীণাও বলা চলে।

**আলাপিণী বীণা** : এটি প্রাচীন সভ্য তার যন্ত্র। যন্ত্রটি মিজরাবের সাহায্যে বাজান হ'ত। আলাপিণী ও অলাবনী দুটি ভিন্ন যন্ত্র বলে অনেকে মনে করেন। সঙ্গীতরত্নাকরে আলাপিণীর পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা এটি নামভেদ মাত্র। সঙ্গীত দামোদরের অলাবনীর পরিচয়ের সঙ্গে আলাপিণীর যে সামান্য প্রভেদ দেখা যায় তাতে দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। (অলাবনী দেখুন)।

**একতন্দ্রীবীণা বা একতারী** : শুদ্ধ ভাষায় একতারাকে একতন্দ্রীবীণা বলা হয়। একটি তার থাকে বলেই এর নাম একতারী। ভারতের অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটির জন্মতারিখ বা আবিষ্কারকের নাম আমাদের অজ্ঞাত। একতারী যন্ত্রটি

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে। আকৃতিগত সৌন্দর্য থাকলেও বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত একতারার খোলের ও দানড়ির মাপের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে এটিকে অশ্রাশ্র বীণার আবিষ্কারের বহু পূর্বে আবিষ্কৃত বলে মনে করে থাকেন। এর একটি তার থেকে কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশ পায়।

একটি গোল লাউয়ের সম্পূর্ণ খোলাটির একচতুর্থাংশ বাদ দিয়ে এর খোল অর্থে ধ্বনিকোষটি তৈরী করা হয়। খোলের মুক্ত স্থানে চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সেই তবলির ( আচ্ছাদনের ) ওপর সওয়ারী ( অর্থে bridge ) বসিয়ে তানপুরার কায়দায় ব্রীজের ওপর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়া হয়। খোলের সঙ্গে একটি সরু দানড়ি খোলটিকে আরপার ছিদ্র করে তার মাঝে যুক্ত করা হয়। এই দানড়ির মুক্ত প্রান্তে রাখা একটি কীলকের ( অর্থে কানের ) সঙ্গে একগাছি তারের গোড়া বাঁধা হয় ও হাঁড়ির শেষ প্রান্তে রাখা পনথির সঙ্গে সেই তারের গোড়া বাঁধা হয়। লোহার বা পেতলের তারই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজিয়ের ইচ্ছামত তার চড়িয়ে নিজ নিজ কণ্ঠস্বরের ওজনে স্বগ্রামে ষড়্জের সঙ্গে স্বর মেলান হয়। দানড়িটা ডান কাঁধের ওপর হেলান দিয়ে রেখে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে স্বরধ্বনি প্রকাশ করা হয়। বাউল বৈরাগীরা বা ভিখারীরা এর সাহায্যে ভক্তিমূলক গান গেয়ে থাকেন। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন যে আমাদের আগের দিনের বীণাযন্ত্র বলতে একতন্ত্রীকেই বোঝাত।



একতন্ত্রীবীণা

আসামে ও মণিপুরে পেয়া বা পেনাক নামে একতারার আকারের এক প্রকারের একতারযুক্ত ধনুর্যন্ত্র দেখা যায়। এই যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজানো হয়। পেনাক নামের কথায় আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের সৃষ্ট প্রাচীন পিনাকী বীণার নাম মনে পড়ে যায়। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব হবে না যে এই পেয়া বা পেনাক নামক যন্ত্রটি হয়ত আমাদের প্রাচীন পিনাকী বীণার ভিন্নরূপ। পিনাকী আজকের দিনের সারেস্বী, এশ্রাজ প্রভৃতি নানা ধনুর্যন্ত্র আবিষ্কারের সহায়ক।

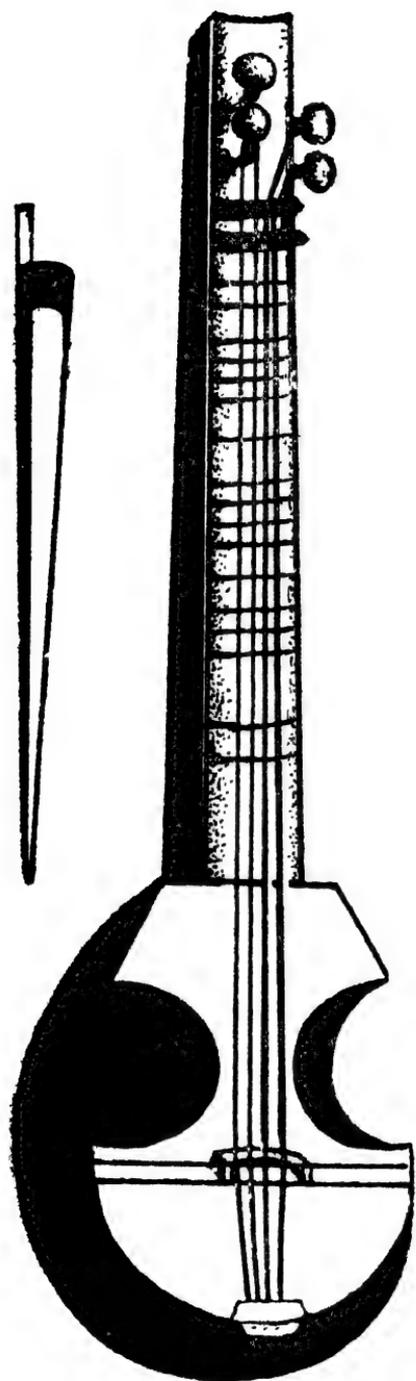
## এসরাজ ও তার প্রকার ভেদ

**এসরাজ :** এসরাজ যন্ত্রটির জন্মকাল দেড়শো বছরও পার হয় নি বলে মনে করা হয়। অনেকে বলেন যে কাশীধামের সঙ্গীতপ্রেমী নবীবক্স নামে সারেকী বাদকই এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।<sup>১</sup> অথোরা আবার কাশীধামেরই সঙ্গীতসাধক ঈশ্বরীপ্রসাদজীকে এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন এই ঈশ্বরীপ্রসাদকে লোকে ঈশ্বরী মহারাজ বা ঈশ্বরীরাজ বলে ডাকতেন এবং তাঁদের ধারণা যে ঈশ্বরীরাজের নাম থেকেই তাঁর সৃষ্ট যন্ত্রটির নাম “ইসরাজ” রাখা হ’য়েছিল এবং এই ইসরাজ শব্দটিই পরবর্তিকালে এসরাজ শব্দে পরিণত হয়েছে। এই ঈশ্বরী-প্রসাদ পাঞ্জাবের লোক ছিলেন। এরূপও শোনা যায় যে ঈশ্বরী দাসজীর শিষ্য বিহারিজী ও লক্ষ্মণদাসজী ইসরাজ আবিষ্কার করে তাঁদের গুরুর নামে যন্ত্রটি উৎসর্গ করেন।

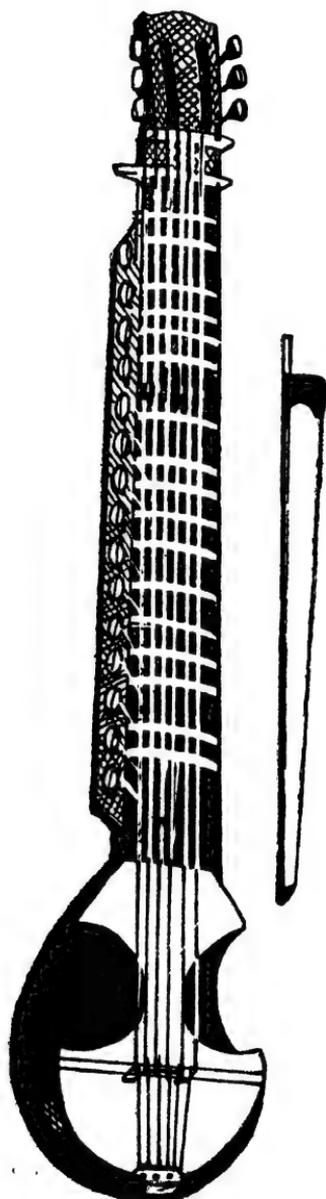
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতৃক প্রকাশিত ভারত কোবের ২য় খণ্ডে।<sup>২</sup> স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন, “কথিত আছে, সঙ্গীতবিরোধী হওয়ার পূর্বে সম্রাট আওরঙ্গজেব যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন”। সেই হিসাবে যন্ত্রটির জন্মকাল তিনশো বছর হয়ে যায়। এখানেও প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না। আকবর বাদশা বা তান্ত্র প্রপৌত্র দারা অথবা সূজার নাম থাকলেও কথাটি কিছু বিশ্বাসযোগ্য হ’ত। আওরঙ্গজেবের নামটি আমাদের কাছে খুব সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় না। আওরঙ্গজেবের সময় তাঁর অন্তঃপুরে কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চার নমুনা অবশ্যই পাওয়া যায়। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গীতচর্চা করার নজীরও দেখা যায় কিন্তু তাঁর নিজের এ বিষয়ে আগ্রহের কোন হৃদিশ পাওয়া যায় না। কাজেই সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় এরূপ কিংবদন্তীতে বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। সঙ্গীতবিদেবী হওয়ার আগে সঙ্গীতসম্বন্ধে তাঁর বিশেষ চর্চা বা প্রকার কোন নজীর আমরা পাই না বলেই কোন একটি নূতন বাণ্যযন্ত্র তাঁর পক্ষে উদ্ভাবন করার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তাছাড়া যদি এটি ঔরঙ্গজেবের সময়ে নির্মিত বা স্বয়ং বাদশার দ্বারা উদ্ভাবিত হত, তবে বাদশার সময়ে তাঁর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ফকিরুল্লা রচিত রাগদর্পনে এই যন্ত্রের উল্লেখ থাকতো।

(১) এসরাজ তরঙ্গ-রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) ভারতকোব-২য় খণ্ড এসরাজ।



স্বরভাষ বা তাজ বা মঞ্জবাহার বা খাদম্বরী নাদেশ্বর



সাধারণ এশ্রাজ

রাগদর্পনের পঞ্চম অধ্যায়ে বাণ্ডম্‌য়ের তালিকার মধ্যে এশ্রাজ যন্ত্রের নাম পাওয়া যায় না।

মুসলমান উস্তাদেরা অনেকে বলেন যে এসরাজ শব্দটি এসেছে “আয়েন-সিন্-রে-আয়েন-জিম্” কথাটি থেকে। প্রথম আয়েন থেকে ‘এ’, সিন্ থেকে স, রে থেকে র, দ্বিতীয় আয়েন থেকে ‘া’ এবং জিম্ থেকে ‘জ’। এইভাবে এ-স-র-া-জ অর্থাৎ এশ্রাজ শব্দটি এসেছে। ‘আয়েন সিন রে, আয়েন জিম্’ শব্দটির অর্থ হল ‘রোশনাই পয়দা করা’ অর্থে ‘দীপ জ্বালা বা আগুন জ্বালা’। তারা বলেন যে এই যন্ত্রের মধুর আওয়াজ মনের মাঝে আগুন জ্বালায়, তাই এর নাম এসরাজ বা এশ্রাজ। কবির ভাষায়—“তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে” : অনেকে বলেন “সিরাজ” এই উর্দু শব্দটি থেকে “এশ্রাজ” এসেছে। এই সিরাজ শব্দটির অর্থও দীপ। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই যন্ত্রটির নাম রেখেছিলেন “আশুরঞ্জনী”।<sup>১</sup> এই শব্দটির অর্থ প্রমাণ করে যে যন্ত্রটির মধুর আওয়াজ শীত্ৰই সকলের মনোরঞ্জন করে। আশুতোষ অর্থে শিবকে বুঝায়, এইভাবে আশুরঞ্জনী অর্থে মহাদেবের আনন্দদায়ক এরূপ অর্থও করা হয়।

অনেকের ধারণা যে এই যন্ত্রটি এরেবিয়া থেকে এসেছে।<sup>২</sup>

এ সম্বন্ধে এরেবিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থলেখক হুসেন ইবনু জাইলা লিখিত “কিতাব-মল-কাফীফল-মিউজিকি” গ্রন্থে যে সমস্ত বাণ্ডম্‌য়ের নাম পাই এবং আসিয়া থেকে নানা দেশে যে সমস্ত বাজনা তখনকার দিনে রপ্তানি করা হ’ত, তাদের নামের তালিকার মধ্যে আমরা এসরার, এশ্রাজ, বা ইসরাজ নামের কোন বাণ্ডম্‌য়ের সন্ধান পাই না। তাছাড়া এটি যদি পারস্য থেকে আমদানি করা হ’ত তবে এশ্রাজ বা এসরাব শব্দটি কোন না কোন প্রাচীন পারস্যীক অভিধানে পাওয়া যেত। আমরা সম্ভবমত অনুসন্ধান করে এরূপ কোন বাজনার নাম পাই নি। খ্যাতনামা সঙ্গীতানুসন্ধিৎসু পরিব্রাজক আলমাস্তুদীও এইরূপ নামের কোন বাণ্ডম্‌য়ের কথা লেখেন নি। সিনি (Sine) নামে যে মধুরযন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন সেটা আদৌ এশ্রাজের অরূপ কোন যন্ত্র নয়। Dr. Snouick Hourgronje

(১) আশুরঞ্জনী শব্দ-ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

(২) New oxford History of Music ( volume 1-1957 edition ) chapter Ancient and Oriental Music. Edited by Egon Wells page no 225. “The Dilruba and Esraj are of persian origin”.

তাঁর mecca নামক গ্রন্থে যে Kamanuja<sup>১</sup> কথা লিখেছেন, যেটি প্রথমে দুই তার এবং পরে চার তারবিশিষ্ট যন্ত্র বলে পরিচিত ছিল, সেই যন্ত্রের ছবি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেটি এস্রাজ নয়। এই কেমানোজে যন্ত্রটিও 'রাভানা' অর্থাৎ রাবনাস্ত্রমের অন্তর্করণ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আবার কেমানোজে যন্ত্রটি ভারতের অমৃতীর অন্তর্করণে নির্মিত এরূপ ধারণাও করা হয়।<sup>২</sup>

সেতার ও সারেক্কার যুগ্মমিশ্রণে এস্রাজের জন্ম। এর দান্ডি সেতারের মত। আর খোল (হাঁড়ি) অনেকটা সারেক্কার মত চামড়ায় ঢাকা। বাজনাটি ছড় দিয়ে বাজান হয় বলে ধনুর্ষন্ত্রের কোঠায় পড়ে। আজকের এস্রাজ রাভানা যন্ত্রগোষ্ঠীর নবীন সংস্করণ। এই যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধ ও সভ্যযন্ত্ররূপেই বেজে থাকে, তবে অনেক সময় অল্পগতসিদ্ধ যন্ত্ররূপে গানের সঙ্গতেও একে দেখা যায়। যন্ত্র সৃষ্টির প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিচার করে এবং যুগ্ম যন্ত্রের মিলনে জন্ম হওয়ার ফলে অসবর্ণের কোঠায় ফেলে একে আমরা অপাংক্তেয় করে রেখেছি। কোন সঙ্গীতাসরে সভ্যযন্ত্ররূপে একে স্থান দিতে তাই আমরা দ্বিধা করি। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে এই যন্ত্রে কুশলী বাদকের সংখ্যা খুব অল্প। ভাল (quality-র) এস্রাজে যথাযথ ভাবে সাইজমত তার লাগিয়ে যন্ত্রোপযুক্ত পীচে (pitch) বেঁধে হুরেলা তৈরী হাতে যদি বাজান হয়, তবে তত গোষ্ঠীর কোন বংশধরের পক্ষ নিয়ে তুলনামূলকভাবে এর বিরুদ্ধে সঙ্গীতকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে না। একমাত্র ঝালার কয়েকটি বিশেষ কাজ ছাড়া এতে আলাপচারীর কাজ এত সুন্দর হয় যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যাঁরা ভাল বাজিয়ের হাতে এই যন্ত্রের বাজনা শুনেছেন তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন। এটিকে আলাপচারীর অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

যন্ত্রটির জন্ম বেনারসে বা দিল্লীতে অথবা যেখানেই হোক, গয়্যার কয়েকজন গয়্যালীই (গয়্যার তীর্থগুরু অর্থে পাণ্ডাদের গয়্যালী বলা হয়) এতে বিশেষ

(১) আববদের কেমানজে নামক আদি ছড়ের যন্ত্রের সম্বন্ধে Grove's Dictionary of Music and Musicians (2nd Edition 1952) IV volume এ লেখা আছে. "It is undoubtedly one of the earliest of all bowed instruments, claiming identity with or descent from the somewhat mythical Ravanastarm of India from which the Urheen (Erhsien) of the Chinese is also supposed to have sprung."

(২) সঙ্গীতসার—কেন্দ্রমোহন গোস্বামী (২য় সংস্করণ ১৯৮৬ সাল পাতা ৬৫-৬৬)

স্বনাম অর্জন করেন ও কলকাতায় যন্ত্রটি প্রচলনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরে এর প্রচলন ছিল এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার উস্তাদদের চেষ্টাতেও এটি কলকাতায় প্রচলিত হয়। নামকরা বাজিয়েদের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন বাদক এই যন্ত্রে দক্ষ ছিলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি। আজও বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে এর ব্যবহার আছে।<sup>১</sup>

যন্ত্রটির সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ ভালজাতের ( Special quality-র অর্থে মধুর জোরদার গম্ভীর আওয়াজ বিশিষ্ট ) যন্ত্রের অভাব। গমক, ফান্দা, জলদ তান, গীটকারী প্রভৃতি অলংকারগুলি এতে বাজান বিশেষ অস্থূলনসাপেক্ষ।

বহুদিনের নিয়মিত একাগ্র সাধনায় এই যন্ত্রে দক্ষতা লাভ করা যায়। হাঁড়িতে চামড়ার আচ্ছাদন থাকায় আবহাওয়ার তারতম্যে চামড়াটি টেনে বা নরম হ'য়ে গেলে সুর ও পর্দার অবস্থানের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নতুন করে সুর বাঁধতে ও ভাল আওয়াজ ফিরে পেতে দীর্ঘ সময়ের ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। এইসব কারণে শ্রোতারাও অনেক সময় বিরক্ত হ'য়ে পড়েন। সারেকী বাজিয়েরা বাঈজীর গানের অহুসরণ করতেন বলে সারেকী বাদকদের ও সারেকীর মান নীচু ছিল। এসরাজের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এতে সহজে সুন্দর করে যন্ত্র ও গানের সব কাজ ভালভাবে আদায় করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতে পারেন অথচ মর্যাদা হানি না হয়। অনেক শিক্ষিত ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে গততোড়া বাজানো পছন্দ করেন এবং গানের সঙ্গে সঙ্গত করাকে এড়িয়ে চলেন। অনেকে আবার হারমোনিয়ামের বদলে এই যন্ত্রের সাহায্যে গান বা সঙ্গত করাকেই শ্রেয় মনে করেন। বলা হয় 'এস্রাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাজে কিন্তু তাছাড়াও যে এতে উচ্চাঙ্গ (classical) সঙ্গীতও বাজে, কোন উপযুক্ত গুণীর বাজনা শুনলে সেটি বোঝা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতও সহজসাধ্য বস্তু নয় এবং তাতেও কিছু এমন কঠিন কাজ থাকে যা আদায় করতে গেলে classical সঙ্গীতে জ্ঞান ও দখল থাকা প্রয়োজন।

এখন এসরাজের অপর নাম "এসরার" শব্দের কথায় আসছি। খ্যাতনামা সঙ্গীতচার্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীজীর "আশুরঙ্গনীতন্ত্র" নামক পুস্তকেই

(১) The Music of India by Rev. Popley. The Esraj is the Bengal variety of Sarangi.....This is the common instrument that one finds in the house of cultured people of Bengal".

আমরা এই 'এসরার' শব্দটি প্রথমে পাই। এই শব্দটি বিষ্ণুপুর ঘরানার স্বনামখণ্ড সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর "এসরার তরঙ্গ" নামক পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। সেই ঘরাণার ধারক ও বাহক শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "এসরার মুকুল" নামক পুস্তিকায়ও এই নাম দেখা যায়। আধুনিক বাংলা অভিধানে এস্রাজের অর্থ যন্ত্রবিশেষ বলে লেখা হয়েছে। এসরার শব্দের অর্থ বিষয়ে আমরা খ্যাতনামা শ্রবীণ যন্ত্রনির্মাতা ৭ শিল্পী স্বর্গীয় নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয়ের মারফত তাঁর সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুপুরের স্বর্গীয় স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে বিষ্ণুপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় 'এস' মানে স্মৃষ্টি ও 'রার' মানে র্ননি লেখা আছে। অতএব আসলে মানেটি দাঁড়ায়—এসরার একটি স্মৃষ্টি ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র। স্বরেনবাবুর ধারণা যে এসরার শব্দটি হয়ত ফার্সী শব্দ হতে পারে, কিন্তু আমরা এস বা রার এই দুটি শব্দ পার্সিয়ান বা এরাবিক অভিধানে পাই নি। এস্রাজ বা এসরার অথবা 'এস' বা 'রার' প্রতৃতি শব্দচতুষ্টয়ের অর্থ সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের উর্দূ প্রফেসর মিঃ সিদ্দিক ও মিঃ তাইয়্যাব, এম, এ মহোদয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তাঁরাও জানিয়েছেন যে এরূপ কোন শব্দ ঐসব ভাবার অভিধানে পাওয়া যায় না তবে ইসরার নামে চলতি একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ হচ্ছে রহস্য (mystery)। তথাপি বিষ্ণুপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় যখন এসরার শব্দটি লেখা আছে, এবং স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তকেও যখন এই নামটি দেখা যায় তখন আমাদের পুরাতন সংগ্রহ হিসাবে এসরার নামটিকে সম্মান দিতে হবে।

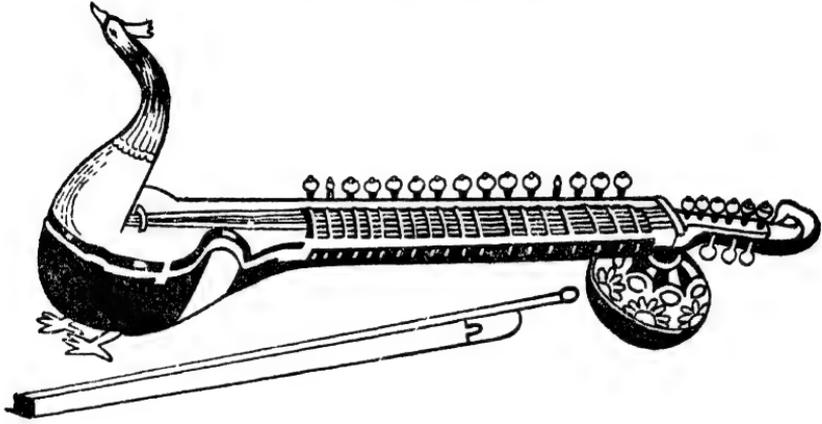
The Story of Indian Music by O. Goswami, chapter Indian Musical Instruments, page 305.

"Esraj and Dilruba are both muslim innovations from sarangi. During the muslim rule when the women in the harem took to singing, they could not be accompanied by the sarangi players who were mostly men. Women could not take to the Sarangi as it was not only a difficult instrument but also spoilt the beauty of the nails. So the upper portion of the Sarangi was lengthened to some extent and frets were fixed on it numbering 15 to 17 according to their size."

এ উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য : গান বাজনা শেখানোর কারণে গাইয়ে ও বাজিয়েরা হারমে পাহারাধীনে যেতে পারতেন তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়,

কাজেই আমরা উপরোক্ত যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম। আমরা এসরাজ নামে কোন বাগ্গযন্ত্রের নাম তখনকার কোন মূল্যীম সঙ্গীত গ্রন্থেও দেখতে পাই না, অতএব এটি লেখকের নিজস্ব অভিমত বলেই আমাদের ধারণা। এসরাজ যন্ত্রটির ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। প্রামাণ্য এমন কিছু পাই না যা আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি।

**মায়ুরী :** এসরাজের হাঁড়িতে ময়ূরের মুখ জুড়ে আর একটি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা হয় 'মায়ুরী' বা 'তাউস'<sup>১</sup> এই তাউস শব্দটি ফার্সী শব্দ, এর অর্থ ময়ূর। মায়ুরী এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থও ময়ূর। নামের দিক থেকে আলাদা হলেও উভয়



মায়ুরী

যন্ত্রই আকৃতিতে এক। খ্রী: পূ: ৫০০ শত বৎসর পূর্বে চীনের রাজসভায় হিন্দু বাগ্গযন্ত্রের মাঝে মায়ুরীর নাম পাওয়া যায়।<sup>২</sup> নাম থেকে যদিও আমরা প্রমাণ করতে পারি না যে সেটি বর্তমানে প্রচলিত মায়ুরীর অল্পরূপ ছিল তবে আমরা ধারণা করতে পারি যে যখন হিন্দু বাগ্গযন্ত্রের মধ্যে একপ্রকার বাগ্গযন্ত্র হিসাবে পরিচিত ছিল তখন হয়ত সেটিই আজকের 'মায়ুরী'। প্রাচীনকালে এটি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহার কমে যায়, যেমন আজ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র প্রায় অবলুপ্তির পথে।

মায়ুরীর প্রাচীনত্বের কথা চিন্তা করে একথাও ভাবা যেতে পারে যে মায়ুরীর হাঁড়ির (belly-র) ময়ূরের মুখটি বাদ দিয়ে এশ্রাজ সৃষ্টি করা হয়েছিল! এরূপ

(১) কলিকাতার বাহুবল্লভ প্রদর্শনীর একোষ্ঠে মায়ুরী নামক বস্তু রাখা আছে।

(২) The History of Musical Instruments by Curt Sach Edition 1940, chap. India, page 232.

ভাবলে যন্ত্রটি যে ভারতীয় সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তবে মায়ুরীকে আমরা কোনরকমেই দিলরুবা বলতে পারিনা, কারণ মায়ুরীতে দিলরুবীর কায়দায় পটরীর তলদেশ দিয়ে কম্পনের তার নিয়ে যাওয়া হয় না এবং এর হাঁড়িটা দিলরুবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। রাজা শ্রী সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের মতে এই যন্ত্রটি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়েছে এবং বিষ্ণুপুর নিবাসী শিল্পী সেবারাম এই যন্ত্রের আবিষ্কারকর্তা।<sup>১</sup> কিছুদিন আগের সঙ্গীত গ্রন্থেও আমরা মায়ুরীবীণের নাম পেয়ে থাকি। যন্ত্রটি কত প্রাচীন তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীনকালে তারযন্ত্র মাত্রকেই বীণ বলা হত এবং সেই কারণেই মায়ুরীকে “মায়ুরী-বীণ” বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই মায়ুরী-বীণ “বাসরম্বতী” নামে পরিচিত। মায়ুরী ও মায়ুরী-বীণ একই আকৃতির যন্ত্রবিশেষ। স্বর্গীয় ডাঃ অমিয়নাথ সাহালা পিনাকী বীণাকে এসরাজের পূর্বরূপ বলে এই বীণাকে এসরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “পিনাকী আধুনিক এসরাজের পূর্বরূপ হবে।”<sup>২</sup>

অতএব তাঁর কথায় এসরাজ ভারতের নিজস্ব একটি প্রাচীন যন্ত্রের ভিন্নরূপ বলেই প্রতীত হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বা তারও আগে এমন একটি যন্ত্র ছিল যাকে এসরাজের পূর্বরূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মায়ুরী ও এসরাজ একই যন্ত্র।

এসরাজ যন্ত্রটির নাম, অর্থ, জন্মকাল ও আবিষ্কারক সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সমাধানে আসা সম্ভব নয় বলে আমরা বিভিন্ন মতামত আপনাদের সামনে রেখে ইতিহাস থেকে বিদায় নিলাম।

এসরাজ যন্ত্রের আকার ও অবয়ব ভেদে আরও যে কটি নাম প্রচলিত আছে একে একে তাদের কথায় আসছি। খুব বড় আকারের এসরাজ যা আগের দিনে সমবেত বাণবৃন্দে ব্যবহৃত হত তার কথা বলছি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই প্রথম এই বৃহদাকারের এসরাজ তৈরী করান, দেবী যন্ত্রের অর্কেষ্ট্রায় (বাগমণ্ডলীতে) বাজাবার জন্ম। একে **মঙ্গলবাহার** বলা হয়।<sup>৩</sup> এগুলি এত বড় ছিল যে চেয়ারে বসে violincello-র কায়দায় বাজান হ’ত। কলকাতার ষাট্‌ঘরে **নাদভরজ** নামে এই যন্ত্র রাখা আছে। প্রাচীন যন্ত্রবিদদের মধ্যে অনেকেই এটিকে ‘**তাজ**’

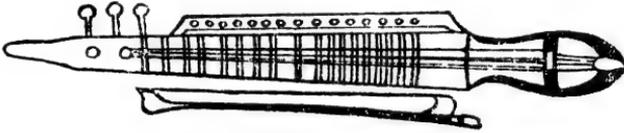
(১) স্বয়ংকোষ—রাজা শ্রী সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর

(২) প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা—ডাঃ অমিয় নাথ সাহালা (পরিচ্ছদ আয়োজন পৃ. ৯)

(৩) Musical Instruments of India by S. Krishnaswamy, Page 59, “The Mandar Bahar” is very similar to the Esraj but the Finger Board and the Body are much bigger.”

বা সুরভাষ বা 'ভাষ' বলে থাকেন। তাজ বা ভাষ নামটি আমরাও পছন্দ করি। যন্ত্রকোষে এটি **খাদস্বরী নাদেশ্বর** নামে পরিচিত।

**সুরসজ বা সুরসৌ :** আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বিষ্ণুপুরের জনৈক শিল্পী সেবারাম দাস সুরসজ বা সুরসৌ নামের আর একটি বাণ্যযন্ত্র সৃষ্টি করেন। এটি অবিকল এশাজের মতই, তরফহীন বলে এতে নিস্তির কাঠ থাকে না। বাজাবার কায়দা অবিকল এশাজের মতই। আজকাল এর প্রচলন নাই।



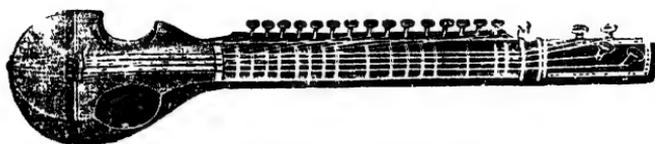
মীন সারেঙ্গী

**মীন সারেঙ্গী :** মীন সারেঙ্গী এশাজের আর এক রূপ। এই যন্ত্রের দানডি ও হাঁড়ি একটি বড় লম্বা লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হ'ত। যন্ত্রটির বাকি সব অংশই এশাজের মত। বাজাবার কলাকৌশলও অভিন্ন। যন্ত্রটি আকারে ছোট এবং হাঁড়ির কাছে কাঠের তৈরী একটি মাঁচের মুখ রাখা হত। মীনশব্দের অর্থ মাঁচ এবং সেই কারণেই এর নাম "মীন-সারেঙ্গী"।

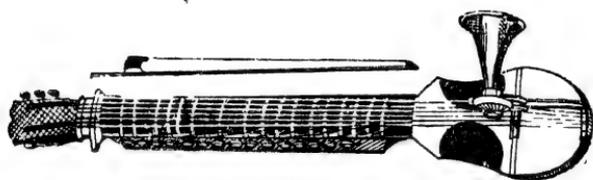
**কোয়েল :** খুব ছোট আকারের এশাজকে 'কোয়েল' বা এশাজের ফাস্টপাট বলে। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কালে ছোট আকারের চড়া সুরে বাঁধা এশাজের নাম রাখেন **কোয়েল**।

**তারশানাই :** ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে এশাজ যন্ত্রে গ্রামোফোনের সাউণ্ডবক্স লাগিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে 'তারশানাই'। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন কর্তা। (যন্ত্রটির রেজিস্টার্ড নং ৭২৩ কলিকাতা)। স্বর্গীয় বেতারশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারশানাই যন্ত্রটি নির্মিত হয়। দাস মহাশয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। সঙ্গীতের ব্যবহারিক শাস্ত্রে ও ক্রিষ্টাঙ্ক অংশে তাঁর দখল ছিল। সমবেতবাণ্যে তিনিই তারশানাই প্রথম ব্যবহার করেন। এই তারশানায়ের ব্যবহার ও তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বাণ্য মণ্ডলীর মাঝে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। একক বাজনা তেমন সুন্দর হয় না।

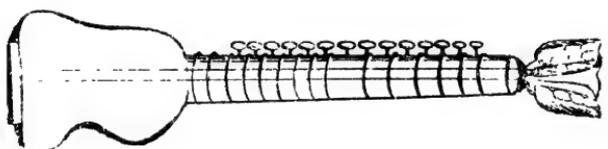
**দিলরুবা :** এখন আমরা সারেঙ্গীর গর্ভে সেতারের গুরসজাত তার দ্বিতীয় পুত্র "দিলরুবার" কথায় আসছি। এর খোলটি সারেঙ্গীর অনুরূপ ও দানডিটি



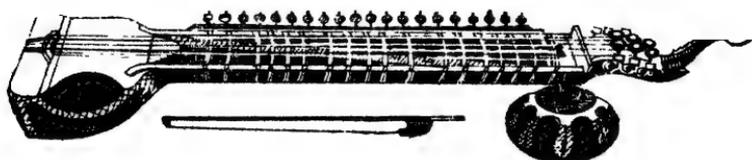
কোয়েল ( এশাজের 1st Part )



তারশানাই



সাধারণ দিলরুবা



উন্নত ধরনের আধুনিক দিলরুবা

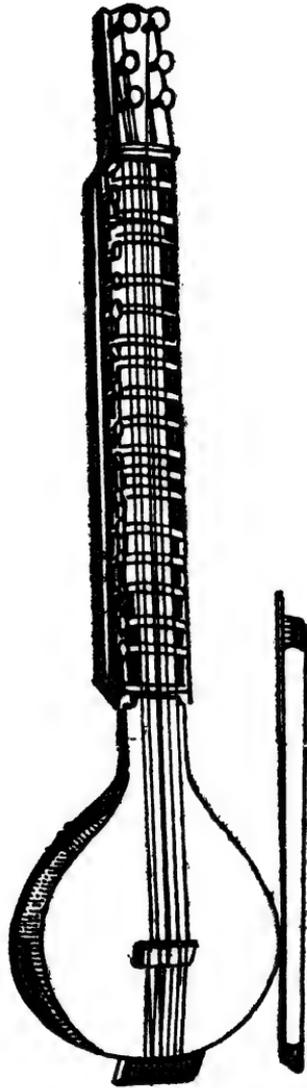
সেতারের সমরূপ। খোলের আকৃতির ঈষৎ প্রভেদ ব্যতিরেকে আর সবই এশ্রাজের মত। পটরির কাঠের তলদেশ দিয়ে তরফের তারগুলি নিশ্চির কাঠে রাখা ছোট ছোট কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে সারেকীর কায়দায় পটরির কাঠের ওপর ছুপাশে ছোট ছোট সওয়ারী রাখা হয়, এবং তার ওপর দিয়ে ৭৮ সাত আটটা তার টানা হয়। সওয়ারীঘরে জোয়ারী খোলার ফলে বাজাবার সময় এই তারের কম্পনে প্রতিটি বাঁদিত স্বরে বিশেষ জোয়ারীযুক্ত আওয়াজ প্রকাশ পায়, ফলে স্বরধ্বনিগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই দিলরুবা কথাটি উর্দু শব্দ এবং এর অর্থ হৃদয়কে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা বা টেনে নিয়ে যাওয়া, সুতরাং বাংলা ভাষায় আমরা এটিকে মনোরঞ্জনী নামে ডাকা পছন্দ করি। এশ্রাজ **আশুরঞ্জনী**, তার ভাই দিলরুবা **মনোরঞ্জনী**।

বর্ন সাহেবের ইতিহাসে<sup>১</sup> (আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে) দিলরুবা নামে একটি বাত্মযন্ত্রের নাম দেখা যায়। যন্ত্রটির আকৃতি বা বাদন প্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ জাগে যে সেটি আজকের দিনের প্রচলিত দিলরুবা কিনা। এশ্রাজের মত এরও জন্মকাল এবং উদ্ভাবকের নামের কোনও হিঁদিশ মেলে না। এই যন্ত্রটি বর্তমানে বোম্বাই অঞ্চলেই বেশী ব্যবহৃত ও নির্মিত হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা যন্ত্রটি পাঞ্জাব থেকে এসেছে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও এর কিছু ব্যবহার দেখা যায়। দিলরুবাবার ব্যবহার বাংলা দেশে অল্প।<sup>২</sup> খুব অল্প-সংখ্যক বাদকই এই যন্ত্রটি এককভাবে বাজিয়ে থাকেন। বৃহত্তর এশিয়ার নানা জাতির সহিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান থাকায় ও বহুদিন যাবৎ নানা জাতির শাসনাধীন থাকায় অতীতে ভারতীয় যন্ত্রের সহিত অল্প জাতির যন্ত্রের আদানপ্রদান ও মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণের ফলে অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় যন্ত্র অতীত নামটি হারিয়ে ফেলে। যন্ত্রের আসলরূপ ও বাদনপদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায়। অথচ কোন্ দেশের কোন্ যন্ত্রের সহিত মিশ্রণের ফলে অথবা কবে কোন্ দেশে চলে যাওয়ায় যন্ত্রটির আকারে রদবদল ঘটলো, তার ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। নিতুল সমাধানে পৌঁছান তাই এত কঠিন, একথাটি আমাদের বার বার করে বলতে হচ্ছে। এখনও চীন জাপান ও এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশে বিশেষভাবে অল্পসংখ্যক

(১) History of Music by Burney Charles.

(২) Herbert A Popley সাহেব তাঁর The Music of India গ্রন্থে বলেছেন—“It is used in the Punjab & in the United Provinces.” (ইং ১৯২১ সালে প্রকাশিত)

করলে হয়ত আমরা প্রাচীন ভারতের কিছু লুপ্ত বাগ যন্ত্রের সন্ধান পেতে পারি।



শতবর্ষ পূর্বকার প্রাচীন এক-ধরণের এশ্রাজ। এ সঙ্কে কোন সঠিক সংবাদ এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বাগযন্ত্রের আবিষ্কার সঙ্কে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে কিছু উদাসীন। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরাও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেননি। ফলে অগ্ণাৎ দেশের কাছে আমাদের নিজস্ব বাগযন্ত্রও আরব বা পারস্যদেশজাত বলেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। আমাদের জাতীয়সম্পদ সঙ্কে আমাদের আরও সন্নাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এশ্রাজ যন্ত্রে অতীতে খারা বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ও বর্তমানে খারা এই যন্ত্র বেতারে বা সঙ্কীতাসরে বাজিয়ে চলেছেন তাঁদের নাম লিখে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

**অতীত :** বেনারসের নবীবক্স সারেঙ্গী-ওয়ালা ও ঈশ্বরীপ্রসাদজী। গয়ার হুসমান-প্রসাদজী, কানাইলাল টেঁড়ীজী, যোগীন ডাক্তারজী ( ভেলুবাবু ), চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবেজী। বিষ্ণুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিষ্ণুপুর ঘরানাদাবেরা। বরিশালের বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শীতল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার হাবুদত্ত ( স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ) ও তন্ত্র পুত্রপ্রতিম শরৎদত্ত ( নস্তুবাবু ), বীরেন মুঞ্জাজী, দর্জিপাড়ার সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী উপাধিপ্রাপ্তা যাত্রাণি, কাঁসারী পাড়ার কালীদাস পাল, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অঙ্কবাদক শ্রীনিবাস, ভারতের খ্যাতনামা সেতারী বিলায়েত খাঁর পিতামহ ও অতীতের

অধ্বিতীয় সেতারী এনায়েত খাঁর পিতা স্বর্গীয় সেতারী এমদাদ খাঁ সাহেব ( এশ্রাজে

অতি স্নন্দর ঠুংরী বাজাতেন, তবে তিনি কোন সভায় এ যন্ত্রটি বাজাতেন না), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এশ্রাজ বাজাতে ভালবাসতেন ও ভালভাবে বাজাতে পারতেন। **বর্তমান** বাজিয়েদের মধ্যে সর্বশ্রী দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, রনদীর রায়, নিমাই মল্লিক, শাস্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভদ্র পাল, সুনীল ভট্টাচার্য, অপূর্ব মুগোপাধ্যায়, শিবনাথ দাস, কেয়া মিত্র, বিজলীকুমার সেন, রাধারাণী কুণ্ডু, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। খাতনামা বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসতেন বহু মহাশয়ও এই যন্ত্রটি বিশেষ পছন্দ করতেন এবং নিজে বাজাতেন।

**যন্ত্রগুলির প্রধান অঙ্গ :** (খোলের ছাঁউনি ছাড়া আগাগোড়া কাঠের তৈরী)।

১। **হাঁড়ি বা খোল :** শুদ্ধ ভাষায় হাঁড়িকে **খর্পর** বা **ধ্বনিকোষ** বলা হয়। হিন্দীতে **তুন্দা** এবং ইংরাজিতে **বেলি (Belly)** বা **ড্রাম (Drum)** বলা হয়। হাঁড়ির ছু পাশের খালকে **হালোর** বলে। হাঁড়ির সামনের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, এটিকে **খোলের ছাঁউনি** বলে। শুদ্ধ ভাষায় এটি **ধ্বনিপট্টক** নামে পরিচিত। হাঁড়ির পিছন দিকে দান্ডির জোড়ের জায়গায় অনেক যন্ত্রে **খাঁজ** থাকে। এই জোড়ের জায়গাটিকে **কোমর** বলা হয়, অনেকে **ষাড়ু**ও বলে থাকেন। খোলের ৬ দান্ডির মাঝে **ঠেস** থাকে, আচ্ছাদনের ভেতর রাখা এই সরু কাঠের ঠেসটিকে ইংরাজীতে **বেসবার (Base Bar)** বা **সাইণ্ডপোস্ট (Sound Post)** বলা হয়। হাঁড়ির বাইরে মাঝখানে একটিনকোনা বস্তু থাকে। এটিকে **পন্থী** বা **মোগরা** বলে। সমস্ত তারের গোড়া এই পন্থীর খাঁজে খাঁজে বাধা থাকে। পন্থীকে শুদ্ধ ভাষায় **শালায়নী** বলে। হিন্দীতে **তারদান** বা **লংগোট** বলা হয়। ইংরাজীতে এটি **টেলপিস্** নামে পরিচিত।

২। **দান্ডি :** হাঁড়ির মতন দান্ডিও এই যন্ত্রগুলির এক প্রধান অংশ। হাঁড়ির মত দান্ডিও ধ্বনি-নিয়ামক। দান্ডির ছুটি ভাগ : প্রথমটি অর্ধবৃত্তাকার ফাঁপা, পিছনের অংশ নোঁকার খোলের মত। দ্বিতীয়টি দান্ডির ওপরের কাঠের ঢাকা। এই ঢাকাটিকে **পট্টরি** বলা হয়। পট্টরিকে শুদ্ধ ভাষায় **অঙ্গুলিপট্টক** বা **স্মারিকাস্থান** বলা হয়। ইংরাজীতে এটিকে **ফিংগার বোর্ড (Finger-board)**

বলে। দান্ডিকে হিন্দীতে **দান্ড্** বলা হয়। দান্ডিও খেলের সংযোগ স্থলকে কোমর বলা হলেও কারিগরেরা **গুন্ডু** বা **গলা** বলে থাকেন। দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান রাখার জায়গার ঠিক নীচে পরপর দুটি সাদা ফলক থাকে এগুলিকে **আড়ি** অথবা **ঘাড়ি** বলা হয়। শুক ভাষায় আড়িকে **তার-গহন** বা **সেতু** বলা হয়। এই সেতুকে সংস্কৃতে **মেরু** বলা হয়। অনেকে আড়িকে **সরস্বতী** বলে থাকেন। হিন্দীতে আড়িকে **অটি** বা **তার-দান** বলে এবং ইংরাজীতে বলে **নেক-ব্রীজ ( Neck Bridge )**। এগুলি চরিত্রের সিং, হাতীর দাঁত বা অগ্নি কোন ঘন পদার্থে তৈরী হয়।

**নিস্তীর কাঠ :** এশ্রাজ দিলরুবা প্রভৃতি যন্ত্রে তরফের কান রাখার কারণে দান্ডির পাশে একটি সরু কাঠ রাখা থাকে। তার মাঝের ছিদ্রগুলিতে তরফের কান রাখা থাকে।

**কান :** কানকে শুক ভাষায় **কীলক** বলা হয়। হিন্দীতে একে **খোঁটি** এবং ইংরাজীতে একে **পেগ ( Peg )** বা **কী ( Key )** বলা হয়। সাধারণ এশ্রাজে দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে চার (৪) বা ছয়টি (৬) প্রধান কান ও নিস্তীর কাঠে পনেরটি (১৫) তরফের কান রাখা হয়। যন্ত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

**পর্দা :** দান্ডির গায়ে চূড়ির মত গোলাকার কিছু সংখ্যক পর্দা রাখা হয়। এগুলি স্বর-স্থান নির্দেশক। দান্ডির সঙ্গে রেশমের সূতা দিয়ে এগুলি বাঁধা থাকে। পর্দাকে শুক ভাষায় **সারিকা** বলা হয়। হিন্দীতে পর্দাকে **সুন্দরীয়া** বা **পর্দে** ও ইংরাজীতে **ফ্রেট ( Fret )** বলা হয়। অনেকে একে **ঘাঁট** বা **ঘাট** বলে থাকেন। বৈদিক **আঘাট** শব্দ থেকেই এই **ঘাট** শব্দের উৎপত্তি। সচল ঠাটের যন্ত্রে ষোলটি ( ১৬ ) ও অচল ঠাটের যন্ত্রে উনিশ থেকে চব্বিশটি ( ১৯-২৪ ) পর্যন্ত পর্দা রাখা হয়।

**সওয়ারী :** শুক ভাষায় সওয়ারী **তন্ত্রাসন** নামে পরিচিত। হিন্দীতে একে **ঘোড়ী** বা **ঘুরচ** অথবা **গুরজ** বলা হয়। ইংরাজীতে এটি **ব্রীজ ( Bridge )** নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এটিকেও **মেরু** বলে। সওয়ারীর উপর এবং ভিতরের ছিদ্র দিয়ে পন্থীতে বাঁধা সকল তার দান্ডির মুক্ত প্রান্তে নিস্তীতে রাখা কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রকিশোর এই যন্ত্রটির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর অভিমত এই

যে যন্ত্রটিতে গান বাজান ও চলে, আবার যন্ত্রসঙ্গীতের সকল প্রকার অলংকারও প্রকাশ করা যায়।

**তার :**—বাজিয়ের খুশীমত এতে তার বাঁধার ওজন ও সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণভাবে চারটি (৪) প্রধান ও পনেরটি (১৫) তরফের তার থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখার ইচ্ছা থাকলেও কাগজের দুর্মূল্যতা ও অনটনের কারণে লেখা সম্ভব হল না। আসন ধারণ ও ছড়ের বিষয় সেই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আমরা এস্রাজের বিশেষ পুস্তকে সেগুলি প্রকাশ করার আশা রাখি।

**এস্রাজের ঘরাণা :** (১) **প্রথম বনারস ঘরাণা :** নবীবক্স সারেঙ্গী-বাদকএর প্রতিষ্ঠাতা। বনারস ঘরাণার ধারক ও বাহক হিসাবে আজ আর কোন এস্রাজীর নাম পাওয়া যায় না। **দ্বিতীয় বনারস ঘরাণা** পঞ্জাব ঘরাণার ঈশ্বরীপ্রসাদজী থেকে আরম্ভ। ঘরাণাদার হিসাবে আজ কোন এস্রাজ বাজিয়ের নাম পাওয়া যায় না।

(২) **গয়া ঘরাণা :** হুজুমানদাস সিংজী এই ঘরাণার প্রবর্তক। কানাইলাল টেঁড়ীজী এই ঘরের বিশিষ্ট বাদক ছিলেন। হুজুমানদাসজীর বাজের চাল থেকে এঁর চাল কিছু পৃথক ছিল। চন্দ্রিকাপ্রসাদ তবে গয়া ঘরাণার নামী এস্রাজী ছিলেন। কানাই টেঁড়ী থেকে বাঙ্গলায় হাবু দত্তের প্রতিষ্ঠায় এস্রাজঘর জন্মে ওঠে। শরৎদত্তের নামের সঙ্গেই কানাই টেঁড়ীর বাজ প্রায় শেষ হয়ে যায়। হাবু দত্তের বাজের মাঝে রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁ সাহেবের চাল যুক্ত ছিল। গয়া ঘরের খ্যালগায়ক ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, হারমনিয়ম-বাদক সোহনী সিং, মুনেশ্বরদয়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এস্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায়ও এই ঘরের এস্রাজবাদক হিসাবে নাম করেন। গয়ার যোগীন ডাক্তারজী (ভেলুবাঁবু), গৌরীপুরের আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতিও গয়া ঘরের এস্রাজী ছিলেন। (২) স্বর্গীয় স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এই ঘরাণার এস্রাজী হলেও তাঁর চালে গৌরীপুরের আচার্যের মত ইমদাদখানি চালের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এই বাজ এখনও দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রভৃতির হাতে শোনায়।

(৩) **করামৎ কুকুভ খাঁর ঘরাণা :**—এই ঘরের স্বর্গীয় কালীদাস পালই এস্রাজ ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর নামের সঙ্গেই প্রায় এই ঘরাণা শেষ। যে ছ একজন গুণী এই ঘরাণায় আছেন তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) **ইমদাদখানী ঘরাণা :** এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন ইমদাদ খাঁ।

এই ঘরে ডাঃ প্রকাশচন্দ্র সেন ও আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর (গোর্খাপুর) এশ্রাজ শেখেন। এই ঘরাণায় নাম করেন অন্ধবাদক শ্রীনিবাস। বর্তমানে অনেকেই এই ঘরাণার চালে এশ্রাজ বাজিয়ে থাকেন, যদিও চালের বাজে অল্প ঘরের মিশ্রণ দেখা যায়।

(৫) **বিষ্ণুপুর ঘরাণা** : রামশঙ্কর ভট্টাচার্য থেকে এশ্রাজের ঘর শুরু হয়। পরে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাম করা গুণীরা এশ্রাজের এক বিশিষ্ট বাজ প্রচলন করেন। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরের গুণী এশ্রাজ বাদক : এঁর ছাত্র রণগীর রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

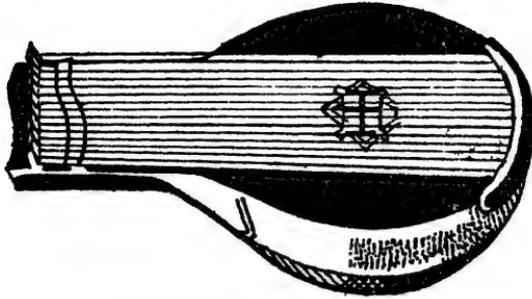
\* \* \*

**ওতুঘরী বীণা** : সঙ্গীত রত্নাকর ও বাগুরত্ন কোষ প্রভৃতিতে এই বীণার নাম দেখা যায়। যজ্ঞভূমির কাঠে এই বীণার দান্ডি তৈরী করা হত। এই বীণাকে কোন কোন স্থানে পিছোলা বীণা বলা হয়েছে। আর কোন পরিচয় বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। (শাঙ্খায়ন শ্রোত সূত্র)

**কচ্ছপী বীণা (কেচুয়া সেতার)** : কচ্ছপী বীণা বর্তমানে কেচুয়া সেতার নামে প্রচলিত। এই বীণার খোল (হাঁড়ি) বা ধ্বনিকোষটি কচ্ছপের পিঠের মত চ্যাপ্টা, এই কারণেই একে কচ্ছপী বীণা বলা হয়। হাঁড়িটি তিত লাউয়ের শুকনো গোলা থেকে ও দান্ডিটি কাঠ থেকে তৈরী হয়। ভারতীয় সেতার বলতে কচ্ছপীকেই বোঝায় কারণ প্রাচীনকালে কচ্ছপী ও ত্রিতন্ত্রী এই উভয় বীণাতেই তিনটি করে তার রাখা হত। কচ্ছপী বীণা অতি প্রাচীন। তদানীন্তন সংগীতপণ্ডিত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর “যন্ত্রকোষ” পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে গীটার জিতার, লায়ার, টেমটিডো প্রভৃতি যন্ত্র কচ্ছপী বীণার অন্তর্ভুক্ত। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-অনুসন্ধানী বহু পণ্ডিতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে এই কচ্ছপী পাশ্চাত্য দেশের বহুবিধ তত যন্ত্রের আদিপুরুষ। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বইটি পড়ার অনুরোধ জানাই।

কলিকাতার যাহুঘরে একটি অতিবৃহৎ কচ্ছপী বীণা রাখা আছে। এটি রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে মিউজিয়ামকে দান করা হয়েছিল। কচ্ছপী বীণাকে অনেকে কুর্মী বীণা বলে থাকেন, কিন্তু আমরা সঙ্গীত গ্রন্থে কুর্মী বীণা নামে একটি পৃথক যন্ত্র পাই বলেই কচ্ছপীকে কুর্মী বলতে পারি না।

কচ্ছপীর বাদনপ্রণালী সেতারের মত, অর্থাৎ মিজরাব দিয়ে তারে ঘা মেরে বাজান হয়ে থাকে। ষোলটি পর্দা এবং ক্ষেত্র বিশেষে চব্বিশটি পর্দা দান্ডিতে তাঁত দিয়ে বাঁধা থাকে। হাঁড়ির আকৃতিভেদ ব্যতিরেকে সকল বিষয়ই সেতারের সমরূপ, তাই পৃথক ছবি দেওয়া হল না।

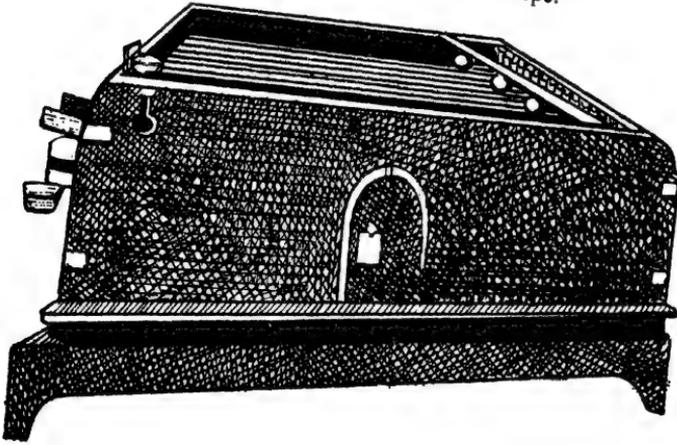


কাত্যায়নী বীণা (প্রাচীন প্রকার)

কাত্যায়নী বীণা বা কানন অথবা কানুনঃ ঋক্বেদে যে বাণ জাতীয় বীণার উল্লেখ দেখা যায় সেই শততন্ত্রীযুক্ত বাণ বীণাই আকার পরিবর্তনে ও নামভেদে কানুন বা কানন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অনেকের ধারণা খৃঃ জন্মের চারশো বছর আগে পার্টলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) নন্দরাজার রাজত্বকালে যে কাত্যায়নের নাম শোনা যায় তিনিই এই যন্ত্রের স্রষ্টা কিন্তু আমাদের ধারণা যে শততন্ত্রী যন্ত্রের স্রষ্টা কাত্যায়ন নন্দরাজার আমলের লোক নন। ইনি শ্রীতসূত্রের কাত্যায়ন। Rev. Popley সাহেব “The Music of India” পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “Katyayani vina was invented by Kishi Katyayana and was also called the Sata-tantri vina, because it had originally a hundred strings.” অতএব প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঋক্বেদ-বর্ণিত বাণ জাতীয় বীণাই কাত্যায়নী বীণা। শততন্ত্রী বীণায় একশত তার থাকতো, একথাও এখানে বলা হয়েছে এবং সেই কারণেই এর নাম শততন্ত্রী রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া “পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে” শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মুঞ্জা ঘাসে বা দুবা ঘাসে তৈরী একশতটি তার এতে রাখা হত। ফরাসী সংগীত-ইতিহাসলেখক ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ভিলেটি (Mr. Velleteau) স্বীকার করে গেছেন যে মিশরীয়েরা ভারত থেকে কাত্যায়ন বীণা মিশরে নিয়ে গিয়ে তার অঙ্করণে তাদের কাতুন যন্ত্র নির্মাণ করেন।

আরবেরা এই কাভুন যন্ত্র নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এর নাম দেয় **কানুন**।\*  
অতএব আমরা সহজেই অহুমান করে নিতে পারি যে বর্তমানের কাহুন বা  
কানন বা সন্তর প্রভৃতি যন্ত্রসকল আমাদের শততন্ত্রী অঙ্করণেই গড়ে উঠেছে।  
(মোগলদের আমলে এই কাহুনে মাত্র চল্লিশটি তার রাখা হত।)

আরবীয়েরা ও পারশীকেরা উভয়েই দাবী করেন যে যন্ত্রটি তাঁদের উদ্ভাবন।  
Harvard Dictionary of Music 1956 Edition. page 385-এ  
লেখা হয়েছে "An Arabic Psaltery with 26 gut strings, the  
name of which is derived from the Greek word 'Canon' i, e  
monochord, occurs as early as in the tenth century in a story  
of the Arabian nights. In the later middle ages (12th  
century, ) the instrument was imported into Europe.

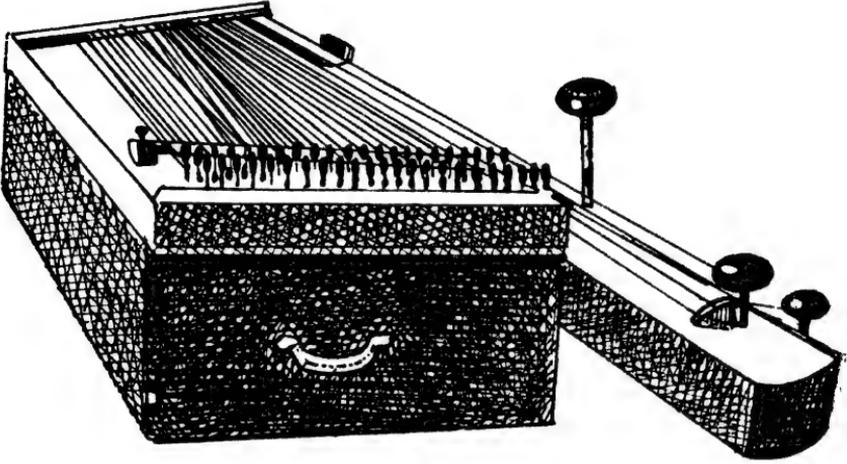


বর্তমান কানন

এখানে আরব দেশের নাম পাই। আবার Mr. Henry George Farmer  
টার লেখা "Studies in Oriental Musical Instruments" নামক পুস্তকে  
নবম পৃষ্ঠায় লিখেছেন "It is stated that the Instrument called the  
Quanun was Al-Farabi's invention and he was the first who  
mounted it in its present form. এখানেও আরব দেশের আলফারাবির

\* যন্ত্রকোষ...রাজা স্তার দৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

নাম পাওয়া যায়। History of Arab Music by Salvader Daniel পুস্তকটির ২২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে The instrument had seventy five strings এবং whilst the instrument came from the Greeks, I am not sure whether it is derived from trigonon or kynnari. এই পুস্তকে আরও বলা হয়েছে যে Egypt এবং Asia-তে যে ধরণের কাছন ব্যবহৃত হয় সেগুলি ( Santur ) সম্ভব যন্ত্রের মত।



মিজরাব বাদিত কানন ( স্বরমণ্ডলও বলা হয় )

এই সব পুস্তক পাঠে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এটি প্রাচীন গ্রীকদের বা আরব অথবা মিশরীয়দের উদ্ভাবিত যন্ত্র নয়। আমাদের “কাতায়ননী”ই তারসংখ্যার পরিবর্তনে ও আকারভেদে ভিন্ন দেশে গিয়ে নামান্তর গ্রহণ করেছিল এবং পরে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আবার আমাদের দেশে ফিরে এসেছে ‘কানুন’ নামে। এই কানুন নামটি আরবীয়েরা পেয়েছে গ্রীকদের কাছ থেকে। ( The Canon or rule of Greeks ) Farmer সাহেবের পুস্তকে দশম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে “The name Kanun was clearly derived from the Greeks. By the tenth century, owing to Arabic translation from Greek, Syriac and Persian a considerable foreign nomenclature had been adopted by the Arabs in their science & arts.”

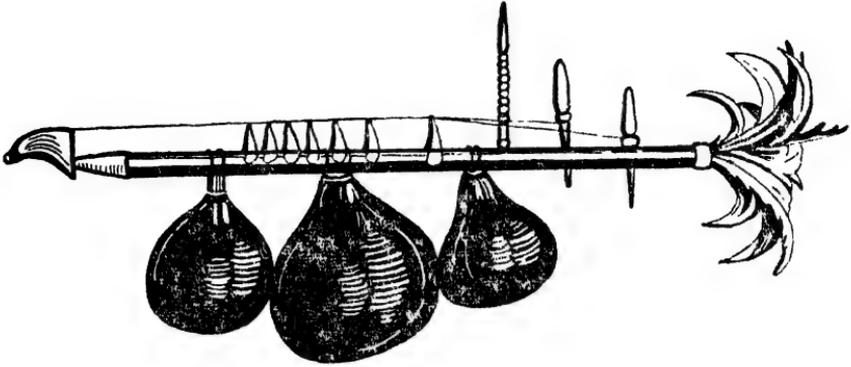
এখানে জানা যায় যে কানুন নামটি পর্যন্ত আরবীয়দের নিজের নাম নয়,

তা ছাড়া অনেকেরই ধারণা যে প্রাচীন কাত্যায়নী বীণার কাত্যায়নী শব্দটি মিশরে গিয়ে কাতুন শব্দে পরিণত হয়। কাতুন নামটি গ্রীসে গিয়ে হয়ে যায় কাহুন। সেই নামেই আজ পর্যন্ত এটি পরিচিত।

বর্তমানে কাহুন যন্ত্রটি প্রায় অপ্রচলিত। এখন কাহুনের পরিবর্তে সস্তুর যন্ত্রটি কাহুনের কায়দায় বাজাতে শোনা যায়। পণ্ডিতরা বলেন ইউরোপীয় পিয়ানো শততন্ত্রী অর্থে কাত্যায়নীর অন্তর্করণেই নির্মিত। আমরা কাননের ক্ষুদ্র সংস্করণ স্বরমণ্ডলের কথায় Rev. Popley সাহেবের উক্তি থেকে এটির প্রমাণ দিয়েছি। ‘The Indian Music’ পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন “This instrument is the forefather of Modern Piano which is nothing more than an enlarged Swaramondal”. অতএব বোঝা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য দেশের পিয়ানো জাতীয় যন্ত্রগুলিও কাত্যায়নীর অন্তর্করণেই গড়ে উঠেছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ১ম ভাগে ৫-পৃঃ লিখেছেন “বৈদিক শততন্ত্রী বীণার মতন ‘সস্তুর’ নামে একটি বীণা জাতীয় বাণযন্ত্র এখনো কাশ্মীরে প্রচলিত আছে। কাশ্মীরী বীণাটিতে আটটি করে তন্ত্রী প্রত্যেক স্বরের জন্য নির্দিষ্ট। ৭টি সুর ও ৫টি কোমল মোট ১২টি স্বরের জন্য ১২ × ৮ = ৯৬টি তন্ত্রী এবং চারটি প্রধান তন্ত্রী বীণাকাণ্ডে সংযোজিত, মোট একশটি (১০০) তন্ত্রী বা তারের সমাবেশ কাশ্মীরী বীণাটিতে দেয়া যায়। ছুটি ছোট কাঠি দিয়ে যন্ত্রটি বাজান হয়। বৈদিক শততন্ত্রী বীণাই ভূগর্গবাসী কাশ্মীরীদের ভিতর এখনো পূর্বরূপ কিছু পরিবর্তিত করে নিজেকে বজায় রেখেছে কিনা ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে। এই থেকে প্রমাণ হয় যে বর্তমানে প্রচলিত কানন যন্ত্রটি নামভেদে শততন্ত্রী বীণারই পরিবর্তিত আকার মাত্র। এটি বিদেশজাত যন্ত্র নয়।

**কাণ্ড বীণা :** সাধারণ মতে এই বীণাকে আঘাটি বলা হত ও দ্রাহ্মায়ণ মতে এর নাম ছিল বেণু। বীণাটি শর দিয়ে তৈরী হত। অনেকের মতে পর্বহীন বাঁশ থেকে তৈরী হত এবং তাই এর নাম বেণু রাখা হয়েছিল। ডাঃ কালাণ্ডের লেখা “পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ”-এ এই বীণার কথা লেখা হয়েছে এবং এখানে কাণ্ড বীণাকে “Flute of bamboo” অর্থে বাঁশের বাঁশী বলা হয়েছে। বীণা প্রপাঠকে ( পরমেশ্বর লিপিত ) বীণালক্ষণ অধ্যায়ে ১৯ নং শ্লোকে আছে যে এই বীণা চারটি আঙ্গুল দিয়ে বাজান হত। আর কোন পরিচয় আমরা পাই না।



কিন্নরী বীণা ( ১ম প্রকার )

**কিন্নরী বীণা :** দেবলোকের এক জাতিকে কিন্নর বলা হয়, সেই কিন্নরদের হাতের বাণযন্ত্র বা কিন্নরদের আবিষ্কৃত বলেই যন্ত্রের নাম কিন্নরী বীণা বলা হয় এরূপ কিংবদন্তি আছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থে কিন্নরী বীণার নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি যে অতিপ্রাচীন ভারতীয় যন্ত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন মন্দির গানের ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পের মাঝে এর আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বান্দ্যালোরে বাসবাসুদির মন্দিরে কিন্নরী বীণা-বাদনরত মূর্তি আছে। এমন কি বাইবেল ধর্মগ্রন্থের ( II Chronicles XX 28 ) অধ্যায়েও কিন্নর যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। মহাশূর ও অন্ধ প্রদেশে এখনও এই যন্ত্রটি বিদ্যমান। বাঁশের দান্ডির ওপর বারটি পর্দা মোষ দিয়ে জমান থাকে। দণ্ডটি তিনটি লাউয়ের ওপর বসান থাকে, মাবের লাউটি অপেক্ষাকৃত বড়। যন্ত্রটিতে তিনটি তার থাকে তার মধ্যে একটি তার পর্দার ওপর দিয়ে যায় ও বাকি দুটি তার পাশে রাখা থাকে, ছেড়ের কাজের জন্ত। (প্রো: রামকৃষ্ণ কবির মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সঙ্গীতপণ্ডিত মতঙ্গ মুনি দ্বারা কিন্নরী বীণা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বীণার উপর সারিকা স্থাপন এঁর দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। মতঙ্গের কিন্নরীতে ১৪১৮টি পর্দা রাখা হত। তিনটি তার থাকতো একটি বাজের ও দুটি চিকারীর)। রাজা আর সৌরাস্ত্র মোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে লেখা আছে যে এটি ছোট আকারের সেতার, এতে কচ্ছপীর মত চিকারীর তার ছাড়া পাঁচটি তার ব্যবহার করা হত। দান্ডি কাঠের হাঁড়িটি ( ধ্বনিকোষ ) কাঠ বা লাউয়ের বদলে নারিকেলের মালা থেকে বা উটপাখি জাতীয় কোন বড় জাতের পাখির ডিমের খোলা থেকে তৈরী করা হত। ধনী লোকেরা রূপা দিয়েও হাঁড়ি তৈরী করতেন। যন্ত্রটি খুব ছোট হওয়ায়

আওয়াজ ক্ষীণ। সেই কারণেই এই জাতীয় কিন্নরী বীণা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। লঘুকিন্নরী বীণার সঙ্গে রাজা ঠাকুরের আকার ব্যাখ্যার কিছুটা মিল পাওয়া যায় কিন্তু বৃহতীকিন্নরীর সঙ্গে এই আকার মেলে না। আমরা এখানে দুই রকমের কিন্নরীর ব্যাখ্যাই দিলাম ও দু'রকম ছবিও আমাদের সংগ্রহ থেকে দিয়েছি। সঙ্গীত রত্নাকরে তিন প্রকার কিন্নরীর উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর



### লঘু কিন্নরী বীণা ( ২য় প্রকার )

মিত্র মহাশয় তাঁর “মুঘল ভারতে সঙ্গীতচিন্তা” নামক পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় কিন্নরী বীণা সম্বন্ধে লিখেছেন—“সঙ্গীত শাস্ত্রে দেখা যায়, যন্ত্রটি বীণার মত, দু'টি ঈষৎ বেশী লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকে। মুসলিম সমাজে যন্ত্রটি **কিঞ্জিরা** নামে পরিচিত ছিল। সঙ্গীত রত্নাকরে বর্ণিত তিন প্রকারের কিন্নরীর সঙ্গে প্রচলিত কিন্নরীর মিল দেখা যায় না। আমাদের ছবি দুটি পরে লেখা কিন্নরীর ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে। গ্রীস দেশে এটি **শম্বুকা** নামে খ্যাত। ইহুদিরা একে **কিন্নর** বলে থাকেন। এই কিন্নরী বীণার অনুরূপে চীন দেশে কীন্ যন্ত্রটি জন্ম নিয়েছে এরূপ শোনা যায়। চীনারা কীন্ যন্ত্রটি খালি হাতে বাজিয়ে থাকেন।

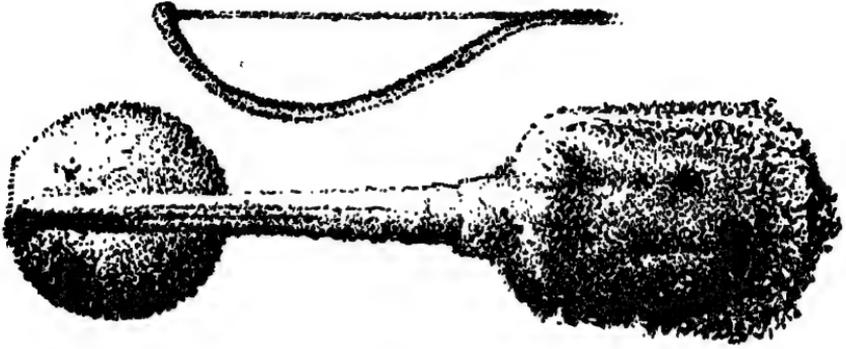


কিরাত বীণা

**কিরাত বীণা :** প্রাচীন কিরাতজাতীয়দের মধ্যে এই বীণা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় ; চারটি কানে চারটি তার বাঁধা থাকতো। জওয়ার সাহায্যে বাজান হত। বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

**কুর্মী বীণা বা কুর্ম বীণা :** দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত তিরুখাকুদালুর মন্দির গায়ে খোদিত ভাস্কর্যের মাঝে আমরা কুর্মী বীণার সন্ধান পাই। সঙ্গীত মকরন্দেও কুর্মী বীণার নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি ধনুস্তত যন্ত্র। এই প্রাচীন যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজান হয়। তিনটি তাঁতের তার থাকে। দেখতে

অনেকটা সারিন্দার মত। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত গ্রন্থেও কুম্ভী বীণাকে ধর্ষ্যস্ত্র বলে প্রমাণ করা হয়েছে। রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে কচ্ছপী বীণার



কুম্ভী বীণা বা কুম্ভ বীণা

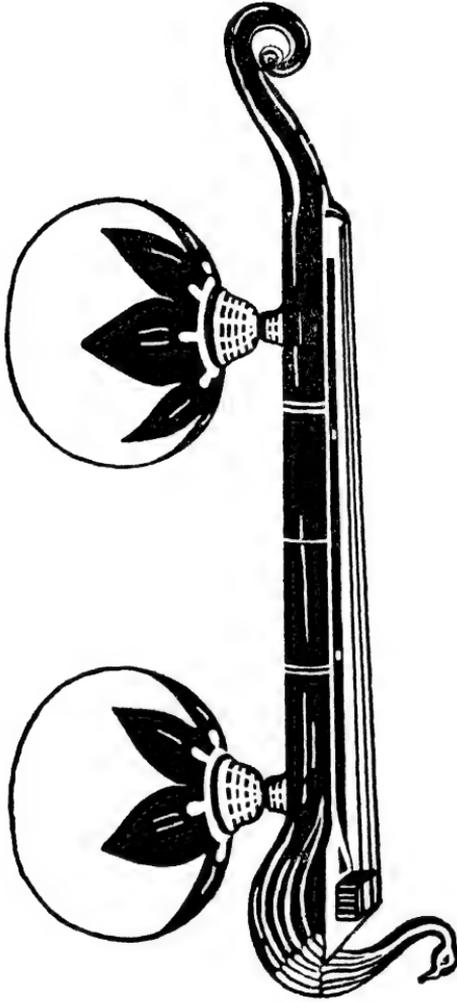
অনুরূপ বলা হলেও আমরা প্রাচীন গ্রন্থে কচ্ছপী ও কুম্ভী নামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বীণার নাম দেগতে পাই। আমাদের কাছে কুম্ভী বীণা ধনুস্তত গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট বাণ্যস্ত্র বলেই পরিচিত।

**ক্লেঙ্গী-বীণা :** ঋক্ সংহিতায় এই বীণার নাম পাওয়া যায়। ঋক্ বেদের স্তোত্র গানের সময় ব্যবহৃত হত। আর কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

**গটুবাণম্ বা গটুবাণম্ ( মহানাটক বীণা )**—দক্ষিণ ভারতেই গটুবাণমের জন্ম ও প্রচলন। গটুবাণম্ শব্দটি তামিল ভাষার একটি শব্দ। কহু বলে একটি তামিল শব্দ আছে যার অর্থ কাঠি। এই কহু শব্দটির সাথে বাণম্ শব্দটি মিলে কহু-বাণম্ শব্দ থেকেই কটুবাণম্ ও পরে গটুবাণম্ শব্দটি আসে বলে তামিল ব্যাকরণে লেখা আছে। মনে হয় যন্ত্রটি প্রথম আবিষ্কারের সময় কেবলমাত্র কাঠি দিয়েই বাজান হ'ত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে কোথাও আমরা গটুবাণম্ যন্ত্রটির নাম শুনতে পাই না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বাজনাটি গতি-বাণম্ নামে দেখতে পাই। তাম্বোরের পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক দ্বারা ১৭শ শতাব্দীতে লেখা “শৃঙ্গার সাধিত্রী” নামক পুস্তকে লেখা আছে যে তম্বুর মুনি গতিবাণম্ যন্ত্রটির সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এটি ব্রহ্মার সভায় বাজাতেন। আমাদের ধারণা উত্তরভারতের বীণার অনুরূপে এটি জন্ম নেয়, তবে বিচিত্র বীণা বা বাট্টা বীণের বাজটি উত্তরভারতে কতদিন

চালু হয়েছে সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না। আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে



গটু-বাণম্

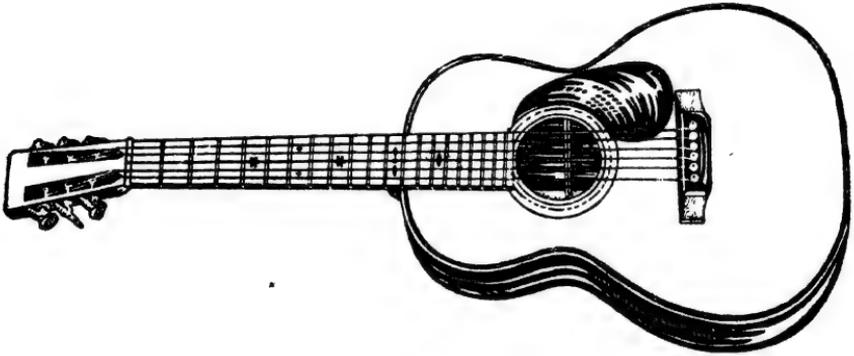
সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীনিবাস রাও গটুবাণম্ যন্ত্রটি প্রচলিত করেন। তাঁর পুত্র সখারাম রাও মহাশয়ও এই যন্ত্রটিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। কাবেরী নদীর ধারে তিরুভিদাই-মাক্কুর গ্রামে এঁদের বাস ছিল। অনেকের ধারণা যে রাও বংশই এটির আবিষ্কারক। আমাদের ধারণা তাঁরা এই যন্ত্রের স্ভবাদক ও প্রচারক ছিলেন মাত্র। প্রথম আবিষ্কারকের নাম আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। মহীশূর রাজ্যের সভাবাদক নারায়ণ আয়েঙ্গার স্বামী এই যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ও এটিকে তিনিই বেশী জনপ্রিয় করে তোলেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গারই প্রথমে এই যন্ত্রটির নাম **মহানাটক বীণা** রাখেন বলে জানা যায়। যন্ত্রটির ধ্বনি আমাদের বিচিত্রবীণার থেকেও গম্ভীর ও স্বর্ভেল।

এই বীণার পটরীতে কোন পর্দা থাকে না। অন্যান্য বীণার থেকে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই

যে, এটি পর্দাবিহীন। এতে ছয়গাছা প্রধান তার থাকে এবং তরফদার সেতারের কায়দায় প্রধান ধ্বনিসেতুর নীচে রাখা একটি পাতলা ছোট সেতুর ওপর দিয়ে ক'এক গাছা তরফের তার রাখা হয়। একটি শিং বা কাঠের টুকরা বাঁহাতে ধরে (বাট্টা বীণ অথবা গীটারের কায়দায়) তারের ওপর ঘষে এবং ডানহাতে মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করে স্বর প্রকাশ করা হয় এবং এই ভাবেই

সমস্ত সময় বাজান হয়ে থাকে। অন্ত্যান্ত দক্ষিণী বীণাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সমস্ত অনংকার, আলাপ ও তান ইত্যাদি প্রকাশ করা যায় সে সমস্তই এতে প্রকাশিত হয়। দ্রুত লয়ের সরগম, কোন গং তোড়া বা তান এতে বাজান কঠিন, তাই যন্ত্রীরা এসব এড়িয়ে চলেন। এই যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত বাদক প্রায় দেখা যায় না। সমগ্র যন্ত্রটি যখন আগাগোড়া একটি কাঠে তৈরী করা হয়, তখন এই যন্ত্রকে “একপাদ গটুবাণম” বলা হয়। সাধারণত এই যন্ত্রের মাথা, হাঁড়ি ও দান্ডি ভিন্ন ভিন্ন কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। যন্ত্রটি সামনে শুইয়ে রেখে ডান হাতে মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করার সাথে সাথে বাঁ হাতে ধরা কাঠের গোল টুকরা দিয়ে তারের ওপর ঘষে বাজান হয়ে থাকে। যে কাঠটি দিয়ে ঘষে বাজান হয় তামিল ভাষায় সেটিকে কভ্ৰাই, উরুতাই বা কুব্ৰভি বলা হয়। ইংরাজীতে এটিকে স্লাইডার ও বাংলাতে স্বর-চালক বলা হয়। প্রাচীন পিচোলা বীণার অন্তর্করণ বলে মনে করা হয়।

গাত্রবীণা—এই বীণা আসলে কোন বাণযন্ত্র নয়। এটি শরীরজ কণ্ঠনিঃসৃত স্বরধ্বনি-প্রকাশক দেহ-যন্ত্রকেই গাত্রবীণা বলা হয়।



গীটার

গীটার (হাওয়ার্ডমান)—ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণাই গীটারের আদিপুরুষ। ডক্টর বর্ণী সাহেবের ইতিহাসে লেখা আছে যে ‘গীটার’ এই নামটি প্রথম আরব দেশেই পাওয়া যায়। ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণা পারশ্বে সেতার নাম ধারণ করে, সেই সেতার আরবদেশে” কিঞ্চিত্ত অবয়ব ভেদে গীটার নাম পায়। মুর জাতির যখন স্পেন অধিকার করে সেই সময় থেকেই গীটার স্পেনে চালু হয় এবং স্পেন

থেকে Spanish Guitar বা Regular Guitar নামে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। Encyclopaedia Americana. International Edition Vol. 13, 1966—“Probably derived from Kithara, it was introduced by the Moors about 1300. Earliest Guitar was of 4 Strings. In 1554 a fifth string was added and this instrument was known as Spanish Guitar.”

ওপরের লেখাটিতে আমরা দেখতে পাই যে আদিতে গীটার কিথারার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল এবং এতে চারটি তার ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা আছে যে স্প্যানিশ শিল্পী এন্টোনিও টরেস ১২ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান আকারের গীটার চালু করেন—অবশ্য এ উক্তি স্প্যানিশ গীটার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। “The Guitar in its modern form was introduced by the Spanish maker Antonio Torres in the mid 19th Century —Encyclopaedia Britanica Vol. 10. 1966 edition.”

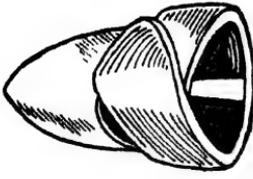
তেরশো শতাব্দির আগে ইউরোপে গীটার নামের কোন বাণ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৭০০ শতাব্দী থেকে এটি স্পেনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ইটালি ও স্পেন থেকে এটি ব্রিটেন ও পরে আমেরিকাতে প্রচলিত হয়। Antonio Torres-এর আগে ১৫৫১-১৬৬৪ খৃঃ নাগাদ আমরা Vincente Espinel নামে একজন স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাচ্ছি। গীটারে পঞ্চম তারটি তিনিই প্রথমে যুক্ত করে একে জনপ্রিয় করেন ও স্পেনের জাতীয় যন্ত্রের মর্যাদায় এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। “The International Cyclopaedia of Music & Musicians, Ninth Edition, 1964, page 858—According to Lope-de-Vega and other Spanish writers—The Musician and Novelist Vincente Espinel 16th century added a fifth string to the guitar thus transforming it into spanish Guitar.” এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানাতেও আমরা পাচ্ছি যে ১৫৫৪ খৃঃ চার তারের গীটারে আর একটি তার যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোন নাম লেখা নাই।

এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে ভারতের ত্রিতন্ত্রী পারশ্বে গিয়ে চারতারের যন্ত্র হয়েছিল, সেখান থেকে স্পেনে গিয়ে পাঁচতারের যন্ত্র হয়েছিল এবং বর্তমানে সে ছয়তারবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য

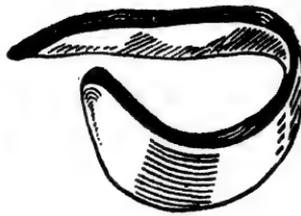
বিষয়টি হল হাওয়াইয়ান গীটার। স্প্যানিশ গীটার থেকেই এর উৎপত্তি। হাওয়াই দ্বীপে এর প্রথম প্রচলন শুরু হয় বলেই এটির নাম হাওয়াইয়ান গীটার। এই হাওয়াইয়ান গীটারকে স্টীল-গীটারও ( Steel Guitar ) বলা হয়।

The World Book Encyclopaedia, Vol. 9, Chapter Hawaii Page 98 B ( 50th Aniversary edition 1966 )—"The Hawaiian Steel Guitar was invented by **Joseph Kekuku** a Hawaiian Musician about 1895" আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৮৯৫ খৃঃ নাগাদ হাওয়াইয়ান গীটার হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ জোসেফ কেকুকু নামক ব্যক্তিই উদ্ভাষন করেন। স্মরণ্য যন্ত্রটির বয়সক্রম মাত্র ৭২।৮০ বৎসর হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যন্ত্রটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা হাঙ্কা ধরনের বাংলা গান এতে বেশ সুন্দর শোনায়। এই যন্ত্রে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের নানা অলঙ্কার প্রকাশ করা খুব কঠিন হওয়ায় সাধারণত রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাজাতে শোনা যায়। অনেকে এতে গংকারীর কাজ করার চেষ্টাও করেন। সেতার শরোদের টিমা বা মধ্যলয়ের গংগুলি এতে ভালই শোনায়, বোলের কাজ সুন্দরভাবে প্রকাশ করা খুব কঠিন, অধিকাংশ সময়েই রক্ষ শোনায় এবং গাটারের স্বাভাবিক স্বরমাধু্য নষ্ট হয়। স্বরকম্পন ও মীড়ের কাজ এতে অপূর্ব শোনায় এবং এইটি এই যন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রটি উপযুক্তভাবে নিচের দখলে আনতে হলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ( Western method বা Process ) হাত তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। হাওয়াইয়ান কায়দা ( Hawaiian Technique ) শেখা এবং কর্ড, হারমনি প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তবেই গাটারে গান বাজান সহজ ও মধুর হবে এবং যন্ত্রটি ভালভাবে দখলে আসবে।

গীটারের বিভিন্ন অঙ্গ : (১) হাঁড়ি ( Belly বা Drum ) শুদ্ধ ভাষায় একে ধ্বনিকোষ বলা হয়। (২) দান্ডি Finger Board or Neck বাংলায় এর নাম অঙ্গুলি-পট্টক বা সারিকা স্থান। (৩) ড্রাম বা বেলির চার পাশের রিবস্ বা সাইডস্ ( Ribs or Sides )। ফাঁপা হাঁড়ির তলার ও উপরের তবলির কাঠের সঙ্গে রিবস্ জোড়া থাকে। হাঁড়ির চার ধারের পাতলা কাঠকেই রিবস বলা হয়। (৪) ব্রীজ ( Bridge ) বাংলায় একে ধ্বনিসেতু বলা হয়। সেতুর শেষ প্রান্তে রাখা বোতামগুলিতে সমস্ত তারের গোড়া বাঁধা থাকে। (৫) গার্ড-প্লেট-( Guard Plate ) তবলির উপর এই কাঠের 'রক্ষণ-পটি' তবলির কাঠের অবক্ষয় রোধ করে। (৬) সাউণ্ড-হোল ( Sound-



ফিঙ্কার পিক



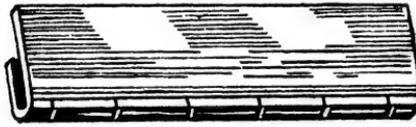
থাষ পিক



ফিঙ্কার পিক



ষ্টীল বা রোলার বার (স্বর-চালক)



এক্সটেনসন নাট

**Hole**) হাঁড়ি ও দান্ডির সংযোগস্থলের কাছে গোলাকার বড় ছিদ্রটিকে সাউণ্ডহোল বলে, এটিকে আমরা ধ্বনিচ্ছত্র বলি। এটি বায়ু-তরঙ্গে ধ্বনি-প্রসারণে সাহায্য করে। (৭) **ফ্রেট (Fret)** দান্ডির উপর কুড়িটি পিতল ব্রোঞ্জ বা সিলভারের সরু লাইন কিছু পর পর গাঁথা থাকে, সেগুলিকে ইংরাজীতে ফ্রেট ও বাংলায় পর্দা বলা হয়। (৮) **পজিসন মার্কস (Position Marks)** দান্ডিতে ছোট ছোট বোতামের আকারে বিহুকের স্থান-চিহ্নগুলিকে পজিসন মার্কস বলা হয়। (৯) **পেগ বক্স (Peg Box)** দান্ডির মুক্ত-প্রান্তস্থিত চ্যাপ্টা জায়গাটিতে Peg box অর্থাৎ চাবী-ঘর থাকে। চাবি ঘরের দু'পাশে সমস্ত চাবি রাখা থাকে। (১০) **মেটাল বা রেস্‌ড্‌ নাট (Metal বা Raised Nut)** চাবির নীচে এর যে পদার্থটির উপর দিয়া চাবিতে জড়ান তারগুলি ব্রোঞ্জের দিকে যায় সেই পদার্থটিকে Raised Nut বলে, আমরা চলতি ভাষায় এটিকে আড়ি বলি। (১১) **স্ট্রিংস (Strings)**

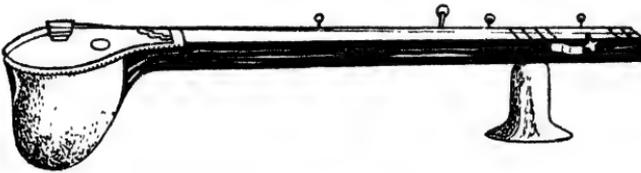
**তার :** চাষিঘরে যে ছটি কান রাখা থাকে সেই কানের সঙ্গে ছটি তার বাঁধা থাকে। নীচে তারগুলির নাম ও কোনটি কোন স্বরের সহিত মিলান হয় দেখুন :

বাঁ দিক থেকে প্রথম তার 1st String 'ই', 'E' স্বরের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

"	"	দ্বিতীয়	"	2nd	"	'সি', C <sup>♯</sup>	"	"	"	"
"	"	তৃতীয়	"	3rd	"	'এ', A	"	"	"	"
"	"	চতুর্থ	"	4th	"	'ই', E	"	"	"	"
"	"	পঞ্চম	"	5th	"	এ, A	"	"	"	"
"	"	ষষ্ঠ	"	6th	"	'ই', E	"	"	"	"

(১২) **স্লাইডার (Slider)** বিস্তৃত লোহায় নিমিত স্বর-চালককে ইংরাজীতে স্লাইডার বলা হয়। বাঁ হাতে slider তারের উপর স্বল্প চাপ দিয়ে ধরে এবং তারের উপর ঘসে ডান হাতের আঙ্গুলে পরা **Pick** অর্থাৎ অঙ্গুলিত্বের আঘাতে যন্ত্রটি বাজান হয়।

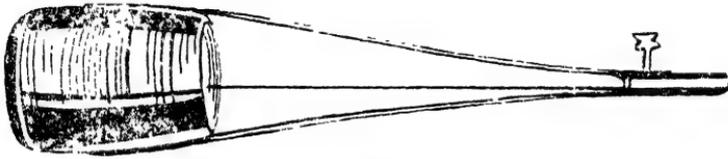
(১৩) **এক্সটেনসন নাট (Extension Nut)** : এই নাটকে হাওয়াইয়ান নাট বা এডাপ্টার (Adaptor) বলা হয়। স্প্যানিস গীটারকে হাওয়াইয়ান গীটারে রূপান্তরিত করতে এই নাট সাহায্য করে।



গেটু-বাত্ম

**গেটু-বাত্ম বা গেতুবাত্ম :** দক্ষিণ ভারতের এক অভিনব বাজ্যযন্ত্র। এটি ছ'ফুট লম্বা সাধারণ তানপুরার আকারের একপ্রকার তত যন্ত্র। যন্ত্রটিকে বাজিয়ের সামনে শুইয়ে বাজান হয়। যন্ত্রটি সমানভাবে শুইয়ে রাখার কারণে দানড়ির মুক্ত প্রান্তের পেছন দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের দিকে একটি ঠেকনা

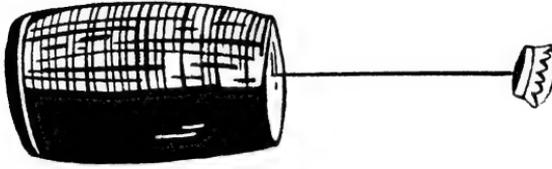
থাকে। এই সত্য যন্ত্রটি অল্পগতসিদ্ধ। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য তারে বাঁধা যন্ত্র হয়েও এটি গানের সঙ্গতে ভাল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি দুহাতে দুটি বাঁশের হালকা (পাতলা) কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কচিং একে মৃদঙ্গের সঙ্গে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে এককভাবেও বাজতে দেখা যায়। একক বাদনের সময়ে বাঁ হাতের কাঠিতে তালে তালে ঘা দিয়ে ডান হাতের কাঠিতে মৃদঙ্গের অনুরোধে বোলের কাজ দেখান হয়। যন্ত্রটি শ্রুতিমধুর, এতে চারগাছা স্টীলের তার থাকে এবং বাজাবার সময় মাঝে মাঝে চারটি তারে একসঙ্গে আঘাত করা হয়।



### গোপীযন্ত্র

**গোপীযন্ত্র :** এই তারযন্ত্রটি আঙুলের ঘায়ে বাজান হয়। এটি গ্রাম্য যন্ত্রবিশেষ। বাউল ও ভিখারীরা এই যন্ত্র তাঁদের গানের সঙ্গে বাজান। একতারা, আনন্দলহরী, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি বাজায়ন্ত্রগুলি সরল ও সাধারণ। প্রাচীন কালে সাধারণ লোকের প্রয়োজনে এই যন্ত্রগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে কবে কোন মহাজন কোন যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তার সঠিক হৃদিস পাওয়া যায় না। আনন্দলহরীর মত এটিও ঢোলাকৃতির। কাঠের বদলে লাউয়ের খোলাতে হাঁড়ি (অর্থে ধনিকোষটি) তৈরী হয়। শুকনো লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হয় বলে অনেকে এই যন্ত্রটিকে লাউ বলে থাকেন। একই গোপীযন্ত্রকে দুই তিন আকারে দেখা যায়। লাউগুলির হাঁড়ির পেট (মধ্যস্থল) বেশী গোলাকার ও হাঁড়ির খাড়াই কম থাকে। কোনও কোনও লাউযন্ত্রের তলদেশ চামড়া দিয়ে ছাওয়া থাকে না, গোলাকার লাউটির তলদেশে একটি ছিদ্র করে সেটির মাঝখান দিয়ে তার নিয়ে এসে মুক্তপ্রান্তে রাখা দান্ডির কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। লাউ বা গোপীযন্ত্র, উভয় যন্ত্রের দান্ডিই একটি সরু বংশদণ্ড অর্থে কন্দির মুক্তপ্রান্তের ছ-সাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে চার ভাগ করে চিরে তার দুভাগের দুটি পাশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকি দুভাগের শেষ প্রান্ত

দুটি খোলের তপাশে যুক্ত করা হয়। গোপীযন্ত্রের খোলের তলদেশ চামড়ায় ঢাকা থাকে এবং উর্ধ্বমুখি সম্পূর্ণ খোলা থাকে। তলদেশের চামড়ার ঢাকার মধ্যস্থলে ছিদ্রের সাহায্যে বাদিত তারের গোড়াটি চামড়ার ঢাকার মুক্তপ্রান্তে একটি কাঠের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই তারের আগাটি দান্ডির মুক্তপ্রান্তের অখণ্ড অংশে একটি কাণের সাহায্যে বাঁধা থাকে। একতারার মত এটিতেও একটিমাত্র তার থাকে। অনেকে এই যন্ত্রকে **গোপীচান্দ** বা **খম্বক** বলে থাকেন।



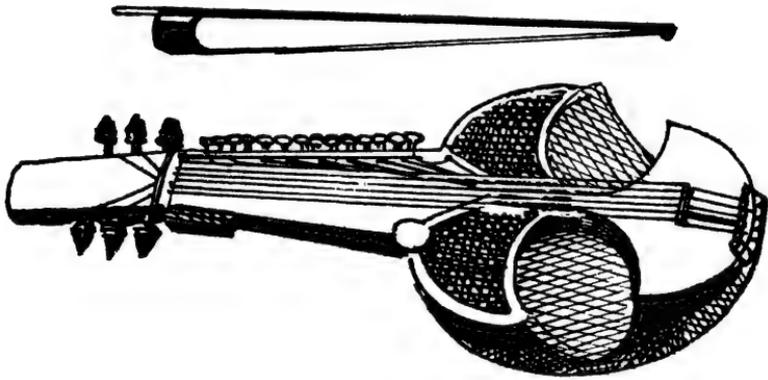
গুবগুব বা আনন্দ লহরী

**গুবগুব বা আনন্দ লহরী :** চলতি নামের গাবগুবগুব বা গুবগুব আনন্দ লহরী বলেই পরিচিত। এটি গ্রাম্য যন্ত্র। সারি জরি প্রভৃতি গ্রাম্য গান ও ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে সঙ্গতে একে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে এই যন্ত্রটিকেও অনেকে **খম্বক** বলে থাকেন। অনেকে গোপী যন্ত্রকেও **খম্বক** বলেন একথা গোপী যন্ত্রের কথায় লিখেছি। অন্ধ প্রদেশের **জামিদাইকা** উত্তর প্রদেশের **ধুন-ধুনাওয়া**, মহারাজের ধারওয়ার জেলার **চৌধুরী** প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রগুলিও আনন্দ লহরীর সমজাতীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশজাত একই ধরনের যন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ সামঞ্জস্য থাকলেও আকারে সামান্য সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। ধনিমাধুর্ষে এবং ধরবার ও বাজাবার কায়দায় কোন প্রভেদ নাই। আনন্দ লহরীর ধনিকোষটি (হাঁড়িটি বা খোলটি) আধহাত লম্বা একটি শূন্যগর্ভ কাঠের বা মাটির খোলের (প্রায় ছোট একটি ঢোলের আকারের) এক দিকের শূন্যমুখি চামড়া দিয়ে ঢাকা হয় ও অপর দিকটি উন্মুক্ত অর্থাৎ খোলা বা ফাঁকা থাকে। এই খোলামুখি উপর দিকে রাখা হয়। তলদেশের চামড়ার বাহির পিঠে ফুটো করে তার মাঝ দিয়ে তার নিয়ে আসা হয়। তারের গোড়াটি ফুটোর পিছনে একটি কাঠের টুকরার সঙ্গে বাঁধা থাকে। ওপরের খোলা মুখের কিছু উঁচুতে ঐ তারের আগাটি একটি কাঠের ভাগের সঙ্গে বাঁধা থাকে। হাঁড়িটি বাহ্যিকের বগলে চেপে ধরে বাঁহাত দিয়েই মুক্ত প্রান্তে রাখা কাঠের ভাগটিকে জোরে টেনে ধরে, ডানহাতে শলাকা দিয়ে

আঘাত করে স্বর প্রকাশ করা হয়। বাঁহাতের টানের কমবেশীতে প্রকাশিত স্বরের বিচিত্রতা ঘটান হয়। বলা বাহুল্য যে এই যন্ত্রে কেবল একটি মাত্র তারই রাখা হয়।

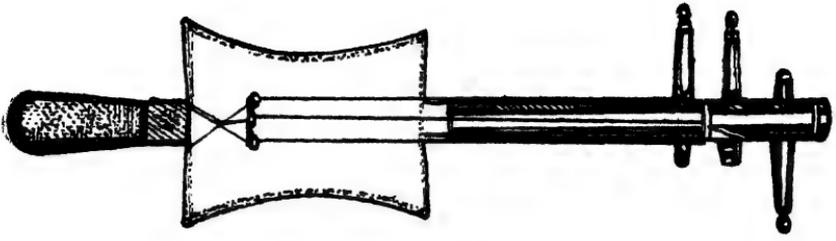
**ঘীচক :** একপ্রকার প্রাচীন ধনুর্যন্ত্র বিশেষ। বর্তমানে লুপ্ত। সঠিক আকারের বিবরণ পাওয়া যায় না।

**ঘোষবতী বীণা :** ১৭৮৭ খুঃ প্রকাশিত ‘বাণপ্রকাশ’-এর মতে এই বীণায় ২টি তার থাকতো। ঘোষবতী সঙ্গীত মকরন্দে ও যামলতন্ত্রে ঘোষাবতী নামে পরিচিত। সঙ্গীত রত্নাকরে কিন্তু একে ঘোষবতীই বলা হয়েছে। কোনখানেই নাম ছাড়া আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

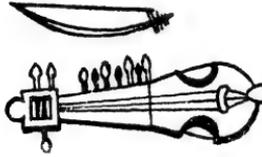


চন্দ্র সারঙ্গ

**চন্দ্র সারঙ্গ :** চলতি ভাষায় এটিকে “চাঁদ সারঙ্গ” বলে। সর্ব বিষয়েই এটি সারিন্দার অনুরূপ। প্রসিদ্ধ সরোদবাদক উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কণিষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ হায়াত আলি খাঁ এই যন্ত্রটি আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নির্দেশমত তৈরী করেছিলেন। পূর্বে সারিন্দায় কেবলমাত্র তাঁতের তার ব্যবহার করা হত। কিন্তু চাঁদ সারঙ্গ-এ চারটি তারের ক্ষেত্রেই ধাতুনির্মিত তার ব্যবহার করা হয় ও কোন কোন যন্ত্রে তরফের তারও দেওয়া হয়। বাজের কায়দা অবিকল সারিন্দার মত। যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজান হয়। গানের সঙ্গতেই এর ব্যবহার বেশী। এটি অনুগতসিদ্ধ ধনুস্তত যন্ত্র; কচিং একে স্বতঃসিদ্ধ সভ্য যন্ত্ররূপে এককভাবেও বাজতে শোনা যায়।



চিকারা ( ১ম প্রকার )



চিকারা ( ২য় প্রকার )

**চিকারা :** তত জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। ছড় দিয়ে বাজান হয়। এই যন্ত্রে যে তিনটি তার খাটান হয় সেগুলি ঘোড়ার লেজের চুল থেকে ( বালামচি পাকিয়ে ) তৈরী। সাধারণত অনুরত শ্রেণীর লোকেরাই এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকে। ছব্বকমের চিকারা দেখা যায়, তবে বর্তমানে এই যন্ত্র প্রায় লুপ্ত।

**দোতার :** তত জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। দোতারার মত এতেও চারটি তার থাকে। জওয়া দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত। অনেকে বর্তমানে প্রচলিত দোতারার সঙ্গে তুলনা করে উভয় যন্ত্রই এক এরূপ বলে থাকেন।



ঠুনঠুনে

**ঠুনঠুনে :** এই যন্ত্রটিকে অনেকে দোতারার বলে থাকেন, কারণ এটিতে দুটি তার থাকে। ঠুনঠুনায় দুটি তার থাকলেও দোতারার সঙ্গে এর আকারে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ‘ভুল্লনা’ এই সংস্কৃত শব্দ থেকেই টুনটুনা, ঠুনঠুনা, ঠুনঠুনা প্রভৃতি শব্দ জন্ম নিয়েছে। এর খোল লাউয়ের বদলে কাঠে তৈরী হয়। এতে দুটি কাণ থাকে এবং একই স্বরে দুটি তার দুটি কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

মহারাজ্জেও এটি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে এর নাম টুনটুনে। বাংলাদেশেও একে অনেকে টুনটুনে বলেন। মাদ্রাজে এটি ঠনঠনা বলে প্রচলিত। এইসব দেশে সাধারণত ভিক্ষকেরাই এই যন্ত্রের সাহায্যে গান গেয়ে ভিক্ষা করে থাকে। দক্ষিণভারতে অনেকে এটিকে তুনতিনা বলে থাকেন। মাদ্রাজ ও মহারাজ্জে তুনতিনাতে কেবলমাত্র একটি তার রাখা হয়।<sup>১</sup> আকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

**তুষরী :** প্রাচীন তত জাতীয় বাগযন্ত্র। তানপুরার মতই। যন্ত্রটি খয়ের কাঠের তৈরী। এতে আট মুষ্টি লম্বা দানডি রাখা হত। সওয়ারী আধ আঙ্গুল উঁচু, যেটি দানডির নীচের দিকের এক আঙ্গুল মাপের ফুটোর সঙ্গে, চার আঙ্গুল বেড় দিয়ে জড়িয়ে দানডির সঙ্গে বাঁধা থাকতো। এই বেড়কে শক্ত করার জন্তে, রূপার আংটা দেওয়া হত। দানডির নীচের দিকে ছ' আঙ্গুল ওপরে একটি তুষ রাখা হত। দানডির ছাঁকশ আঙ্গুল ওপরে আর একটি তুষ মুক্ত প্রান্তের দিকে রাখা হত। লেজাডির সঙ্গে তিনটি তার বাঁধা হত। একটি তাঁতের তার (ছাগ অস্ত্রের) ও বাকী দুটি রেণুকের স্ততার তার। আজকের তানপুরা এই তুষরী থেকে এসেছে বলে আমাদের ধারণা।<sup>২</sup>



তুষরী বীণা বনাম তানপুরা

**তুষরী বীণা বনাম তানপুরা :** অতি প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের নামের তালিকার মধ্যে আমরা তুষরী নামে খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নাম দেখতে পাই। তানপুরা উক্ত তুষরী নামক গন্ধর্বেণ আবিষ্কার, এরূপ কিংবদন্তি আছে। স্মার গার্ডনার উইলকিন্সন প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা যে যন্ত্রটির উৎপত্তি মিশর দেশে। মিশরের হাইরোগ্লিফিক কায়দায় লেখার ছবি থেকে তাঁরা প্রমাণ করতে

১. Sruti Vadyas—By P. Sambomoorthy B. A., Page 23.

২. হরিনারায়ণ কৃত—সঙ্গীতসার

চেয়েছেন যে খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বছর আগে মিশরে এই যন্ত্রটির প্রকাশ ঘটে। কেবল মাত্র একধরনের ঈজিপ্সিয়ান কঠিন ছবি-লেখ থেকেই প্রমাণ করা যায় না যে যন্ত্রটি সেই দেশেই ছিল এবং সেটি অন্য কোন দেশে তার আগে ছিল না বা অন্তর্দেশ থেকে এরূপ যন্ত্র সে দেশে আনা হয় নি। আদিম মিশরীয়েরা কেউ এই যন্ত্র ব্যবহার করেন না। মিশরে বসবাসকারী গ্রীক, আর্মেনিয়ান, তুর্কি প্রভৃতি দেশের লোকদের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। পার্শিয়া, টার্কি, এরেবিয়া প্রভৃতি দেশে তুঘুরার প্রচলন রয়েছে। এইসব তানপুরায় পর্দা ও বেশীসংখ্যক তারের ব্যবহার দেখা যায়। এইসব তানপুরায় ছয় থেকে দশগাছা তারের ব্যবহার এবং দানডির পটরির উপর পচিশ থেকে পঞ্চাশখানি পর্যন্ত পর্দা ব্যবহার লক্ষ্য পড়ে। এরেবিয়ার প্রাচীন গ্রন্থেও তুঘুর নাম পাওয়া যায়। স্মতরাং যন্ত্রটির আদি উৎপত্তিস্থল মিশরদেশে একথা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অতীতে এই ভারত বহুপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। আমাদের ধারণা যে এই যন্ত্রটি ভারত থেকেই মিশরে, গ্রীসে ও রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রোমে হাদ্রিয়ানের সময়ে দুই ও তিন তার বিশিষ্ট তুঘুরার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।<sup>১</sup> এই তুঘুরা জুগুয়া (Plectrum) দিয়ে বাজান হত। এই ধরনের বহুপ্রকারের লম্বগ্রীব বাণযন্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল। হয়ত কালের প্রভাবে এর আকারে কিছু রদবদল ঘটেছে। পণ্ডিতদের অনেকের ধারণা যে আমাদের প্রাচীন ব্লকী বীণাই তানপুরার আদি জননী। আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি না যে ব্লকী বীণাই তানপুরা ছিল। রাজা স্মার শেরীশ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষ নামক গ্রন্থটিতে এরূপ লিখিত হয়েছে যে রাশিয়ার তেকোণা হাঁড়ির লম্বগ্রীব 'ব্যালালাইকা' যন্ত্রটি তানপুরার অন্তর্করণেই নিমিত।<sup>২</sup>

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ) ১ম সংস্করণ, ৩৭৩ পৃঃ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেছেন তুঘুর নামক গন্ধবের নাম তানপুরার সঙ্গে জড়ান থাকলেও তুঘুর অতীত কাল ২য় থেকে ৭ম শতাব্দির মধ্যে বলে মনে হয়। তুঘুবীণার উল্লেখ (খৃঃ পূঃ ৩০০—২০০) অর্থাৎ মহাভারত-হরিবংশের সময়েও পাওয়া যায়। অতএব তানপুরা

১. Music Through The Ages—Edited by Elizabeth E. Rogers E. D. P. Third edition. Newyork, 1946. Chapter, Music of the Greeks & Romans. Page 95: "..... there was in Hadrian's time a Tamboura, the plucked lute of two or three strings."

২. "The three Cornered Balalika of Russia is also related with Tambura"—International Cycloepadia of Music & Musicians.

তুধুক মূনির অভ্যুদয় কালেরও আগে ছিল। অনেকের অভিমত খৃষ্টীয় অন্ধের গোড়ার দিকে ( খৃষ্টীয় ২য়-৫ম-৭ম শতাব্দী ) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্ত্রী তুধুক নামের সঙ্গে তুধী বীণাটিকে সম্পর্কিত করে তুধুক বীণা তথা তানপুরার নাম ভারতীয় সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতের স্বপক্ষে এখনও কোন ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি।

আগের দিনে এই তুধুককে কিয়র বলা হত।<sup>১</sup> এরবিয়াতে একে **পাণ্ডুরা** বলা হত। প্রাচীন-বীণাদের ছবি বা সঠিক রূপবর্ণনা না থাকায় আমরা অতীতের সকল বীণার যথাযথ রূপ দিতে পারছি না। আমাদের তানপুরা চাঙ্গুরা ( changura ), তামপুর ( Tumpur ) এবং তানবুর ( Tanbur ) নামেও প্রচলিত।<sup>২</sup>

দক্ষিণ ভারতে পুতুকোটে শহরে প্রাচীন তিরুমায়াম মন্দিরে তুধুরার নিদর্শন মন্দিরগাত্রের ভাস্করের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে এই তুধুরার আর একটি নাম **কলাবতী**। কলাবতী নামটি তুধুরার শাস্ত্রীয় ( classical ) নাম।

এই তুধুরা নামটি অনেক প্রকার বাণ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ইটালিয়ান Side Drum এবং Bass Drum-কে **তাম্বুরো** ( Tamburo ) বলা হয়। পাঁচাতো আর এক ধরনের Drum-কে **তাম্বুরিন** ( Tamburin ) বলা হয়। ককেশাসে **তামপুর** নামে তিনতারযুক্ত এক প্রাচীন চর্মযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। এইভাবে তুধুরার নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে এটা তানপুরা নামেই প্রচলিত। হিন্দিতে একে **তাম্বুরে**, **তমুরা** অথবা **তমুরা** বলা হয়।

এবার তুধুরার ব্যবহারিক বিষয়ে বলবো। গান বা বাজনার সময় স্বর-বিশ্রাম না হয়ে যাতে সব সময় সুরের গোলভাব অর্থাৎ জমাট ভাব বজায় থাকে ও মূল গ্রামিক স্বরটির সাহায্য পাওয়া যায় সেইজন্য গান বা বাজনার পশ্চাতে সুরের স্থায়ী জমি ( Back ground ) তৈরী রাখার জন্ম এর ব্যবহার। তানপুরা বাজালে গায়কের স্বরবিচ্যুতির আশংকা কম। এটি অমৃগতসিক ও সত্য যন্ত্ররূপে পরিচিত।

১. Studies in Oriental Musical Instruments [ 1st Series ] 1031, Page no. 10. by Henry George Fermer.

২. The International Cyclopedia of Music & Musicians Oscar Thompson, 9th Edition, Newyork, 1964.

তানপুরার হাঁড়ি ( ধ্বনিকোষ বা খোল ) তিতলাউয়ের শুকনো খোলায় এবং দান্‌ডি, পটরি, তবলি প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। সেখন, তুঁত, গাঙ্গার কাঠই প্রশস্ত, কাঁঠাল আম বা পিয়ারশাল কাঠেও তৈরী হয়ে থাকে। তবলির ওপর একটি তন্ত্রাসন—অর্থে সওয়ারী ( Bridge ) থাকে এবং হাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝে তার বাঁধার জন্ত একটি তেকোণা ফলক—অর্থে পন্থি থাকে। দান্‌ডির মুক্ত প্রান্তে চারটি কাঠের তৈরী কীলক—অর্থে কান থাকে। এই চারটি কানে চারটি তার বাঁধা থাকে। জানা যায় যে উচ্চ, গম্ভীর ও স্নিগ্ধ এই তিন পৃথক ধ্বনির কারণে তানপুরায় আদিতে তিনটি তার রাখা হত।<sup>১</sup> অনেকে বলেন তুধুরা শ্রী তুধুর চারটি মুখ ছিল এবং সেই কারণে আদিতেই এতে চারটি তার রাখা হত। তুধুর চারটি মুখ ছিল সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এটি উর্চত বিবেচিত হয় না। জানা যায়, তুধুর আবর্ভাবের আগে থেকে তানপুরা প্রচলিত ছিল।

অনেকে ছয়তার যুক্ত ছয় কাণের তানপুরাও ব্যবহার করেন! তানপুরার তারগুলি লেজাডির ফাঁসে পন্থির সঙ্গে যুক্ত থেকে ত্রীজের ওপর দিয়ে দান্‌ডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা থাকে। চার তারের তানপুরার ২নং ও ৩নং তার দুটি লোহার তার। এই দুটি নিজের কণ্ঠস্বরের উচ্চতার পরিমাপে খুঁশমত ( scale ) ঞ্কেলে মূদারার বড়জের সঙ্গে মেলান হয়। ১নং পিতলের তারটি উদারার পঞ্চমে বা মধ্যমে ও ৪নং পিতলের বা ব্রোঞ্জের তারটি উদারার বড়জের সঙ্গে মেলান হয়। যন্ত্রের আকার ও স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতাঙ্ঘ্যায়ী ( according to pitch ) উপযুক্তমত ( gauge ) গেজ-এর অর্থাৎ স্থূলতার তার ব্যবহার করা হয়। চারটি তারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ সওয়ারীর পশ্চাতে ও পন্থির মাঝে চারটি গোল হাড়ের বা কাঁচের পুঁতি বা বাহারি, হাঁস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে মান্কা বলে। নিখুঁত ভাবে স্বর মেলাতে এগুলি সাহায্য করে। সওয়ারীর ওপর চারটি তারের চাপের ফাঁকে স্ততা দিয়ে তানপুরার জোয়ারী খোলার ব্যবস্থা করা হয়। জোয়ারীদার আওয়াজ ( zaring note ) ভারতীয় তানপুরার স্বরধ্বনির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তানপুরার মধ্যে যেগুলি বৃহদাকারের হয়, সেগুলিকে মহাতানপুরা বলা হয়। উত্তর ভারতের মিরাজে উৎকৃষ্ট তানপুরা তৈরী হয়ে থাকে।

১. তুধুরী দেখুন।



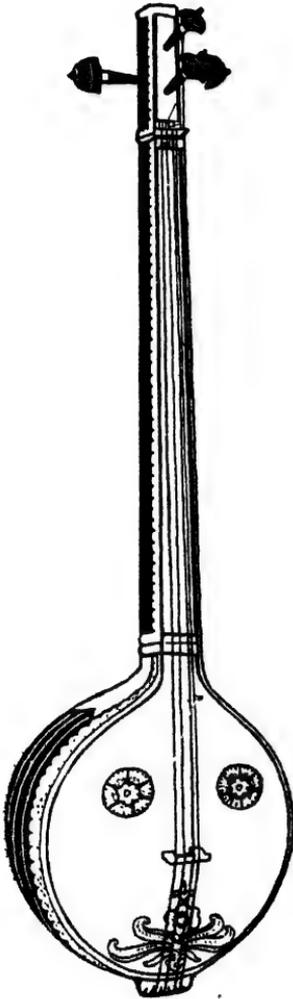
ত্রিতন্ত্রী বীণা

**ত্রিতন্ত্রী বীণা :** বীণাটি কচ্ছপীর মত দেখতে হলেও এর হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ) লাউয়ের খোলার বদলে কাঠের তৈরী হয়ে থাকে। কচ্ছপীর থেকে আকারে কিছু ছোট। তার বাঁধা ও বাজাবার কায়দা অবিকল কেচুয়া সেতারের মতই। তিনটি তার থাকার কারণেই এটি ত্রিতন্ত্রী নামে প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী বীণাই বহুবিধ পাশ্চাত্য তত যন্ত্রের ও বর্তমানে প্রচলিত সেতারের আদি পুরুষ। সেতারের ইতিহাস লেখার সময় আমরা একথা বলেছি। সেই কারণে ত্রিতন্ত্রীর বিশদ ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকছি। মুসলিম আমলে এই বীণার অনুকরণে আর এক প্রকার উন্নত ধরণের বাগযন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল—সেটি কেবলমাত্র “যন্ত্র” নামেই পরিচিত ছিল। এই “যন্ত্র” নামক বাগযন্ত্রে লোহার তার থাকতো এবং দান্ডির দুদিকে দুটি গোলাকার আপথানা করা লাউয়ের তুষা রাখা হত আর তিনটি লোহার তার থাকতো। আইন-ই-আকবরীতে এই ‘যন্ত্র’ নামক বীণার উল্লেখ আছে। এটিই মোঘল যুগে বীণ-সেতার নামে পরিচিত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে এটি প্রাচীন ত্রিতন্ত্রীর আকারভেদ মাত্র।

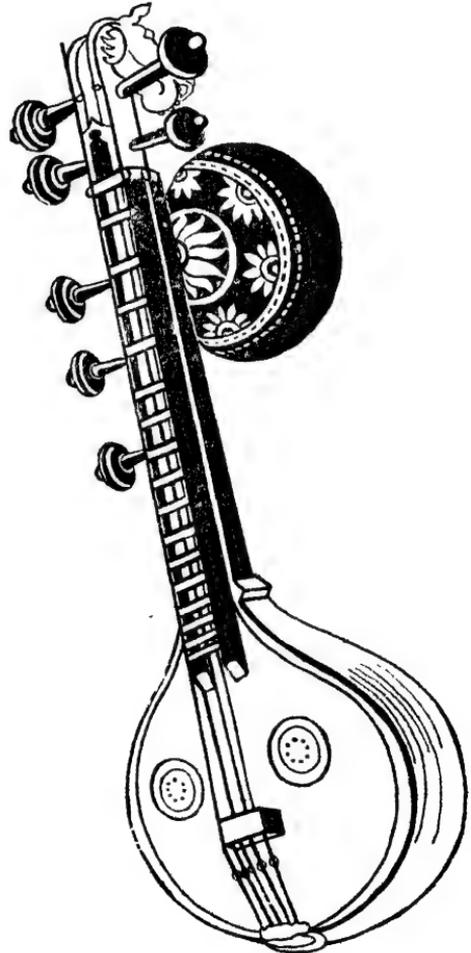
**দক্ষিণী-তানপুরা :** ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও উত্তরের মত একই প্রকারের তানপুরার ব্যবহার দেখা যায় এবং গানের অনুসঙ্গ হিসাবে এর ব্যবহার। আকৃতিগত মিলও রয়েছে। আজকাল দক্ষিণে ছয়তার ও সাততার যুক্ত বড় উত্তরী আকারের তানপুরার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যুতচালিত স্বয়ংক্রিয় তানপুরার প্রচলন হয়েছে। আমরা এর নাম **ভড়িৎ-তাম্বুরা** রাখছি। দক্ষিণে এটিকে **স্ববাদিত-তাম্বুরা** বলা হয়। এতে গায়কের নিজের হাতে তানপুরা ছাড়ার প্রয়োজন হয় না, বা স্বর ছাড়ার জন্য অল্প কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। ইলেকট্রিক প্লাগ লাগালেই সেটি আপনি আপনি বাজতে থাকে। বলাবাহুল্য তাম্বুরাটি বাজাবার আগে নিখুঁতভাবে স্বর বাঁধার প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভারতে আর এক প্রকার **চল-সেতু** যুক্ত তাম্বুরা আবিষ্কার করা হয়েছে। এই তাম্বুরার স্থির সেতুটি তবলির উপরে নিয়মিত স্থানে স্থির ভাবে রাখা

হয়। তুঙ্গুরার দান্ডির ওপরে আর একটি **চলমান সেতু** রাখা হয়, এটি ওপর দিকে বা নিচের দিকে নাবালে তানপুরার স্বর বদলে প্রয়োজন মাফিক স্বর পাওয়া যায়। পিচ্ পরিবর্তনের সুবিধার জন্ম সেতুর ভেতর দিয়েও তিনটি তার রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও তাজোর এই দুই স্থান তানপুরা নির্মাণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দক্ষিণ ভারতের অগ্নাচ্ছ রাজ্যেও তানপুরা নির্মিত হয়।



দক্ষিণী-তানপুরা



দক্ষিণী বীণা

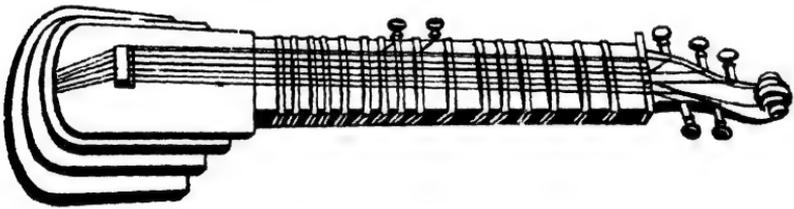
**দক্ষিণী বীণা :** দক্ষিণ-ভারতের সংগীতপণ্ডিতেরা অনেকে দক্ষিণী বীণাকে **সরস্বতী বীণা** বলে থাকেন। উত্তর ভারতের নারদীয় বীণাকেও সরস্বতী বীণা বলা হয়। ভারতীয় ধারার বিভিন্ন অলঙ্কার যুক্ত রাগ পরিবেশনে এই বীণাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। বীণার কথা বলার সময় Rev Popley তাঁর Music of India বইটিতে বলেছেন “The vina occupies the first place amongst the most honourable instruments of India” দক্ষিণী উচ্চারণ ভঙ্গীমায় এই বীণাকে গুঁরা ‘ভীনা’ বলে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে তাম্রশ্রাব ও মহীশূর প্রদেশ এই বীণা নির্মাণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাড়, হরিণের সিং বা হাতির দাঁতের তৈরী নানা নকশা দিয়ে যন্ত্রটি শ্রীমণ্ডিত করা হয়। যন্ত্রের দান্ডির মুক্তপ্রান্তে ময়ূর, হরিণ বা ড্রাগন প্রভৃতির মুখ খোদাই করা হয় বা হস্তিদন্তনির্মিত মুখ বসান হয়। এইভাবে যন্ত্রটিকে সূদৃশ্য ও স্মরণোদ্ভিত করা হয়।

উত্তরভারতের বীণ ও এই বীণার আকারে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। এই বীণা উত্তরভারতের রুদ্র বীণার আকারের সঙ্গে কিছুটা মেলে। বীণার হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষটি একটি গোলাকার বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়, দান্ডিটি আর একটি লম্বা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয় এবং মাঝখানটি কুঁদে খাল করা হয়। সেতারের মত দান্ডিটি খোলার সঙ্গে জোড়া হয়। কখনো কখনো সমগ্র যন্ত্রটিই একটি বিরাট বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়। দান্ডির মুক্তপ্রান্তটি নিচের দিকে বাঁকান থাকে ও এই বাঁকান মুখটিতে জীবজন্তুর মূণ্ডি খোদাই করে বাহারি করা থাকে। সাধারণত এই যন্ত্রটি নির্মাণে কাঁঠাল কাঠ ও ক্রুঞ্চ কাঠ ব্যবহার করা হয়, বীণার দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে সেতারের কায়দায় একটি পৃথক লাউ লাগান হয়, প্রয়োজন মফিক এটি খোলা বা সরান যায়। এই বীণা মিজরাব বা নখের আঘাতে বাজান হয়। ডানহাতে তার টেনে বা পর্দার উপর দিয়ে চালনা করে বাঁ হাতে মিজরাবের বা নখের ঘা দিয়েই বাজান হয়।

দান্ডিতে ২৪টি পর্দা মোম বা গালা দিয়ে জমান থাকে। প্রয়োজনে অল্প তাপ দিয়ে মোম নরম করে পর্দা সরান হয়। ধনী লোকেরা অনেকে রূপার পর্দাও লাগিয়ে থাকেন। দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দুপাশে ছুটি করে কান রাখা হয়। এইভাবে রাখা চারটি কাণের সঙ্গে চারটি প্রধান তার বাঁধা হয়। দান্ডির পাশে রাখা বাকি তিনটি কাণের সঙ্গে বালার তিনটি তার বাঁধা থাকে।

হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সোওয়ারীর উপর দিয়েই চারটি প্রধান তার কান থেকে নিয়ে পনথির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই চারটি তারের নাম যথাক্রমে (১) সারগী (২) পঞ্চম, (৩) মন্দারম্ (৪) অল্পমন্দারম্। পাশে রাখা তিনটি চিকারীর নাম যথাক্রমে (১) পাকাসারগী (২) পাকাপঞ্চমম্ এবং (৩) হেচুসারগী। যন্ত্রের প্রধান তার দুটি পিতলের রাখা হয়, অনেকে রূপার তারও ব্যবহার করেন। বর্তমানে ষ্টীলের তার ব্যবহার করা হয়। প্রধান তার দুটিই বিশেষভাবে বাজান হয়। দক্ষ বাজায়েরা চারটি তারেই নানারকম ছন্দ ও মীড়ের কাজ দেখিয়ে থাকেন। পাশের তিনটি ষ্টীলের তার ছেড়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

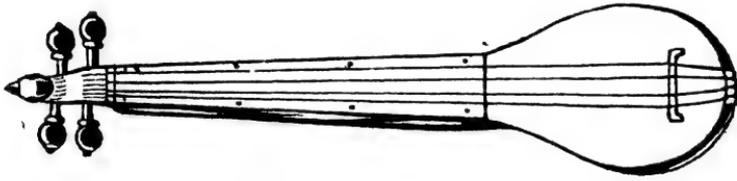
বাদকেরা নিজের খুশিমত স্বরে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এই যন্ত্রে সুর মেলান। সাধারণত তাঁরা প্রধান চারটি তার বাহির দিক থেকে যথাক্রমে স, প, স, স বা প, স, প, প অথবা ম, স, প, স এবং চিকারীর তারগুলি যথাক্রমে প, স, প বা স, প, স অথবা স, স, প স্বরের সহিত মেলান। এই বীণা তত গোষ্ঠীর সভ্য স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে পরিচিত। দক্ষিণে অনেকে কঠমঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতেও একে ব্যবহার করেন। সঙ্গীতরসিক শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় তাঁর “ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়” মহীশূরের রাজসভা-বীণকার শেষণের সম্বন্ধে লিখেছেন “দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার”……“গানের দবদ যার কাছে মূল্যবান, মিষ্টত্বে যিনি উদাসীন নন ও সুরের মোচড়ের দাম যিনি জ্ঞানেন, শেষণের মূল্য তিনিই বুঝবেন।” দক্ষিণের বীণার কথায় আমরা শেষণের নাম না উল্লেখ করে পারি না। বর্তমানে ইনি সুরলোকে প্রয়াণ করেছেন।



দারবী বীণা বা দারুবীণা

দারবী বীণা বা দারুবীণা : প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এর নাম পাওয়া যায়। এই বীণার দান্ডী, ভূষ (অর্থে ধ্বনিকোষ), তবলী সবই দারুময় অর্থে কাঠের তৈরী। সেই কারণেই এর নাম দারুবীণা। ভূষটি একটি বড় কাঠের উপর তার চেয়ে ছোট পরে আরও ছোট কাঠ দিয়ে তবকে তবকে সাজান থাকে। সেতারের

মত সাতটি কাঠের কাণ থাকে। তবলীর ওপর সেতারের কায়দাতেই একটি তন্ত্রাশন থাকে। মোটা তারের জগ্ৰ আওয়াজ কিছু গভীর হয়, মিজরাবের সাহায্যে বাজে। প্রাচীন দারুবীণা বা দারবী বীণার চিত্র বা আকৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমরা দারবী বীণার এই আকৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি। বর্তমানের এই বীণাটিকে শতবর্ষের অধিক আয়ুযুক্ত বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র দারুময় (অর্থাৎ হাঁড়ি বা ধ্বনিকোষ, দান্ডি ও সমস্ত অবয়বই কাঠের তৈরী) বলেই আমরা এর নাম দারুবীণা বলেছি। প্রাচীনকালে বীণাকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—প্রথম : গাত্রবীণা অর্থাৎ শরীরজ বীণা যাকে দেহ-বীণা বলা হত, দ্বিতীয় : যে কোন কাঠ নিষ্পিত বীণাকেই বলা হত দারুবীণা।



দোতার

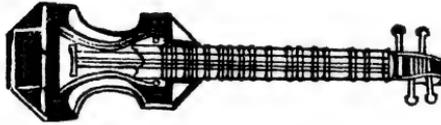
**দোতার :** তত গোষ্ঠীর এক প্রকারের গ্রাম্য যন্ত্র। নামটি দোতার হলেও চার পাঁচটি তার এতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কচিং ছুতার যুক্ত দোতার ও নজরে পড়ে। পণ্ডিতেরা বলেন যে পূর্বে এই যন্ত্রে ছুটি তারই ব্যবহৃত হত। সেই কারণেই এর নাম দোতার রাখা হয়েছিল। কালের পরিবর্তনে তার-সম্বন্ধে এবং পটরিরও পরিবর্তন ঘটেছে, দান্ডির পাশে নিস্তুর কাঠ দিয়ে তরকের তারও রাখা হচ্ছে। বর্তমানে সমোদ যন্ত্রের মত এর পটরির উপর ষ্টীলের পাত মোড়া হয়। দোতারার আকারটি প্রায় সরোদ বা রবাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রাচীন ভারতে দুই তার যুক্ত আর একপ্রকার বীণা ছিল। তার নাম **নকুল বীণা**। এই নকুলবীণাতেও কেবলমাত্র দুইটি তারই থাকতো। এটি দোতারার আদিপুরুষ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে দোতারাকে অল্পপতঙ্গ যন্ত্ররূপে গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নানাদেশে অল্পবিস্তর আকৃতিভেদে আরও কয়েকপ্রকার দোতার দেখা যায়। বাংলাদেশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপে এর প্রচলন বেশী। দোতারার আর একটি নাম **আরাজ**। **সুরসংগ্রহ** নামে দোতার পরিচিত। দুই তার যুক্ত দোতার দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত, সেটিতে দান্ডির মুক্তপ্রান্তে রাখা ছুটি কাণের সঙ্গে

দুটি তার বাঁধা থাকে। দক্ষিণী দোতারায় উত্তর ভারতের দোতারায় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, একতারার আকৃতির। এই দোতারায় তারদুটি লাউয়ের উপরে রাখা ব্রীজের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক আমাদের একতারার কায়দায়।

**ঋববাঁণা :** শারঙ্গদেবের কালে এই বীণায় বাইশটি তার রাখা হত। বাইশ শ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাইশটি তার বাঁধা হত। এটিকেও অচল বীণা বলা হত। ভরতের কালে ঋববাঁণাতে সাতটি মাত্র তার রাখা হত। ( অচলবীণা দেখুন )



নাদেশ্বর বীণা ( ১ম প্রকার )



নাদেশ্বর বীণা ( ২য় প্রকার )

**নাদেশ্বর বীণা :** পুরুষত যন্ত্রগোষ্ঠীর এক অভিনব সংস্করণ। ৭০৮০ বছর আগে এটি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এটি সেই সময়েই আবিষ্কৃত। যন্ত্রটি এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত। রাজা ট্যাগোর কৃত যন্ত্রকোষে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় ষাট্‌ষরে দুই প্রকারের দুটি নাদেশ্বর রাখা আছে। একটিতে চামড়ার তবলী ও অপরটিতে কাঠের তবলী। যন্ত্রটি অবিকল বেহালার মত দেখতে, তবে দণ্ডটি দীর্ঘ। বেহালা ও সেতারের মিশ্রণে এর জন্ম, সেই কারণে এর খোল (ধ্বনিকোষ) বেহালার মতন এবং দানডিটি সেতারের মত। বেহালার মত এটি ছড় দিয়ে বাজান হলেও হাঁড়িটি বাদকের সামনে মেঝেতে রেখে দানডিটি এশ্রাজের মত কাঁধে হেলান দিয়ে অথবা সমান ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত তারের সংখ্যা, স্বর বাঁধার রীতি, পদাবিষ্ঠাস ইত্যাদি সবই সেতারের মত। উইলার্ড সাহেবের পুস্তকে বড় কাঠের তবলির নাদেশ্বর বীণাটিকে স্বরসঙ্গ বলা হয়েছে।

রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে নাদেশ্বর বীণা বলা হয়েছে। তাঁর ইংরাজী পুস্তকেও ( Short Notices of Hindu Musical Instruments-এ Page 25/26 ) বলা হয়েছে “Nadeshvara Vina—a drawing room instrument played with the bow ; a very modern instrument formed out of the Violin and the Kachhapi Vina.”

**নিঃশঙ্ক বীণা :** অবয়বের ব্যাখ্যায় সঙ্গীত রত্নাকরে দানাড়ির কথা কিছু বলা নেই। কেবলমাত্র বলা হয়েছে যে 'ওপরে একটা কাঠের টুকরো ও নীচে একটি কাঠের টুকরো থাকে। নীচের কাঠটা আধ হাত লম্বা ও দু' আঙ্গুল মোটা। চার হাত লম্বা তার ( তন্ত্রী ) ওপরের ও নীচের কাঠের টুকরোর আগার দিকের দু' আঙ্গুল দূরে বাঁধা থাকে। তুষের কথায় বলা হয়েছে যে সেটি তন্ত্রী-বন্ধনের নীচের দিকে যুক্ত থাকতো। সম্ভবত তারের গোড়া এই তুষে বাঁধা থাকতো। বাজাবার কায়দার কথায় বলা হয়েছে বাঁ হাতে তুষ চালনায় কিম্বা শুকনো মোটা চামড়া তারের উপর ঘষে স্বর বার করা হত ও ডান হাতে পিণাকী বীণার মত ছড় ধরে বাজান হত।

**পদ্মবীণা :** মহারাণা কুম্ভ লিখিত বাণরত্নকোষে এই বীণার নাম পাওয়া যায়। এই বীণার সবিশেষ পরিচয় আর কোন গ্রন্থে না পাওয়ায় আমাদের পক্ষে এই বীণার আকারাদি সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হল না।

**পরিবাদিনী বীণা :** পণ্ডিতেরা বলেন বর্তমানের সেতার প্রাচীনকালে পরিবাদিনী নামে পরিচিত ছিল। এই বীণায় সাতটি তার থাকতো ও মিজরাব দিয়ে বাজান হত। এই পরিবাদিনী বীণা দুই প্রকারের ছিল। ( সেতার দেখুন )

**পিচোলা বীণা বা পিচ্ছোরা বীণা :** প্রাচীনকালে বাঁশীর ( কাণ্ডবীণার ) সম্বন্ধে এই বীণা জওয়ার সাহায্যে বাজান হত। এটি গীটার জাতীয় বীণা ছিল বলা হয়। সম্ভবতঃ এই বীণার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিচিত্রবাঁণা ও দক্ষিণের গটুবাণমের জন্ম। ডাঃ কালাণ্ডে লিখিত পঞ্চবিংশতাব্দীতে এই বীণার উল্লেখ আছে।

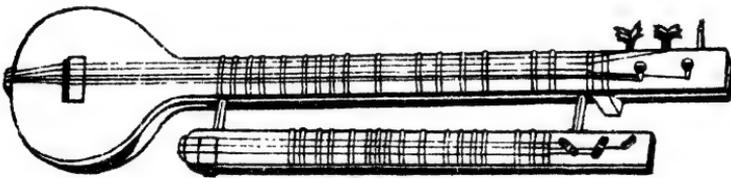
**পিণাক বীণা :** অতি প্রাচীন ধনুস্তত যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতেও ধনুকাকার। দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে এই বীণা দেখা যেত বলে তাঁর আর এক নাম পিণাকপাণি। এই ধনুর্ধ্বজ্জই সমস্ত ধনুস্তত বা ধনুর্ধ্বজ্জের আদি বলে পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। পিণাক বীণা সম্বন্ধে রাজা স্মার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে বলা

হয়েছে—“যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সমুদায় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিনাকযন্ত্র। এই যন্ত্র দেখিতে ধনুকের গ্রায়। একটি স্থিতিস্থাপক গুনোপেত যষ্টি, তাহার দুই সীমা একটি তন্তু দ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। ধনুকের গ্রায় ইহার আকার বলিয়া মহাদেব যুদ্ধ-কালেও ইহার ব্যবহার করিতেন।”

শ্রীযুত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর ‘উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত’ নামক পুস্তকে পিনাকীর বর্ণনায় লিখেছেন, “পিনাকী বীণা ধনুকের আকৃতিবিশিষ্ট। এতে তাঁতের একটি তার থাকতো। এর দুদিকে ছুটি কাঠনির্মিত পেয়ালার মত পাত্র উল্টোভাবে বসান থাকতো। এটি ছড়ি দিয়ে বাজান হত কিন্তু একটি ক্ষুদ্র লাউ তারের ওপর ঘষে ঘষে আওয়াজ উৎপন্ন করা হত।”

বর্তমানে এটি লুপ্ত এবং এই যন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি আমরা পাইনি। আসাম, মণিপুর অঞ্চলে পেপ্লা বা পেলাক নামে একতারার আকারের এক প্রকার ধনুর্যন্ত্র দেখা যায়। এটি পিনাকীর ভিন্ন নাম ও রূপভেদও হতে পারে।

পরমেশ্বর লিখিত বীণা প্রপাঠকে বাঁচাধ্যায়ের ২২।২৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে : পিনাকী একটি তুষুক্ত ধনুর্যন্ত্র বিশেষ, অশ্বপুচ্ছযুক্ত ছড় দিয়ে এটি বাজান হত। এটি একতারযুক্ত ততযন্ত্র। সঙ্গীত রত্নাকরের বাঁচাধ্যায়ের লেখা হয়েছে, বীণাটি ১১ আঙ্গুল লম্বা হত, দু পায়ের মাঝে হাঁড়ি ধরে, দানডি কাঁধে রেখে ও ডান হাতে ছড় ধরে বাজান হত। ছড়ে ঘোড়ার লেজের চুল থাকতো। তাই অনেকে একে এশ্রাজের আদিম সংস্করণ বলে থাকেন।



প্রসারণী বীণা

**প্রসারণী বীণা :** কেচুয়া সেতারের মত দেখতে হলেও মূল যন্ত্রটির সঙ্গে ১৬টি পর্দাযুক্ত আর একটি সেতারের দানডি যুক্ত থাকে। প্রধান যন্ত্রটিতে পাঁচটি তার সেতারের কায়দায় পাঁচটি কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে এবং সংলগ্ন ছোট দানডিতে

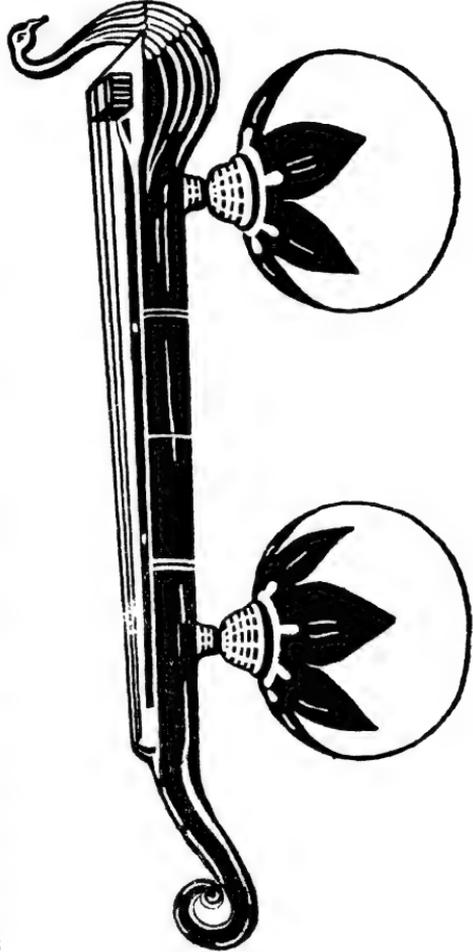
একসপ্তক চড়ায় তিনটি তার বাঁধা থাকে। মুখ্য যন্ত্রটির হাঁড়ির ঢাকা তবলির উপর ও সংলগ্ন দানডিটির শেষ প্রান্তে ব্রীজ রাখা হয়। তারগুলি ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়। যন্ত্রের বড় এবং ছোট দুটি দানডিতেই ১৬টি করে পর্দা রাখা থাকে। এতে চিকারীর কোন তার থাকে না। যন্ত্রটি কোলের ওপর বা সামনে শুইয়ে রেখে পর্দার ওপর বা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ঘষে ও ডান হাতে রাখা কাঠের কাঠি দিয়ে বাজান হয়। এই লুপ্ত বীণাটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখা আছে। আমাদের ধারণা আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। যন্ত্রকোষে এই বীণার উল্লেখ আছে।

**বল্লকী বীণা :** বাণ প্রকাশে এটি সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। নাহুদেব বলেছেন যড়গুণা তন্তী। এই যড়গুণাতন্ত্রী কথার মানে আমরা বুঝতে পারিনি (এটির অর্থ কী ছয়তারযুক্ত বাণা ?)। দক্ষিণী সংগীতপণ্ডিত শ্রীশাশ্বমুতি এটিকে ‘যাজ’ জাতীয় বাজনা বলেছেন (A kind of yajh)। অমর কোষে আমরা বল্লকী বীণার নাম পাই। হিন্দুদের এই প্রাচীন তারযন্ত্রটি বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত। অনেকে মনে করেন পুরাকালে তানপুরা বল্লকী নামে প্রচলিত ছিল। যন্ত্রটি মিজরাব সাহায্যে বাজান হত। রাশিয়ার ব্যালানাইকাকে বল্লকী বীণার অন্তর্করণ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

**বাণবীণা :** আচার্য মায়ণ বাণবীণাকে শততন্ত্রী বলেছেন; “মরুতঃ বাণ শত সংখ্যাভিস্তন্ত্রীভিযুক্তং বীণা বিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্ত”। ঋগ্বেদে বাণবীণার কথাই দেখা যায় (১।৮।৫।১০) মরুদগণ সোমপান করার পর যখন তরণে আসতেন তখন বাণ বাজাতেন। এখানে বাণে শততার থাকতো বলা হয়েছে। দশটি খুঁটি থাকতো ও অঙ্গুলিয়ক অর্থে মিজরাব দিয়ে বাজান হত। (শ্রোত সূত্রের যুগে একে মহতী বীণাও বলা হত।) এই বীণাতে একশোটি তার থাকতো ৬ তারগুলি মুঞ্জা ঘাষে তৈরী হত; বীণাটি যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ থেকে তৈরী হত। দানডির মাপ পাওয়া যায় না, নিচের দিকটা অর্থাৎ স্ননা পলাশ কাঠে তৈরী হত। এই স্ননা ঘাঁড়ের চামড়ায় ছাওয়া হত। চামড়ার ছাউনিতে দশটি ফুটো থাকতো এবং প্রতিটি ফুটোর মাঝখান দিয়ে দশ গাছা তার ঢুকিয়ে নীচে বাঁধা হত। শাঙল্য এতে তিনটি খুঁটি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এখানে আমরা শততন্ত্রী বীণার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য দেখতে পাই। এই মতে ছাউনিতে তিনটি ফুটো রাখা হত এবং তিনটি ছিদ্রে যথাক্রমে ৩৩, ৩৪ ও ৩৩ গাছা তার রাখা হত। যন্ত্রটি বেতের কাঠি দিয়ে বাজান হত। (বিস্তারিত শ্রোত সূত্র)

**বিচিত্রবীণা :** এই বীণা মাত্র ৪০।৫০ বছর আগে উস্তাদ আবদুল আজিজ খাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত বলা হয়। এই যন্ত্রের প্রবর্তক ও বাদক ছিলেন তিনি নিজেই। এই বীণার আর এক নাম **বাট্টাবীণ**। প্রাচীন গ্রন্থে পিচোলাবীণার নাম পাওয়া যায়। বিচিত্রবীণা

সেই পিচোলাবীণার পরিবর্তিত সংস্করণ হতে পারে। অনেকের মতে এটি দক্ষিণী গট্‌বান্ধমের অঙ্গসরণ। আকৃতিতে মহতী-বীণার মত দেখতে হলেও এর দানডিতে কোন পদা থাকে না এবং দানডির উপরিভাগ সমতল তবে ঈষৎ অবতল। দানডির নীচের অংশ গোলাকার। কাঠের ফাঁপা দানডিট প্রায় তিনফুট লম্বা ও ছয় হাঁক চওড়া হয়। মহতীর মত দানডির গোলাকার অংশের অর্ধে তলদেশের দু'প্রান্তে দুটি বৃহদাকারের তিত লাউয়ের তুষা থাকে। মহতীর মত কাঁধে তুলে এটি বাজান হয় না। বাজিয়ের সামনে বীণাটি শুইয়ে রেখে বাঁহাতে কাঁচের গোলাকার ভারী একটি স্বর-চালক (slider) তারের উপর রেখে বা ঘষে ডান হাতে তারের উপর মিজরাবের ঘা দিয়ে বাজান হয়। এই বীণায় ছয়টি প্রধান তার ও দশ-বারটি তরফের তার থাকে। দানডির ডান-

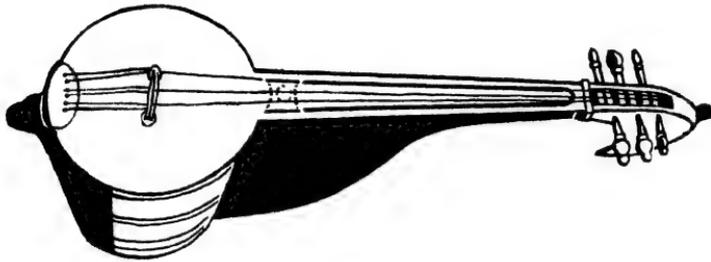


বিচিত্রবীণা

দিকে দানডির চওড়ার সম-মাপের একটি সওয়ারি (Bridge) থাকে। দানডির অপর প্রান্তে কানের দিকে একখানি আড়ি থাকে। এই কানে আটকানো

তারগুলি আড়ির উপর দিয়ে সওয়ারীর উপর চেপে শেষ শ্রাস্তে রাখা লেজাডির সঙ্গে যুক্ত থাকে ।

ইং ১৯৩৮ সালে লেখক যখন দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন, তিনি আজিজ খাঁ সাহেবের হাতে এই বাজনা কয়েকবার শুনেছিলেন । এই যন্ত্রে বোলদার গততোড়া বাজান খুব কঠিন, তবে আলাপ, টিমাগৎ ও গানের কায়দায় গায়কীর কাজ খুব ভাল শোনায । বর্তমানে বাজনাটি খুব কম শোনা যায় ।

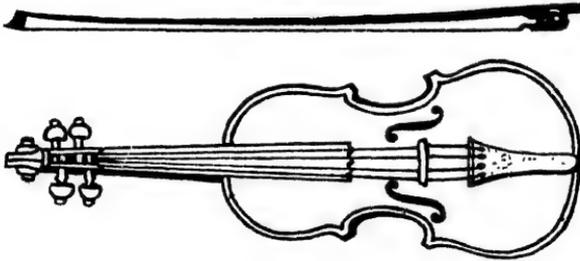


বিপক্ষী বীণা

**বিপক্ষী বীণা :** ভারতের নাট্যশাস্ত্রে বিপক্ষী বীণার নাম দেখা যায় । তিনি বলেছেন “বিপক্ষী নব তন্ত্রিকা”—অন্য মতেও “বিপক্ষী নবভির্মতা” । বিপক্ষীতে নয়টি তার থাকে । আরও বলেছেন—“বিপক্ষী কোন বাণ্ডা স্যং”—বিপক্ষী কোনস্ অর্থে জওয়া ( plectrum ) দিয়ে বাজান হত । বহুদিন আগেই বিপক্ষীর পঞ্চম প্রাপ্তি ঘটেছে । কলিকাতার ষাটঘরে এই যন্ত্রের একটি নিদর্শন রাখা আছে । এতে আমরা পাঁচটি তার দেখতে পাই । অনেকের ধারণা, বিপক্ষী কিন্নরীর আকৃতিতে দেখা যেত । শ্রীযুত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর “উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত” গ্রন্থে ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—বিপক্ষীকে তৎকালীন প্রচলিত বীণার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বীণা বলা হত এবং এটি কোন্ বা মিজরাব দিয়ে বাজান হত । আমাদের ধারণা, শরোদ যন্ত্র প্রচলিত হবার আগে এই যন্ত্রটি শরোদের মতই ভারতে বাজতো । এর যে আকৃতিটি আমরা পাচ্ছি তাতে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হয় । মুসলমান রাজত্বকালে শরোদের প্রাধান্য লাভের পর এর ব্যবহার কমে আসে এবং এটি লুপ্ত হয়ে যায় । এর আকৃতি ও তার সন্নিবেশে যে বিভেদ দেখা যায় সেটি সম্ভবত পরবর্তিকালে ঘটেছে, কারণ যন্ত্রটি যে অতি

প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে লেখা হয়েছে, “পুরাকালে বিপক্ষী বীণাতে সাতটি তার সংযোজিত হত কিন্তু এক্ষণে পাঁচটির অধিক তার ব্যবহৃত হয় না। আরও লেখা হয়েছে, “বিপক্ষীর পরিমাপ, তার-সংখ্যা, সারিকাবিছাঙ্গ, স্বরবন্ধন, ধ্বনিমাধুর্ষ, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম এতৎসমুদায়ই কিম্বরীসদৃশ।” স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রথম ভাগে ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে বিপক্ষী সম্ভবতঃ আমাদের স্বর-শৃঙ্খার। বর্তমানে বিপক্ষীর যে আকার আমরা দেখতে পাই, তাতে একে স্বর-শৃঙ্খার বলা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না।

অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটির আকার ও তারসম্বন্ধে সম্পর্কে নিঃসন্দেহভাবে কিছু বলা কঠিন। বর্তমানে বিপক্ষী নামে যে যন্ত্রটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখা আছে সেই পাঁচতার বিশিষ্ট বিপক্ষীকেই আমরা বিপক্ষীবীণা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। এই বিপক্ষীতে কোন সারিকা (পর্দা) নেই। যন্ত্রটি শরোদের মত দানডিতে বা হাতের আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ও ডান হাতে জওয়ান আঘাতে বাজান হত।



বেহালা

**বেহালা (Violin = বাছলীন বীণা):** দু-তিনশো বছরের চেষ্টায় স্থপতিকল্পিত ও সূচিস্তিত গবেষণার ফলে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে যন্ত্রটি নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়ে তার বর্তমান আকার পেয়েছে। আমরা বিস্তৃত ভাবে সেই ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনের পিছনে ভারতের যে দান রয়েছে সেটির সম্বন্ধেই লিখছি। ইংরাজি ভাষায় বেহালার জন্মবিষয়ে অনেক বই আছে সেখানে আপনারা যন্ত্রটির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পাবেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কোন ইতিহাসেই ভায়লিনের নাম পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আরবীয় রিবেক যন্ত্রের অঙ্করণে ইটালিতে ভায়লিনের আদি পুরুষ “ভিয়ল” যন্ত্রটি প্রথমে তৈরী করা হয় এবং সমস্ত ইউরোপে প্রচলিত হয়। আরবের এই রিবেক যন্ত্রটি পারস্যের কেমানজে যন্ত্রের অঙ্করণে তৈরী করা হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কেমানজে যন্ত্রটি ভারতীয় অমৃতি যন্ত্রের অঙ্করণ। কেমানজে যন্ত্রটি ভারতীয় রাভাণা বা রাবণাস্তম থেকে জন্ম নিয়েছে বলা হয়। এ সম্বন্ধে Groves' Dictionary of Music & Musicians, 3rd Ed. Vol III, Page no. 13-এ লেখা আছে— “Kemangeh.....It is undoubtedly one of the earliest of all bowed instruments, claiming its identity or descent from somewhat mythical Ravanastram of India.”

সংগীতজ্ঞানী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী রুত “সঙ্গীত সার” নামক বইটিতেও প্রমাণ করা হয়েছে যে বেহালা যন্ত্রটি ভারতের ‘অমৃতি’ যন্ত্রের অঙ্করণে নির্মিত। আরও অনেক প্রমাণ ঐ পুস্তকটিতে রয়েছে যা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে এটি ভারতীয় যন্ত্রের অঙ্করণ। প্রমাণসাপেক্ষে ভারতীয় কোন বাণ্যযন্ত্র এর আদি পুরুষ হয়ে থাকলেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে বেহালার বর্তমান আকার, তার ধ্বনিমাধুর্য প্রভৃতির উৎকর্ষতার জন্তে ইউরোপই তার আবিষ্কারক ও প্রবর্তক বলে গর্ব অহুভব করতে পারে। চারণো বছর ধরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তাভাবনা ও চেষ্টায় তাঁরা এই যন্ত্রের উৎকর্ষতার যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন তার প্রশংসা করা আমাদের উচিত।

বর্তমানের বেহালা ধনুস্তত যন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্রের আসন পাবার যোগ্য। একক বাদনে, বৃন্দ বাদনে বা অহুগতসিক্তায় তার বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করবেন। যে “ভিয়ল” থেকে ভায়লিন পরিবর্তিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে, বেহালার আগে পর্যন্ত ইউরোপে তার একাধিপত্য ছিল। এমন কি, ভায়লিন আবিষ্কারের পরও প্রায় ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ভিয়লকে ভায়লিনের পাশে পাশে চলতে দেখা গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে লম্বাডি প্রদেশের সাল নগরের শিল্পী গাসপার্ডির তৈরী বেহালা বা ঐ একই সময়ে ফ্রান্সে নবম চার্লসের রাজত্বকালে শিল্পী আমিটির তৈরী বেহালা থেকে আজকের বেহালার আকৃতি ও নির্মাণে বেশ কিছু রদ বদল ঘটেছে, যেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করলে ধরা পড়ে না। তবে আমিটির

তৈরী বেহালা গামপাড়ির চেয়ে কিছু ভাল। এরপরে আমরা এন্টনি ও ষ্ট্রাডিভারিকে পাচ্ছি, যিনি এর বর্তমান রূপের প্রবর্তক। ইনি আরও সামান্য কিছু অদলবদল করে যন্ত্রটির স্বরধ্বনিকে আগের থেকে মধুরতর করে তোলেন। এই ধনু-প্রাণ যন্ত্রটি আরও উন্নত হল ১৮৩৫ সালে যখন প্যারিসের ফ্রনকেসটটি-এর জগ্গে নতুন ধরণের ছড় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। আগের দিনে ছড়ের যন্ত্রের ছড় মাত্রই ছিল convex অর্থাৎ উত্তল (বৃত্তের মত ক্রমোন্নত তল-বিশিষ্ট) এবং বেহালাতেও সেই কন্ভেক্স টাইপের ছড়ই ব্যবহৃত হত। টটি মাহেব নিয়ে এলেন (concave type bow) কনকেভ (অর্থে অবতল, ভিতরের দিকে বাঁকান ধনুকের মত) টাইপের ছড়। এই ছড়ের বৈশিষ্ট্যে বাজিয়েরা বিশেষ খুশী হলেন। অনেক কাজ, যা তারা আগের ছড়ে করতে পারতেন না, এতে তা সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এখনও গুঁদের দেশে চলছে গবেষণা আরও কি উপায়ে এটিকে অধিকতর শ্রান্তমধুর করা যায়, এর নির্মাণে আরও কী বৈচিত্র্য ঘটান সম্ভব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে আমাদের বাণ্যন্ত্র নিয়ে এই ধরণের গবেষণার বিশেষ চেষ্টা হয় না। আমাদের গভর্ণমেন্টও এ বিষয়ে উদাসীন। বেহালার জগ্যকথা ও নির্মাণকৌশল বিষয়ে নানা বিদেশী গ্রন্থ রয়েছে, তাই আমরা এর বিষয়ে বিশেষ লিখাচ্ছি না।

**বেহালার অঙ্গ :** বেহালা যন্ত্রটি আগাগোড়া সীজন করা কাঠে তৈরী। এর দুটি প্রধান বিভাগ : (১) **বেলী বা ড্রাম (Belly or Drum) :** আমরা এটিকে ধ্বনিকোষ বলি। (২) **ফিঙ্গার বোর্ড (Finger Board) :** যাকে আমরা অঙ্গুলি-পটক বলি, চলতি কথায় এটিকে দানাড বলা হয়। এর উপরের অংশে তান্ত্র অঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরে বাজান হয়। ফিঙ্গার বোর্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত। নীচের গোল অংশটিকে বলা হয় খাড়ি ও উপরের ফ্ল্যাট সমতল অংশটিকে বলা হয় অঙ্গুলিস্থান। এই অঙ্গুলিস্থানটি ঈষৎ উত্তল থাকে। বেলির পশ্চাদ ভাগের কাঠকে (Back of the Belly) বলা হয় তলি। উপরি ভাগের কাঠকে (Upper portion of the Belly) বলে তবলি বা চাপা। **রিবস্ অথবা সাইডস্ (Ribs or sides) :** ফাঁপা বেলীর চার দিকের পাতলা কাঠের অংশগুলি অর্থাৎ যেগুলি বেলির উপরের চাপা ও তলদেশের তলির কাঠকে যুক্ত করে রাখে। **নেক (Neck) :** ফিঙ্গার বোর্ডের যে অংশ (দানডির তলদেশ) হাঁড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে। **সাইণ্ড হোলস্ : (Sound Holes)** বেলীর তবলির দুই পাশে এক্ অক্ষরের আকারে যে দুটি ছিদ্র থাকে।

**ব্রীজ ( Bridge ) :** ব্রীজকে সওয়ারী বলা হয়। তবলির উপর হাঁড়ির প্রায় মাঝামাঝি একটি তন্ত্রাসন অর্থে সওয়ারী বা ব্রীজ রাখা হয়। এই ব্রীজ পাতলা শক্ত কাঠের তৈরী হয়। এর উপর দিয়ে বেহালার চারগাছি প্রধান তার দানড়ির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

**সাইণ্ডপোস্ট : ( Sound Post )** ব্রীজের নীচে তবলির তলায় ঠেকানোর মত একটি গোল কাঠের টুকরো থাকে। এতে ধ্বনিটি সমস্ত ধ্বনিকোষকে গুঞ্জিত করে তোলায় সাহায্য করে। তবলিটি যাতে তারের চাপে নীচের দিকে দেবে না যায় অর্থাৎ তারের টানের চাপে বসে না যায়, সেটিও সাইণ্ডপোস্টের এক প্রধান কাজ।

**টেলপিস : ( Tailpiece )** বেহালার শেষ প্রান্তে একটি কাঠের ছোট টুকরা লাগান থাকে। এর সঙ্গে সমস্ত (৪টি) তারের গোড়া বাঁধা থাকে। চলতি কথায় এটিকে লেজাডি ও শুদ্ধ ভাষায় শালায়ণী বলা হয়।

**এডজাস্টার : ( Adjuster )** টেলপিসের বাঁধা তারের ঠিক উপরে যে চারটি ক্র থাকে তাদের এডজাস্টার বলে। সামান্য কমবেশী অর্থে সূক্ষ্ম স্বর মেলাবার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

**বাটন ( Button ) :** বেহালার শেষ প্রান্তে নীচের দিকে বোতামের মত একটি কাঠের গৌড় থাকে যার সঙ্গে টেলপিস টানা থাকে, তাকে বাটন বলে।

**চিনরেষ্ট ( Chin Rest ) :** ছোট কাল আবলুস কাঠের বা ইবোনাইটের একটি গোলাকার অবতল টুকরা বেহালার বড়ির শেষ প্রান্তে রাখা হয়। বাজাবার সময় বেহালাটিকে একভাবে ধরে রাখার জন্তু এর উপর যেখানে খুতনি ( chin ) রাখা হয়, সেটিকে চিনরেষ্ট বলে। খুতনির চাপে বেহালাটি ধরে থাকায় বাঁ হাতটি স্বচ্ছন্দে খেলান যায়। **স্ক্রল ( Scroll ) :** বেহালার মাথা অর্থে যে দিকটিতে তার বাঁধার জন্তু কাণ থাকে অর্থাৎ খুঁটির দিকের মুক্তপ্রান্তটিকে হেড বা স্ক্রল বলে। চলতি ভাষায় এটিকে বেহালার মাথা বলে। যদিও বাজাবার সময় মাথাটি নীচের দিকে অর্থে বার দিকেই রাখা হয়।

**পেগবক্স ( Peg Box ) :** বেহালার মাথার দিকে যেখানে চারটি পেগ ( Peg ) অর্থে কাণ থাকে, দানড়ির প্রায় শেষপ্রান্তের সেই অংশটিকে পেগ বক্স অর্থাৎ কর্ণাসন বলা হয়। এইখানে চারটে—কাণ রাখার জন্তু চারটে ফুটো থাকে।

**পেগ (Peg) :** কাঠের যে চাবি দিয়ে বেহালার তারকে টান দেওয়া অথবা আল্গা ( টিল ) করা হয়, সেই কীলককে পেগ বলা হয়। বেহালার চারটে কাণ থাকে। পেগের যে গোলাকার সৰু অংশটি দানড়ির ছিহের মাঝে গলান থাকে তাকে **নাট (Nut)** বলা হয়। কাণের মাথাটি অথবা সমগ্র কাণটিকে **key** বলা হয়।

**ষ্ট্রিং (String) :** বেহালার চারটে কাণের সঙ্গে চারটে তার রাখা হয়। সকল তারের গোড়া টেলপিসে বাঁধা থাকে ও পরে ব্রীজের উপর দিয়ে এসে দানড়ির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই চারটে তার বিভিন্ন স্বরের সঙ্গে মেলান হয় এবং সেই স্বরের নামেই তারগুলির নাম। বাজাবার অবস্থায় ডানদিক থেকে প্রথম তারটির নাম ই E, দ্বিতীয়টি এ A, তৃতীয়টি ডি D, এবং চতুর্থটিকে জি G বলা হয়। অনেকে জি তারটিকে প্রথম ধরে G. D. A. E এরূপও বলে থাকেন। আজকাল প্রথম E. stringটি steel-এর হয় এবং বাকিগুলি Silver, Chromium Plated বা Aluminium Coated হয়। আগের দিনে এইগুলিতে তাঁতের তার ব্যবহৃত হত।

**বো (Bow) :** বেহালার তারে আঘাত দিয়ে বাজাবার জন্য কাঠের তৈরী পাতলা লম্বা সৰু ছড় ব্যবহৃত হয় তাকে ইংরাজিতে ষ্টীক বা বো (stick or bow) এবং বাংলায় ছড়ি বলা হয়। **বো-হেড (Bow Head) :** ছড়িটির যেখানটি ধরে বাজান হয় সেই স্থানটিকে ছড়ির মাথা বলা হয়। ছড়ির মাথার নীচে থাকে ফ্রক (Frock) ও স্ক্রু (Screw) : ছড়ের চুলগুলি ঝাঁট ও টিলা করার জন্য ছড়ের মাথার শেষ প্রান্তে এই screw রাখা হয়।

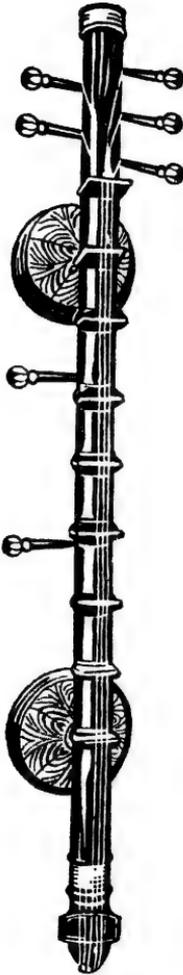
**বো-হেয়ার (Bow-Hair) :** ছড়ের তলদেশে ঘোড়ার লেজের এক গুচ্ছ চুল অথবা বালামুচি থাকে, যা দিয়ে বেহালাটি বাজান হয়। এই চুলগুলি মাথার দিকের ফ্রক ও স্ক্রুর সঙ্গে এবং মুক্ত প্রান্তের নাটের (nut) সঙ্গে যুক্ত থাকে।



ভরত বীণা

**ভরতবীণা :** ভরতবীণা নামে একটি বীণার নাম আমরা 'যন্ত্রকোষ' বইটিতে দেখতে পাই। নাম দেখে আমরা এটিকে ভরতের কালের যন্ত্র বলে মনে

করি। কিন্তু এটি সেরূপ প্রাচীন যন্ত্র নয়, আধুনিককালে মাত্র একশো বছর আগে এটি নির্মিত হয়েছিল। রবাব ও কেচুয়া সেতারের মিশ্রণেই যন্ত্রটির জন্ম। খোলটি রবাবের আকারের ও দানডিটি কেচুয়া সেতারের মত। দানডিতে কয়েকটি পেতলের তরফের তার থাকতো। যন্ত্রটির স্বরধ্বনি নীরস হওয়ার কারণে বর্তমানে এর প্রচলন লুপ্ত।



প্রাচীন মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা

বর্তমান মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা

**মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা :** প্রাচীনকালে তারযন্ত্র মাত্রকেই বীণা বলা হত। আকার ও প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল।

বীণা বলতে তখন সাধারণত মত্তকোকিলা বীণাকেই বোঝাত। এর আকৃতি ছিল অনেকটা হার্পের মত। প্রাচীন গ্রন্থে পঞ্চাশ ষাট রকমের বীণার নাম আছে। তার মধ্যে নারদীয়, মত্তকোকিলা, পিনাকী, সারস্বত, রঞ্জনী, কুম্বী, কচ্ছপী, চিত্রা, বিপক্ষী, আলাপিনা, স্বরবীণা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। উত্তরভারতে মহতীবীণার ব্যবহার বেশী ছিল। এই বীণাটি উত্তরে স্বরস্বতীবীণা ও নারদীয়বীণা নামে চলে আসছে। শারঙ্গদেবের সময়ের আগে এই বীণা প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য লাভ করেছিল। মহর্ষি নারদকে এই বীণার আবিষ্কারক বলা হয়। আমাদের দেহের সঙ্গে এই বীণার তুলনা করে বীণার ছুটি তুষ্ণের সঙ্গে নাভি ও মস্তক এবং দণ্ডের সঙ্গে মেরুদণ্ডের তুলনা করা হয়। আমাদের শরীরে নাভি ও মস্তক যেমন প্রধান, বীণার এই ছুটি তুষ্ণও তেমনি প্রধান স্বরস্থান। ঐ বীণার দণ্ডে ষোল বা উনিশ অথবা তেইশটি পদা গালা বা মোম দিয়ে জমান থাকে। পদাগুলি সরান যায় না, সেই কারণে এই বীণাকে অচলবীণা বা অচলঠাটের বীণাও বলা হয়। এর দানডিটি বাঁশের ও তুষ্ণ দুটি তিতলাউয়ের খোলা থেকে তৈরী। বর্তমানে পবনীয় বাঁশের অভাবে দানডি কাঠেই তৈরী হয়। বীণার দানডি প্রায় ২" ইঞ্চি মোটা এবং আড়া থেকে সওয়ারী পর্যন্ত তিন ফুট আন্দাজ লম্বা হয়, গোলকাকার লাউগুলি (তুষ্ণ) ১৪ ইঃ, ১৬ ইঃ, ২০ ইঃ বা আরও বড় মাপের রাখা হয়। বীণাতে তিনটি লোহার ও চারটি পিতলের তার থাকে। দানডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে তারের আগাগুলি বেঁধে সওয়ারীর উপর দিয়ে (মেরুর উপর দিয়ে) বীণার শেষপ্রান্তে রাখা পনখীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। বর্তমানে কাঠের দানডির বৃত্তের মাপ ২ ইঃ থেকে ৩ ইঃ পর্যন্ত রাখা হয়। মুঘল যুগে খ্যাতনামা বীণকার পিন্নার ঝাঁ ও জীবন শাস্ত্রীদের বীণাতে ২টি লোহার ও ৪টি পিতলের তার ব্যবহার করতেন।\* বর্তমানে ছাটি তারের পরিবর্তে সাতটি অথবা আটটি তার ব্যবহার করা হয়।

এই বীণা কাঁধে রেখে বা হাতে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে পর্দার ওপর তার চেপে বা টেনে এবং ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলিতে মিজরাব পরে প্রধান তারে ও অল্প তারে আঘাত দিয়ে বাজান হয়। এই মেজরাব পরার কায়দা নেতারের মেজরাব পরার কায়দা থেকে ভিন্ন। মাঝে মাঝে স্বর যোগ দেওয়ার কারণে ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে ও বাঁ হাতের বুডো আঙ্গুলেও মিজরাব ব্যবহার করা

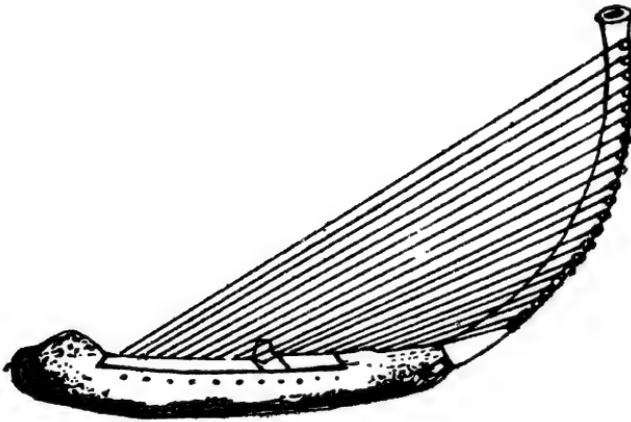


(৩) **জয়পুর ঘরাণা** : আলোয়ারের বীণকার মুশরফ খাঁর পুত্র সাদেক আলি তন্ত্র পুত্র আমাদ আলি—এই ঘরাণার বর্তমান ধারক। ঘরাণার সূত্রপাত ঘটে রজব আলীর সময় থেকে। এই ঘরাণার অন্ত্যন্ত বীণকারদের মধ্যে আমীতুদ্দীন ( জয়পুর ) মুরাদ খাঁ ( দেবাস ) জমালুদ্দীন ( বরোদা ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) **বনারস ঘরাণা** : মনোহরজী বীণকার থেকে শুরু তন্ত্র পুত্র স্বর্গীয় লছমীপ্রসাদ মিশ্রই এই ঘরাণার শেষ ধারক ছিলেন ও তাঁর সঙ্গেই এই ঘরাণার বীণ শেষ।

(৫) **ডাণ্ডুর বা উদয়পুর ঘরাণা** : এই ঘরাণার জীয়া মহীউদ্দীন ডাণ্ডুর বর্তমানে খ্যাতনামা বীণকার ও তাঁকেই এই ঘরাণার প্রবর্তক বলা চলে।

(৬) **কিরাণা ঘরাণা** : বন্দে আলি খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘরাণা শেষ।

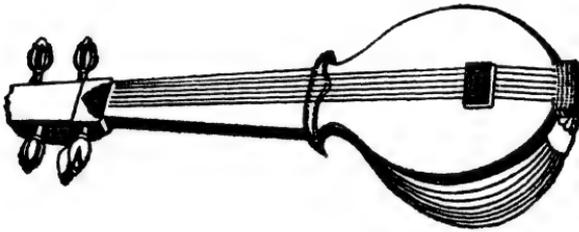


মুক্তকোকিলাবীণা

**মুক্তকোকিলাবীণা** : সঙ্গীত রত্নাকরের ভাষ্যকার এই বীণাকে “সর্বাঙ্গাং বীণানাং মধ্যে মুখ্যা” বলেছেন। মহারাণা কুস্ত তাঁর সঙ্গীতরাজ নামক পুস্তকে এই বীণাকে স্বরমণ্ডল বলেছেন। এই বীণাতে একশটি তার রাখা হত। কোন কোন সঙ্গীতপণ্ডিত মনে করে থাকেন যে মুক্তকোকিলাতে একশত তার রাখা হত, এবং এই বীণা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভারতের গ্রন্থে জানা যায় যে

মন্তকোকিলা বীণায় একশটি তার রাখা হত।\* একশটি তার তিনসপ্তকে বাঁধা হত। ভরতের কালে কোন বীণাতেই পর্দা থাকত না। প্রত্যেক স্বরের ভ্রম্ম আলাদা আলাদা তার রাখা হত। মহতীবীণার তারসংখ্যার ক্ষেত্রেও কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে মহতীতে একশোটি তার রাখা হত। প্রাচীন এই বীণা স্বরমণ্ডল বা পিয়ানোজাতীয় বিদেশী যন্ত্রগুলির আদি, একথা কানন ও স্বরমণ্ডলের কথায় লিখেছি। (স্বরমণ্ডল দেখুন)

**মহাবীণা :** সঙ্গীত রত্নাকরের বাগাধ্যায়ে ও পরমেশ্বর সিংখিত বীণা প্রপাঠক গ্রন্থে মহাবীণার নাম পাওয়া যায়। এটি প্রাচীন তত্তজাতীয় বীণা। ডান হাতের আঙ্গুলে মিজরাবের আঘাতে ও বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার টেনে ও ঘষে যন্ত্রটি বাজান হত, এইটুকু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। লাট্টিয়ান শ্রোত সূত্রেও এই বীণার নাম পাওয়া যায়।



রবাব

**রবাব :** এশিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির কয়েকটিতে রবাবের আকারের যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। ১৯১৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Mr. Shahinda-র লেখা Indian Music নামক পুস্তকটিতে রবাবকে রুবাব বলা হয়েছে এবং সিকান্দার জুলকোয়ারনিন এই যন্ত্রের আবিষ্কারী এরূপ লেখা আছে। “This is supposed to be the invention of Shikandar Julquarnin”—Page 86”

রাজা স্তার সৌরভ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে বলা হয়েছে যে এই যন্ত্রের আসল নাম রুবাব এবং আরব দেশের বাসুদ গ্রামের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল্লা খাঁ সাহেবই এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা নানা প্রাচীন গ্রন্থে রুবাবীণা নামে যে যন্ত্রটি দেখতে পাই, পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সেটি

\* পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র হেব বৃহস্পতি মহাশয়ের মতে।

অনেকাংশে বর্তমানে প্রচলিত রবাবের মত এবং রবাব রুদ্রবীণারই অল্পসরণ। রবাবের বাজের পদ্ধতিতেও তার ছাপ স্থম্পষ্ট। অনেকের ধারণা ভারতের রুদ্রবীণাই কিঞ্চিৎ আকারভেদে আরবে ও মিশরে রুবাব নামে চলতে থাকে এবং সেখান থেকে গ্রীসে আনা হয়, আর তখন এর নামটি রুবাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে রেবেক নামে চলতে থাকে। ক্যাপটেন উইলার্ড সাহেব বলেছেন যে রুবাব পাঠানদের প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং স্প্যানিশ গীটার ও ম্যাগোলিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।<sup>১</sup>

ভারতীয় রবাব, যেটি বর্তমানে ভারতে বাজান হয়ে থাকে, সেটি সংগীতসম্রাট **তানসেনজীর** আবিষ্কার।<sup>২</sup> বর্তমানের রবাব প্রাচীন ভারতের রুদ্রবীণা, কাবুলি রবাব, পারস্যের রেবেক প্রভৃতির মিশ্রনে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠেছিল বলে আমাদের ধারণা। তানসেনজী রবাব বাজাতেন 'ও তাঁর পুত্র বিলাস খাঁ রবাবের সহযোগিতায় গান করতেন এমত শোনা যায়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে **কাসিম উর্ক কোহবর**-কে রবাবের মত একটি যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়েছে।

অনেক গ্রন্থকারই রবাবকে এরাবিক যন্ত্র বলেছেন, কিন্তু বর্তমানের রবাব সে পর্যায়ের পড়ে না কারণ এরাবিক ভাষায় যে কোন ছড দিয়ে বাজান বাণ্যযন্ত্রকেই রবাব বলা হত।<sup>৩</sup> মিঃ ফারমারও একথা স্বীকার করেছেন। অতএব আজকের দিনের ভারতীয় রবাবকে আকৃতি-প্রকৃতির বিচারে আমরা আগের দিনের এরাবিক রবাবের সঙ্গে এক, একথা বলতে পারি না। আজকের রবাব রুদ্রবীণার অল্পসরণ এবং এটি ভারতীয় আবিষ্কার বলেই আমাদের বিশ্বাস।

রবাবের খোল বা হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ) সেগুন, গাভার প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। রবাবের খোলের উমুক্ত মুখটি চামড়ায় ঢাকা থাকে। আগের দিনে এই তবলি (ধ্বনিপট্টক) গোঁধার চামড়ায় ছাওয়া হত, বর্তমানে ছাগল বা বাছুরের (গোবৎস) চামড়ায় অথবা হস্তমানের চামড়ায় ছাওয়া হয়। এই চামড়ার ঢাকাকে অনেকে **খাল** বলেন।

১। Music of India—N. Augustus Willard.

২। রুবাব যন্ত্রের ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বীণকার, “ভৌগোলিক” বিশেষ শারদ সংকলন—১৯৬৮।

৩। Studies in Oriental Musical Instrument By Henry Gorge Farmer. M. A. PhD. (1931 Dr. mus, Cats. London)

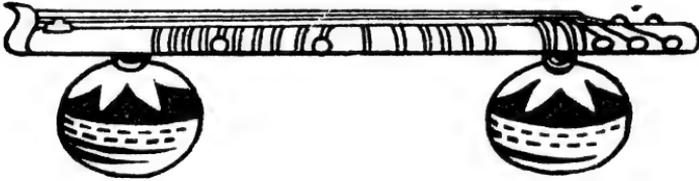
এই যন্ত্রে কোন ধাতুর তৈরী তার ব্যবহার করা হয় না। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে সাধারণ রবাবে ছয়টি তাঁতের তার রাখা হত এবং কোন কোন রবাবে ১২টি বা ১৮টি তারও রাখা হত। যে সব ক্ষেত্রে বেশী তার ব্যবহৃত হত সেক্ষেত্রে ধাতব (লোহা বা তামার) তার ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়। এই যন্ত্রের তবলির (চামড়ার ছাউনির) ওপর একটা সওয়্যারী (তন্ত্রাসন) থাকে যার ওপর দিয়ে তাঁতের তারগুলি যন্ত্রের মুক্তপ্রান্তে রাখা ছটি বড় বড় কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে। তারের আগাগুলি যেমন কাণের সঙ্গে বাঁধা হয় তেমনি প্রতিটি তারের গোড়া খোলের শেষপ্রান্তে রাখা পনখির সঙ্গে বাঁধা থাকে। পনখি ধাতু, হাড় বা শিং-এ তৈরী হয়।

তাঁতের তারগুলিকে শুক ভাষায় **তান্তবতন্ত্রী** বলা হয়। যন্ত্রে রাখা ছয়টি তারের মধ্যে প্রধান তারটি অর্থাৎ ১নং তার যেটিকে রবাবীরা **জিন্ন** বলেন সেটি মূদারী সপ্তকের পঞ্চমে, ২নং তার যেটিকে **মিয়ান** বলা হয় সেটি মূদারী সপ্তকের ষষ্ঠে, ৩নং **সুর** নামে ব্যবহৃত তারটি মূদারীর ষড়্জের সঙ্গে, ৪নং **মস্ত** নামক তারটি উদারীর পঞ্চমের সঙ্গে, ঘোর নামে পরিচিত—৫নং তারটি উদারীর গান্ধারের সঙ্গে এবং ৬নং **শ্বরজ** নামের তারটি উদারীর ষড়্জের সঙ্গে মিলান হয়। রাগ বিশেষে উক্ত তারগুলির সুর বাঁধার কিছু রদবদল হয়ে থাকে। রবাব কাঁধে জুলে দু পায়ের মাঝে হাঁড়িটা রেখে বা হাতের আঙ্গুলে নখের মত মাছের আঁশ বেঁধে অথবা আঙ্গুলে স্বাভাবিক নখ বড় রেখে সেই নখ দিয়ে দানড়ির পটরির ওপর তার দাবিয়ে ও ঘষে বাজান হয়। এর মীড়ের কাজও ঘষেই বার করা হয়। বাজাবার সময় ডান হাতের বুড়ে আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল দিয়ে তেঁকোণা এক ফলক শক্ত করে ধরে তারে আঘাত করতে হয়। এই ফলকটিকে **জওয়া** বলা হয়। বাংলায় অনেকে এটিকে জবা বলেন, সেটি ঠিক নয়, জওয়া শব্দটি ফারসী শব্দ বলা হয়। এই জওয়া চন্দন কাঠ, নারিকেলের মালা অথবা বাঁশের টুকরা থেকে তৈরী হয়।

রবাবে ঘা দিয়ে বাজাবার বৈশিষ্ট্য এই যে জওয়ার ঘাগুলো কোলের দিকে না হয়ে বেশী ভাগ বার দিকেই হয়। রবাবে গত্ তোড়া বাজানো কঠিন। এটি মধ্যলয়ের আলাপের যন্ত্র হিসাবেই খ্যাত। আলাপে মধ্যজোড়ের কাজ অতি সুন্দর হয়, আলাপের নানা ছন্দ ও লড়ির কাজই রবাবের বাজের বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো এর নিবন্ধ বালায় পথাবজের সঙ্গত চলে। সঙ্গতের সময় এর তবলিতে টাটি দিয়ে চপক বোল বাজান হয়। আজকাল চপক বোল বাজাতে

শোনা যায় না। এতে ঝালার কোন বিশেষ তার থাকে না তাই সুরের স্তারে ঘা দিয়ে ঝালার কাজ চালানো হয়।

অতীতে নামকরা রবাবীদের মধ্যে উস্তাদ জাকর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ প্রভৃতি গুণীরা রবাবী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আবার সুরশৃঙ্খারেও এঁরা সিন্ধুহস্ত ছিলেন। পরে সাদিক আলি, শাহাজুর হুসেন, বড়কু মিঞা ও মহম্মদ আলি প্রভৃতির নাম শোনা যায়। এর পরে নামকরা রবাবী হিসাবে আমরা উস্তাদ কাশেম আলি খাঁর নাম পাঈ। তাঁর দ্রুত লডি ও জোড়ের কাজ অতুলনীয় ছিল। বর্তমানে কলিকাতায় মৈমনসিং গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রবাব বাজান। ইনি রবাবের আলাপের যথার্থ তালিম পেয়েছেন মহম্মদ আলি খাঁ প্রভৃতি গুণীদের কাছে। মহম্মদ আলির পৌত্রপ্রতিম সৌকত আলি খাঁও রবাব বাজাতেন। রবাবের বাজ আজ প্রায় লুপ্ত, যন্ত্রটিও অবহেলিত। যে দু একজন গুণী আজও রয়েছে তাদের রবাব বাজনা রেকর্ড করে রাখা উচিত।



রজনী বীণা

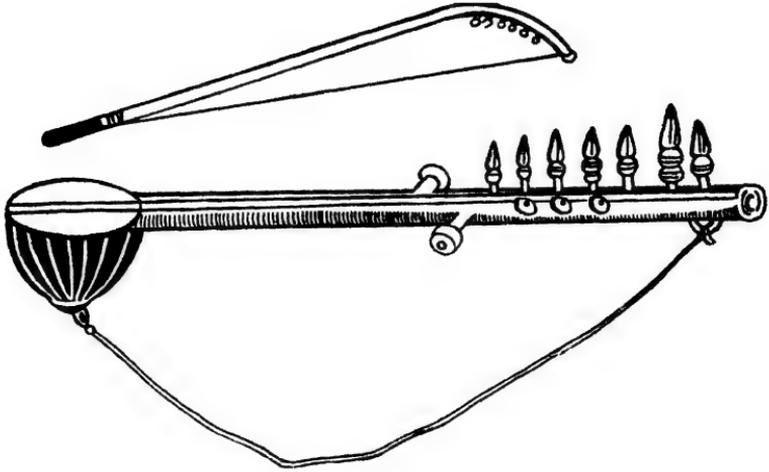
**রজনী বীণা :** রজনী আজ মনোরঞ্জে অক্ষয় ও লুপ্ত।—এটি অবিকল মহতী বীণার মত দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোট। মহতীর মতই এর দানডির দুপাশে দুটি লাউ থাকে। দানডি গোলাকার ও কাঠে তৈরী। মহতী বীণার কায়দায় এতে সাতটি তার রাখা হত এবং পর্দাগুলি মোমদিয়ে জমান থাকতো। যন্ত্রকোষে এর নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি বেশী দিনের প্রাচীন নয়।

**রাবণা বা রাবণাস্ত্রম :** অতি প্রাচীন ধর্মযন্ত্র বিশেষ। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এর নাম পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে লঙ্কাদ্বীপের রাবণ এই বাগ্গযন্ত্রের স্রষ্টা। ঐতিহাসিকেরা রাবণের সময়কাল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। এ বিষয়ে যন্ত্রকোষে লেখা আছে—“রাবণাস্ত্রম নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি পুরাতন ধর্মযন্ত্র বহু আছে তাহা প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাদ্বীপের

রাবণ নির্মাণ করিয়া স্বনামে প্রসিদ্ধ করেন। চীনের উবুহীন, জাপানের কোফিও হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব্য ও পারস্তের কেমানজে ও রবাব এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিক্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিক্রম যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা কতক সম্ভবপর।” এখন ধর্ষুর্ষুনের আদি উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে ফেটিস সাহেবের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি লিখি।

“Hindoostan is the country whence we derive the most ancient monuments of a well developed language, of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thoughts have their expression, of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensibility of natives find expression—Hindoostan has, it appears, been the birth place of the instruments played with bow and has made them known to other parts of Asia. This does not admit of a moments doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakable marks of their Indian origin. If we wish to find the instruments played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find in the Ravanastram, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed.” Translated from—Antoine Stradivery Precede-de Rscherches histori-quest creliques sur L' Origine et les Transformation des instruments a Archet of M. Fetis.

ফেটিস সাহেবের এই উক্তি প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল দেশের সকল প্রকার ধর্ষুর্ষুনের আদি উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত ঐতিহাসিক মঁসিয়ে সনিরাট (M. Sounerat)-এর কথাও প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষই সমস্ত ধর্ষুর্ষুনের উৎপত্তির আদি উৎস। যম্বকোষের উক্তি উদ্ধৃতির সময় একথা লেখা হয়েছে। রাবণহাতো যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা রাভানার বিষয় উল্লেখ করেছি।



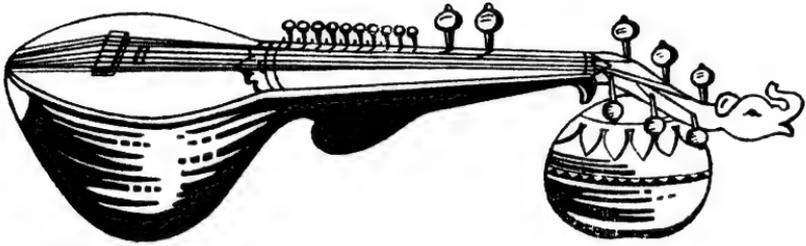
রাবণহাতো

**রাবণহাতা বা রাবণহাতো :** রাবণহাতা গুজরাটে ও রাজস্থানে সমধিক প্রচলিত। রাবণহাতা নামটি আমাদের মনে সন্দেহ জাগায় যে এই যন্ত্রই হয়ত অতীত রাভানার অনুরূপ। বিচারের ভার প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের হাতে ছেড়ে আমরা এর ব্যবহারিক বিষয়ের কথা বলি।

\* রাবণহাতা যন্ত্রটির ধ্বনিকোষ অর্থাৎ হাঁড়ি বা পোলটি আধখানা শুকনো শাঁসহান বড় নারিকেলের মালা থেকে তৈরী হয়। এই হাঁড়িতে লাল, পাটকিলে বা কাল রং-এর পালিশ করা থাকে। হাঁড়ির খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এই চামড়ার ঢাকা অর্থাৎ তবলিটি মজবুত স্ততার টানা দিয়ে হাঁড়ির তলদেশে বাঁধা থাকে। দুফুট আন্দাজ বাঁশের সরু কক্ষির তৈরী একটি দান্ডি হাঁড়ির সঙ্গে আটকানো থাকে। দান্ডির মুক্তপ্রান্তে দশ বারটি কান থাকে। এই কানগুলির সঙ্গে ১০।১২টি তরফের তার বাঁধা হয়। দুটি প্রধান তারও এই বাঁশের মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে; তারগুলির গোড়া হাঁড়ির নীচে পনথির সঙ্গে বাঁধা হয়। এর প্রধান তার দুটির মধ্যে প্রথমটি পাকা ষ্টীলের ও দ্বিতীয়টি বালামটির তৈরী। ছাতার হাতলের মত বেকান বাঁশের বা সরু

\* নারদ কৃত সঙ্গীত মকরন্দে রাবণীবীণার নাম পাওয়া যায়। 'উভয়ী মহামহোদয় ভদ্রে ষোলটি বাস্তবের নামের মধ্যে রাবণ-হস্তক নামটি পাওয়া যায়। সেটি এই রাবণহাতা হতে পারে।

কাঠের তৈরী ছড় দিয়ে যন্ত্রটি বাজান হয়। ছড়টির সামনের দিকে বালামচি লাগান থাকে। ছড়ের হাতলের কাছে কয়েকটি ছোট যুগুর বাঁধা থাকে। যন্ত্রটি বাজাবার সময় এই যুগুর থেকে মৃদু ঝুমঝুম শব্দ প্রকাশ পায়। যন্ত্রের দানডি সামনের দিকে লম্বা করে, হাঁড়িটি চিং করে বাঁদিকের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ডান হাতে ছড় ধরে সেই ছড় দিয়ে বাজান হয়। চার পাঁচটি স্বরাস্রিত দেশী গীত ছাড়া এতে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজতে শোনা যায় না। এটি এক প্রাচীন ধনুস্তত গোষ্ঠীর গ্রাম্য যন্ত্র।



রুদ্রবীণা

**রুদ্রবীণা :** অনেকে রবাব যন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে থাকেন। রাজা সাহেবের যন্ত্রকোষ গ্রন্থটিতে রবাবকে রুদ্রবীণা বলা হয়েছে। স্বর্গীয় সঙ্গীতাত্যচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে যন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে বাজাতেন সেটি প্রচলিত রবাব থেকে ভিন্ন ধরণের। সঙ্গীত মকরন্দের ২২ পৃষ্ঠায় উনিশটি বীণার নামের মধ্যে আমরা রৌদ্রীবীণার নাম দেখতে পাই, রুদ্রবীণা সেটির নামান্তর বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর “উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত” নামক পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এই বীণার বাদন দণ্ডটি ছিল লম্বায় ৪ ফুট। এতে দুটি তুঙ্গায়ুক্ত হতো। মূলতন্ত্রী ছাড়া দুটি শ্রুতিতন্ত্রী থাকতো। এই বীণার জোয়ারী বা বণনের জন্তু সওয়্যারী এবং তন্ত্রীর মধ্যে পাকা বাঁশের খুব পাতলা একটি ছিলো দেওয়া থাকতো। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে এই বীণায় আঠারটি পদা ছিল। আমরা উপরোক্ত বর্ণনামুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত রুদ্রবীণার আকারের সঠিক মিল দেখি না। বর্তমানে রুদ্রবীণার আকারে স্বরশৃঙ্খার কিছু ভাব দেখা যায়। রবাবের ও শরোদের আকার-ভাবও কিছু আছে। অতীতে এই রুদ্রবীণা হয়ত ঐক্য আকারভেদে প্রচলিত ছিল এবং স্বরশৃঙ্খার, রবাব, শরোদ প্রভৃতি

যন্ত্র এই যন্ত্রের অনুরোধেই গড়ে উঠেছিল। অনেকে এটিকে হস্তিশুও বীণা বলে থাকেন। এসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প শোনা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুর-বধের সময় অসুরের হস্তির মাথা কাটিয়া সেই মস্তক এবং অস্ত্রাদি দিয়া এই বীণা সৃষ্টি করেন। দেবতার রোষের সময় এই বীণার জন্ম বলেই এর নাম রুদ্রবীণা এবং হাতীর মাথা থেকে তৈরী হয় বলে এর নাম হস্তিশুওবীণা বলা হয়। রুদ্রবীণা যন্ত্রটি একপানা কাঠে তৈরী, হাঁড়ি ও দাগি সম্বন্ধে এক কাঠের। হাঁড়ির ঢাকা (তবলি) পাতলা কাঠের তৈরী। দাগির ঢাকা কাঠের, তার উপর ষ্টীলের পাতলা পাত মোড়া থাকে। কলিকাতার যাহুঘরে তবলিতে চামড়ার ঢাকা দেওয়া একটি রবাব যন্ত্রের প্রকারান্তর রুদ্রবীণা নামে রাখা আছে। ডানহাতের তর্জনী ও বুঝাঙ্গুষ্ঠের ঠেকনোয় মিজরাব ধারণ করে তাকে আঘাত দিয়ে এই যন্ত্র বাজানো হয়। ধারণের কায়দা : বাদিকের কাঁধে দাগির মুক্তপ্রান্ত রেখে হাঁড়িটি ডানদিকের কোলের নীচে কোলের ঠেস দিয়ে ধরা হয়। আমরা রুদ্রবীণার যে ছবিটি এখানে দিয়েছি সেইরূপ বীণাই শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রুদ্রবীণা নামে বাজাতেন। ভারতের বেতার প্রতিষ্ঠানও এই আকৃতি ও অবয়বযুক্ত বীণাকেই রুদ্রবীণা বলে অনুরোধ করেন।\* উত্তর ঘরাণার জাঁয়া মহিউদ্দীন ডাঙর সরস্বতী বীণাকে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত মতী বা নারদীয় বীণাকে রুদ্রবীণা বলে থাকেন। কিন্তু সেটি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না।

\* RUDRAVEENA

Dr. Pramathanath Banerjee  
(Doctor of Music)

79/1, Haris Chatterjee Street  
Bhawanipur  
Calcutta 7. 3. 1951

To speak of Rudraveena I must admit that I got the model design and teachings of it from my most regarded Ostad Late Wazir Khan Saheb Veenkar of Rampore State. The model and process of playing over it is quite different to the present Sursringer.

Pramathanath Banerjee  
Chairman of the Music Advisory Committee  
All Bengal Music Conference

পত্রটি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল মহাশয়ের দৌহৃদে প্রাপ্ত। রুদ্রবীণার ছবিটির sketch ভদীয় ছাত্র শ্রীমদ্বনাথ হালদারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

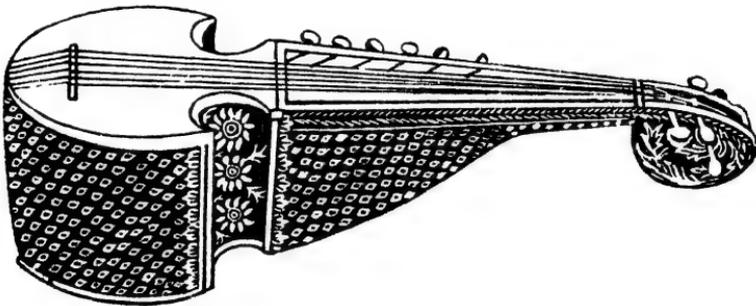
### তার সন্নিবেশ ও সুর বাঁধার নিয়ম :

- ১ নং তার—মুদারার ‘প’ অথবা ‘ম’ স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।
- ২ নং „ —মুদারার ‘র’ অথবা ‘গ’-এর সঙ্গে মিলান হয়।
- ৩ নং „ —মুদারার ‘স’ স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।
- ৪ নং „ —উদারার ‘প’ স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।
- ৫ নং „ —উদারার ‘র’ বা ‘গ’ স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।
- ৬ নং „ —উদারার সুরে মিলান হয়। (‘স’ স্বরে)
- ৭ নং „ —অতি উদারার ‘প’ অথবা ‘গ’ স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।
- ৮ নং-এ ( তিনটি তার থাকে )—রাগ হিসাবে বাদী সঙ্ঘাদী ও জুড়িতে তিনটি তার মিলান হয়।

৯ নং ( দুটি তার )—চিকারী মুদারা ও তারার ‘স’-এর সঙ্গে দুটি তার মিলান হয়।

১০ নং ( সাত বা আটটি তার )—এগুলি তরফের তার, রাগান্ত্যায়ী স্বরে বাঁধার নিয়ম।

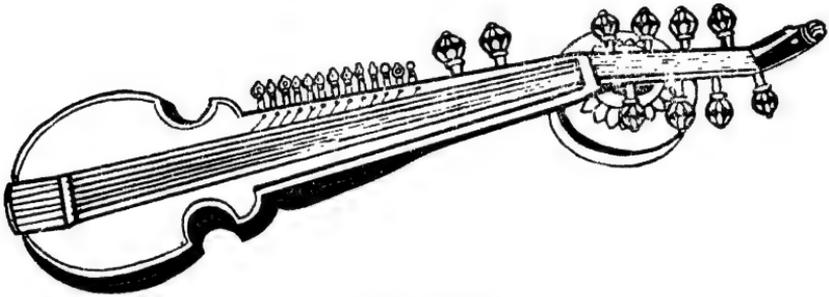
জানা যায় স্বর্গীয় প্রমথবাবু প্রমুখ বীণ-বাদকেরা এইভাবেই তার লাগাতেন ও উপরোক্ত স্বরে সেগুলি বাঁধতেন। অনেক সময়ে বাজিয়ের ইচ্ছামত রাগান্ত্যায়ী স্বরে তারগুলি বাঁধা হয়।



পূর্বকার শরোদ

শারদীয় বীণা অথবা শরোদ : এই যন্ত্রকে আমরা স্বরোদ, সরোদ শরোদ নামে প্রচলিত দেখতে পাই। আফগানিস্থানে ও আরব দেশে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি “শাজিক

যন্ত্র”<sup>১</sup> নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজারা শিকারাভিযানে বা বিদেশ ভ্রমণে হাতি বা উটের পিঠে এই যন্ত্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখতেন। শরোদীরা অনেক সময় এই যন্ত্র বাজিয়ে সভায় গান করতেন। তখনকার দিনে এই যন্ত্রটি অল্পগতসিদ্ধ যন্ত্ররূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে শরোদের পটরিতে প্রেট বসান হত না, কাঠের পটরির ওপরই তাঁতের তার দাবিয়ে বাজান হত (রবাবের অন্তর্করণে)। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বরশৃঙ্গার যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর থেকেই শরোদে লোহার প্রেট ও ধাতুর তার ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় শরোদবাদক উস্তাদ হাফেজ আলি বলতেন যে তাঁর প্রপিতামহ বঙ্গস গুলাম বন্দগী খাঁ হিন্দুস্থানে এটি প্রথম রবাবের আকারে নিয়ে আসেন<sup>২</sup>



বর্তমান শরোদ

এবং পরে এটিকে শরোদে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন যে গুলাম বন্দগী খাঁই গোয়ালিয়রের গোলামালি শরোদি। অনেকে বলেন যে আসাদ উল্লা খাঁ সাহেব<sup>৩</sup> উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে প্রথম এই যন্ত্র চালু করেন এবং সেই কারণে শরোদ প্রস্তুতে বাংলাদেশই পথিকৃত এবং বাংলাদেশেই এই যন্ত্রের প্রচলন বেশী।

মিশরদেশে এই যন্ত্রটি **গুস্তা** নামে প্রচলিত। কাবুলে এখনও এই যন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। সেখানে এটিকে **শারুদ** বলা হয়।<sup>৪</sup> এই শরোদ বা শারুদ শব্দটি কাবুলি শব্দ। কাবুলি শরোদ আকারে একটু ছোট, কাবুলে

১। বঙ্গকোষ—রাজা স্মার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। “হিন্দুস্থানী বাঁজ শরোদ”—প্রোঃ চন্দ্রকান্তলাল দাস, হিন্দী “সঙ্গীত” মাসিক-পত্রিকার ১৯৬১ জুন মাসের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। Music Instruments of India By S. Krishnaswamy, page 48.

৪। “জনপ্রিয় বঙ্গ শরোদ”—মাসিক তৌধাতিক—স্বামীর বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সৌরীপুর)।

এগুলি আখরোট কাঠে তৈরী হয়। শরোদ সীজন করা সেগুন কাঠে, ( Burma Teak ) তুঁত কাঠে অথবা গাম্ভার কাঠে তৈরী করা হয়। শরোদের হাঁড়ি অর্থে প্বনিকোষ ( Belly or Drum ) চামড়ায় ঢাকা থাকে। এই চামড়ার তবলির ওপর তন্ত্রাসন অর্থে সওয়ারী ( Bridge ) রাখা থাকে। বড় একখানা কাঠ থেকেই যন্ত্রটি ( এক কাঠের ) তৈরী করা হয়। বর্তমানে প্রমাণ মাইজের শরোদ তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা হয়। হাঁড়িটা এক ফুট মাপের অর্ধগোলাকার এবং পিচ্চনের দিকটা চ্যাপ্টা থাকে। হাঁড়ির গলাটি সরু করে দানডির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। দানডির মুক্তপ্রান্তে প্রধান কাণগুলি রাখা থাকে। হাঁড়িতে পাল কেটে ফাঁপা করা হয়, দানডির বাজাবার জায়গায় ষ্টীলের পাত বসান হয়। আজকাল দানডির মুক্তপ্রান্তের পশ্চাৎ দিকে একটি তুষণ রাখা হয়, এগুলি লাউয়ের খোলা বা কাঠে বা অল্প কোন ধাতুতে তৈরী করা হয়। হাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝখানে একটা ত্রিকোণ ফলক রাখা থাকে, যাকে বলা হয় পনথি। এই পনথিতে সমস্ত তারের গোড়া বাঁধা থাকে। তারগুলি ত্রিভুজের ওপর দিয়ে দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

রবাবের মত এটিও পদাবিহীন যন্ত্র। রবাবে কেবলমাত্র আলাপ বাজান হয় কিন্তু শরোদে প্রধানত গততোড়াই বাজে, তবে আজকাল এতে আলাপও বাজান হয়। বর্তমানে শরোদে তরফের তার রাখায় স্বরের বেশ বাড়ে। আজকের দিনের শরোদ স্বতঃসিদ্ধ তত্বস্বররূপেই সঙ্গীতাসরে বেজে থাকে। রবাবের মত প্লেটের ওপর তার দাবিয়ে ধরে বা ঘষে বাজান হয়। এই জওয়াকে ইংরাজীতে Plectrum বলা হয়। শরোদে জওয়াটি ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল ( তর্জনী ) দিয়ে চেপে ধরে তারে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতে প্লেটের ওপর দিয়ে তার চেপে ধরে স্বর বার করা হয়। বর্তমানের শরোদে সেতারের মত দুটি চিকারীর তারও রাখা হয় এবং চিকারীর সাহায্যে গতের শেষে ঝালাও বাজান হয়। অনেকে এতে তারপরও বাজিয়ে থাকেন। আবার রবাবের অনুকরণে হাঁড়ির চামড়ার ঢাকার ওপর চাঁটি দিয়ে “চপক” জাতীয় বোলও কচিং বাজান হয়। মনে হয় শরোদ রবাবের অথবা রুদ্রবীণার উন্নত সংস্করণ। রবাব বা রুদ্রবীণাকেই এর আদি উৎস বলা যায়। শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্রের আবিষ্কৃত মোহন বীণা সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা রইলো।

অতীতে শরোদ যন্ত্রে ঝাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের

গোলাম আলি ও তাঁর পুত্র হুসেন খাঁ, মোরাদ আলি খাঁ, লক্ষ্মী-এর নিয়ামতুল্লা, রামপুরের মজরু খাঁ, ফিদা হুসেন, এনায়েৎ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আবদুল্লা খাঁ ও তাঁর পুত্র আমির খাঁ ( কলকাতা ), কয়মতুল্লা ও আসাদউল্লা ( কোকত খাঁ ) প্রভৃতি। পরে উস্তাদ আলাউদ্দীন, উস্তাদ হাফিজ আলি প্রভৃতি। বর্তমানে উঃ আলি আকবর, উঃ ওমর খাঁ, উঃ আমজাদ আলি খাঁ, উঃ বাহাদুর খাঁ, শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীযুত শাম গাঙ্গুলি, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুত তিমিরবরণ ও স্ত্রীবাদিকাদের মধ্যে শরণরাণী মাথুর ও জারিণ দাকওয়লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উদীয়মানদের মধ্যে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও আশীষ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

আসন—সাধারণত বাবু হয়ে বসাই শ্রেয়। আসন গুরুর উপদেশ মত হওয়া উচিত।

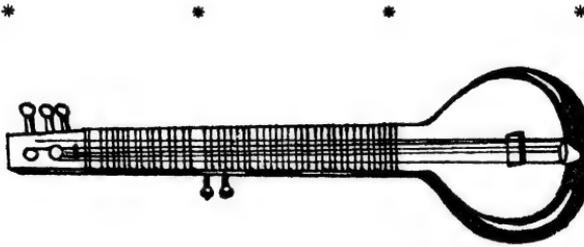
ধারণ—জানদিকের উরুর ওপর কোলে হাঁড়ি রেখে তার ওপরে আলগাভাবে পেটের চাপ রাখতে হয় যাতে বাজনাটি না নড়ে। যন্ত্রের পেছনদিক বুকের দিকে রেখে দানাজিট বাঁহাতের দিকে নিচু করে ধরা হয়। বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুল পেছনে ঠেস হিসাবে আলগা রাখা হয়। পনখীর কাছে হাঁড়ির ওপর জানহাত রেখে কব্জি চার পাঁচ আঙ্গুল বার করে রাখতে হয়।

তার সন্নিবেশ ও স্বর মিলান—শরোদের পাঁচটি প্রধান তারের মধ্যে প্রথম ও প্রধান অর্থে নায়কী তারটি ঈঙ্গিত স্বরের মধ্যমে বাঁধা হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বরের তারের মধ্যমে বাঁধা হয়। দ্বিতীয় তার উদারার সা এ অর্থাৎ ষড়্জের সহিত মেলান হয়, অর্থাৎ যে স্বরে আপনি বাজাতে চান সেই ঠাঁওঁড় স্বরে। তৃতীয় তার দ্বিতীয়ের খাদ পঞ্চমে অর্থাৎ উদারার প এ। চতুর্থ তার উদারার মধ্যমে অর্থাৎ খাদের ম এ এবং পঞ্চম তারটি উদারার ষড়্জ অর্থে খাদের স স্বরের সহিত মেলান হয়। ঘরানা হিসাবে তার রাখা ও বাঁধার কায়দা অথবা তারের সাইজের কিছু রদবদল লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত প্রধান তারটি বাজার চলতি ৫৫ নং তারে ও জি সার্পের স্বরে মেলান হয়। এছাড়া ৪ গাছা তরফের তার আলাদা সওয়ারী রেখে তাতে জোয়ারী খুলে “জোয়ারী তরফ” করা হয়। বাকী ২ গাছা চিকারীর তার ( ৫৫৫ ষ্ট্রলের তার ) রাখা হয়। ১১ থেকে ১৩ গাছা তরফের তার রাখা হয়। এগুলি বাদক নিজের ইচ্ছামত রাগাভুয়ায়ী স্বরের সহিত মিলিয়ে বাঁধেন। আজকাল অনেকে শরোদে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের জগু ইলেকট্রোমেটাল তার ব্যবহার করেন।

**বাদন :** আগেই বলা হ'য়েছে যে ডান হাতে জওয়া বা কোনস্ দিয়ে ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতের তর্জনী ও মধ্যমার নখ দিয়ে প্লেটের ওপর তার চেপে ধরে বা ঘষে স্বর বার করা হয়। ত্রিকোণ জওয়ার মাঝখানটা বৃদ্ধাসুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে শক্ত করে ধরে মুখের সরু কোণটি দিয়ে তারে আঘাত করা হয়। বাঁহাতের চারটি আঙ্গুলই বাজাবার সময় শরোদের তারের ওপর চালান হয়।

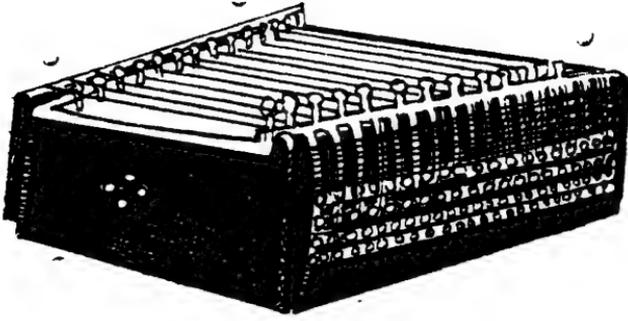
**বোল :** সেতারের মত শরোদেও নানা কাল্পনিক বোলের ব্যবহার দেখা যায়। ডা, রা, ডেরে, ডারডা ইত্যাদি বোলের ব্যবহার রয়েছে। তবে সেতারে যেমন কোলের দিকে ডা ও বাইরের দিকে রা হয়, শরোদে ঠিক তার বিপরীত। শরোদে তারের ওপর থেকে বাইরের অর্থাৎ নীচের দিকে ঘা দিলে 'ডা' ও বাইরের দিক থেকে অর্থাৎ তারের নীচে থেকে ওপরের দিকে ঘা দিয়ে তুললে হয় 'রা'। যুক্ত বোলগুলিও ঠিক একই নিয়মে বার করা হয়। চিকারীর আঘাতকে 'রা' বলা হয় ঠিক সেতারের মতই।

**জওয়া বা কোনস্ :** তারের ওপর ঘা দেওয়ার জন্ত ডান হাতে যে বস্তুটি ধরে তারে আঘাত করা হয় সেটিকে জওয়া বলে। জওয়া শব্দটি কারসী শব্দ বলে অনেকে বলে থাকেন। ইংরাজীতে এটিকে plectrum বলা হয়। এটি চন্দন কাঠের টুকরা, কাঠের টুকরা বা নারকেলের মালা থেকে তৈরী হয়। পাকা তারে বা মোটা প্লাষ্টিকেও জওয়া তৈরী হয়।



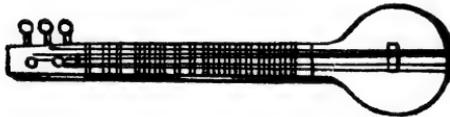
শ্রুতিবীণা

**শ্রুতিবীণা :** প্রাচীনকালে একটি বীণাতে কীলকের সাহায্যে পরপর অনেকগুলি তার বাঁধা হত এবং প্রথম শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনি থেকে ক্রমাগত উচ্চ স্বরে তারগুলি বাঁধা হত। এই ভাবে চক্রিণটি বা তদুর্ক্ তার দিয়ে শ্রুতিনির্ণয় করা হত। বর্তমানে পর্দা-সন্নিবেশে শ্রুতিনির্ণয় করা হয়। শ্রুতিনির্ণয়ে সাহায্য করে বলেই এর নাম শ্রুতিবীণা।



সঙ্কর

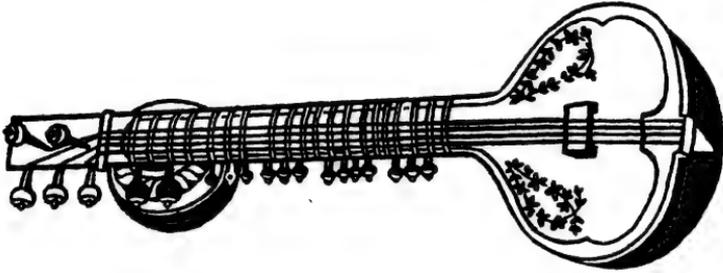
**সঙ্কর**—সঙ্কর সভ্যততযন্ত্র বলে পরিচিত। কাত্যায়নী বীণার অনুরূপ। আকারে কাহ্ননের মতই। প্রতিটি স্বরের জগ্ৰ এক জোড়া করে তার রাখা হয় এবং আঙ্গুলের ঘা এর পরিবর্তে কাঠির ঘা দিয়ে বাজান হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলেই এর প্রচলন বেশী এবং সেখানে গানের সঙ্গতে যন্ত্রটিকে অতুগতসিন্ধ যন্ত্ররূপেই বাজতে দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতের অত্ৰাগ্ৰ প্রদেশেও এর প্রচলন আছে। স্বতঃসিন্ধ যন্ত্ররূপে তবলার সহযোগেও বাজাতে শোনা যায়। দ্রুত বাজনার সময় এর স্বর প্রায় জাবড়া শোনায কারণ এক আঘাতের অনুরণন মিলিয়ে যাবার আগেই অগ্ৰস্বরে ঘা পড়ে তাই বিভিন্ন স্বরের একত্ৰ অনুরণনে ভিন্ন ভিন্ন স্বরধ্বনি পরিষ্কার শোনা যায় না। কানন যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা সঙ্করের কথা বলেছি। কাশ্মীরী সঙ্করে একশতটি পযাস্ত তার রাখা হয়।



সাধারণ সেতার

**সেতার বা সপ্ততন্ত্রী বীণা**—ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে তাঁর দরবারগায়ক সন্ত নিজামুদ্দিনের শিষ্য আমীর খস্কুকে সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়। কারও কারও ধারণা যে সেতার যন্ত্রটি পারস্য দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। কিন্তু একাধিক সঙ্গীত গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে আমীর খস্কু তানপুরা ও বীণার সংযোগে সেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

আমাদের ভারতবর্ষে নানাপ্রকার বীণা প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পূর্বে ভারতের সঙ্গে পারস্যের বানিজ্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সময় বহুপ্রকার ভারতীয় বাণযন্ত্র পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি ও সেখানকার যন্ত্র ভারতে আমদানি করা হত। সেই সময় ভারতীয় বীণা পারস্যে সেতার নামে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। আমীর খস্রুর প্রবর্তিত এই সেতার ভারতীয় ত্রিতন্ত্রী নামভেদ মাত্র। তিনি ত্রিতন্ত্রী নাম বদলে সেতার নাম রাখলেন।<sup>১</sup> পারসিক সহ শব্দের অর্থ তিন, এবং তার শব্দের অর্থ তন্ত্র অর্থাৎ ত্রিতন্ত্রীর পারস্যীয় নাম সেতার রাখা হ'ল। পরে সেতারে আরও চারটি তার সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেতার নামেই সে পরিচিত



তরফদার সেতার

রয়ে গেল। আমীর খস্রু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজদরবারের লোক, তা ছাড়া তিনি কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী ও রাজনীতিক ছিলেন; সুতরাং তাঁর দেওয়া নাম বেশী মর্যাদা পাবে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। বড়ই মজার কথা যে এই নাম রাখাকে কেন্দ্র করেই প্রচারিত হয়ে গেল যে আমীর খস্রু সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক, যেটি আমরা স্বীকার করি না। তিনি এই যন্ত্রের প্রচারক হলেও স্রষ্টা বা আবিষ্কারক নন।<sup>২</sup>

মৌর্যবংশের ও গুপ্তবংশের রাজত্বকালে ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং সে সময় ত্রিতন্ত্রীবীণা ভারতে প্রচলিত ছিল। মহারাজ বিক্রমা-দিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন অমর সিংহ দ্বারা রচিত “অমর কোষ” নামক

১ আমরা ত্রিতন্ত্রী বীণা লেখার সময় যে আকার দিয়েছি সেটিই যে আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী ছিল তা বলা যায় না। কারণ ত্রিতন্ত্রীর সঠিক আকার আমরা পাইনি। তাই প্রচলিত আকার দেওয়া হয়েছে।

২ অনেকের ধারণা হিন্দু রাজত্বকালে সেতার সেতার নামেই প্রচলিত ছিল। যোগেশ আমলে সেটি বীণ সেতার নাম পেয়েছিল।

প্রামাণিক গ্রন্থে সাততারযুক্ত পরিবাদিনী বীণার নাম পাওয়া যায়, এটিকেও পণ্ডিতেরা সেতার বলেন। সেতারের প্রাচীন আর এক নাম **মরুযজী**। **সপ্ততন্ত্রী** নামেও সেতার প্রচলিত। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা নামক গ্রন্থে ফকিরুল্লা লিখিত রাগ দর্পণের অম্বাবাদে গ্রন্থবিবরণের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “সেতার এক প্রকার বীণা। মুঘল যুগে একে বলা হ’ত বীণ-সেহতার।”

রাজা স্মার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁর “যন্ত্রকোষ” নামক বইটিতেও নানা তথ্য লিখে প্রমাণ করেছেন যে কচ্ছপী বীণা ও সাততারযুক্ত সেতার একই যন্ত্র এবং এই ভারতীয় যন্ত্রটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা যে খ্রীস ও আরবদেশীয় নানা যন্ত্রের মিশ্রণে এই যন্ত্রটির জন্ম কিন্তু সেটি ঠিক নয়। সঙ্গীতচার্ঘ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের “সঙ্গীত-সার”-এ লেখা হয়েছে “পুরাবৃত্ত বিষয়ক অভিধানকর্তা উইলিয়াম স্মিথ সাহেব বলেন যে সেতার এবং লাইয়র এই উভয়বিধ তারযন্ত্রই এক রকমের দেখতে ছিল এবং বহু প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও আশিয়াস্থ দেশনিচয়ে এদের ব্যবহার ছিল।” সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থকার এফ্. জে. ফেটিস্ সাহেব বার বার স্বীকার করেছেন, “There is nothing in the west which has not come from the East.” স্মালভেডর ড্যানিয়েল লিখিত Arab Music and Instruments বইটিতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে কউইত্রা ( Kouitra ) নামক যন্ত্রটিই পরে কিথারা নাম ধারণ করেছে এবং সেই কিথারা থেকেই গীটারের সৃষ্টি। আবার রীজ সাহেব তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ায় স্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন যে গীটারের আদি উৎপত্তি কচ্ছপী বীণা অর্থাৎ কেচুয়া সেতার থেকে। কার্ল গ্রেইঞ্জারের Musical Instruments নামক বই থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কিথারা যন্ত্রটিই পারস্যে সেতার নামে প্রচলিত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখেছেন যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে চিত্রাবীণা নামে একটি বীণার উল্লেখ আছে। এটিতে সাতটি তার যুক্ত থাকতো। এই বীণায় কোন পর্দা ছিল না, এবং সাতটি তার সাতটি বিভিন্ন স্বরে বাঁধা হত। বৌদ্ধ জাতকে সাততারযুক্ত বীণার উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন যে চিত্রাবীণাটিই সেতার। সেতারকে আমরা কোনমতেই বিদেশজাত বাণ্যযন্ত্র হিসাবে ভাবতে পারি না। চিত্রাবীণাটি সেতার ছিল অম্বমান করে চিত্রা শব্দটি ভিন্নদেশে গিয়ে চিতারা ও কিথারায় পরিবর্তিত হয়েছিল বলা

যায়।\*<sup>১, ২</sup> এই সমস্ত প্রমাণে আমরা সেতার বস্তুটিকে প্রাচীন ভারতীয় বাণ্ণযন্ত্র ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারি।

তিনতার যুক্ত সেতার কবে থেকে সাততারের যন্ত্রে পরিবর্তিত হ'ল এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলেন। আকবর বাদশাহর সময় বীণ-সেতার বলে যে বাণ্ণ যন্ত্রটি বাজান হত সেটিই ছিল সেতার একথা আগেই বলেছি। বর্তমানে অনেকে বলেন যে বাদশাহ মহম্মদ শাহ ত্রীতন্ত্রীতে (সেতার) আরও তিনটি তার যুক্ত করে সেতারকে ছয়তারযুক্ত বাণ্ণযন্ত্রে পরিণত করেন। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ায় আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে অপারগ। এ সম্বন্ধে শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় "ভারতীয় সঙ্গীত কোষ" নামক পুস্তকে লিখেছেন—প্রাচীন জয়পুর ঘরাণার লোকের মুখে শোনা যায় যে অমৃত সেনই প্রথমে সেতারে পাঁচটি তার ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণা সেতারী মসিদ থা সাহেবই প্রথমে তিনতারের সেতারে পাঁচ তারের ব্যবস্থা করেন। তখনও সেতারে চিকারীব দুটি তার জোড়া হয় নি। বিখ্যাত সুরবাহারী স্বর্গীয় উস্তাদ গুলাম মহম্মদ সুরবাহার যন্ত্রে চিকারীর তার যোগ করার পর থেকেই সেতারে চিকারীর তার ব্যবহৃত হতে থাকে। সেতারে চিকারীর বাজও সেই সময় থেকেই চলে। তাই অনেকের ধারণা সাততারযুক্ত সেতারের প্রচলন তখন থেকেই। লেখক দিল্লী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে জয়পুরের প্রসিদ্ধ সেতারী হাইদার হুসেনের মুখেও এরূপ কথাই শুনেছেন। হুসেন সাহেবের বাজের মধ্যে চিকারীর বাজ কমই ছিল, মিজরাবের ঘা-ও মূহ ছিল কিন্তু তিনি অসম্ভব রকমের তৈরী নানা ছন্দে তান বাজাতেন।

আগের দিনে যে বীণাযন্ত্রের অঙ্করণেই সেতারের সৃষ্টি হয়ে থাকুক, নামকরণ

\* Introduction to the Study of Bharatiya Sangit Sastra by Sri H. Krishnamacharyya in the journal of the Music Academy, Madras Vol. I, January 1930. No. I. P. 12.

১. "The ancient Vina was called Saptatantri, as it had Seven Strings. The present Sitar is a corrupt form of Saptatara as it too has the same number of Chanting Strings. The Vina had some other names too, i. e. Chitra with Seven strings and Vipanchi with Nine Strings. The corrupt forms of Chitra are Citara, Sitara and then Sitar. Chitra became Sitara and Saptatara became Seta . both meaning the same."

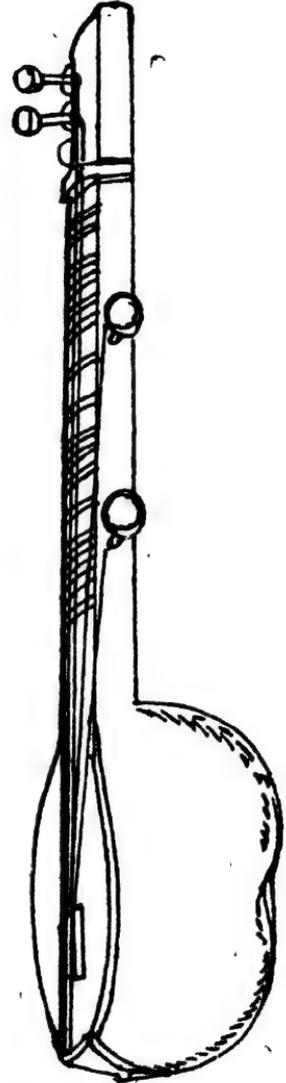
২ চিত্রা বীণাতে যদিও সাতটি তার ছিল শুধুও আমাদের মনে হয় এটি শ্রব বীণার মতই ছিল এবং এতে কোন পর্বা রাগ হত না।

ধিনিই করে থাকুন, সাতটি তারের এবং চিকারীর তারের ব্যবহার যার দ্বারা ই প্রচলিত হয়ে থাকুক, একথা অনস্বীকার্য যে আজকের দিনের সেতার বাদন-ভঙ্গিমায় ও ধনিবৈশিষ্ট্যে আরও মধুর হয়েছে।

স্বয়ংসিক যন্ত্রগুলির মধ্যে আজ সে কেবল মাত্র ভারতেই নয় ভারতের বাইরে স্বদূর আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে এবং চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেও ভারতীয় বাহুযন্ত্র ও সঙ্গীতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। ভারতীয় যন্ত্র যে কত মধুর, তার বাদনপদ্ধতি যে কত সুন্দর, তার রাগ বিকাশের ধারা যে কত গভীর, কত সুস্বরপূর্ণ, কত স্ততানপূর্ণ, কত রকমের চন্দ-বৈচিত্র্যোভরা, সে যে পিয়ানো, গীটার, হার্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাহুযন্ত্রগুলির থেকে অনেক উন্নত তা প্রমাণ করেছে এই সেতার। আনন্দের কথা ভারত থেকে বর্তমানে বহু সেতার আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

**কেচুয়া সেতার :** কচ্ছপী বীণা লেখার সময় আমরা কেচুয়া সেতারের বিষয় বলেছি। সাত-তারযুক্ত সাধারণ সেতারই খোলের (হাঁড়ির) আকৃতিভেদে কেচুয়া। তার সংখ্যা, বাজাবার কায়দা প্রভৃতি একই প্রকারের। কেচুয়া সেতার বনাম কচ্ছপীর ছবি ও রক সংগ্রহে বিলম্বের কারণে আমরা কচ্ছপী-বীণা লেখার সময় ছবি দুটি দিতে না পারায় এখানে দিচ্ছি।

**সেতারের অবয়ব :** সমধিক প্রচলিত এই সেতারের অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন অল্প। তাই সাধারণভাবে কিছু বলা হয়েছে।



বড় কেচুয়া সেতার বা বৃহৎ কচ্ছপী বীণা (১ম প্রকার)\*

\* ভুল করে কেচুয়া সেতারের ছবিতে চিকারীর কান দুটি দানডির ডান পাশে রাখা হয়েছে। এ দুটি বা পাশে হবে।

যন্ত্রটি তিন হাত আন্দাজ লম্বা। দুভাগ করলে তলাকার দিকে খোল ও উপরের দিকে দানডিকে পাওয়া যায়।

**দানডি :** দানডিকে ডাঁটি বা দাঙা বলা হয়, সাধুভাষায় দণ্ড বলে এবং হিন্দিতে বলে দাণ্ড। দানডির ছুটি অংশ। (ক) ফাঁপা পিচনের অর্ধগোলাকার অংশ (খ) পটরী—দানডির মাপের একটি পাতলা কাঠের ঢাকনা। এটিকে সাধুভাষায় বলা হয় **অঙ্গুলিপটুক** বা **সারিকা** স্থান। পটরীর কাঠটি সমতল ও ঈষৎ



কেচুয়া সেতার বা কচ্ছপী বীণা ( ২য় প্রকার )

উজ্জল। তরফদার সেতারে পটরীর ভিতর দিয়ে তরফের তার চালনার জন্ত, পটরীর দুপাশ অল্প উঁচু রাখা হয়। তাই তরফদারের পটরী ঈষৎ অবতল (concave)। সেতারের দানডি সচরাচর সিজন করা সেগুন, মেহয়ী, তুঁত বা গাভার কাঠে হয়।

**খোল :** দ্বিতীয় অংশটি সেতারের খোল বা হাঁড়ি। হাঁড়িকে হিন্দিতে তুধা ও বাংলায় তুধ বলে। শুকভাষায় **ধ্বনিকোষ** অথবা **খর্পর** বলে। খোল তিতলাউয়ের শুকনো খোলা থেকে তৈরী করা হয়। কেচুয়া সেতারের বেলায় খোলটি পেট থেকে আধাআধি করে কাটার ফলে চ্যাপ্টা ধরণের দেখায়। হাঁড়ির উপরের কাঠের ঢাকনাটিকে **তবলি** ও শুক ভাষায় **ধ্বনিপটুক** বলে। দানডি ও খোলের জোড়ের জায়গাটিকে কোমর বলা হয়। কোমরকে চলতি ভাষায় কারিগরেরা 'গুন্' বলে থাকেন।

**পনখি :** হাঁড়ি ও তবলির জোড়ের শেষ প্রান্তে থাকে পনখি। হিন্দিতে একে **লেজো**ট বা **ল্যাজাড়ি** বলা হয়। শুক ভাষায় **শালায়নী** আর ইংরাজিতে **টেলপিস্** বলে। হাড়, শিং হাতির দাঁত বা কোন কঠিন ঘন পদার্থ থেকে এই পনখি তৈরী করা হয়। এগুলি লম্বা ত্রিকোন আকারের হয়। সেতারের সমস্ত তারের গোড়া পনখীর সঙ্গে বাঁধা থাকে।

**সওয়রী অথবা ব্রীজ :** তবলির মাঝখানে হাড়, শিং বা হাতির দাঁতের তৈরী পিঁড়ির মত যে সাদা পদার্থটি দেখা যায় সেটি **ব্রীজ**। ব্রীজ শব্দটি ইংরাজী, তাই আমরা একে **সওয়রী** বলি। সওয়রী শব্দটি হিন্দী। হিন্দিতে অনেকে

সওয়ারীকে **ঘোড়ী** বা **ঘুরচ**ও বলেন। শুদ্ধ ভাষায় এটিকে **তন্ত্রাসন** বা **মেক** বলা হয়। এই তন্ত্রাসনের ওপরই সেতারের সমস্ত তার গুস্ত থাকে। তরফদার সেতারে ছুটি সওয়ারী রাখা হয়। বড় সওয়ারীর ঠিক সামনে দানডির দিকে একটি ছোট অপেক্ষাকৃত নীচু সওয়ারী থাকে। এই ছোট সওয়ারীর উপর দিয়ে তরফের সমস্ত তার নিয়ে যাওয়া হয়।

**মন্কা :** তবলির মুক্ত প্রান্তের দিকে পনখীর কাছাকাছি কয়েকটি গোল পদার্থ তারের মাঝে গলান থাকে। এদের বলা হয় **মেন্কা** বা **মন্কা**। সুর বাঁধার সময় স্ফন্দভাবে সুর মেলাবার কারণে এদের ব্যবহার।

**আড়ি ও ঘাড়ি :** দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান ও পদার মাঝে যে ছুটি সাদা ফলক দেখা যায় সেহুটিকে **আড়ি** বলে। **আড়ি** হরিণের শিং, হাতির দাঁত বা হাড় থেকে তৈরী করা হয়। অনেকে পদার দিকের ফলকটিকে **আড়ি** বলেন ও কাণের দিকের ফলকটিকে **ঘাড়ি** বলেন। আড়িকে শুদ্ধ ভাষায় **সরস্বতী** বলা হয়। অনেকে একে **ভারগহন** বলেন। আড়ির ওপর দিয়ে পাঁচটি তার যায়। এটা ঘাড়ির থেকে সামান্য উঁচু থাকে। তারকে সংযত করার কারণে ঘাড়িতে (অর্থাৎ ২নং আড়িতে) ছেঁদা করে ছেঁদার ভিতর দিয়ে তার গলিয়ে কাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শুদ্ধ ভাষায় আড়ি দুটিকেও **সেতু** বলা হয়।

**পর্দা :** দানডির পটরির ওপর চুড়ির মত যে পদার্থগুলি দেখা যায় তাদের পর্দা বলে। পর্দাগুলি লোহা, পেতল, এলুমিনিয়াম, জার্মান সিলভার প্রভৃতি ধাতুর তৈরী। পর্দাগুলি দানডির পিছনের সঙ্গে তাঁত বা মুগার স্তম্ভ দিয়ে বাঁধা থাকে। তাঁতের স্তম্ভকে শুদ্ধ ভাষায় **ভাস্কর সূত্র** ও রেশমের স্তম্ভকে **পট্টসূত্র** বলা হয়।

সচল ঠাটের সেতারে ১৫ থেকে ১৭ গানি পর্যন্ত পর্দা ও অচল ঠাটের সেতারে ২১।২২ খানি পর্যন্ত পর্দা সাজানো থাকে। সচল ঠাটের কোমল ও কড়ি মিশ্রিত ১২টি স্বরের ব্যবহারের জন্ত বিশেষ বিশেষ পর্দা থাকে। বাজাবার সময় কোন পর্দা সরাতে হয় না। ঘরাণা হিসাবে এই পর্দার সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। পর্দাকে হিন্দীতে **শুন্দরীয়া** বা **পর্দে** এবং শুদ্ধ ভাষায় **সারিকা** বলা হয়।

**কীলক বা কান :** দানডির মুক্ত প্রান্তের শেষের দিকে পাঁচটি কান থাকে সেগুলির সঙ্গে পাঁচটি বিশিষ্ট তার যুক্ত থাকে। কানগুলি কাঠের তৈরী। শিশু, মেহরী ও আবলুস কাঠের কান ভাল হয়। কানকে শুদ্ধ ভাষায় **কীলক** বলে। আড়ির উপর অংশে দানডির পটরির মাঝামাঝি দুটি কান থাকে ও বাকি তিনটি

আড়ির উপর দিকে দানডির বাঁ পাশে লাগান থাকে। দানডি ছেঁদা করে কান লাগান হয়। এই পাঁচটি উপরের কান ছাড়া শেষ কান দুটি আড়ির খানিকটা নীচে দানডির বাঁ পাশে লাগান থাকে। এই দুটির সঙ্গে সেতারের ঝালার ( চিকারীর ) তার বাঁধা থাকে, তাই অনেকে এই কান দুটিকে চিকারীর কান বলেন। তরফদার সেতারে আরও ১১ থেকে ১৩।১৪টি পর্যন্ত অতিরিক্ত ছোট ছোট কান থাকে তরফের তারের জুগ।

**সেতারের ধ্বনি সেতুর রহস্য :** হাঁড়ির অর্থাৎ ধ্বনিকোষের ( ঢাকনার ) তবলীর ওপর যে সাদা আসনটি দেখা যায় তাকে সওয়ারী বলে। পনখীতে বাঁধা সমস্ত তারই এর ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সওয়ারীতে জোয়ারী খোলার ওপরই সেতারের স্পষ্ট মধুর আওয়াজ নির্ভর করে। সওয়ারী উকো ( File ) দিয়ে ঘষে এমন ভাবে পরিষ্কার করা হয় যে তারে ঘা দিলে তারটি থেকে সুন্দর খোলা আওয়াজ পাওয়া যায়। এইভাবে বিশিষ্ট আওয়াজ পাওয়ার জন্ত সওয়ারীকে সাফ করার নামই জোয়ারী খোলা বা জোয়ারী সাফ করা। সওয়ারীর ওপর তার বসে গেলে, মরচে ধরলে বা ঠিক মত পরিষ্কার না হলে, সেতারের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। জোয়ারী খোলার কান সকল কারিগরের সমান থাকে না। কারিগরের অভিজ্ঞতা, শব্দজ্ঞান, স্বরবোধের বৈশিষ্ট্যের উপরই জোয়ারীর কার্যকারীতা ও সেতারের ধ্বনিমার্গ নির্ভর করে। জোয়ারী সাফ হলে সেতারে মীড় কেমন থাকছে তা প্রতিটি পর্দা থেকে তিন চার পর্দার মীড় টেনে নিজে ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হয় এবং কোথায় কোথায় স্বরমার্গ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা কারিগরকে দেখিয়ে দিতে হয়। দক্ষ কারিগরের বাজিয়ে স্ববিধামত জোয়ারীর আওয়াজ ভাল করে খোলার চেষ্টা করেন। সেতারের অতি সূক্ষ্ম কাজ এই জোয়ারী এবং সওয়ারীর তারের ঘাট ঠিক করার ( Placing-এর ) ওপর নির্ভর করে। কারিগরের স্বরের কান ভাল হ'লে স্বভাবতই তাঁর কানে বাজিয়ের অস্ববিধা ধরা পড়ে অর্থাৎ কোন জিনিষটি বাজিয়ে প্রকাশ করতে চাইছেন, মীড়ের কোন কাজটি জোয়ারীর অস্ববিধার জন্ত সম্যগভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না অথবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে সেটি তাঁর কানে লাগে। স্বর ও শব্দের তারতম্য ধরার মত জ্ঞান খুব অল্পসংখ্যক কারিগরের থাকে তাই সকলে ভাল জোয়ারী খুলতে পারেন না। আমাদের জানা দরকার যে সেতারের মাপজোপ, তবলী, দানডি প্রভৃতির ঘনত্ব ইত্যাদির ওপর যেমন সেতারের ধ্বনিমার্গ নির্ভর করে, তেমনি ভাল জোয়ারীর ওপরও সেটি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

**সেতারের তারসংখ্যা ও বাঁধার কায়দা :** সেতারে দানডির মুক্তপ্রান্তে আড়ির উপর দিকে সামনে রাখা দুটি কান ও পাশে রাখা তিনটি কান, যেটি পাঁচটি কানে পাঁচটি তার বাঁধা হয়। এইসব তারের গোড়া পনখী থেকে বাঁধা হয়ে সওয়ারীর ওপর দিয়ে আড়ির মাঝখানের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এসে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে। এর মধ্যে আড়ির কাছে যে কানটি প্রথম দেখা যায় সেটিই প্রধান তারের কান। এটিকে **নায়কীতার** বা **মেনতার** বলা হয়। হিন্দিতে এটিকে **বাজকা তার** বলে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে সেতারের অধিকাংশ বাজ এই তারের ওপরেই বাজান হয়। এই তারটি পাকা স্টীলের ভাল তার হওয়া দরকার। সাধারণ বড় সেতারে বা তরফদার সুরসেতারে ২নং তার ব্যবহার করা হয়। অনেকে ৩নং তারও ব্যবহার করে থাকেন। পাকাতার বলতে Piano steel তারকেই বোঝায়। গেজচার্টে তারের সঠিক মাপ দেখে নিন। Piano steel বলতে পিয়ানো যন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ temper যুক্ত তারকেই বোঝায়। এই তার সাধারণত হল্যান্ড, জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করা হয়। বর্তমানে ভারতের বেরিলি প্রভৃতি স্থানে ভাল তার তৈরী করা হচ্ছে। ভাল তার বলতে বোঝায় যে তার সহজে কেটে যায় না বা টান থাকার সময় বেশী বাড়ে না, সহজে তারে ঘাট পড়ে না এবং আগাগোড়া একভাবে স্ফর্জিত থাকে।

এই মেন তারটি মধ্যম অর্থে মা স্বরের সঙ্গে মেলান হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার দুটিতে ২৮নং এর পেতল বা ব্রোঞ্জের তার দেওয়া হয়। এহুটি তারই (স) ষড়জে মিলান হয়। দুটি তারই এক স্বরে বাঁধা হয় বলে এদের জুড়ির তার বলে। আজকাল অনেকে জুড়ির তারের একটিমাত্র অর্থাৎ ৩নং তারটি রাগেন ও ২নং তারটি খুলে ফেলেন। হিন্দিতে এই তার দুটিকে **জোড়েকা তার** বলা হয়। চতুর্থ তারটি খাদ পঞ্চমে (খাদের প-এ) বাঁধা হয়। এটিও পেতল বা ব্রোঞ্জের তার। অনেকে এটিকে খাদের সা স্বরের সঙ্গে মেলান তখন এটিকে খরজের তার বলা হয়। হিন্দিতে এটিকে লরজের তার বলে। এটিতে ২৬নং পেতলের তার ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ঘরাণায় এটিতে ১নং স্টীল তার ব্যবহার করা হয়, এবং এটিকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চম স্বরে ('প' স্বরে) বাঁধা হয়। এরপর পঞ্চম তারটি অনেকে মধ্যসপ্তকের ('গ'-এর) গান্ধারের সঙ্গে বাঁধেন। যারা গ-তে বাঁধেন তাঁরা এতে ২নং পাকা স্টীলের তার ব্যবহার করেন! আর এটিকে যারা পঞ্চমে ('প'-তে) বাঁধেন তাঁরা ১নং স্টীলের তার লাগান।

প্রধান প্রধান পাঁচটি তারের কথা বলা হ'ল। এখন বাকি ষষ্ঠ ও সপ্তম তার ছুটি। এ দুটিকে চিকারীর তার বলা হয়। এ দুটিতে পাতলা ০০নং এর স্ট্রালের তার ব্যবহার করা হয়। এ দুটিকে (তারার 'স') তার-ষড়্জের সঙ্গে মিলিয়ে বাঁধা হয়। অনেকে একটিকে মধ্যসপ্তকের পঞ্চমে ও শেষটিকে তারার 'স'-র সঙ্গে বাঁধেন। অনেকে প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের 'স'-এর সঙ্গে ও শেষটিকে তারার 'স'-এর সঙ্গে বাঁধেন।

সবশেষে, তরফদার সেতারে তরফের তারসমূহের মধ্যে খাদের 'ন' স্বর থেকে বা মধ্যসপ্তকে 'স' স্বর থেকে রাগ অনুরায়ী বাদক তাঁর খুশীমত সমস্ত তরফের তার বেঁধে থাকেন। তড়পটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ অনুরণন। এই তারগুলিকে ইংরাজীতে Vibrator অর্থাৎ কম্পনের বা অনুরণনের তার বলা হয়।

শিক্ষার্থীর পক্ষে যন্ত্রে সুর বাঁধা খুব কঠিন। যতদিন পর্যন্ত সুরের কান অর্থে সুরের জ্ঞান না জন্মায় ততদিন গুরুর কাছে সুর বাঁধা শিখতে হয়। পরে সুরের কান তৈরী হলে নিজেই বাঁধা যায়। যন্ত্রটি ভালভাবে সুরে বাঁধা হলে আওয়াজটি মধুর লাগে। যন্ত্র বাজাবার তালিম নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে সুর বাঁধতে শেখা একান্ত প্রয়োজন। যার সুরজ্ঞান যত সূক্ষ্ম তিনি তত নিখুঁত ভাবে সুর মেলাতে পারেন।

**আসন :** সেতার নিয়ে কীভাবে বসতে হয়, সেটা গুরুর কাছে শেখা দরকার। সেতার নিয়ে দীর্ঘসময় স্বাভাবিকভাবে বসে থাকতে পারা যায়, এমন একটি আসন বেছে নিতে হয়। নামকরা উস্তাদেরা ও অন্যান্য বাজিয়েরা কীভাবে বসেন তাই দেখে নিজের সুরবিধামত একটি আসনে বসে বাজাতে বাজাতে আসনসিদ্ধি লাভ করা যায়। আসনটি যাতে দৃষ্টিকটু না হয় বা তাতে শরীরের কোন অংশের বিশেষ ক্ষতি না হয়, মেরুদণ্ডটি যথাসম্ভব সোজা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আসন বেছে নেওয়া উচিত।

**ধারণা :** সেতার ধরতে হলে প্রথমে লাউ অর্থাৎ খোলের পেছন দিকটা বাজিয়ের (অথবা শিক্ষার্থীর) সামনের দিকে ডান হাঁটুর পাশে রেখে ডান হাতের কনুয়ের সামনের অংশটি আলগাভাবে লাউয়ের ওপর চাপ রেখে ধরতে হয়। সেতারের দানডিটা বৃকের সামনে বা পাশে হেলিয়ে, বা হাতের বুড়ো আঙ্গুল দানডির পেছনে ঠেকা দিয়ে, প্রথম আঙ্গুল (তর্জনী) পর্দার ওপর রেখে নায়কী তারকে পর্দার সঙ্গে টিপে ধরতে হয়। বা হাত এমন আলগাভাবে রাখা দরকার, যাতে সহজেই হাতটি দানডির নিচের দিকে ও ওপর দিকে

সমস্ত পর্দার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চালান যেতে পারে। বই পড়ে জানার চেয়ে, এসব বিষয় গুরুর কাছে হাতে কলমে শেখা ভাল।

**মিজরাব :** লোহার পাকা তারে তৈরী বিশেষভাবে ভাঁজ করা একরকমের আংটির নাম মিজরাব। মিজরাব শব্দটি পার্সী শব্দ, মুসলমান আমল থেকে চলে আসছে। শুদ্ধ ভাষায় একে **অঙ্গুলিত্রে** বলা হয়। হিন্দিতে একে **আঙুঠা** বা **নক্কী** বলা হয়। ইংরাজীতে একে ( plectrum ) প্লেকট্রাম বলে।

সেতার বাজাবার আগে ডানহাতের প্রথম আঙ্গুলে ( তর্জনীতে ) মিজরাব পরতে হয়। মিজরাব তর্জনীর প্রথম গাঁটের ওপর আঁট করে এমন ভাবে পরা উচিত যাতে তারে আঘাত করার সময় সেটি খুলে বা ঘুরে না যায়। অনেকে আঙ্গুলের প্রথম গাঁট পার করেও মিজরাব পরেন। কোন কোন ঘরাণায় ( তর্জনী ও মধ্যমা ) প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি আঙ্গুলেই মিজরাব পরা হয়। চিকারীর কাজের সুবিধার জন্ম অনেকে চতুর্থ আঙ্গুলেও ( কণ্ঠাতে ) মিজরাব পরেন, অনেকে চিকারীর তারে আঘাতের জন্ম মিজরাবের বদলে চতুর্থ আঙ্গুলের নখটি বড় রাখেন ও নখ দিয়েই চিকারীর তারে আঘাত করেন।

**অঙ্গুলিচালন :** সেতারে স্বরের উর্ধ্বগতির বাজের সময় ( অর্থাৎ যখন তারার স্বরের দিকে যাওয়া হয় ) বা হাতের প্রথম আঙ্গুল অর্থে তর্জনী দিয়ে স র গ ম প ধ ন পর্য্যন্ত চালিয়ে সপ্তক শেষ করে তারার স স্বরটিতে পৌঁছালে স স্বরটির ওপর দ্বিতীয় অঙ্গুলি অর্থে মধ্যমা ব্যবহার করা হয়। আবার মৃদারার সপ্তকে ফিরে আসার সময়, অর্থাৎ ন ধ প ম গ র স বাজাবার সময় ( বিশেষ স্বরের নিম্নগতি ও হাতের উর্ধ্বগতির সময় ) তার ও পর্দার ওপর তর্জনীর ( ১ম আঙ্গুলের ) ব্যবহার হবে। বিভিন্ন ঘরে নানা ধরণের অঙ্গুলি চালনার নিয়ম দেখা যায়। অনেকে মধ্য সপ্তকের স থেকে গ পর্য্যন্ত বাজিয়ে 'ম'-তে আসার সময় মধ্যমা ব্যবহার করেন এবং এই ভাবে আবার তারার স পর্য্যন্ত মধ্যমা দিয়েই নামেন আবার ওই মধ্যমা দিয়েই ন ধ প ম বাজিয়ে তর্জনী দিয়ে গ র স-তে পৌঁছান। এভাবে বিভিন্ন ধরণে অঙ্গুলিচালনার নিয়ম দেখা যায়। পর্দার ওপর আঙ্গুলের টিপ রাখার সময়, আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পর্দার ঠিক ওপরে তারটিকে শক্ত করে চেপে ধরতে হয়, অথচ আঙ্গুলটা সহজেই যাতে অপর পর্দায় সরান যায় এরকম সুযোগ রাখতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল ( ৫ম অঙ্গুলি বা বৃহস্পতি ) সব সময় কানড়ির পেছনে আলাগা ঠেকানোর মত ধরে রাখতে হয়। আঙ্গুল চালাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন সময়েই তর্জনী ( ১ম আং ) তার ছেড়ে না ওঠে।

তর্জনী গড়িয়ে (slip) চলে আসবে আর (মধ্যমা) তার থেকে তুলে অঙ্গ পর্দায় বা স্বস্থিত পর্দায় উঠবে আর পড়বে, এটি সাধারণ নিয়ম। কোন কোন বাদক রুস্তন বা স্পর্শরুস্তনের সময় অনামিকা (৩য় আ:) ব্যবহার করে থাকেন। এ সম্বন্ধে নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মেনে চলাই শ্রেয়।

**বোলপ্রকরণ:**—সেতারের তারের উপর মিজরাবের আঘাতকে কয়েকটি কাল্পনিক নামে ডাকা হয়, সেই নামগুলিকে সেতারের বোল বা বাণী বলা হয়। সেতারের প্রধান বাণী ছটির বা বোলের নাম ডা ও রা মিজরাব দিয়ে তারের ওপর কোলের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বলা হয় “ডা” ও বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বলা হয় “রা”। ডা, ডে, ডি, প্রভৃতি বোল কোলের দিকের ডা আঘাত থেকেই বার করা হয়, এবং রা, রে, রি প্রভৃতি বোলগুলি রা আঘাত থেকেই প্রকাশিত হয়। ডা ও রা-এর মিশ্রণে ড্রে, ড্রার, ড্রেদার অথবা ডে, ড্রার, ডেড্রার প্রভৃতি বোল বাজান হয়। মিজরাবের উল্টা ঘা দিয়ে আরম্ভ করে রাডা প্রভৃতি বোল বার করা হয়। লয়ভেদে একই বাণীকে ভিন্ননামেও ডাকা হয়। যেমন ডারা বাণীটি ডেরে হয়ে যায় ইত্যাদি। ঝালা বাজাবার সময় চিকারীর তারে যে আঘাত করা হয় তাকে ‘রা’ বা ‘র’ বলা হয়। অনেক সময় চিকারীর তারেও ডেরে প্রভৃতি বাণী বাজান হয়।

**সেতার ঘরাণা:** সেণী ঘরাণা বা গোয়ালীয়র ঘরাণা: পণ্ডিত স্ফদর্শনাচার্য (অমৃত সেনের ছাত্র) লিখিত সঙ্গীত স্ফদর্শন নামক গ্রন্থে গোয়ালিয়রের রহিম সেন ও তশ্র পুত্র অমৃত সেনকেই সেতারের প্রথম পুরুষ বলা হয়েছে। স্ফদর্শনাচার্য যাই বলুন আমরা জানি মসিদখানি বাজের স্রষ্টা মসিদখাই সেতারের প্রথম পুরুষ। রহিম সেন ও অমৃত সেনই প্রথমে সেতারে বীণের অঙ্গ, ধ্রুপদের অঙ্গ ও খ্যালের অঙ্গ জুড়ে সেতারের বাজে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। উস্তাদ হুলহে খাঁই সেতারে তাঁদের এই ভাবে তালিম দেন। পরবর্তীকালে এঁদের সেতারের ধারা বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন কায়দায় চলতে থাকে। এই ঘরে সেতারের প্রথম খলিফা আমীর খাঁর নাম পাওয়া যায়। সেতারের ঘরাণাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম বীণকার ঘরাণায় আমরা গুলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, সেতারী ইমদাদ খাঁ, রাজা স্মার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তি প্রমুখ গুণীগণের নাম পাই। গুলাম মহম্মদের শিষ্য মহম্মদ খাঁর ঘরে পাই বামাচরণ বাবু, জীতেন ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে। গোয়ালীয়রের

সেতার ঘরাণার প্রথম খলিফা আমীর খাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে পাই বরকতউল্লা, আসাক আলি, ও মুস্তাক আলি থাকে। রবাবী প্যার খাঁর ঘরে পাই বেনারসের বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ, পান্নালাল বাজপেয়ী, (জাফর খাঁর শিষ্য যিনি দুই আঙুলে মিজরাব পরে বাজাতেন) ও নবীবক্স ডেরেডার প্রভৃতি গুণীদের। প্যার খাঁর শিষ্যদের মধ্যে কুতুব আলির ( কুতুবদৌলা ) নামও পাওয়া যায়।

**জয়পুর ঘরাণা :** এই ঘরাণায় অমৃত সেনের পুত্র নিহাল সেনের নাম করা হয়। এই ঘরে সেতারী খলিফা হাফিজ খাঁর নাম পাওয়া যায়। অমৃত সেন, নিহাল সেন প্রভৃতি দীর্ঘদিন জয়পুরে বাস করার কারণে গোয়ালীয়র বা সেণী ঘরাণার হলেও এঁদের অনেকে জয়পুর ঘরাণার সেতারী বলতেন। জয়পুর ঘরে সর্বশেষ আমরা হাইদার হুসেনের নাম পাই। এঁর বাজে জয়পুর ঘরাণার বিশিষ্ট ছাপ ছিল।

**লক্ষ্মী ঘরাণা :** গুলাম রজা থেকে আরম্ভ ( রেজাখানি বাজ )। হুসেন বক্স, নবাবলি নক্কী খাঁ প্রভৃতি আরও অনেকের নাম এই ঘরে পাওয়া যায়।

**বেনারস ঘরাণা :** এক দিকে প্রসাদজীর ঘর, অপর দিকে প্যার খাঁর ঘরের শিষ্য ঈশ্বরী প্রসাদ, নবীবক্স প্রভৃতিদের ঘর। বড়ে মহম্মদ খাঁর কাছে তালিম নিয়ে নেপাল দরবারের পশুপতি সেবক মিশ্র ও শিব সেবক মিশ্র এই দুই ভাই আর এক বেনারস ঘরাণা গড়ে তোলেন। এই ঘরাণায় সেতারী বিজয়দাস পাকড়ের নাম পাই। এই ঘরাণা লয়ের বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। প্রায় অশিতপির বৃদ্ধ বিজয় বাবুর বাজনা শুনে এখনও আমরা সেই লয়দারীর পরিচয় পাই। ইনিই এই ঘরাণার একমাত্র ধারক ও বাহক।

**বিষ্ণুপুর ঘরাণা :** সেণী-বীণকার ঘরাণার নালমাধব চক্রবর্তি থেকে শুরু। রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এঁর কাছে তালিম পান। রামপ্রসন্ন বাবু এই ঘরের বিশেষ গুণী ছিলেন। এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। এই ঘরে আমরা নাম পাই স্বর্গীয় স্বরবাহারি ও সেতারী স্বরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের। বর্তমানে শ্রীযুক্ত সত্যকিন্দর বন্দোপাধ্যায় এই ঘরাণার বাজ অক্ষয় রেখেছেন। এই ঘরে রয়েছেন গোকুল নাগ ( রামপ্রসন্ন বাবুর ছাত্র ) ও তাঁর পুত্র মণিলাল নাগ। শ্রীমান মণি নাগ খুবই ভাল বাজান ও যথেষ্ট স্নানার্জন করেছেন, তবে তাঁর বাজে অল্প ছাপ আসায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার style কিছু ক্ষুণ্ণ।

**দারভাঙ্গা ঘরাণা বা পাঠক ঘরাণা :** এঁদের তালিম বেনারস ঘরাণা থেকেই এসেছে শোনা যায়। রামেশ্বর পাঠক থেকে শুরু। বর্তমানে এই ঘরাণার

সেতারী রয়েছেন বলরাম পাঠক। তাঁর বাজে ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাপ পাওয়া যায়।

**মহারাত্রি ঘরাণা :** বীণকার বন্দে আলি থেকে চলে আসছে। এই ঘরে মুরাদ আলি খাঁর নাম পাওয়া যায়। এই ঘরাণায় রুক্ষরাও (কোলাপুর) ও বাবু খাঁর নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ঘরে রয়েছেন আবদুল হালিম জাফর খাঁ। এঁর বাজেও ঘরাণার বৈশিষ্ট্য আছে।

**ঢাকা ঘরাণা :** এই ঘরাণার নাম বর্তমানে শোনা যায় না। ভগবান দাস সেতারী ছিলেন এই ঘরাণার বিশিষ্ট গুণী। তাঁর নামেই প্রায় এই ঘরাণার শেষ।

বর্তমানে সেতারে যে দুটি ঘরাণা অগ্রগামী :

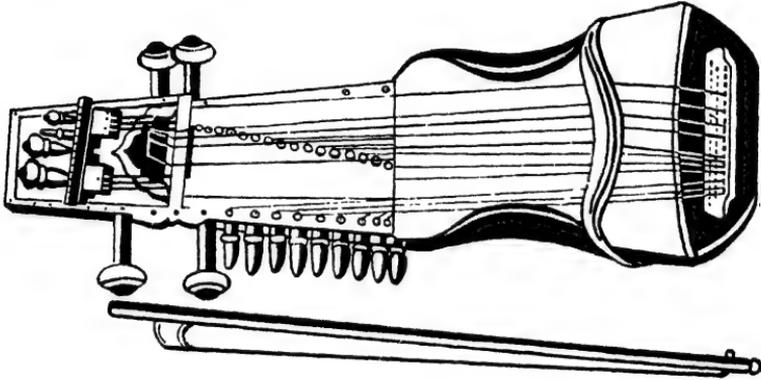
**প্রথম ইমদাদখানী ঘরাণা :** ইমদাদ খাঁ থেকে আরম্ভ। এ ঘরে ছিলেন স্বনাম ধন্য সেতারী এনায়েৎ খাঁ। বর্তমানে তাঁর পুত্র প্যাতনামা বিলায়েৎ খাঁ ও তন্তু ভাত্তা ইমরাৎ খাঁ।

**দ্বিতীয় আলাউদ্দীন খাঁর ঘরাণা :** রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁর কাছ থেকে তন্ত্রকারের তালিম পান ক্রিয়াসিদ্ধিক গুণী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। এঁর তালিমে গড়ে ওঠেন এই ঘরাণার মধ্যমণি পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই ঘরাণায় রয়েছেন গুণী সেতারী নিখিল ব্যানার্জী প্রভৃতি আরও অনেকে এই দুই ঘরাণায় ও অন্ত্যগ্র ঘরাণায় যেসব গুণী সেতারীর আছেন তাঁদের সকলের নাম দিতে না পারায় আমরা একান্ত হুঃখিত। পরে সকলের বিষয় বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

**সারেন্জী বা সারঙ্গ বীণা :** এসরাজের বিষয় লেখার সময় ছুড়ের যন্ত্রের অর্থাৎ ধনুস্তত যন্ত্রগোষ্ঠির প্রাচীনত্বের বিষয় লেখা হয়েছে। এখন ছুড়ের যন্ত্রের আদি উৎপত্তির কথায় Groves Dictionary of Music & Musicians edited by N. C. Colles. M. A. (Oxon) 3rd edition 4th Volume 1952-তে পারশ্বের আদি ধনুস্তত কেমানজের প্রসঙ্গে লিখেছেন .....“It is undoubtedly one of the earliest of all bowed instruments, Claiming identity with or descent from the somewhat Mythical Ravanastram of India, from which the Urhun (ERSHIEN) of the chinese is also supposed to have sprung.”

আমরা এসরাজের বিষয় লেখার সময় বলেছি যে (৫০০০) পাঁচ হাজার বছর আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ রাবণাস্তম বা রাভাণা যন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং এসরাজ

বা সারেঙ্গী প্রভৃতি ধরুর্ষন্ত্র সেই রাবণাস্ত্রম থেকেই গড়ে উঠেছে এবং তারও আদিত্তে রয়েছে পিণাকীবীণা ও একতন্ত্রীবীণাদিযন্ত্র যা থেকে রাভাণা বা রাবণাস্ত্রম প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে। পিনাকী পিণাকপাণি মহাদেবের হাতে শোভা পেত এবং এটি তাঁরই সৃষ্ট। এই পিণাকী যে ধরুর্ষন্ত্রের সর্বপেক্ষা আদি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। আমরা অমুতি যন্ত্রটির বিষয় লেখার সময় বলেছি যে ভারতের অমুতি নামক ধরুর্ষন্ত্র থেকে কেমানজে যন্ত্রটি রূপ পেয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। ভারতের অতিপ্রাচীন এই অমুতি যন্ত্রটির সঙ্গে আমরা



সারেঙ্গী

কেমানজের সাদৃশ্যও দেখতে পাই। আমাদের ধারণা এই অমুতি জন্ম নিয়েছে পিনাকী থেকে। কাজেই পিনাকীকে আমরা সমস্ত ধরুর্ষন্ত্রের আদি বলতে পারি।

সারেঙ্গী যন্ত্রটি কত প্রাচীন তার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নি তবে অনুমান করা যায় রাভানা বা রাবণাস্ত্রমের অনেক পরে এটি এসেছে। পারস্যের কেমানজে, চীনের আর্হিন, জাপানের কোপীন, ইউরোপের ভায়োলিন প্রভৃতির আদিপুরুষ আমাদের রাভানা। সারেঙ্গী বর্তমানে তত গোষ্ঠীর সভাষন্ত্রের বিভাগে অল্পগত সিদ্ধ যন্ত্ররূপে পরিচিত। কদাচিৎ স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে সঙ্গীতাসরে এককভাবেও বাজতে শোনা যায়।

বর্তমানে বাজারে দুই ধরনের সারেঙ্গী দেখা যায়। প্রথমটি **টোটা সারেঙ্গী**। এগুলিতে একপ্রস্থ তরফ দেওয়া হয়। অনেকে একে একহারা সারেঙ্গী বলেন। দ্বিতীয়টি **দেড়পোষী সারেঙ্গী**। এগুলিতে দুই প্রস্থ তরফ থাকে এবং আকারে টোটা সারেঙ্গীর থেকে বড়। কিছুদিন আগে সমবেত বাগ্গমঞ্জলীতে বাজাবার জন্তে এক প্রকার বৃহদাকার সারেঙ্গী

ব্যবহার করা হত। এগুলি দাঁড়িয়ে বাজান হত। বর্তমানে এ ধরণের সারেঙ্গী দেখা যায় না। খ্যাতনামা নৃত্যবিদ শ্রীউদয়শঙ্করের বৃন্দবাগের মাঝে এরূপ বৃহদাকার সারেঙ্গী দেখা যায়। রাজস্থানে আরও কয়েক প্রকারের সারেঙ্গী ব্যবহৃত হয় যেগুলিকে **ধানি-সারেঙ্গী** বা **দেড়পোষলি সারেঙ্গী** বলে। এগুলির আকার প্রচলিত সারেঙ্গী থেকে ভিন্ন ধরণের। রাজস্থানে **গুজরতন সারেঙ্গী** নামে একপ্রকার সারেঙ্গীর ব্যবহার দেখা যায়, গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতেই এদের ব্যবহার। **সিঙ্কিসারেঙ্গী** নামে আর একপ্রকার সারেঙ্গীও রাজস্থানে প্রচলিত আছে।

সারেঙ্গী একখানা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়, এর দানাড়ি ও খোল কাঠের, গর্তটি ফাঁপা এবং খোলটি শরোদ প্রভৃতির মত চামড়ায় ঢাকা থাকে। পটরির তলাটিও ফাঁপা থাকে। খোলের শেষপ্রান্তের মধ্যভাগে পন্থী থাকে, সমস্ত তারের গোড়া এতে বাঁধা হয়, চামড়ার উপর খাড়া ভাবে একটি সওয়ারী রাখা থাকে। সওয়ারীর ওপর দিয়ে প্রধান তার গুলির আগা দানাড়ির মুক্ত প্রান্তের কানগুলির সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। তরফের তারগুলি সওয়ারীর মাঝের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে দানাড়ির দাক্ষণ পাশে রাখা তরফের কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে। চারটি প্রধান কাণে চারটি প্রধান প্রধান তার (তাদের তার) লাগান থাকে। পটরীর শেষপ্রান্তে দুটি তন্ত্রাসন অথবা দুটি সমতল সওয়ারী রাখা হয়, তার উপর দিয়ে দু'পাশে মোট ১১টি জোয়ারী-তরফের তার রাখা হয়। এই জোয়ারী-তরফের দুই ভাগের প্রতিটি সওয়ারীর প্রথম তারটি পিতলের এবং বাকিগুলি ষ্টিলের এ ছাড়া পটরীর ডানপাশে রাখা ছিদ্রের উপর ছোট ছোট বোতামের মাঝ দিয়ে ২৭টি ষ্টিলের তরফের তার। এগুলি পর পর কোমল, কড়ি মিলিয়ে বারটি স্বরে মেলান হয়। সারেঙ্গী বাদক, গায়কের স্বরের সহিত মিলিয়ে এগুলি বাঁধেন এবং একক বাদনে নিজের ইচ্ছামত স্বর বেঁধে নেন।

সারেঙ্গীর স্বর অতীব মধুর। মেয়েদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে যায় তাই কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গতে আর কোন যন্ত্রই এর সমকক্ষ নয়। বেহালা একাজে ব্যবহৃত হলেও কণ্ঠস্বরের তুলনায় কিছু রক্ষা। যদিও দাক্ষণ ভারতে গানের সঙ্গতে বেহালার প্রচলনই বেশী। সারেঙ্গীর প্রথম তার (নায়কী বা প্রধান তার) মধ্যমে মিলান হয়, দ্বিতীয় ষড়জে, তৃতীয় পঞ্চমে, চতুর্থ (তারটি ঋরা সারেঙ্গীতে ব্যবহার করেন) তার ঋদ পঞ্চমে বা

উদারার ষড়জে। সারেঙ্গী, মেহগ্নী, বার্মানেগুন, গান্ধার অথবা তুঁত কাঠে ভাল হয়। কাঠাল বা আম কাঠেও তৈরী হয়, তবে সেগুলি খুব ভাল হয় না। তারফের তারগুলি বাজিয়েরা নিজেদের খুশী মত বেঁধে থাকেন।

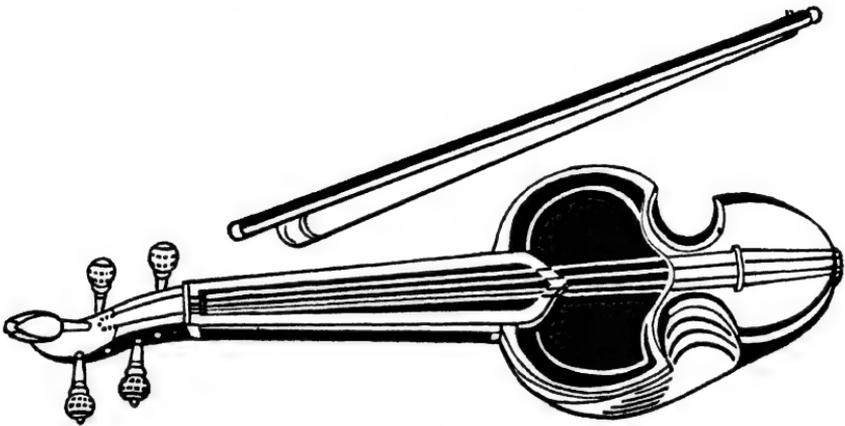
প্রথমে নাম পাই চংগে খাঁর ঘরাণাদার হাইদার বকস্ যিনি সারেঙ্গী বাদক হয়েও দরবারে বীণকারের মত সম্মান পেতেন। ইনি বাদশাহের কাছে “পলিফা” উপাধি পেয়েছিলেন। দরবারে যাবার জন্তু এর নিজস্ব তামজাম অর্থাৎ খাস সবারী নিযুক্ত ছিল। এই হাইদার খাঁর ভায়ের ছেলে ছিলেন কলিকাতার গ্যাতনামা উস্তাদ বাদল খাঁ। বুনিয়াং হুসেন ও পুত্র মেহেদী হুসেন হাইদার খাঁর ঘরাণার রামপুরের প্রতিনিধি। এই বদল খাঁর গায়ক শিষ্যদের নামের মধ্যে পাই জমীরুদ্দীন খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তি, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ভায়দেব চাটাজী, শচিন্দাস, মোতীলাল, শৈলেশদত্ত গুপ্ত প্রভৃতিকে।

সারেঙ্গীর আর এক ঘরের নাম পাওয়া যায় ভারত বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক সেতারী ইমদাদ খাঁর ঘরাণার মন্সন খাঁর জামাতা বুদ্ধ খাঁকে, যাঁর নাম সারেঙ্গী জগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। বুদ্ধ খাঁর ঘরাণায় পাওয়া যায় ছোট্টে খাঁকে বর্তমানে এই ঘরাণায় আছেন সাগীরুদ্দীন। এ ছাড়া কিরানী ঘরানায় রহমন বক্সের এবং বনারস ঘরাণায় নাম পাওয়া যায় নবীবক্সের। বনারসের উস্তাদ গৌরীশঙ্কর মশ্বেের নামও স্মরণীয়। দিল্লীর গুলাম সবীরের নামও আমরা পাই।

পুরাতন দিনের সারেঙ্গীওয়ালার ক্ষেত্রে আমরা দিল্লীর আলিবকস্, লক্ষ্মীর হুসেন বকস্, গোয়ালীয়ারের সাবিতালি খাঁ, দোকানীর বালে আমীর খাঁর শিষ্য খুরজার খাজা বকস্ প্রভৃতির নাম পাই।

**সারিন্দা :** প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থে সারিন্দা নামে এক ধরণের ছড়ের যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সারিন্দা সেই সারিন্দারই অনুলসরণ বা পরিবর্তিত সংস্করণ। বর্তমানের সারিন্দা বা সারিন্দা একই যন্ত্র একরূপ কথাও অনেকে বলে থাকেন। এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, এমন কি বর্তমানে প্রচলিত সারেঙ্গী যন্ত্রটি থেকেও—এমন কথাও শোনা যায়। এই যন্ত্রকে অনেকে সারিন্দী বলে থাকেন। যন্ত্রটি ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়। অনেকের ধারণা, এই যন্ত্রের অনুলসরণে ও রূপ পরিবর্তনের মাঝেই সারেঙ্গী জন্ম নিয়েছে। সারেঙ্গীর মত এটিও অনুলসরণস্বরূপ গানের সহজে ব্যবহৃত হয়, এককভাবে সয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপেও একে বাজাতে শোনা যায়। যদিও এটি গ্রাম্য যন্ত্র তবুও বর্তমানে এটি সভ্য যন্ত্ররূপেই খ্যাতির পেয়ে থাকে। যন্ত্রটি একটি কাঠ থেকে তৈরী করা হয়।

বাজের কায়দা সারেঙ্গীর মতই। বর্তমানে এর প্রধান তারটি ষ্টীলের ও বাকি তিনটি তার পিজলের। বেহালার মত এই যন্ত্রে কেবলমাত্র চারটি তারই ব্যবহার করা হয়। নায়কি অর্থে প্রধান তারটি মধ্যমে ও বাকি তিনটি তার যথাক্রমে ষড়্জ, পঞ্চম ও খরজে বাঁধা হয়ে থাকে। অনেকে প্রধান অর্থে মধ্যমের তারটিতে তাঁতের তার ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে সারেঙ্গীর মত চারটি তারই তাঁতের তার রাখেন। প্রাচীনকালে এতে তাঁতের তারই ব্যবহার করা হত। এই

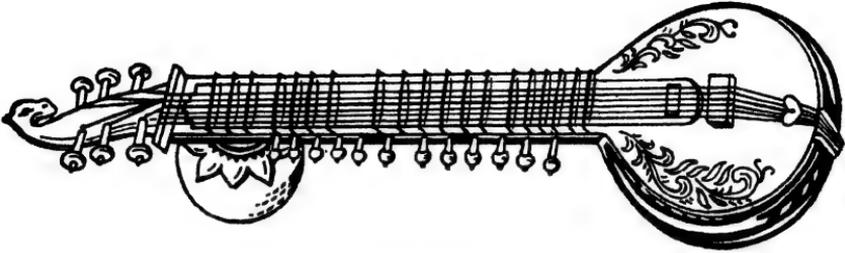


সারিঙ্গা

যন্ত্রের দানডিটা সারেঙ্গীর মত বাহুর আকারের না হয়ে বেহালার ধরণের সরু হয়ে থাকে। রাজস্থান পূর্ববঙ্গ, মণিপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সারিঙ্গার আকৃতির ও 'তার' সন্নিবেশের প্রভেদ দেখা যায়। ধ্বনিকোষের তল দেশটির মধ্যেই বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্যে আসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সারিঙ্গার ইাড়ির সওয়ারী বশানো কাঠের অংশটির মধ্যেই তফাৎ থাকে।

**সুরচয়ন বা সুরচেন :** আলাপচারীর একটি সভ্য যন্ত্র। যন্ত্রটি তুরফ ছাড়া বড় সুর বাহারের আকারের। পর্দা ও সওয়ারী দেওয়া স্বরোদের মত ভিন্নাকৃতির সুরচয়নও দেখা যায়। এই যন্ত্র জওয়া ও মিজরাব উভয়ের সাহায্যেই বাজান হত। ইং ১৮০০ সালের শেষভাগে এই যন্ত্র উদ্ভাবিত। ময়মনসিং গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্র কিশোরের ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের "তৌর্যাজিক" মাসিক পত্রিকার "সুর চয়নের কাহিনী" নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে স্বরোদী হোসেন খাঁর সৃষ্টি। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে যন্ত্রটি স্বরোদের আকারের ৮ আগাগো-৮ চর্ম আবরণহীন ফাঁপা কাঠে তৈরী হত, এবং এতে পর্দা ও সওয়ারী

ধাকতো। হুসেন খাঁ জওয়ার সাহায্যে এটি বাজাতেন এই যন্ত্র স্বরোদের মত  
কোলে নিয়ে অথবা সুরবাহারের মত বাজান হত। আবদাল্লা খাঁ এটি  
মিজরাব দিয়ে বাজাতেন। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত।



সুরবাহার

**সুরবাহার :** সুরবাহার যন্ত্রটির জন্মকাল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে। লক্ষ্মী নবাবের সভা-বীণকার পীয়ার খাঁ সাহেবের ছাত্র (তানসেনের পুত্র-বংশীয়) প্রখ্যাত বীণকার গোলাম মহম্মদ খাঁ সাহেবই এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। গোলাম মহম্মদ খাঁ তানসেনের দোহিত্র-বংশীয় বীণকার ওমরাও খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাই অনেকে মনে করেন যে ওমরাও খাঁ সাহেব এর স্রষ্টা কিন্তু আসলে গোলাম মহম্মদই এই যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন। সুরবাহারকে কেচুয়া সেতারের বৃহৎ সংস্করণ বলা চলে কারণ যন্ত্রটি অবিকল কেচুয়া সেতারের মত দেখতে, তবে সেতারের থেকে আকারে অনেক বড়। সেতারের থেকে এর আওয়াজ গভীর, দীর্ঘস্থায়ী, মধুর ও সুশ্রাব্য।

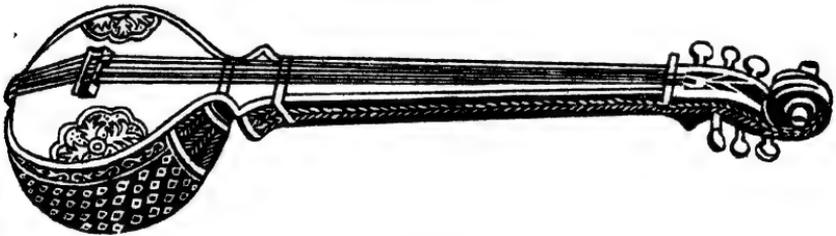
সুরবাহারের বৈশিষ্ট্য তার খাদের কাজ, বিলম্বিত মীড়, দীর্ঘস্থায়ী স্বরধ্বনির স্থিতি ও (ছয় সাত পর্দা পর্য্যন্ত) লম্বা মীড় টানার সুবিধা। সেতারের থেকে এতে আলাপ ভালভাবে করা যায়। এটিকে আলাপচারির যন্ত্র বলাই ভাল; গতকারী এতে করা হয় না। সুর বাহারেই প্রথমে তরকের তার ব্যবহার করা হয়, এবং বাঁণের মত তারপরণের কাজ চালু করা হয়। সুরবাহারের সৃষ্টির পর থেকেই সেতারে খাদের তারে আলাপ করা ও চিকারীতে ঝালা বাজান আরম্ভ হয়, আমরা সেতারের কথায় একথা বলেছি। ৩৭ পর্দা পর্য্যন্ত লম্বা মীড় ছাড়া আজকাল সেতারে সুরবাহারের প্রায় সব রকম কাজই (আদাম) করা হয়। সেই কারণে সুরবাহারের প্রচলন কমে গেছে। তা ছাড়া এই যন্ত্র প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সুরচয়ন যন্ত্রের সঙ্গে সুরবাহারের সাদৃশ্য দেখা যায়।

অতীতের নাম-করা গুণীদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের গোলাম মহম্মদের নাম করতে হয়। তার পরেই সাক্কাদ মহম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা সেতারী এমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ স্বর বাহার ভালই বাজাতেন। সেতারী মাত্রেই চেষ্টা করলে স্বরবাহার বাজাতে পারবেন, তবে স্বরবাহারের নিজস্ব বাজ বজায় রেখে দক্ষতার সহিত এর তারপরণের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে এটি বাজান কঠিন। তাই এই যন্ত্রের বাদকসংখ্যা কম।

স্বরবাহারের তারসংখ্যা, পর্দামান্বেষণ, তরকের তার, সওয়ারী, যন্ত্রধারণ ও বাদনপ্রণালী ইত্যাদি সবই সেতারের মত।

নায়কী বা প্রধান তার—ষ্টীলের—জুড়ীর তারের মধ্যমে বাঁধা হয়। জুড়ীর তার বা স্বরের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের—ইচ্ছামত স্বরে বাঁধা হয়। খাদ পঞ্চমের তার উদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়। পরজের তার উদারার বড়জে বাঁধা হয়। পঞ্চমের তার—ষ্টীলের—মুদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।

প্রধান তারের মাপ অনুযায়ীই অত্যাঁচ তারের মাপ ধরা হয়। আমাদের দেশের বাজিয়েরা তাদের ইচ্ছামত সাইজের তার লাগান। নায়কীতে কেউ ৬ নং ষ্টীল, কেউ ৫ নং, কেউ বা ৪ নং তার (বাজিয়ের বাজনার আকার, নিজের টিপ ও বাজাবার সুবিধানুযায়ী) লাগান। তাই তারের নির্দিষ্ট স্থূলত্ব দেওয়া গেল না। আমাদের সকল যন্ত্রের বেলাতেই এই একই নিয়ম। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের মাপ, তারের সাইজ প্রভৃতি সমস্ত বাজিয়ের বেলাতেই এক রকম, এমনকি স্বর মেলানও এক স্বরে। আমাদের এখানে বিশেষ বিশেষ ঘরাণার উস্তাদেরা নিজস্ব সুবিধামত তার ব্যবহার করেন।

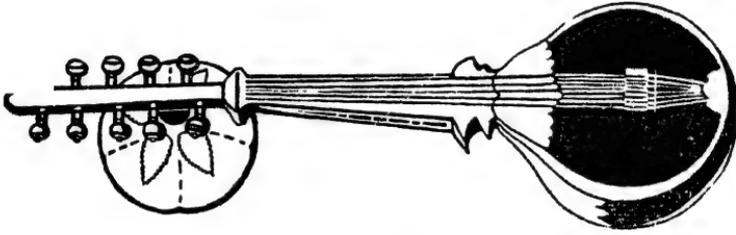


স্বরবীণ

সুরবীণা বা সুরবীণ : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরীতে সুরবীণ যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে এতে চটি তার থাকতো, কিন্তু কোন পর্দা থাকতো না। শাহিন্দাজীর লেখা

“Indian Music” গ্রন্থটিতেও সুরবীণের উল্লেখ আছে। এই পুস্তকে বলা হয়েছে : দিল্লীর ওমরাহ কালে সাহেব কতক যন্ত্রটি আবিষ্কৃত, কিন্তু এখানে আবিষ্কারের সাল তারিখ ইত্যাদি কিছুই লেখা নাই।\*

যন্ত্রটি বহুলাংশে সেতারের মতই, তবে দানড়ির পটরী অর্থাৎ মারিকা স্থানটি পাতলা ষ্টীলের পাত দিয়ে মোড়া থাকে। যন্ত্রটি জওয়ান সাহায্যে বাজান হয়। ছয়টি তারের আগা দানড়ির মুক্তপ্রান্তে রাখা ছয়টি কানের সঙ্গে ঐং হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সওয়রীর উপর দিয়ে এই ছয়টি তারের গোড়া হাঁড়ির শেষ প্রান্তে রাখা লেজাড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে। সুরবীণে পর্দা থাকে একথা অনেকে বলেন, আমাদের ধারণা এই যন্ত্রে পর্দা থাকে না। পর্দা থাকলে পটরীতে প্লেট বসানোর কোন যুক্তি নেই। যন্ত্রটি জওয়ান সাহায্যে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত, তবে কলিকাতার ষাটঘরে একটি সুরবীণ রাখা আছে।



সুরশৃঙ্খার

সুরশৃঙ্খার ॥ সুরশৃঙ্খার যন্ত্রটিকে অনেকে সুরশৃঙ্খারও বলে থাকেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় ছজু খাঁর পুত্র জাফর খাঁ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এই যন্ত্র সৃষ্টি করেন। এই ব্যাপারে একটি গল্প শোনা যায়। বেণারসের (কাশীর) রাজ-দরবারে এক সঙ্গীত সম্মেলনে খ্যাতনামা বীণকার নির্মলধার বীণা ও রবাবী জাফর খাঁর রবাব বাজনা হয়। বর্ষাকালের ভিজ্জে হাওয়ায় চান্দ্রা দেবে রবাবের আওয়াজ ঢাবঢোবে হ'য়ে যায় তাই বীণের পর রবাব বাজনা জমে না, তখন জাফর খাঁ বাজনা বন্ধ করে দিয়ে একমাস পরে বাজনা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি বেণারসের কোন কারিগর দিয়ে সুরশৃঙ্খার যন্ত্র তৈরী করান ও একমাস পরে বেণারসের রাজ-দরবারেই এই যন্ত্রে বীণ ও রবাবের

\* Surbeen was invented by Kaale Saheb, Prince of Delhi. It is like the Sitar in shape with the bars. The Surface is covered with a thin plate of steel—Indian Music—By Sahinda—London. page ৪৬.

কায়দায় আলাপ বাজিয়ে সকলকে চমক লাগিয়ে দেন। সেদিন বীণকার নির্মল-  
শা তাঁর পুত্রপ্রতিম জাফর খাঁর বাজনার তারিফ করে তাঁকে বৃকে জড়িয়ে ধরেন।  
অনেকের মতে রামপুরের নবাব সৈয়দ কালবে আলি খান বাহাদুর এই যন্ত্রের  
স্রষ্টা।<sup>১</sup> চলতি কথায় যন্ত্রটি সুরশিকার নামে পরিচিত। করম ইমাম সাহেব  
তাঁর মাদেহুল মৌসিকী গ্রন্থে **পঁয়ান্ন খাঁকে** এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলেছেন।  
সম্ভবতঃ সেই কারণেই রবাবের জায়গায় বাহাদুরহুসেন খাঁকে সুরশিকার শেখানোয়  
কোন আপত্তি ওঠেনি।

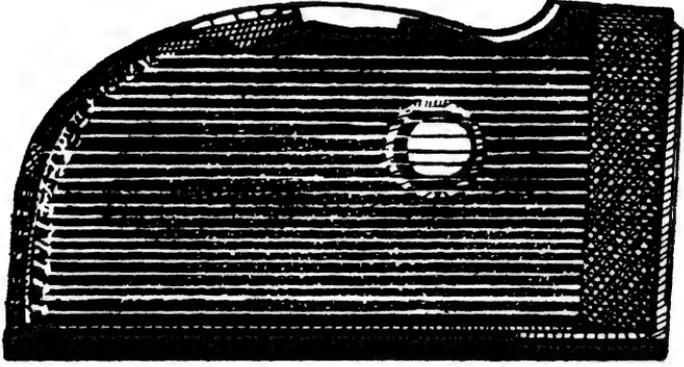
রবাবের খোল (হাঁড়) যেমন কাঠে তৈরী হয় এই যন্ত্রে তেমন লাউয়ের  
খোলায় হাঁড়ি তৈরী করা হয়। খোলের (হাঁড়ির) ওপর চামড়ার বদলে কাঠের  
তবলি দেওয়া হয় সুরবাহারের মত। পর্টার ওপর শরোদের মত লোহার অল্প-  
সমতল পাত লাগান হয়। সুরশিকার রবাব থেকে আকারে বড়, রবাব বা শরোদের  
মত এটিও পর্দাবিহীন যন্ত্র। এর খোলটি আকারে কেচুয়া সেতারের মত (লাউয়ের  
আধখানা)। এর তবলির ওপর হাতের দাঁতের, হারণের শিং-এর বা হাড়ের  
সওয়ানী থাকে। এতে ছয়গাছা তার খাটান থাকে (তিনটে লোহার আর তিনটে  
পেতলের)। হাঁড়ির শেষপ্রান্তের মধ্যস্থলে রাখা পনথিতে তারের গোড়া বেঁধে  
তবলীর ওপর রাখা সওয়ানীর ওপর দিয়ে নিয়ে এগুলি দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা  
কাণের মঞ্চে যুক্ত করা হয়। রবাবের মত এটিও কোনস্ বা জওয়া দিয়ে বাজান  
হয়। বর্তমানে ভারতে সুরশিকার বাদক নাই বললেই চলে।

রবাবের বিষয় লেখার সময় আমরা যেসব গুলীদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের  
প্রায় সকলেই সুরশিকার বাদনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সুরশিকারে আমরা ৫৬টি প্রধান তার ও দুটি চিকারীর তার দেখতে পাই।

- ১। নায়কী তার—ষ্টীলের জুড়ি স্বরের মধ্যমে বাঁধা হয়।
- ২। জুড়ির তার—(স্বরের তার)—পেতল, ষ্টীল অথবা ব্রোঞ্জের হয়  
এবং মূদারার বড়জে বাঁধা হয় (ইচ্ছামত সুরে)।
- ৩। পঞ্চমের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের তার—মূদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।
- ৪। খরঞ্জের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের তার—উদারার বড়জে বাঁধা হয়।
- ৫। খাদ পঞ্চমের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের—উদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।
- ৬, ৭। চিকারীর তার—ষ্টীলের তার—তারাগ্রামের স এ বাঁধা হয়।

**সংযোগী** ॥ সারেকীর অনুরূপ এই তত যন্ত্রটি সারেকীর মতই ছড় দিয়ে বাজান হ'ত। এটি প্রায় একশো বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটিতে সারেকীর থেকে অনেক কম সংখ্যক তারকের তার রাখা হ'ত। আকারেও সারেকীর থেকে অনেক ছোট ছিল, বর্তমানে লুপ্ত। (S. N. on H. M. Ins. By S. M. Tagore).



স্বরমণ্ডল

**স্বরমণ্ডল :** সঙ্গীতরত্নাকরের কল্লিনাথের টাকায় স্বরমণ্ডল যন্ত্রটির নাম পাওয়া যায়। এটিকে সুরমণ্ডলও বলা হয়। এর আর এক নাম সুরমঞ্জরী। স্বরমণ্ডলকে কানন যন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। একটা কাঠের বোর্ডের ফ্রেমের ওপর ২১টি তার ছোট ছোট কাণ দিয়ে বাঁধা থাকে। তারগুলি বাদক তার নিজের ইচ্ছামত তিনসপ্তকের স্বরবিভাগে রাগানুযায়ী স্বরে বেধে কোলেব ওপর আড়ভাবে ধরে আঙ্গুলের ঘা দিয়ে বাজান। আজকাল অধিকাংশ গায়কেরা তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গে স্বরের জমাটি ভাব বজায় রাখার জন্য নিজেই স্বরমণ্ডল বাজিয়ে থাকেন। ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রটি কখনও কখনও কাননের কায়দায় কোলের সামনে রেখে কাঠি দিয়েও বাজান হয়। সেক্ষেত্রে একে সস্তরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বর্তমানে প্রচলিত বিদেশী পিয়ানো<sup>১</sup> এই প্রাচীন যন্ত্রের অহুকরণেই জন্মগ্রহণ করেছে। “তন্ত্রীনামেকবিংশত্বা কীৰ্ত্তিতা মন্তকোকিলা”।<sup>২</sup> আমাদের ধারণা প্রাচীন মন্তকোকিলা বীণাই বর্তমানের স্বরমণ্ডল।

১. This instrument is forefather of modern Piano which is nothing more than an enlarged Swaramandal”.

—The Music of India by H. A. Popley Page 117.

২। সংগীত রত্নাকর-বাছাখার শ্লোক নং ১১২।

## যন্ত্রে ব্যবহার্য্য তারের মাপ অর্থে তুলনা

এই Chart-টি M/s. C. A. Wallgate & Co.-র Player Piano Accessories-এর Catalogue থেকে উদ্ধৃত। তত-যন্ত্রে আমরা যে সব তার ব্যবহার করি সেগুলির প্রকৃত মাপ কিরূপ হওয়া উচিত সেটি নীচে দেখান হয়েছে।

যন্ত্রে ব্যবহার্য্য তারের বাজার চলতি নাম	ইঞ্চি ব হিসাবে	মিলিমিটার হিসাবে	ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়্যার- গেজ হিসাবে
০০০নং ট্রিবল জিরো	০·০০৭৬	০·১৯৩	৩৬
০০নং ডবল জিরো	০·০০৮৪	০·২১৩	৩৫
০নং ওয়ান জিরো	০ ০০৯২	০·২৩৪	৩৪
১নং	০·০১০	০·২৫৪	৩৩
২নং	০ ০ ১১	০·২৭৯	৩২
৩নং	০·০১২	০·৩০৫	৩১
৪নং	০·০১৩	০·৩৩০	৩০
৫নং	০·০১৪	০·৩৫৬	২৯
৬নং	০ ০ ১৫	০·৩৮১	২৮
৭নং	০·০১৭	০·৪৩২	২৭
৮নং	০·০১৯৫	০·৪৯৫	২৫
৯নং	০·০২২	০·৫৬৯	২৪
১০নং	০·০২৫	০·৬৩৫	২৩

উপরোক্ত ফার্মের মিউজিক Wire gauge পাকা মাপের। বাজারে নানা রকমের Wire gauge ব্যবহৃত হয়, সেই সব Wire gauge-র মাপ ঠিক মত মেলে না।

## । আনন্দজাতীয় যন্ত্র

বাণ্যযন্ত্রের বিভাগ লেখার সময় আমরা তত, আনন্দ, শুধির ও ঘন এই চার রকম বাণ্য যন্ত্রের কথা লিখেছি। চর্মাচ্ছাদিত সকল প্রকার আঘাত যন্ত্রকেই আনন্দ বা বিতত যন্ত্র বলা হয়।

অগ্ৰাণ্য বাণ্যযন্ত্রের মত আনন্দ যন্ত্রগুলিও প্রধানত: পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রথম : মুদঙ্গ, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি সন্ধ্যা ;

দ্বিতীয় : ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাহির্দ্বারিক ;

তৃতীয় : মহানাগরা, জয়ঢাক, জগবাম্প প্রভৃতি সাময়িক ;

চতুর্থ : মাদল, ডুগডুগি, ডমরু প্রভৃতি গ্রাম্য ;

পঞ্চম : খোল, নাকাড়া, টিকারা, দামামা প্রভৃতি মাজল্য ;

প্রায় সমস্ত তালবাণ্যই অহংতসিক। কচিং তবলা, ঢোল প্রভৃতি কয়েকটিতে ( স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে ) লহরা বাজাতে শোনা যায়।

\* \* \* \*

**অগাধপাল :** এক প্রকার প্রাচীন চর্মাচ্ছাদিত আনন্দ যন্ত্র, বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত। আকারের পরিচয় পাওয়া যায় না।

**আঘাট বা আঘাটি :** ঋকবেদবর্ণিত একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত তালযন্ত্র। নৃত্যের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। বিদেশী ভাস্করীণ যন্ত্রের মত। আকারের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না।



ইডাক্সা

**ইডাক্সা :** ইডাক্সা যন্ত্রটিকে দক্ষিণে অনেকে উডুক্সাইও বলে থাকেন। দক্ষিণভারতের অভিনব তালবাণ্য। দেখতে ডমরুর মত হলেও এটি বাজাবার

কায়দা ভিন্ন রকমের। বাঁ হাতে বাজনার মাঝখানের টানা গুলিকে ধরে ডান হাতে সৰু কাঠি দিয়ে অথবা খালি হাতে বাজান হয়। বাঁ হাতে ধরা ছোটের টানাগুলির ওপর হাতের মুঠার চাপের কমবেশীতে আওয়াজের তারতম্য ঘটান হয়। এই বাজনার দুই মুখ ছোট বাছুরের (গো-বৎসের) চামড়ায় ছাঁওয়া হয়। ছাঁউনির দুটি পাগড়ি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে মুঠার চাপের কমবেশীতে পাগড়িতে টানের কম বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাঁউনির টানের তারতম্য ঘটে। এই তারতম্যের ফলে ধনিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়।

**উরুমি :** দক্ষিণভারতের এক প্রকার বাহির্দারিক আনন্দ যন্ত্র। ছেন্দা যন্ত্রটির কথা লেখার সময় আমরা ছেন্দা-মেলম শব্দটি ব্যবহার করেছি। দক্ষিণে যখন একটি বাণ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে অপর কয়েকটি বাণ্যযন্ত্র বৃন্দ-বাদনের মত একসঙ্গে বাজান হয়, তখন মুখ্য বাণ্যযন্ত্রটির প্রাধান্যের কারণে সেই যন্ত্রটির নামের সঙ্গে ‘মেলম’ শব্দটি যুক্ত করা হয়। এই যন্ত্রের সঙ্গে ছোট আকারের পমবাই ও ছোট আকারের নাগেশ্বরম বাজতে দেখা যায়। তিনটি বাণ্যযন্ত্রের সন্মিলিত বাণ্যবৈঠককে এক কথায় “উরুমি-মেলম” বলা হয়। উরুমি যন্ত্রটি অনেকটা বড় আকারের ডমরুর মত, মাঝখানটা কিছু সৰু, দু মাথা চওড়া, ভেতরটি ফাঁপা, কাঠের তৈরী। দু দিকের খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা। শব্দগুণমনেই উরুমি-মেলমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অত্র কোনও ক্ষেত্রে একে বাজাতে দেখা যায় না। পমবাই ও নাগেশ্বরম প্রায় সর্বত্রই আলাদা আলাদা বাজে।

**কাঠি :** পশ্চিমবঙ্গে ব্রতচারী নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে দেখা যায়। দুটি ছোট ছোট কাঠের কাঠি দু হাতে ধরে নাচের তালে তালে মগল নৃত্যের এক সঙ্গী অপর সঙ্গীর কাঠিতে ঠুকে বা নিজের দু হাতে ধরা দুটি কাঠির পরস্পরের আঘাতে অথবা মাটিতে ঠুকে তাল দিতে থাকেন। বিহার ও উড়িষ্যার কাঠি-নৃত্যেও এই ধরনের কাঠির ব্যবহার দেখা যায়। বিহারে এই কাঠির উগায় ঘুঙ্গুর বেধেও বাজান হয় এবং এই কাঠি-বাণ্যকে তারা **ভাণ্ডা** বলে থাকেন। (Folk dances of Bengal by Guru Saday Dutta—Page 119.)

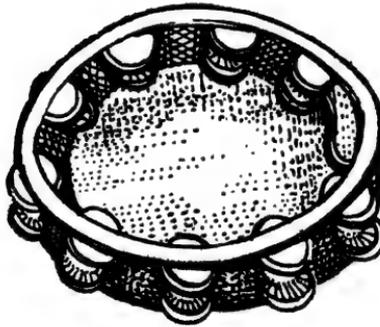
**কাড়া :** বাণ্যযন্ত্রটি আনন্দ জাতির বাহির্দারিক শ্রেণীভুক্ত। আগে যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পূজাপার্বণের শোভাযাত্রায় একে **জগবান্দ**

ও নাকারার যন্ত্রের সঙ্গে বাজাতে দেখা যেত। এর হৃদিকের মুখ নাকারার থেকে প্রশস্ত, নীচের মুখ ওপরের মুখ থেকে অপ্রশস্ত, গোলাকার ও উন্মুক্ত।



কাড়া

বড় মাপের কাড়াও দেখা যায় নাকারার থেকে কাড়ার আওয়াজ মোটা ও গভীর। দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে সামনে পেটের ওপর রেখে, দু হাতে দুটি কাঠি ধরে বাজান হয়।



কাজিরা

কাজিরা : ৮ই: থেকে ২ই: গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ সম্পূর্ণ ভাবে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুর তৈরী ছোট ছোট চাকার মত বিনবিনি থাকে, বাজাবার সময় বিনবিনিগুলি থেকেও মধুর ধ্বনি বেরোয়। এই কাজিরা কখনও কখনও ১১০ ই: থেকে ১৫ ই: ডায়ামেটারের হয়ে থাকে। বিদেশী তাম্বুরীন ( Tambourine ) যন্ত্রের মত। ঝড়টি বা হাতে ধরে ডান হাতে বাজান হয়।

**কিরিকিটি বাগম :** কাঠাল কাঠে তৈরী এক জোড়া দক্ষিণী বাগমযন্ত্র। খোলার মাঝখান ফাঁপা ও উপরি ভাগের মুখগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই



কিরিকিটি

আচ্ছাদন ছোট দিয়ে টানা থাকে। কিরিকিটি বাগম নাগেশ্বরম যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রযুগল দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। দুটি যন্ত্রের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ ডাহিনাটি চড়া স্বরে ও বাঁয়া ( বামকটি ) খাদ স্বরে বাজে।

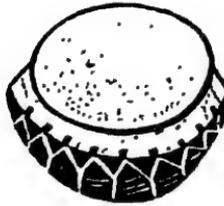


কুদামুকা

**কুদামুকা :** চর্মাচ্ছাদিত বাগ যন্ত্র, আকার পিতলের কলসির মত। কলসির খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। মুখের ঢাকা একটি লোহার বালা দিয়ে কলসির গলায় আটকান থাকে। লোহার বালাটি স্তম্ভলি দড়ি দিয়ে কলসির গায়ে টানা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এই যন্ত্রটি দক্ষিণী বাগযন্ত্র এবং দক্ষিণেশ্বর পঞ্চমুখ বাগমের সঙ্গে বাজান হয়।

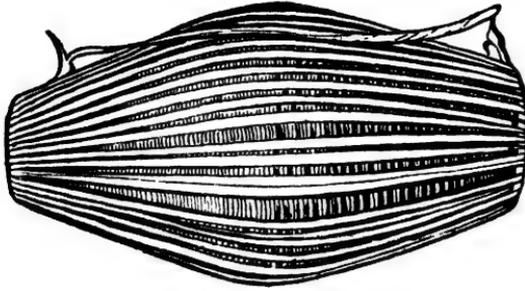
**কুড়ুকা :** ছড়ুকার মত এক রকমের দক্ষিণী যন্ত্র। হু পাশের মুখ চামড়া দিয়ে ছাঁওয়া। হু দিকের মুখের মাপ মাত আঙ্গুল। কাঠের তৈরী এক হাত লম্বা, আটাশ আঙ্গুল মোটা শরীর, ভেতরটি ফাঁপা। মুখে চামড়ার ছাউনি ও চামড়ার বেড়। বেড়ে ছটি ফুটো এবং ফুটোর মাঝ দিয়ে দড়ির ছোট। বত্রিশ গাছা স্তম্ভ দাড়ি ছোটের সঙ্গে বাঁধা থাকে। সেই দড়ি কাঁথের ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যন্ত্রটির বাঁ দিকের মুখ বাঁ হাতের কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ ডান হাতে বাজান হয়।

**খঞ্জরী :** এটিও তালবাণ্য ও গ্রাম্যযন্ত্র। খঞ্জরী উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, গুজরাট, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত। দশ ইঞ্চির মত একটা কাঠের গোল ফ্রেমের এক পাশ চামড়া দিয়ে ঢাকা এবং অপর পাশটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে। খঞ্জরী বাঁ হাতে ধরে চামড়া দিয়ে ঢাকা মুখটি ডান হাতের আঙ্গুল সোঁজা রেখে, ডান হাতের চেটো ও আঙ্গুল দিয়ে বাজান হয়। এতে কোন ধাতুর তৈরী বিনবিানি থাকে না (কাঞ্জিরার সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ)। মাঝে মাঝে বাঁ-হাতে ধরা আঙ্গুল দিয়ে চামড়ার ওপর চাপ দিয়ে আওয়াজের ভারতম্য ঘটান হয়। সব দেশেই গ্রাম্য-গীতে ও ভজনে এর ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে কচিং একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতেও দেখা যায়।



খোঁরদক ( ডাহিনা )

**খোঁরদক :** রৌশন চৌকির সঙ্গে সঙ্গতে এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এই যন্ত্রের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। বাঁয়া ও ডাহিনা দুটি যন্ত্রই একসঙ্গে জোড়ায় বাজে। এর ডাহিনাটি ছোট ও বাঁয়াটি বড়। যন্ত্রদুগল চড়াবরে বাঁধা থাকে। বাঁয়ার স্বর অপেক্ষাকৃত নীচু ও গম্ভীর। ছোট ও বড় আকারের হয়।



খোল বা শ্রীখোল

**খোল বা শ্রীখোল :** খোল আনন্দের জাতীয় অমৃগতর্সিক যন্ত্র। ভারতের পূর্বাঞ্চলেই এর জন্ম ও প্রচলন। এর আকারের সঙ্গে মৃদঙ্গের আকারের মিল দেখা যায়। মৃদঙ্গ শব্দের ধাতুগত অর্থে আমরা খোল, মাদল, পথাবজ প্রভৃতি যন্ত্রের যে কোন একটিকেই মনে করতে পারি। সংস্কৃত খু+ল থেকে খোল শব্দটির জন্ম, খোল মানে আধার, তুষ, আবরণ বা গহ্বর। খোল যন্ত্রটিকে অনেকে মৃদঙ্গ বলে থাকেন। “মুময়ং অঙ্গং যন্ত্র” অর্থে মাটিই যার অঙ্গ সেই হিসাবে খোল মৃদঙ্গ নাম পাওয়ার উপযুক্ত হলেও আমরা মৃদঙ্গ বললে পথাবজকেই বুঝি। মৃদঙ্গের সঙ্গে আকারগত মিল থাকলেও দুয়ের মধ্যে যেথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সঙ্গীত রত্নাকরে মৃদঙ্গের বর্ণনায় যে তিন রকম আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে যবাকৃতির উর্ধ্বককে দেখা যায়। উর্ধ্বকের দুমুখ খোলের থেকেও সঙ্গীত হত এবং মাটির তৈরী হত। খোল মাটির তৈরী বাণযন্ত্র থেকেই জন্ম নিয়েছে, এবং উর্ধ্বক জাতীয় যন্ত্রই এর আবিষ্কারের মূলে রয়েছে। খোলের উৎপত্তি ও নামকরণের সঠিক বিবরণ জানা যায় না।

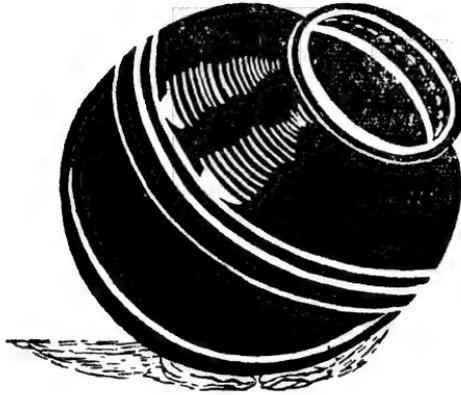
খোলের আর এক নাম মর্দল, এই মর্দলও মাটির তৈরী হত। সঙ্গীত রত্নাকরে ও সঙ্গীত দামোদরে এইরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেবলমাত্র ১৭শত খৃষ্টাব্দের ভক্তিরত্নাকারে মর্দলকে কাঠের তৈরী বলা হয়েছে। মাদলকেও মর্দল বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের শুক্কমদলম যন্ত্রটি কাঠের তৈরী এবং আকারে প্রাচীন মৃদঙ্গের মত। আমাদের ধারণা প্রাচীন মর্দলই দক্ষিণ ভারতের শুক্কমদলম। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাস্করের মাঝে বর্তমান আকারের খোল যন্ত্রটি দেখা যায় না। নরহরিকৃত পঞ্চমসার সংহিতায় দশকোশী ডাঁশপাহিড়া প্রভৃতি যে সব তালের নাম পাওয়া যায় তা থেকে আন্দাজ

করা যায়, খোলের জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এটি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল। তাই অনেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকেই খোলের আবিষ্কারক বলে থাকেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আগেও খোলের জন্ম হয়ে থাকতে পারে, আমরা তাঁকে আবিষ্কারক বলতে পারি না, তবে তান প্রধান প্রচারক ও প্রবর্তক ছিলেন একথা বলা যায়। মণিপুরে কাঠের খোলকে পুঙ্গ বা পুং (Pung) বলা হয়।

খোল প্রধানতঃ কীৰ্তনের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হলেও মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতেও ব্যবহৃত হয়। তবলা, মাদল প্রভৃতির বোলের সঙ্গে খোলের বোলের মিল নাই। খোলের বোল তার স্বকীয়তা বজায় রাখে। খোলের আওয়াজ বুন-যুক্ত হয়। খোল শ্রীহরি কীর্তনের প্রধান অঙ্গ বলে বৈষ্ণবেরা খোলকে **শ্রীখোল** বলে থাকেন। বাঙ্গলা বাজের সঙ্গে মণিপুরের খোলের বাজের স্টাইল ও বাণীর পার্থক্য আছে।

খোল বা শ্রীখোলের (হাঁড়—Body) অঙ্গটি পোড়া মাটির তৈরি। এই অঙ্গ খুব কড়া পোড়া মাটির এবং ওজনে একটু ভারী না হলে তিকমত বন্ধনে আওয়াজ পাওয়া যায় না। গম্বীর আওয়াজ পেতে হলে খোলের (পেট) মাঝবানটি মোটা হওয়া দরকার। যুদ্ধের মত এর আওয়াজ গম্বীর নয় তাই সহজেই এর আওয়াজের বৈশিষ্ট্য কানে ধরা পড়ে। প্রমাণ আকারের খোলের দৈর্ঘ্য (১১০) দেড়হাত থেকে (১৮০) পৌনে দুহাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডাহনার মুখের ব্যাস (৫১০) সাড়ে পাঁচ আঙ্গুল থেকে ছয় আঙ্গুল ও বায়ীর মুখ (১০) দশ থেকে (১১) এগার আঙ্গুল হয়। ডাহিনা ও বায়ীর মাপ উপরোক্ত মাপ থেকে ছোট বড় হলে খোলের আওয়াজ ভাল হয় না। খোলের ডাহিনা খুব চড়া থাকে তাই কাঁসর মত মস্তিষ্ক টুং টুং আওয়াজ পাওয়া যায়। বায়ীর তালি নরম রাখা হয়, যাতে বায়ীর আওয়াজ গম্বীর শোনায়। ডাহিনা ও বায়ী উভয়ের আওয়াজই জোয়ারাদার অর্থে বুনযুক্ত হওয়া দরকার। বায়ীর স্বর এমন ভাবে নাচু রাখা হয় যাতে ডাহনার চড়াগুরে আঘাতের সময় উভয়ের মিলিত স্বর একভাবেই হয়। খোলের ডাহিনা ও বায়ীর উভয় মুখেই 'খরণ' (গাব) লাগান হয়। বাঁ মুখের গাব ডান মুখ থেকে অনেক হালকা অর্থে পাতলা রাখা হয়। খোলের দুর্দিকের মুখ অর্থাৎ তালি বড় ছোট দিয়ে টান রাখা হয়। তালিতে ষোলটি ঘাট থাকে তবে ছোটো বিশেষ টান দেওয়ার জন্য কোন আঁটা বা গুল রাখা হয় না। খোলের বাজের মধ্যে তান চার ধরণের বাজের নাম শোনা

যায়। (১) সাধারণত খোলা বাজ (২) নামমালা বাজ (৩) গুপা বাজ-  
(ক) খোলা গুপা (খ) চাপা গুপা (৪) টুকী বাজ গুপা বাজেরই ভিন্ন নাম।



ঘটবাগ

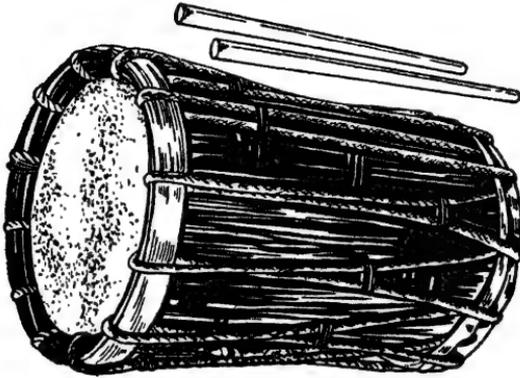
**ঘটবাগ :** ঘনঃ স্কন্ধঃ স্পন্দক্শ স্তোক বজ্জে। মহোদরঃ  
পাণিভ্যাং বাগ্গতে তজ্জঞ্জৈ-শ্চর্মনো-দ্বান নো ঘটঃ  
কথিতা পাটবর্ণা যে মর্দলে তে ঘট। মতাঃ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর ( আভেয়ার সংস্করণ ৪৭২ পৃঃ শ্লোক নং ১০৮৫ )

ভারতের এই প্রাচীন তাল-বাগ্গটি ঘটের আকৃতি। মাটির কলসীর বা হাঁড়ির মত। পেটটি মোটা ও মুখটি ছোট, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা বা খোলা থাকে। হাঁড়ি বাজনা বর্তমানে দক্ষিণভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। লেখক মাদ্রাজে থাকার সময় বহুবার ঘট বাজানো দেখবার ও শোনিবার সুযোগ পেয়েছেন। হাঁড়ি বাজানোর সময়ে হাঁড়ির মুখটি পেটের ওপর চেপে ধরে বা অনেক সময় মাটিতে উপুড় করে রেখে ও হাঁড়ির ঘাড়ের কাছে ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে বাজান হয়। সভ্যবস্তুরূপেই এটি সঙ্গীতাসরে মান পেয়ে থাকে। তবলা ও বাঁয়ার মত এটি সাথ সঙ্গতে ও জবাবে অধিতীয়। বাজনাটির ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মধুর, তবলার মতই শুনতে লাগে, এবং দু'হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের এই ঘটবাগ্গ আকারভেদে কাশ্মীরে ঘরুহা ও মধ্যপ্রদেশে মাটিকি বলে প্রচলিত আছে।

**যড়স :** হুড়ুকার অল্পরূপ বা তার রূপান্তরবিশেষ বলা চলে। বাঁদিকের মুখের বেড় দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাঝের আঙ্গুল ও কড়ে আঙ্গুলের উগায় মোহ লাগিয়ে, সেই উগা দিয়ে বাজান হয়। ডান হাতে ঘবে ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের ঘা দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত।

**চর্চরী :** এই চর্মাচ্ছাদিত বাহির্দ্বারিক যন্ত্রটি আগে পূজাপাথনে বাজতে দেখা যেত। যন্ত্রটি ছোট আকারের নাকারার মত ছিল ও কাঠি দিয়ে বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত।



ছেন্দা

**ছেন্দা :** কথাকলি নৃত্যসঙ্গীতে এই ঘাতযন্ত্রটিকে বাজতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের এই বাগ্গযন্ত্রটি আমাদের ঢোলের আকারের। যক্ষাগ্র নামক অতিপ্রিয় কর্ণাটকীয় নৃত্য-নাট্যে এই তালযন্ত্রটির বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। ছেন্দা যন্ত্রের প্রাচীণে কেলিকট্টু নামক বাজ দিয়ে কথাকলি নৃত্য আরম্ভ করা হয়। কেলিকট্টু বাজে আমাদের পথাবাজের মত একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয় যার নাম মদলম, তাছাড়া ভারী কাঁসর শ্রুতি আরও দু-একটি তালযন্ত্র এই ঐক্যতালিতে ব্যবহার করা হয়। এই বাগ্গযন্ত্রকে এক কথায় দক্ষিণী ভাষায় ছেন্দা-মেলম বলা হয়। যন্ত্রটি ঢোলের মত ঝুলিয়ে সামনে পেটের কাছে রেখে দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। আমাদের ঢোল সামনে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠের পাশ দিয়ে অথবা ঘাড়ের মাঝ দিয়ে এমন ভাবে বোলান থাকে যে বাজনাটি শোয়ান অবস্থায় দুটি খোলা মুখ উপাশে দুটি হাতের দিকে থাকে এবং তাকে দুহাতে দুটি মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়। ছেন্দা কিন্তু লম্বা ভাবে

ঝোলান কোমরের মাঝ দিয়ে দড়ি বেধে (Vertically) ঝোলান থাকে এবং তার বাঁ মুখটি ওপর দিকে রেখে একদিকের মুখেই হাতে ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়।



জগবান্ধ

**জগবান্ধ :** আনন্দের যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সামরিক ও বাহির্দ্বারিক। • যন্ত্রটি মাটির তৈরী, বাজাবার সমতল খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা থাকে ও বাঁয়ার মত চামড়ার ডুরি দিয়ে টানা থাকে। গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটি গোলাকার, নীচের দিকের গোল মুখটি ওপর দিকের মুখ থেকে আকারে কিছু অপ্রশস্ত ও উন্মুক্ত। জগবান্ধ দুইরকমের দেখা যায়। (তাসা দেখুন)



টিকারা

**টিকারা :** এটিও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, মাটির তৈরী, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা ও চামড়ার ডুরিবাঁধা থাকে। টিকারা দুই রকম—একটি মহানাপায়ার মত বড় ও

অপরটি ছোট আকারের। আগের দিনে বিবাহাদির শোভাযাত্রায় হাতি বা উটের পিঠে রেখে বড় টিকারা বাজান হত। নৌবতের সঙ্গেও একে মাটিতে রেখে বাজাতে দেখা যেত। দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। ছোট আকারের টিকারা কচিং বাজতে দেখা যায়। (নাকারা দেখুন)



ডমারম

**ডমারম :** বাঁয়ার আকারের যুগল বাণযন্ত্র। কাঠের তৈরী বাণযুগলের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ার ওপর কাঠি দিয়ে বাজান হয়। যন্ত্রযুগল দক্ষিণভারতের বাহির্দ্বারিক আনন্দযন্ত্র। একটি ষাঁড়ের পিঠে রেখে বাদক কাঠি দিয়ে বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রার আগে আগে চলেন। যন্ত্রদুটি কত প্রাচীন তা জানা যায় না, অনেকে এই যন্ত্রযুগলকে বাঁয়া-তবলার আদি-উৎস বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

**ডমরু :** এই যন্ত্রটিকে শুদ্ধ ভাষায় ডমরু বা ডম্বরু বলা হয়। যন্ত্রটি অতি প্রাচীন। দেবাদিদেব মহাদেবের নটরাজ মূর্তির হাতে এই যন্ত্র দেখা যায়। সেই কারণে মহাদেবের আর এক নাম ডম্বরুপাণি। এই যন্ত্রটি আমাদের কাছে ডুগডুগী বলেই পরিচিত। বর্তমানে বীদরনাচিয়েদের হাতে একে দেখা যায়। চীনের Tang Dynasty-র সময় (618-907 A D.) অবিকল আমাদের ডমরুর আকারের একটি যন্ত্র Tang-huang গিরিগুহায় অঙ্কিত দেখা যায়। ভারতে এই যন্ত্র আরও বহু আগে থেকে প্রচলিত। (ডমরুর ছবি পরে দেয়া হয়েছে)

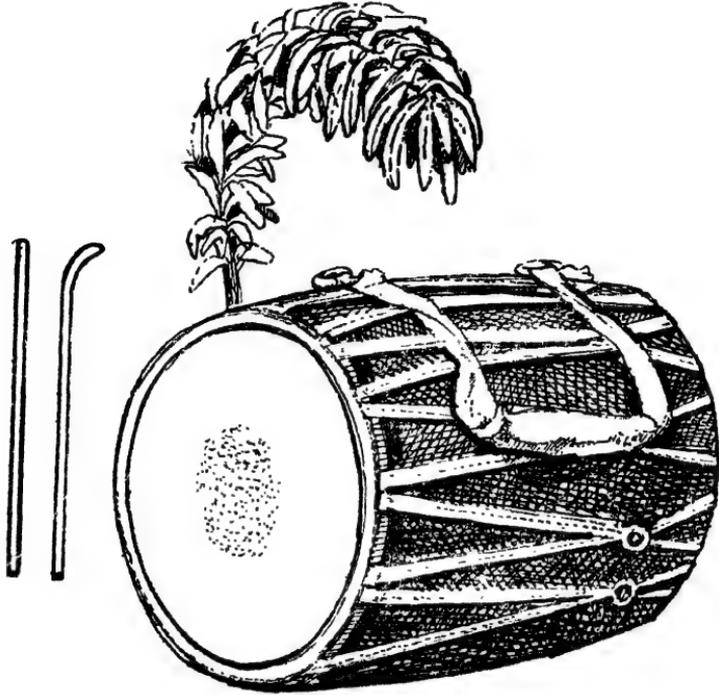
**ডাফ :** আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভজন ও অন্যান্য ভগবদবিষয়ক গানের সঙ্গে সঙ্গতে এই তালবাঁজটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় লুপ্ত।

**ডাফ :** চামড়ায় ঢাকা ছোট আকারের সাধারণ গ্রাম্য আনন্দযন্ত্র। গ্রাম্য নৃত্য ও গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ভারতে গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। কাঠ বা ধাতুর গোল ফ্রেমের একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। হাত দিয়ে বাজান হয়। বাজাবার কায়দায় ও আকারে ঝঞ্জরীর মত। ডাফ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে।

**ডোলকি :** মৃদঙ্গের অল্পরূপ ছোট আকারের যন্ত্র। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত।

**টাইস বা ঢবস :** এক হাত লম্বা উনচল্লিশ আঙ্গুল মোটা, ঘেরের মাঝখান ফাঁপা, এক ধরণের প্রাচীন চর্মবাঁজ। দুপাশে দুটি বারো আঙ্গুল ঘেরের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো। চামড়ায় সাতটি ফুটো রাখা হত, দুপাশে লতার বলয় থাকতো এবং বলয় দুটি চামড়া দিয়ে বেড় দেওয়া হত। সাতটি ফুটোর মাঝ দিয়ে দড়ি এসে চামড়ার বেড় দেয়া বলয় দুটিকে টেনে রাখতো। হুড়ুকার মতো এই বাঁজযন্ত্রটিও কাঁপ থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁ হাতে ও ডান হাতে দুটি কাঠি ধরে বাজানো হত। বর্তমানে লুপ্ত।

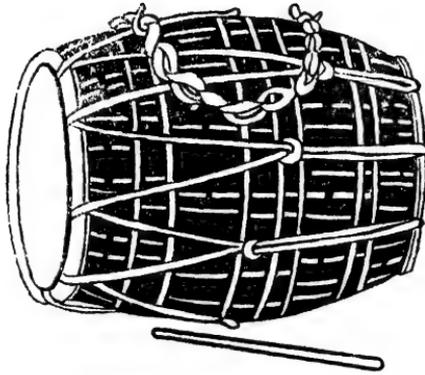
**ঢাক ও জয়ঢাক :** আনন্দযন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে ঢাক ও জয়ঢাক বাহির্দ্বারিক যন্ত্র বলেই গণ্য। পুরাকালে যুদ্ধযাত্রায় ব্যবহৃত হত বলে অনেকে একে সামরিক যন্ত্র বলে থাকেন। বর্তমানে পূজাপার্বণে বাজতে দেখা যায়। শুক ভাষায় ঢাককে **ঢক্কা** বলা হয়। অতি বৃহদাকারের ঢাককে **'জয়ঢাক'** বলা হয়। সাধারণ ঢাক থেকে জয়ঢাকের আওয়াজ গম্ভীর ও জোরদার। ঢাকের ডানমুখটাই উর্ধ্বমুখ। ঢাক মাটিতে বসিয়ে রেখে উর্ধ্বমুখে দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। দুদিকের খোলা মুখই মোটা চামড়ায় ঢাকা থাকে। দুদিকের চামড়ায় ছোট্টের টান দেওয়া থাকে। ঢাকের ওপর দিকে বাঁধারি বা বেতের ছুড়ে নানা রং-এর পাখির পালক থোকা থোকা করে বাহারের জগু সাজান থাকে। অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটি ত্রেতাযুগে রাম-রান্ধের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর পূজায়, নানা পাবণে ও চড়কে গাজনের সময় ঢাক দেখা যায়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিশরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ঢাকের অল্পরূপ একটি



ঢাক ও জয়ঢাক

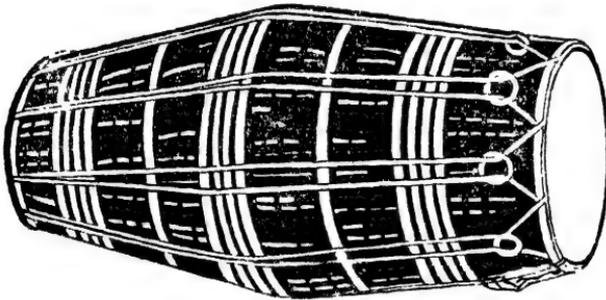
যন্ত্র পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এই কারণে এটিকে মিশর দেশের যন্ত্র বলে আমরা স্বীকার করতে অক্ষম। আমরা এটিকে একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই মনে করি।

**ঢোল :** এটিকে গ্রাম্য ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র বলা হয়। অতি পুরাতন এই আনন্দযন্ত্রটি অনেকটা ঢোলকের মত। ঢোলকের থেকে লম্বায় ছোট হলেও অল্পভাবে আকারে বড় ও পেটটি মোটা। দু'দিকের গোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। আগে বাঁদিকের মুখের ছাউনির মাঝে 'গাব' অর্থে পরলি বা খিরল দেওয়া হত, বর্তমানে কোন গাব দেওয়া হয় না। এটি কাঁধে ঝুলিয়ে সামনে পেটের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে বাজান হয়। ডান হাতে কাঁঠি দিয়ে ডান দিকের মুখ, এবং বাঁহাতে বাঁদিকের মুখ বাজান হয়। ঢোলে স্বর বাঁধার কোন ব্যবস্থা নাই একই সুরে এটি বাঁধা থাকে ও সেই সুরেই বাজে। এর সঙ্গে সঙ্গতে (মাত্রা ও লয় রাখার জন্ত) একটা কাঁসি বাজে। পূজাপার্বণে এবং



ঢোল

তরঙ্গা ও কবি পানের আসরে একে বাজতে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে ঢোল নাগেশ্বরমের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সামান্য আকারভেদে ঢোল প্রচলিত। বাজাবার কায়দা সর্বত্রই প্রায় সমান।



ঢোলক

**ঢোলক :** ঢোলক শব্দটি প্রাকৃত শব্দ। এই নামই এর প্রাচীনত্বের বড় প্রমাণ। আনন্দ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সভ্যত্বের তালিকাভুক্ত। বহুকাল পূর্বে লিডিয়া ও অ্যান্ডাল এসিরীয় দেশে অল্পরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হত। তবুও এটি একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই পরিচিত। পাঁচালি ও কবিগান প্রভৃতির সঙ্গেই বেশী বাজে। দোলের শোভাযাত্রায় ও অ্যান্ডাল উৎসবে সমবেতসঙ্গীতের সঙ্গে এবং যাত্রা ও পালাগানে এর ব্যবহার নজরে আসে। ঢোলক একখণ্ড মোটা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। এর মাঝখানটা কুঁড়ে ফাঁপা করা হয়। ঢোলের মতই হৃদিক ফাঁকা (খোলা) মুখটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এই

চামড়াগুলিতে টান রাখার জন্ত ছাঁউনির দুমুখের পাগড়ি স্ততলী দাঁড়িয়ে টেনে বাঁধা হয়। প্রয়োজন মত স্বর বাঁধার জন্ত জোড়া জোড়া দড়ির মাঝে লোহা, পেতল, তামা বা রূপার আংটা (কড়া) গলান থাকে, সেগুলি সরিয়ে স্বর বাঁধার জন্ত দড়ির ছোটে ইচ্ছামত টান করা হয়। ঢোলক বিভিন্ন আকারের (size) হয়। পথাবজের মত একেও কোলের উপর শুইয়ে খালি হাতেই দুমুখ বাজান হয়। দাক্ষিণাত্যে ছোট আকারের যে ঢোলক ব্যবহৃত হয় তাকে **ঢোলকি** বলে। দক্ষিণভারতে কিছুদিন আগে কাঁচের ঢোলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এর (Body) হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষটি ফাঁপা কাঁচের তৈরী। এগুলি "Glass Dhole" নামে পরিচিত। আমরা **শীশ-ঢোলক** বলাই পছন্দ করি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঢোলক স্বরবিণ্ডুর আকারভেদে ঢোলক নামেই প্রচলিত আছে।



তবলা ও বাঁয়া

**তবলা ও বাঁয়া :** তবলাকে শুদ্ধ ভাষায় তল-মুদঙ্গ বলা হয় ও বাঁয়াকে বলা হয় বামক অথবা বাম-মুদঙ্গ। এটি অন্তর্গত সিদ্ধ ও সভ্য যন্ত্ররূপেই পরিচিত। তবলা ডান হাতে বাজান হয় বলে এর অপর নাম ডাইনা বা ডাইনে (ডাঁয়া)। আমরা বৈদিক, পৌরাণিক ও হিন্দুযুগের নানা গ্রন্থে বহু প্রকারের চর্মাচ্ছাদিত বাস্তুর উল্লেখ দেখতে পাই। প্রাচীন গুহাতে মর্মরমূর্তির মাঝে, শিলালিপিতে, মন্দিরগাত্রে খোদাই করা চিত্রপটে নানা প্রকারের বাস্তবস্ত্রের আকৃতি দেখতে পাই; কিন্তু হিন্দুযুগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা উপরিউক্ত চিত্রাদির মাঝে তবলা বাঁয়ার আকৃতির কোন প্রতিকৃতি আমাদের নজরে আসে

না। অবশ্য দক্ষিণভারতের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে যুগল বাণ্যযন্ত্রের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। অভিধানে “তবল” এই ফার্সী শব্দের অর্থ তুন্দুভী বা নক্কারা জাতীয় যন্ত্র বলা হয়েছে এবং তবলী নামে আরবী শব্দের অর্থ “ঢোল কি তরহ বাজতা হৈ” এরূপ বলা হয়েছে। শব্দটিকে বিজ্ঞানীয় বলেই জানা যায়। কিন্তু তবুও আমাদের ধারণা যে হিন্দুযুগে এজাতীয় যন্ত্র ভারতে প্রচলিত ছিল। স্বামী পঞ্চানন্দজী ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ৩০৭ পৃঃ লিখেছেন “প্রাচীন ভারতে তবলা ও বাঁয়ার মত গানে ঢটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়”………… “তবলা ও বাঁয়ার গঠন, বাদনপদ্ধতি মুসলমান যুগে নতন রূপ গ্রহণ করতে পারে” অতএব বোঝা যায় যে অতীতে হয়ত তবলা বাঁয়ার মত কোন যন্ত্র ছিল। ডাঃ অমিয় সাত্তাল মহাশয় ভারতীয় দর্দুর যন্ত্রকে তবলা বাঁয়ার আদি উৎস বলে মাগ্ন দিচ্ছেন। ডাঃ বিমল রায় এই মতগুলি স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। তাঁর বক্তব্য—ভরতের গ্রন্থে দর্দুর দুগুণ ছিল এমন কথা কোথাও লেখা নাই। দর্দুর পনব ছাড়া অল্প কোন যন্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হয় নি, ব. উর্ধ্বকের স্থানও সে কখন গ্রহণ করে নি। দর্দুর ছিল ঘট বা ছোট কলসের মত দেখতে। তিনি ভারতের উক্তি দিয়ে নানা ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তবলা ভারতীয় কোন বাণ্যযন্ত্রের অঙ্গগ্রহণ করে নি। এটি এরোবিয়া থেকেই এসেছে। তাঁর লেখার সমগ্র সংশ্লিষ্ট বা এসম্বন্ধে অত্রান্ত গুলীরা যা লিখেছেন, বা যেগুলি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে, সে সমস্ত বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হয় নি। শ্রীযুত রবীন্দ্রকুমার বসু মহাশয় তাঁর “তবলা বিজ্ঞান ও বাণী” নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে “গৌতমবুদ্ধ পাথর কুঁদিয়ে তা থেকে একরকম বাজনা তৈরী করলেন। তাঁর নাম দিলেন ‘তবল জাং’। পঞ্জাব প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে সেটাকে বলে ‘ধামা’ বা ‘তুন্ধুড়’। এর পর আরব দেশের লোকেরা এর অনেক পরিবর্তন করেন। চম্পাপাল এবং আনন্দপালের সময় যখন তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করবার জন্য কর্ণাটকে এলেন, তখন তাঁরা তবল-জাংকে কাঠের রূপ দিয়ে তবলা নাম দিলেন। তখন বাঁয়ার রেওয়াজ হয় নি। তাঁরাই বাঁয়ার প্রচলন করেন। আর্মীর খসরু তবলার সাজ গাব ইত্যাদির রেওয়াজ করেন।”

এঁর লেখায় দেখা যায় ভারতে বৌদ্ধযুগেই প্রথমে তবলার জন্ম হয় কিন্তু আমাদের ধারণা তবলা তাঁর আগেই জন্ম নিয়েছিল, ভিন্ন নামে ও রূপে।

মুসলমান আমলে সেটি সামান্য রূপবদলে তবলা নামে আমাদের কাছে পরিচিতি পায়।

বাণবিশারদ শ্রীযুত স্ববোধ নন্দী মহাশয় লিখিত “তবলার কথা” পুস্তকের প্রথম খণ্ডে স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সম্বন্ধে বক্তব্যে লেখা আছে—“বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় গদাধর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় মুরলীধর চক্রবর্তী দিল্লীতে যান এবং প্রথমেই তিনি অচপলের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন। ইনি যখন বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন তখন আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে সদারঙ্গ কর্তৃক যখন খেয়াল গানের প্রচলন হয়, তখন ইঁহার সঙ্গে পাখোয়াজই সঙ্গত হইত, কিন্তু সদারঙ্গ যখন এই গানের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত অল্পপয়োগী বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন তাঁর শিষ্য দ্বিতীয় আমীর খসরু এই প্রকার গানের সঙ্গে সঙ্গতের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত তবলা যন্ত্রটি তিনিই সৃষ্টি করেন।” “মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় মহম্মদ শাহর সময়ে ১৭৩৮ খৃঃ রহমন্ খাঁ নামক বিখ্যাত পাখোয়াজীর পুত্র দ্বিতীয় আমীর খসরু সাহেব, সদারঙ্গের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন এবং এই খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করিবার জন্ত তিনি বর্তমান তবলা যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন।”

উপরোক্ত লেখা থেকে বোঝা যায় যে যন্ত্রটি আলাউদ্দীন গিলজীর রাজত্বকালের খামীর খসরু দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্র নয়, এটি দ্বিতীয় আমীর খসরু (১৭৩৮ খৃঃ) দ্বারা সৃষ্ট। অথচ (১৩৮০ খৃঃ) প্রথম আমীর খসরুর জীবিত কালে আমরা স্নানকলশ রচিত “সঙ্গীতোপনিষৎ সারোদ্ধার” গ্রন্থটিতে “তথৈব শ্লেচ্ছবাণ্যানি ঢোল তবল মুখানিতু” শ্লোকে শ্লেচ্ছ বাণের মধ্যে তবলা নামটি পাচ্ছি। অতএব তবলা তখন ছিল এটি ধারণা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না। আমরা বলি তবলা তখন ছিল কেবল দিল্লী, পাঞ্জাবেই নয়, ভারতের অগ্রাঞ্চ প্রদেশেও তাঁর দেখা পাওয়া যেত এবং তবলা নামেই সে পরিচিত ছিল। অতএব দ্বিতীয় আমীর খসরো বা সদারঙ্গের আগে তবলা ছিল না একথা মানা যায় না। এই বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীর নৃত্যরত গণপতিদেবের মূর্তিতে একক তবলার মত একপ্রকার যন্ত্র দেখা যায় কিন্তু দশম শতাব্দীর আগে বা পরে কোন মূর্তিতেই এ ধরণের কোন বাণ্যযন্ত্রের নমুনা আমাদের নজরে পড়ে নি। এখানেও বাঁয়া ও তবলাকে জোড়ায় দেখা যায় না। খেয়াল গানের সময় থেকে তবলার প্রসার ও প্রচার হয়েছে একথা স্বীকার করা যায়। তখনকার দিনে

রূপদ প্রবন্ধাদিতে পথাবজ্রে সঙ্গত চলতো, খ্যাল প্রভৃতি গানের মান নীচু থাকায় তবলা তার নাম প্রচারের অবকাশ পায় নি।

Salvadar Daniel লিখিত Arab Music Instruments গ্রন্থে আমরা (A-Tabal) এ-তবল নামে একজোড়া যন্ত্রের নাম পাই, দুটিই বাঁয়ার মত দেখতে, ডাহিনাটি বাঁয়ার থেকে বড়! এই এ-তবলের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের ডমারমের মিল দেখা যায়। তবে ডমারম কতদিনের প্রাচীন সেটি জানা না থাকায় আমরা সঠিকভাবে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। এ-তবল নামটির মাঝে তবল শব্দটি রয়েছে। পারস্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই যন্ত্রগুলি পারস্যের থেকে স্পেনে তথা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে আরব দেশেও চালু হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতই উচ্চমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিভূমি ছিল, একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। তাই এই যন্ত্রগুলি অতীতে ভিন্ন আকারে ভারত থেকে পারস্যে গেছিলো, একথা ভাবা খুব অসঙ্গত নয়। ল্যাটিন তবলা (Tabula) শব্দের সঙ্গে তবলা শব্দটির মিল পাওয়া যায় এবং এই ড্রামটি পূর্বদেশজাত তাও জানা যায়। ইটালির তিমপ্যানি, ফরাসির তিব্যালো ও আরবীয় এতবল শব্দ প্রভৃতির সঙ্গে তবল শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এই সব বাণ্যযন্ত্রগুলি আরবীয় এ-তবল যন্ত্রের পরের সংস্করণ। প্রাচীনকালে প্রচলিত 'সম্বল' নামক একজোড়া বাজনা থেকে তবলা এসেছে একথাও অনেকে বলে থাকেন। ঔর্ধ্বক নামে এক প্রাচীন বাণ্যযন্ত্রের চিত্র থেকে একক তবলার অকুরূপ আকৃতির সন্ধান মেলে। দুঃখের বিষয় কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এ এই সমস্ত যন্ত্রগুলির আবিষ্কারের সাল তারিখ আমাদের হাতে না থাকায় আমরা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়েরা ভারতের সিন্ধুদেশের কিয়দংশ অধিকার করে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। সেই সময় থেকেই ভারতীয় বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় বাণ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে কিন্তু এখানেও বাণ্যযন্ত্রের বিশদ ইতিহাস বা তাদের আকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ না থাকায় সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা ভারতীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশদ ভাবে অন্বেষণের অনুরোধ জানাই।

ঐতিহাসিক কোন সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় তবলার প্রবর্তন সম্বন্ধে ঘরানাদার তবলীয়াদের মুখের কথাই একমাত্র সম্বল এবং অতীতকে ত্যাগ করে

বর্তমানে প্রচলিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমরা চলতে বাধ্য হচ্ছি। এই কারণে উদ্ভাদ স্তম্ভের খাঁকেই তবলার আদি পুরুষ ও প্রচারকর্তা হিসাবে মান্য দিতে হবে। এখন তবলা ও বাঁয়ার অঙ্কের কথা বলেই তবলার কথা শেষ করছি। পরে আরও বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

**তবলার অঙ্গ :** (১) যেটি ডান হাতে বাজান হয় সেটিকে তবলা বা ডাহিনা বলা হয়, চলতি কথায় এটিকে ডাঁয়া বা ডাইনে বলে। অনেকে এটিকে তবল বলে থাকেন। হিন্দীতে একে তবলা বা তবলে ও চলতি হিন্দীতে “দাঁয়া” বলা হয়।

(ক) **খোল :** তবলার খোল বা খাদি, ( অর্থাৎ মূল কাঠামোটি=Body, যাকে স্তম্ভ ভাষায় ধ্বনিকোষ বলা হয় ), সেটি কাঠের তৈরী। হিন্দীতে পোলকে কাঠ বা লকড়ী বলা হয়। সাধারণতঃ কাঁঠাল কাঠ, শিরীষ কাঠ, আম কাঠ, খয়ের কাঠ, নিম কাঠ, বিজয়শাল ও শিশুকঠ থেকে খোল তৈরী হয়। রক্তচন্দন কাঠে খুব ভাল খোল হয়। হুমুলা ও দুপ্রাপ্য বলে কচিং চন্দনের খোলের দর্শন মেলে। খোলের ওজন, কাঠের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং খোলের মাঝখানের খালের কুঁদার ( অর্থাৎ খোলের মাঝের খালের ) ওপরই তবলার আওয়াজের ভালমন্দ নির্ভর করে।

(খ) **ছাঁউনি :** খোলের ওপর চামড়ার স্ফাচ্ছাদনকে ছাঁউনি বলে। ছাঁউনিকে স্তম্ভ ভাষায় ধ্বনি-পট্টক ও হিন্দীতে পুড়ী বলে। বাংলাতে একে **তাল** বা **তলি** বলা হয়। চাগল বা বাছুরের চামড়ায় ছাঁউনি হয়। এই ছাঁউনিতে বাজাবার তিনটি জায়গার তিনটি পৃথক নাম। ১। **কাগি** বা **কিগার** ( ছাঁউনির ধারের অংশ ) এই স্থানটিকে **চাঁটি** বা **চাঁটও** বলা হয়। বাংলাতে এটিকে **পরতাল** বা **পরতলি** বলা হয়। কিগারে অর্থাৎ তালার প্রান্তে তালার উপর একটি সরু চামড়ার ঘের থাকে, সেটিই পরতাল। অনেকে একে **পটি** বলে থাকেন। ২। **আহী** ( সিয়াহী শব্দ থেকে এসেছে ) বা **গাব**। ছাঁউনির মাঝে গোলাকার কালো যে পদার্থটি সঁটা থাকে সেটিকেই **গাব** বলা হয়। সাধু ভাষায় এটিকে **খিরগ** বলা হয়। ৩। **কাগি** ও **গাবের** মাঝে যে সাদা সমতল অংশটি দেখা যায় সেটিকে **মৈদান** অথবা **লব** বলা হয়। মৈদান শব্দটিকে বাংলায় অনেকে **ময়দান** বলেন। এই অংশটিকে বাংলাতে **সুর** বলা হয়।

(গ) **পাগড়ী :** ছাঁউনির শেষে তবলার মুখের ( কিগারে ) ধারে তবলার

ছাঁউনিকে অর্থাৎ তাল ও পরতালাকে বেঁধে টেনে রাখার জন্ত মোটা চামড়ার বিনটের বেড দেওয়া হয়। তবলার ওপর মুখের দারের এই চামড়ার বেডটিকে পগড়ী বলা হয়। হিন্দীতে এটিকে 'গজরা' বলা হয়। 'পগড়ী' শব্দটিও হিন্দী শব্দ, বাংলায় এটি পাগড়ীতে পরিণত হয়েছে। এই পাগড়ীতে ষোলটা ছেদ রাখা হয় এবং তার মাঝ দিয়ে ছোট গলিয়ে ছাঁউনিকে প্রয়োজনমত টেনে বাঁধা হয়। এক ছেদ থেকে আর এক ছেদ পবস্ত স্থানকে তবলার ঘাট বলা হয়। প্রতিটি তবলায় ষোলটি ঘাট থাকে।

(ঘ) ছোট্ট : শুক ভাষায় এগুলিকে চর্মরজ্জু বলা হয়। এর হিন্দী নাম বন্ধি। চলতি ভাষায় এগুলিকে ছোট্ট, ছড় বা ছোটা বলা হয়। তবলার ছাঁউনির থেকে তলবেড়ের সঙ্গে টেনে ছোট্ট বাঁধা হয়। ছাঁউনিতে প্রয়োজন মার্ফিক টান রাখার কারণেই ছোট্টের ব্যবহার।

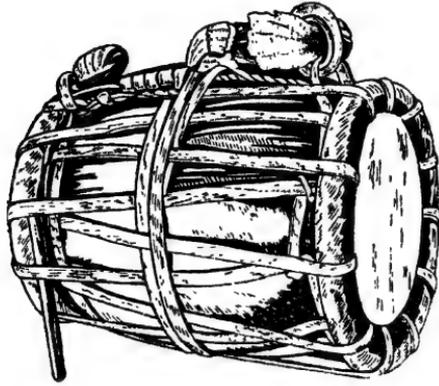
(ঙ) গুলি : খোলের ওপর চামড়ার পটির অর্থে ছোট্টের নিচে গোল গোল যে কাঠের ছোট ছোট টুকরো দেখা যায় তাদের গুলি বলা হয়। হিন্দীতে এদের গট্টা বলে। প্রতিটি তবলায় ৮টা গুলি থাকে।

(চ) গুড়রা : তবলার (খোলের নীচে) বসবার জায়গায় চামড়ার পটি দিয়ে তৈরী গোলাকার বিঁড়ের মতন বস্তুটিকে 'গুড়রা' বলা হয়। পাগড়ীর মাঝ দিয়ে ছোট্ট পরিয়ে গুড়রীর মাঝ দিয়ে গলিয়ে ছোট্টে টান রাখা হয়। আমরা বাংলায় গুড়রীর নাম তলবেড় রেখেছি।

বাঁয়ার অঙ্গ : বাঁয়ার খোল অর্থে ধ্বনিকোষটি সাধারণতঃ মাটির তৈরী হয়। বাঁয়ার খোল—কাঠ অথবা তামা, স্টীল, রূপা প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হইতে পারে। বাঁয়ার খোলকে বাংলায় হাঁড়ী ও হিন্দীতে 'কুড়া' বলা হয়। তবলার সঙ্গে বাঁয়ার সব অঙ্গই প্রায় সমান ও তাদের ডাক নামও একই। বাঁয়ার ছোট্টগুলি অনেক সময়ে স্তরলী দড়ির হয় বলে একে 'ডোরী' বলা হয় এবং ডোরীতে টান রাখার জন্ত গুলির বদলে পেতল বা লোহার আঁটা পরান থাকে। বাঁয়ার গাব একপাশে রাখা হয়। তবলার মত মাঝখানে থাকে না, বাকী সব একই প্রকার। পথাবজের আওয়াজের সঙ্গে মিল থাকলেও তবলা ও বাঁয়ার ধ্বনি তার নিজস্বত্বের দাবী রাখে। দ্বিতীয় খণ্ডে তবলার বোল ও ঘরাণা প্রভৃতির বিষয় লেখার ইচ্ছা রইলো।

ভাঙিল : দক্ষিণের বাহির্দারিক আনন্দযন্ত্র। নাগেশ্বরমের সঙ্গে বাজে। অনেকটা উত্তরভারতের ঢোলের মত। যন্ত্রটি প্রায় ১৬/১৭ ই: লম্বা ও ১৫/১৬ ই:

মোটা গোলাকার হয়। একখানা বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়। দুপাশে বেতের বা বাঁথারির বেড়ের সঙ্গে চামড়া বাঁধা থাকে। চামড়ার ছোট দিয়ে



তাবল

দুপাশের ছাউনিকে টেনে রাখা হয়। ডাকের মুখের মাপ এক। ডান দিকের মুখ ডান হাতের চেটো, আঙ্গুল ও কব্জির সাহায্যে বাজান হয় এবং বাঁ হাতের মোটা শক্ত কাঠি দিয়ে বাজান হয়।



তাসা



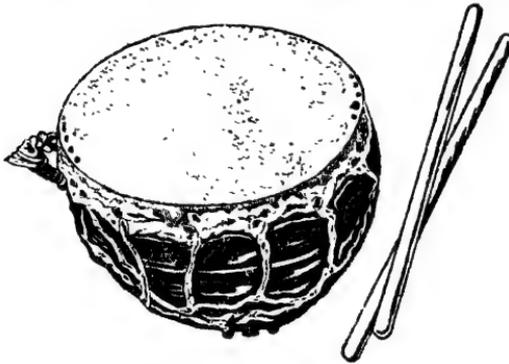
বড় তাসা বা ঝগঝগ

তাসাঃ এটি সাময়িক ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্রের কোঠায় পড়ে। এটি ঝগঝগের সঙ্গে জুড়িতে বাজান হয়। কাড়া ও তাসা দেখতে প্রায় একই রকম তবে তাসা আকারে ছোট। মাটির তৈরী, এর চামড়ার ছাউনি খুব মোটা।

হয়। বিবাহে, বরাহুগমন-শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার। বর্তমানে বড় ড্রামের সঙ্গে একে কোন কোন শোভাযাত্রায় বাজতে দেখা যায়। বাংলাদেশে শারদীয় পূজার সময়ে এটি ঢাক ঢোলের সঙ্গেও বাজে। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই তাসা সামান্য আকারভেদে প্রচলিত আছে। বৃহদাকার তাসাকে অনেকে জগন্মশ্প বলেন। অধিকাংশ তাসার তলদেশ ফাঁকা থাকে।

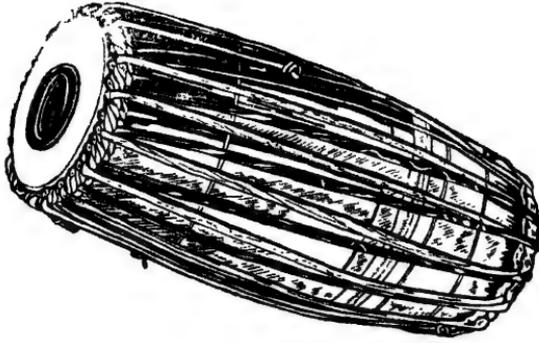
**তিমিলা বা থিমিলা :** তিমিলা দক্ষিণ ভারতের আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। ২।২।০ ফুট লম্বা ডমরুর আকারের এক ধরণের যন্ত্র। সাধারণতঃ দক্ষিণের কেরালা অঞ্চলের মন্দিরে পূজাপার্বণের সময় বাজে। একটা বড় কাঠ ফাঁপা করে কুঁদে ঘনুটি তৈরী করা হয়। ছুদিকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বাঁ কাঁধের ওপর থেকে একপেশে করে ঝুলিয়ে রেখে ওপরের মুখ দুহাত দিয়ে বাজান হয় অথবা কোমরে বেঁধে সামনে ঝুলিয়ে এক মুখ ( ওপরের মুখ ) দুহাত দিয়ে বাজান হয়।

**তুম্বকনারি :** চর্মাচ্ছাদিত এক প্রকার বাগ্গযন্ত্র। গ্রাম্য সঙ্গীতেই এর ব্যবহার। লম্বা ঘাড়ওয়ালা কলসির মত এই যন্ত্রটির মুখে চামড়া ঢাকা দেওয়া থাকে। যন্ত্রটিকে বাঁদিকের কোলের ওপর রেখে অথবা বাঁদিকের বগলে চেপে ধরে বাজাতে দেখা যায়। ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলেই এটি বিশেষভাবে প্রচলিত।



দামামা, দগড়া বা ডকা

**দগড়া :** দামামার আকারের চর্মাচ্ছাদিত আঘাতযন্ত্র। যন্ত্রটি কাঠ বা মাটি থেকে তৈরী হয়। মোটা কাঠ দিয়ে চামড়ার ঢাকার ওপর ঘা ঘেয়ে বাজান হয়। এর আওয়াজ জোরদার, যন্ত্রটি বহির্দ্বারিক। প্রদেশ বিশেষে এটিকে ডকাও বলা হয়।

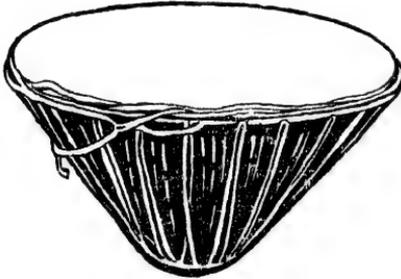


দক্ষিণী মৃদঙ্গ

**দক্ষিণী মৃদঙ্গ :** দক্ষিণে যে তিনটি বাগ্গযন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ( বাগ্গত্রয়ম্ : বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ ) তার মধ্যে মৃদঙ্গ অন্যতম । এই মৃদঙ্গকে দক্ষিণীরা মন্দলম বলে থাকেন । আমাদের মৃদঙ্গের মত দুই প্রান্তের খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা থাকে এবং ডানদিকের মুখে স্থায়ীভাবে গাব লাগান থাকে । বাজাবার সময় বাঁদিকের মুখে আটা বা স্ফজি মেখে তাল করে অস্থায়ীভাবে গাব লাগান হয় । এতে আওয়াজ গভীর শোনায় । কাঁঠাল কাঠ (Jack Wood), রক্তচন্দন বা লাল কাঠ ( Red Sandal Wood & Red Wood or Alomgium decapatum ) বা নিম কাঠ ( Margosa Wood ), নারিকেল কাঠ ও তাল কাঠের মাঝ ( Coconut tree core or Palm tree core ) প্রভৃতি থেকে তৈরী করা হয় । দক্ষিণীদের ধারণা মন্দিরের আশেপাশের গাছের কাঠে যন্ত্র তৈরী করলে আওয়াজ ভাল হয় । কারণ মন্দিরের আরতি বা উৎসবাদিতে বাদিত বাগ্গযন্ত্রের তরঙ্গে ঐ গাছের কাঠগুলি শব্দসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ও তাদের আশের মাঝে ধ্বনিকোষ গড়ে ওঠা সম্ভব । তাই মন্দিরের সন্নিকটের গাছগুলির কাঠই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় । দক্ষিণী মৃদঙ্গের ডানদিকের মুখ ৬৫" থেকে ৭" ই: পর্যন্ত, বাঁদিক থেকে ৩" ই: পরিমাণ ছোট হয় । বাঁদিকের মুখ ৬৪" থেকে ৭৩" পর্যন্ত । লম্বায় ২২" ই: ২৪" ই: পর্যন্ত হয় । চড়ার স্বরের মৃদঙ্গ ২২" ই: ও খাদের জগ্গ ২৪" ই: সাইজের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে । উত্তর ভারতের মতই হুপাশের মুখের চা.ড়া ছোট্ট দিয়ে টানা থাকে, তবে কোন গুলি থাকে না । কাণিতে ঘা মেরে সুর বাঁধা হয় । প্রাচীন কালে উত্তরের মৃদঙ্গেও কোন গুলি ব্যবহার করা হত না । দক্ষিণী মৃদঙ্গ

উত্তরের পথাবজ থেকে ছোট। বাদনপদ্ধতিরও প্রভেদ আছে। দক্ষিণের বাঁয়া আঙ্গুল মুড়ে বাজান হয়; উত্তরে হাত খুলে সোজা রেখে বাজান হয়। বিস্তৃতির ভয়ে তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

**দামামা :** দামামা দেখতে টিকারার মত, মুখটা আরও চওড়া ও চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। দামামার আর এক নাম দগড়া। এর শরীরও মাটির তৈরী। আগে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। কিছুদিন আগেও নানা শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার নজরে পড়তো, এবং সঙ্গে জোড়ে কখনও কখনও টিকারাকেও বাজতে দেখা যেত। হাতে দুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। আজ এর দর্শন মেলা ভার। (দগড়া দেখুন)



নাগারা বা নাকারা



নাকারা বা নাগারার প্রকারভেদ

**নাকারা ও নাগারা :** নাকারাকে শুধু ভাষায় অনেকে হৃন্দুভি বলে থাকেন। শাস্ত্রে আমরা আর এক প্রকারের হৃন্দুভির কথা জানতে পারি, (হৃন্দুভির ব্যাখ্যা দেখুন)। প্রাচীন কালের ভেরী প্রভৃতি বাগ্বস্ত্র থেকেই এর জন্ম। নাকারা বহু প্রকারের দেখা যায়। শানায়ের সঙ্গে একে জোড়ায় (একটি বড় ও একটি ছোট আকারের) এখনও বাজতে দেখা যায়। বৃহদাকারের নাকারাকে মহানাগারা বলা হয়। মহানাগারার মত দেখতে—“ধাউসি” নামেও একজাতীয় যন্ত্র আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল। সেগুলি অস্বারোহী সৈনিকেরা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য যে এটি অস্থপৃষ্ঠেই বচন করা হত। দক্ষিণ ভারতেও আমরা নাকারা যন্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাই। ছোট নাকারা গলায় ঝুলিয়ে পেটের ওপর দামনে রেখে দুই হাতে জট কাঠি দিয়ে বাজান হয়। মন্দিরের দ্বারে রাখা মহানাগারাগুলিকে পূজা ও আরতির সময় বাজতে দেখা যায়! ত্রুণো বচ্ছর আগে নাকারাকে যুদ্ধের সময় বা রাজা মহারাজাদের শিকারে বেরোবার সময় অস্ত্রা

যন্ত্রের সহযোগে বাজতে দেখা যেত, বর্তমানে এর ব্যবহার কম। নাকারা ও নাগারা এই দুটি যন্ত্রের পৃথক ছবি থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে নাকারা ও নাগারা এই দুটি অবয়বভেদে কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল, যদিও উভয়ের বাজের কায়দা

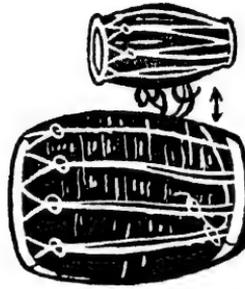


মহা নাগারা

একই রকম। একথাও ভাবা যায় যে দেশ ও কালভেদে যন্ত্রটি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। আকবর বাদশাহের নৌবতে বিশ জোড়া নাকারা রাখা হত বলে জানা যায়।

**পটহ :** আগের দিনে পটহকে অড্ডাবৎ বলা হত। মার্গ বাণযন্ত্রের মধ্যে একে ধরা গেলেও প্রাচীন দেশী বাণযন্ত্রের তালিকায়ও এর নাম পাওয়া যায়। বাজনাটি খয়ের কাঠের তৈরী হত। মার্গজাতীয় পটহ আড়াই হাত এবং দেশী আধ হাত লম্বা হত বলে জানা যায়। মার্গজাতীয়ের পরিধি ৬০ আঙ্গুল বলা হয়েছে কিন্তু দেশীর পরিধির কোন মাপ নাই। মার্গজাতীয়ের ডানদিকের মুখ সাড়ে এগারো আঙ্গুল, বাঁ মুখ সাড়ে দশ আঙ্গুল হত। দেশীর ডান মুখ সাত আঙ্গুল ও বাঁ মুখ সাড়ে ছয় আঙ্গুল হত। পটহের উভয় মুখ লোমণ্ডলা (আলাতলি) চামড়ায় ছাঁওয়া হত। চামড়ায় সাতটি ফুটো থাকতো এবং ধাতুর তৈরী চার আঙ্গুল বড় সাতটি ধাতুর কলসের আকারের দোলনা ফুটোর মাঝ দিয়ে ঝোলান থাকতো। ডান মুখের বেড়ে লোহার বলয় অর্ধে ঘের ও বাঁ মুখে লতার বলয় থাকতো। বাঁ মুখের চার আঙ্গুল নীচে তিন আঙ্গুল চওড়া আর একটি লোহার পাতের বেড় থাকতো। বাঁ দিকের মুখের দড়ির

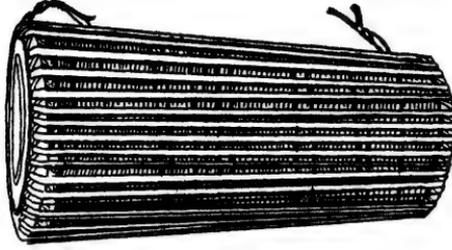
টানাগুলো লোহার পাতের মাঝ দিয়ে এসে ডান মুখের বলয়কে টেনে রাখতো। যন্ত্রটি আঠার আঙ্গুল লম্বা হত মাঝখান মোটা ও ডগা-বেঁকা কাঠি দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হত। কখনও কখনও কাঠির সঙ্গে বাজাবার জন্তে হাতকেও ব্যবহার করা হত। তখনকার দিনের নাটকে এই বাজনা ব্যবহৃত হত। এর ডান মুখে দেং ও বাঁ মুখে ঝেং ধ্বনি প্রকাশিত হত। অনেকটা ঘট বাজনার মতই বাজতো। বর্তমানে লুপ্ত।



পশাই বা জোড়ঘাই

**পশাই ও জোড়ঘাই :** উত্তর ভারতের জোড়ঘাইকে ঢোল-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। জোড়ঘাই যন্ত্রটি আজ লুপ্ত। ছোট আকারের ঢোলের উপর তদপেক্ষা ছোট আকারের আর একটি ঢোল জোড়া থাকে। ছোটটি চড়া স্বরে ও বড়টি খাদে অর্থাৎ নীচ স্বরে বেঁধে বাজান হয়। বাজনাটি গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। দু'মুখেই বাজে। কাঠের ফাঁপা বাজনাটির ছদ্দিকের খোলামুখই চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বাঁ দিকের মুখ কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের পশাই যন্ত্রটিও একই প্রকার আকারের একজোড়া ঢোলকের মত। ১।১।০ ফুট মাপের দুটি খোল, দুটি খোলেই ছদ্দিকের খোলামুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা। একটির ওপরে একটি বঁধা থাকে, ওপরের খোলটি পেতলের এবং নীচের খোলটি কাঠের তৈরী। বাঁ দিকের মুখ হাত দিয়ে ও ডান দিকের মুখ কাঠি দিয়ে বাজান হয়। চামড়ার ছাঁউনিগুলি স্তন্য দিয়ে টানা থাকে। কোথাও কোথাও দুটি খোলই পেতলের তৈরী হয়। গ্রাম্য নাটকে ও প্রাকৃত দেবদেবীর পূজায় এদের বাজতে দেখা যায়। সাধারণতঃ একে কোমরের সঙ্গে বেঁধে বাজান হয়। **উত্তরের জোড়ঘাই ও দক্ষিণের পশাই** সদৃশ ও সমক্রিয়।

**মর্দল :** একপ্রকার প্রাচীন চর্মাচ্ছাদিত বাণ্য। বর্তমানে প্রচলিত মাদল-সদৃশ বলিয়া পশ্চিমেরা অনুমান করেন। এই যন্ত্র মাটির তৈরী। গোলাকার ফাঁপা হাঁড়ির ছপাশের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো। বাম মুখ ১০ আঙ্গুল, ও ডান মুখ ১২ আঙ্গুল থাকতো। বর্তমানে লুপ্ত। সঙ্গীত রত্নাকর মতে একপ্রকার মৃদঙ্গ।



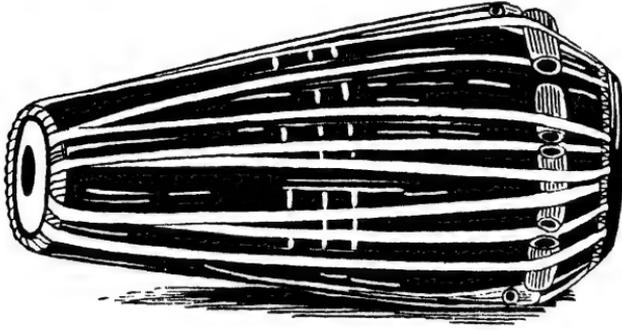
মাদল

**মাদল :** শ্রীখোলকে যেমন মুরজ, মর্দল বা মৃদঙ্গ বলা হয়, শুদ্ধ ভাষায় মাদলকেও তেমনি মুরজ বা মর্দল বলা হয়। মর্দল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এটি অতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র। মাদল কাঠের তৈরী, এর দুদিকের উন্মুক্ত মুখের পরিধি প্রায় একরকমই, বা মুখটি সামান্য কিছু বড় আকারের হয়। মাটির তৈরী মাদলও দেখা যায়। তোলক ও পথাবজ প্রভৃতির মত যেগুলি কাঠের তৈরী তাদের ভিতরটি কাঠ কুঁদে ফাঁপা রাখা হয়। দুদিকের উন্মুক্ত মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বা দিকে চর্মাচ্ছাদনীতে বোহন অর্থে খরলি ( গাব ) লাগাবার রীতি আছে, কিন্তু সপ মাদলে গাব দেখা যায় না। সমস্ত খোলটি চামড়ার বেড় দেওয়া থাকে। ছপাশের চর্মাচ্ছাদনীই ছোট দিয়ে টান করে বাঁধা থাকে। সাধারণতঃ সাঁওতাল, কোল, ভীলজাতীয় লোকদের নৃত্যের ও গীতের সঙ্গে বেজে থাকে। বাংলা দেশের বিভিন্ন উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যে মাদল বাজতে দেখা যায়।

**মুরজ :** একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাণ্য। বাম মুখ আট আঙ্গুল ও ডান মুখ সাত আঙ্গুল ছিল বলে জানা যায়। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত। কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

**মৃদঙ্গ বা পথাবজ :** “মৃদয়ং অঙ্গং যন্ত্র স মৃদঙ্গঃ”—মাটি যার অঙ্গ সেই মৃদঙ্গ—অর্থে যন্ত্রটি মাটির তৈরী। পৌরাণিক কাহিনীতে শোনা যায়, মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করার পর, ভগবান ব্রহ্মা সেই অসুরের রক্তেভেজা মাটিতে মৃদঙ্গের খোল ( Body ) তৈরী করেন, অসুরের ( চর্ম ) চামড়া দিয়ে

হুমুখের ছাঁউনি, শিরা থেকে ডুরি ( অর্থে ছোট ) এবং হাড় কেটে মৃদঙ্গের গুলি তৈরী করেন। পরে অক্ষুরবিজয়ী মহাদেবের নৃত্যের সঙ্গে তাল রাখার জন্য তিনি গণেশকে মৃদঙ্গ শিক্ষা দেন ও তাঁকে দেবাদিদেবের নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে বলেন।



বর্তমান মৃদঙ্গ বা পঞ্চাবজ

অনেকের ধারণা যে মাটির মৃদঙ্গ দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে কাঠের তৈরী হতে থাকে। শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ের ১৩নং শ্লোকে আমরা “ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেধ্যাশ্চ পণবানক গোমুখাঃ” এই ছত্রে নানা বাজযন্ত্রের উল্লেখের মধ্যে পণব নামটি দেখতে পাচ্ছি। গীতার ব্যাখ্যাকারেরা পণব শব্দটির অর্থ মৃদঙ্গ বলেছেন। আমরা মহাভারতের বিরাটপর্বে “পণবাদিকাশ্চ তথৈব বাত্যানি চ বংশশকাঃ” শ্লোকেও পণব নামক বাজটিকে দেখতে পাচ্ছি ও বাজটি রণবাছ হিসাবে ব্যবহৃত হত সেটাও জানতে পাচ্ছি। পণবকে যদিও অনেকে মৃদঙ্গ মনে করেন, কিন্তু আসলে পণব যন্ত্রটি মৃদঙ্গের মত ছিল না। অনেকের ধারণা মৃদঙ্গ তখন পণব নামে প্রচলিত ছিল। আমাদের দৃঢ় ধারণা পণব এক ভিন্ন আকারের যন্ত্র ছিল। যদিও তখনকার দিনে এক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা পাণব ঋষির নামে প্রচলিত একটি গল্প শুনতে পাই। একদিন এক হ্রদে পাণব ঋষি স্নান করতে যান, এমন সময় বৃষ্টি আসে, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা হ্রদের জলে পড়তে থাকে, বৃষ্টির প্রবলতার তারতম্যে সরোবরে পড়া জলের শব্দের তারতম্য ঘটে। এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য তাঁকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এই শব্দকে রূপ দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে যান ও এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। ধ্যানে তিনি একপ্রকার যন্ত্রের রূপ দেখতে পান। তখন তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করেন এবং ধ্যানে পাওয়া যন্ত্রটির রূপ ও শব্দবৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি যন্ত্র নির্মাণ

করান। পাণব ঋষির পরিকল্পনায় প্রস্তুত করা হয় বলে যজ্ঞটির নাম রাখা হয় পণব। এই কাহিনীটি মৃদঙ্গের আদি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।\* অনেকে মনে করেন যে পণব যজ্ঞটি মৃদঙ্গের অতীতরূপ ছিল তাই এই কাহিনী। এই ধরণের কিংবদন্তিতে যে ইতিহাস লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় সেগুলিকে অনেক সময় সত্য ঘটনা বলে মাথা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোনটি যে প্রক্ষিপ্ত তা বোঝা কঠিন, তাই সেদিনের লোকশ্রুতিতে আমরা সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি না, যদিও অতীত দিনের অনেক ইতিহাসই গল্পচ্ছলে আমাদের মাঝে শ্রুতির মাধ্যমেই স্থান পেয়েছে।

অপর এক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা বাণাসুরের নাম পাই, যিনি শিবের বরে হাজার হাত পেয়েছিলেন। তিনি হাজার হাতে মৃদঙ্গ বাজাতেন। এক ভাষণ যুগে তাঁর সমস্ত হাতই কাটা যায়। শিবভক্ত বাণাসুর তখন পুনরায় ষড়পার্শ্বের সাধনায় মগ্ন হন। তাঁর সাধনায় শিবঠাকুর সন্তুষ্ট হলে তিনি মাত্র দুটি হাত ফিরে পাবার প্রার্থনা জানান এবং বলেন তিনি কেবলমাত্র মৃদঙ্গবাদন দ্বারা তাঁর পূজা করার জন্মই এই হাত দুটি প্রার্থনা করছেন। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটি হাত ফিরে পাবার বর দেন। অম্বররাজ তখনই অপূর্ব মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন এবং এই বাজনার মাধ্যমেই তিনি শিবের আরাধনা করতেন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আমরা মৃদঙ্গের প্রচলন বেশী দেখতে পাই। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫শ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের সময়েও এর নাম পাওয়া যায়। নাট্যাশাস্ত্রকার ভারতের লেখায় দেখা যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি মৃদঙ্গের অঙ্কনরূপে পুংকরাদি যন্ত্র সৃষ্টি করিয়েছিলেন এবং ভারতের জন্মের পূর্বে থেকেই যে যজ্ঞটি প্রচলিত ছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়। মৃদঙ্গে বোহন অথবা পাব লাগাবার পদ্ধতিতে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং যতদূর সম্ভব কাঠের মৃদঙ্গ তার আবিষ্কৃত। মৃদঙ্গের তিন রকম রূপের কথা নাট্যাশাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং যজ্ঞটি মাটির তৈরী ছিল জানা যায়। সেখানে অংকিকাকে হরিতকির মত, উর্ধ্বককে যবের মত (অর্থাৎ চুম্বক বর্তমান খোলার থেকে সরু) এবং আলিঙ্গ্যকে গোপুচ্ছের মত বলা হয়েছে (একমুখ বেশী বড় ও অপর দিকের মুখ সরু)। সঙ্গীত রত্নাকরের ৩য় খণ্ডের বাণাধ্যায় শার্ঙ্গদেব চরিতকার আকারের

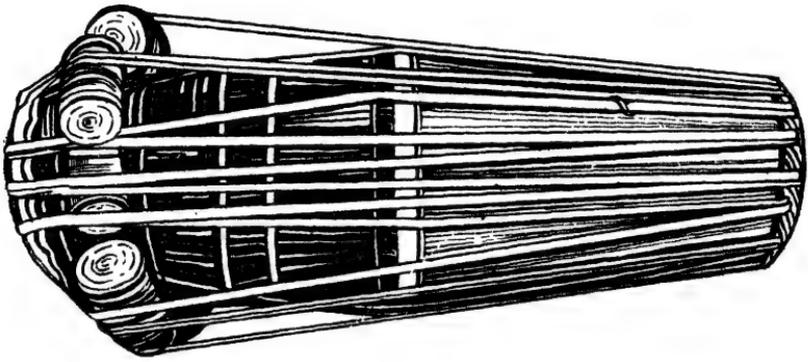
\* কাহিনীটি ভারতের নাট্যাশাস্ত্রে আছে, কিন্তু সেখানে পাণবের পরিবর্তে স্বাতির নাম দেখা যায়।

কথায় বলেছেন লম্বায় ২১ আঙ্গুল, বাদিকের মুখ ১৪ আঙ্গুল ও ডানদিকের ১৩ আঙ্গুল এবং যন্ত্রটি কাঠের তৈরী। রক্তচন্দনের মৃদঙ্গের কথায় লম্বা ৩০ আঙ্গুল, বাঁমুখ ১২ আঙ্গুল, ডান ১১ই আঙ্গুল ইত্যাদি। এখানে বর্তমান পথাবজের সঙ্গে এর মাপের কিছু মিল দেখা যায়। নাট্যকার ভরত মৃদঙ্গকে **ভাণ্ডবাণ** বলেছেন— গঠন ও নির্মাণ প্রণালীর কথায় বলেছেন—আলিঙ্গ্য গোপুচ্ছের মত গঠনাবশ্যে, বাঁমুখ ১৩।১৪ আঙ্গুল, ডানমুখ তার কিছু কম (রত্নাকরের সঙ্গে মিল আছে) মধ্যদেশ পুথুল (মোটা) ও চার দিকে চার আঙ্গুল পরিমিত গোলাকার গুল্মস্বতের সঙ্গে সংযুক্ত। এই আলিঙ্গ্যই মৃদঙ্গ ছিল অনেকে এরূপও বলে থাকেন।

পথাবজীদের ঘরে পঞ্চমুখী পথাবজের নাম শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে এই ধরণের পথাবজের বা মৃদঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় না। মোগল যুগে “**আওয়াজ**” নামে একটি বাণ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি দেখতে পথাবজের মতই ছিল, তবে আকারে কিছু ছোট।

প্রাচীন মৃদঙ্গ থেকেই বর্তমান পথাবজ এসেছে, এটি এরোবিয়া বা পারস্য থেকে আমদানী করা হয় নি এবং আমার খুশরো এর আবিষ্কারক নয়। ফার্সী ভাষায় পথাবজকে **ভুরঙ্গ** বলে। পক্ষ অর্থে পাকা এবং আওয়াজ অর্থে ধ্বনি অথবা পাক অর্থে পাবত্র ও আওয়াজ অর্থে ধ্বনি এই ভাবে পাবত্র ধ্বনিরূপক বলেই যন্ত্রটির নাম পাথোয়াজ হয়েছে এরূপও বলা হয়। বাখাখাগুলি যথাযথ না হলেও প্রায়শঃ এরূপ অর্থ শোনা যায়। আমাদের ধারণা, পথাবজ এই হিন্দী শব্দটি বাংলায় পাথোয়াজ শব্দে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে মৃদঙ্গ কবে, কোথা থেকে, কী ভাবে পথাবজ নামটি পেলো? আমরা পনেরশো শতাব্দীর আগে কোথাও পথাবজ শব্দটি পাই না। তেরশো শতাব্দীতে পার্শ্বদেবের কালে জৈনদের স্থানান্তর সূত্রে আনন্দ জাতীয় বাণ্য-সঙ্গীতের তালিকায় **পুখারগায়া** (Pukharagaya) নামে বাণ্যযন্ত্রের সন্ধান পাই এবং এর পরবর্তী কালে ১৪০৬ খৃঃ সত্যস্বরদলীয় জৈন সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বধাকলশ রচিত “সঙ্গীতোপনিষৎ সারোদার” নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে পটহকে আউজ বলা হত। এই পুস্তকেই আমরা প্রথমে “পথাউজ” শব্দটি পাই। তা ছাড়া, সঙ্গীত রত্নাকরের বাণ্যধায়ে দেখতে পাই যে প্রায় সমস্ত রকমের আনন্দ যন্ত্রকেই “আবজ” (অপভ্রংশে আউজ শব্দটি এসেছে) বলা হত। পুখারগায়া নামটি আমরা আগেই পেয়েছি, এখন পুখারগায়ার “পুখা” শব্দটির সাহিত্য যদি “আবজ” কথাটি যুক্ত করা যায় তবে পুখা + আবজ পুখাবজ এবং তারই অপভ্রংশে হিন্দী শব্দ পথাবজ

জন্ম নিয়েছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। তাছাড়া পথাউজ থেকে পথাবজ শব্দটি এনেছে একথাও সহজেই ভাবা যায়। আমরা মুসলিম যুগের গ্রন্থেই পথাবজ শব্দটি প্রথমে দেখতে পাই। প্রাচীনকালে পথাবজে আটার গাব মাঝে মাঝে দেওয়া হত, দেবতে শ্রীখোলের মত ছিল, ছোটের টান রাখা হত, কিন্তু গুলি ছিল না। মুসলিম যুগে এতে গাব দেওয়ার রীতির পরিবর্তন ঘটলো, ও ছোট টান রাখার জন্ম আটটি কাঠের গুলি ব্যবহৃত হল। এই ভাবে প্রাচীন মৃদঙ্গ বর্তমানের পথাবজে পরিণত হল। পথাবজ রূপদাক্ষীয় গানের সঙ্গে সঙ্গতই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বারানসীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা ও



মহামৃদঙ্গ

আরম্ভের সময় মৃদঙ্গ বাজান হয়। বৃহদাকারের পথাবজ বা মৃদঙ্গকে **মহামৃদঙ্গ** বলে। ঐক্যতান বাদনেও এর ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণভারতে প্রচলিত মৃদঙ্গের সঙ্গে আমাদের অধুনা-প্রচলিত পথাবজের কিছু প্রভেদ আছে। উত্তরের পথাবজ দক্ষিণের মৃদঙ্গের তুলনায় অনেক বড়; বাদন-পদ্ধতির প্রভেদও নজবে পড়ার মত। আমাদের পথাবজে বাদিকে ময়দার অস্থায়ী গাব লাগিয়ে হাত খুলে আঙ্গুল সোজা রেখে বাজান হয় কিন্তু দক্ষিণের বাঁয়া, বাঁ হাতের আঙ্গুল মুড়ে বাজান হয়। বিস্তৃতির ভয়ে তুলনামূলক বিচার থেকে বিরত থাকছি। (দক্ষিণী মৃদঙ্গ দেখন।)

এখন মৃদঙ্গের বা পথাবজের অঙ্গের কথায় আসছি—মৃদঙ্গের পাঁচটি মুখ্য অঙ্গ :

প্রথম : **খোল**—এই খোলকে শুধু ভাষায় ধ্বনিকোষ বলে, হিন্দীতে লকড়ী ও ইংরাজিতে বডি (Body) বলে। এটি বর্তমানে কাঠের তৈরী। কাঁঠাল, নিম, গাভার, খয়ের ও রক্তচন্দন কাঠে খোল তৈরী করা হয়। এই সব কাঠের খোল

খুব ভাল হয়, আওয়াজ মধুর ও গভীর হয় ; এদের মধ্যে রক্তচন্দনের খোলই উৎকৃষ্ট, তবে কচিং পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় : **ছাঁউনি**—ছাঁউনিকে শুক ভাষায় ধনিপটক ও হিন্দীতে “পুডী” বলা হয়। খোলের চমুখেই ছাঁউনি থাকে। ডানদিকে ছাঁউনির মাঝামাঝি গাথ দেওয়া হয় এক ডান হাতে বাজান হয়। বাঁদিকের ছাঁউনিতে স্থায়ীভাবে কোন গাথ থাকে না, বাজাবার আগে ময়দা বা আটার মণ্ড করে অস্থায়ী বোচণ অর্থে গাথ লাগান হয়।

তৃতীয় : **পাগড়ি**—ছাঁউনির বেড, যার সঙ্গে ছাঁউনির চামড়া বিনট করে বাঁধা হয় ছাঁউনিকে কপে রাখার জন্ত। একে শুক ভাষায় চর্মবেগনী ও হিন্দীতে “গজরা” বলে।

চতুর্থ : **ছোট**—একে শুক ভাষায় চর্মসূত্র বা চর্মরঞ্জু বলা হয়, হিন্দীতে বদী বা ডোরী বলে। (চামড়াব সৰু পটি দিয়ে ছোট তৈরী হয়।)

ছাদিকের ছাঁউনির চামড়ার সমান ভাবে টান রাখার জগুই ছোট শাদকৃত হয়ে থাকে।

পঞ্চম : **গুলি**—শুক ভাষায় এদের গুল্লা ও হিন্দীতে গটা বলে। ছাঁউনিতে প্রয়োজনমত টান দিয়ে তাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্বরে নির্ণয় ভাবে মিলিয়ে বাঁধার জগুই গুলির ব্যবহার।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আওয়াজ গষ্ঠীর ও জোরদার। ধ্রুপদ ৬ পামার জাতীয় গানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গত প্রায় সামান্যক। বীণা, রবাব, সুরবাণী প্রভৃতি কতিপয় যন্ত্রের সঙ্গে আলাপের তারপরও গুং বাজাবার সময় একে গাঢ়তে দেখা যায়।

মুদ্রের বিভিন্ন ঘরাণা ও বাজের কথা, বোলের বিষয় পরে লেখার ইচ্ছা বইল।

**মাত্রামান যন্ত্র বা মেট্রোনোম (Metronome) :** বৈজ্ঞানিক মাত্রা ত্রাপক যন্ত্রবিশেষ। ইং ১৮১০ সালে মেট্রোনোম প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। আমস্টারডামের (Amsterdam) মি: উইনকেলই ১৮১২ সালে এটি প্রথমে উদ্ভাবন করেন। তখন মি: মালজেল নামে এক ভদ্রলোকও তাঁর সঙ্গে এই উদ্ভাবনে যোগ দেন। পরে মি: মালজেল ইং ১৮১৬ সালে প্যারিস থেকে নিজের নামে যন্ত্রটি Patent Registration করিয়ে নেন। যন্ত্রটি মালজেলস্ মেট্রোনোম নামে চলতে থাকলেও আসলে মি: উইনকেলই এর উদ্ভাবন কর্তা (Grove's Dictionary of Music & Musicians. Vol. K. to O. Page No. 448.)

মাত্রা ও লয়ের কাল নির্দেশক এই যন্ত্রটি লয় ও মাত্রা বোঝাবার পক্ষে অপূর্ব। কোন বিশেষ লয়ের গতি ও মাত্রার স্থায়িত্বকাল ধরে রাখবার স্বযোগ এতে আছে। যন্ত্রটি নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাল ও মাত্রাবোধের বিশেষ সহায়ক। গান, গত্ ও তাল অভ্যাস করার সময় এটির সঠিক ব্যবহার প্রয়োজনে আসে।



মেট্রোনোম

রেকর্ডিং করার সময় কোন একটি গানের গতি নির্ধারণে হিসাব মত একই লয়ে প্রতিবার নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে গানটি গাওয়া ও সময়মত শেষ করার কাজে এটি অপরিহার্য।

যন্ত্রের গতি যদি ( M. M. 80 ) এম এম ৮০-তে বেঁধে দেওয়া যায় তবে যন্ত্রের গতি-নির্দেশক কাঁটাটি মিনিটে ৮০ বার ছলবে ( 80 Oscillations per minute ) অর্থাৎ এক একটি পূর্ণমাত্রার স্বর ধ্বনির স্থায়িত্বকাল হবে—

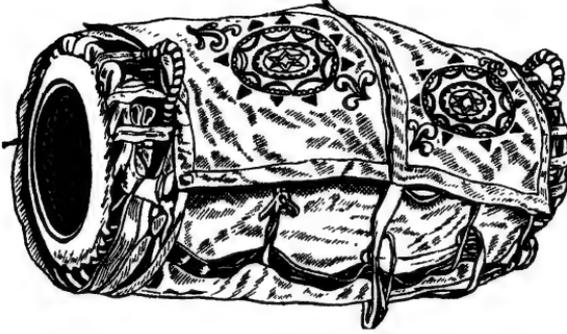
$$\frac{60}{80} = \frac{3}{4} \text{ সেকেণ্ড।}$$

বিভিন্ন তালের জঘ এতে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ মাত্রা পর পর বিশেষ ঘণ্টাধ্বনির ব্যবস্থা আছে। কাঁটাটির মাঝে একটি ভারি দোলক গলান থাকে সেইটির স্থানস্থিতি অল্পপাতেই যন্ত্রের গতি নির্ধারিত হয়।

**রঙ্গুণা :** আঠারো আঙ্গুল লম্বা কাঠের তৈরী একপ্রকার প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র। সমাকৃতি-বিশিষ্ট, তদিকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ছাঁওয়া হত। মুখ দুটি এগারো আঙ্গুল বড় ও বেড়যুক্ত। বামমুখে ভিতর দিকেও থাকত দুটি বেড়, যাদের মাঝে মুখের সমান মাপের ও চার আঙ্গুল মাপের দুটি স্নায়ু-নলিকা রাখা হত। এই বামমুখে একটি ফুটে থাকতো। দুটি মুখের পাগড়িতে ৭টি

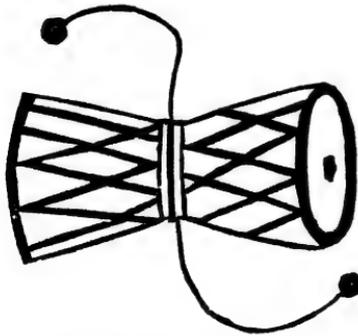
করে বিনোঁট থাকতো। কাঁধ থেকে ৩৪ হাত লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে হাত দিয়ে দুদিকের মুখ বাজান হত। বোলে রুং ধ্বনির ব্যবহার শোনা যেত। বর্তমানে লুপ্ত।

**ছড়ুঝুঝু বা ছড়ুঝুঝু :** বৃহদাকারের ডমরু বিশেষ। কুড়ুঝু দেখুন।



শুকুমদলম্

**শুকুমদলম্ :** দক্ষিণ ভাগতের এক প্রকার আনন্দযন্ত্র বিশেষ। এই ঘাত যন্ত্রটিকে বাস্তবিক যন্ত্রের বিভাগে ধরা হয়। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চবাণম যন্ত্রের মধ্যে এটিকে একটি বিশেষ বাণযন্ত্র বলা হয়। দক্ষিণী মুদঙ্গের তুলনায় এটি আকারে কিছু বড় হয়। দক্ষিণ দিকে বোহন অর্থে মোটা গাব অনেকটা চওড়া করে দেওয়া হয়। আংগাজও বেশ ছোরদার। দক্ষিণের বহু মন্দিরেই পূজা ও উৎসবের সময় একে বাজাতে দেখা যায়।



ডমরু ২৭৩ পাতায় দেখুন

বিভিন্ন প্রদেশে ডমরু বিভিন্ন মাপের দেখা যায়। ক্ষেত্রবিধে আকারের সামান্য প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়।

## শুষ্ক বা সূষ্ক যন্ত্র

বর্জুল বা অগ্র আকারের চিত্রযুক্ত ফুংকার-যন্ত্রমাত্রকেই (ফুটো ওলা ফুঁ দিয়ে বাজান যন্ত্রদের) শুষ্ক যন্ত্রের বিভাগে পরা হয়। শুষ্ক যন্ত্র ছরকমের দেখা যায়—একনল ও দিনল। সঙ্গীতশাস্ত্রে শুষ্কজাতীয় যন্ত্র চার ভাগে বিভক্ত :

- (১) বংশী : বাঁশের তৈরী—সরলবাঁশী, লয়বাঁশী, মুরলী, বেণু প্রভৃতি।
- (২) কাহল : কলম, রোশনচৌকি, সানাই প্রভৃতি। কাহল সেই জাতীয় যন্ত্র যাদের শর বা তৃণধ্বজ অর্থাৎ রীড ( Reed ) দিয়ে বাজান হয়, ( কাহল জাতীয় বাঁশীর এটিই বৈশিষ্ট্য )।
- (৩) শৃঙ্গ : শিঙ্গা, রণশিঙ্গা, তুরী ইত্যাদি।
- (৪) শঙ্খ : বিভিন্ন প্রকারের শঙ্খ ও গোমুখাদি।

প্রধান প্রধান এই চার ভাগে বিভাজিত যন্ত্রদের আরও পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

- (ক) সন্তা : মুরলী, সরলবাঁশী প্রভৃতি সন্তা।
- (খ) বাহির্দ্বারিক : রোশনচৌকি, সানাই, কলম প্রভৃতি।
- (গ) সামরিক : তুরী, শিঙ্গা, রণশিঙ্গা প্রভৃতি।
- (ঘ) গ্রাম্য : তুবড়ী, বেণু, প্রভৃতি।
- (ঙ) মঙ্গল্য : রামশিঙ্গা, শিঙ্গা, গোমুখশঙ্খ প্রভৃতি। শঙ্খাদি বাগ্মকে অনেকে মঙ্গল্য বিভাগে ধরেন।

“বংশঃ পাবঃ পাবিকা চ মুরলী মধুকথ্যাপ।

কাহলাতপ্তকিঙ্কৌ চ চুকা শৃঙ্গমতঃ পরম্ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর

বাঁশ থেকে তৈরী বলেই বাঁশী। এক বিশেষ ধরণের পর্বহীন বাঁশ থেকে বাঁশী তৈরী হয়। দক্ষিণভারতে বাঁশীকে **খুজল** বলা হয়। শঙ্খ, শৃঙ্গ প্রভৃতি ফুঁ দিয়ে বাজান যন্ত্র শুষ্ক শ্রেণীর। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতি প্রসৃত! বিশেষ কোন শিল্পপ্রসাদে গড়ে ওঠেনি। বাগ্মযন্ত্রের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্তে আসার বহুপূর্ব থেকে এদের ব্যবহার চলে আসছে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের গঠনে পরিবর্তন এসেছে। শৃঙ্গাদি যন্ত্র যেমন মৃত গো-মহিষাদির শিং থেকে উদ্ভূত, বাঁশীও তেমনই স্বাভাবিকতার

মাঝেই জন্ম নিয়েছিল। কোন গাছের ফোঁপরা ডালের ভিতর হাওয়া ঢুকলে একটি শব্দ বের হয় আবার সেই ডালেরই উৎপত্তিস্থলে যদি কোন আলাদা ফুটো থাকে তবে দুটি শব্দ শোনা যায়। আমাদের ধারণা আদিতে বাঁশীর উৎপত্তি এই সব বিভিন্ন ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছিল।

জীবজন্তুর ফোঁপা হাড় থেকে বাঁশীর উৎপত্তি, একথা বাণি সাহেব তাঁর History of Music বই-এ ব্যক্ত করেছেন : “The Tibia was originally a flute made of the Shank or Shin bone of an animal and it seems as if the wind instruments of the ancient times have been long made of such material, as nature had hollowed, before the art of boaring flutes was discovered” Charles Burney’s History of Music Vol. I, page 487.

প্যালিওলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রস্তর যুগের আগের দিকে চরিত্রের হাড়ে তৈরী বাঁশীর নমুনা দেখা যায়। নিওলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রস্তর যুগের শেষের দিকে বর্নহোলমে পাঁচটি ফুটোওয়ালা এক বাঁশীর কথা জানা যায়।<sup>১</sup> ক্যাপ্টেন উইলক ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাটির তৈরী দুটি ফুটোওয়ালা এক বাঁশী সংগ্রহ করে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন।<sup>২</sup>

বাঁশীর আদি-উৎপত্তির সালতারিখ বা আবিষ্কারকের নামের কোন মত্বান আমরা পাইনি। যন্ত্রটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান আকারে আমাদের কাছে এসেছে। যন্ত্রটির ইতিহাসে কোন যন্ত্রটি যে আদিম সে কথা বলা কঠিন। অনেকের ধারণা পিনাক নামক ধনুযন্ত্র যখন মহাদেবের হাতে দেখা যায় তখন ধনুযন্ত্রই প্রথম এবং সেটিই আদিম। বিষ্ণুর হাতে যখন শঙ্খকে দেখা যায়, তখন মনে হয় শুধির যন্ত্রই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছে। বাণ্যযন্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস সন্দেহে তাই সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। প্রাচীন শাস্ত্রে বংশ, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী নামে নানা প্রকারের বাঁশীর নাম পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত ইতিহাসে গ্রীসের মিনার্ডা দেবীকে বাঁশীর স্রষ্টা বলা হয়, বাঁশী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আরও শোনা যায় গ্রীসের প্যাতনামা পণ্ডিত পিথাগোরাস খৃঃ জন্মের পাঁচশো বছর আগে বাঁশী আবিষ্কার

১। Musical Instruments through the Ages—By Iris Urwin (3rd Impression 1964.)

২। বন্যকোষ—রাজা স্মার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

করেছিলেন। শ্মশানে শুকনো মড়ার মাথার (খুলির) ভেতর দিয়ে বায়ু চলাচলের শব্দ থেকেই তিনি বাঁশী তৈরীর প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের বিষয়ে গ্রীসের অরফিউসের গল্প আমাদের মনে সন্দেহ জাগায়, কারণ অরফিউসের বাঁশীর গল্প পিথাগোরাসের অনেক আগের কথা। সুতরাং আমরা কি করে পিথাগোরাসের আবিষ্কারে বিশ্বাস রাখি ?

বাঁশ ছাড়াও বাঁশী কাঠে এবং ধাতুতে তৈরী হয়। খয়ের, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠে, প্লাষ্টিক ও হাতির দাঁতে বাঁশী তৈরী হয়ে থাকে। বাঁশীর নির্মাণে সোনা, রূপা, পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও দেখা যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে বাঁশীর ধ্বনি ও ফুংকারের (ফুঁ-এর) দোষ-গুণের বিষয় লেখা আছে। বংশীবাদকদের প্রয়োজনে আসতে পারে ভেবে সে বিষয়ে লেখা হল :

### বার রকম গুণ

- (১) স্নিগ্ধতা—স্নেহমাথা স্বর।
- (২) ঘনতা—স্বরের গভীরতা।
- (৩) রক্তি—স্বরধ্বনির রঞ্জকতাগুণ।
- (৪) ব্যক্তি—বিশেষ প্রকাশভঙ্গী।
- (৫) প্রচুরতা—অনেক দম।
- (৬) লালিতা—স্বরের লালণ্য বা উজ্জলতা।
- (৭) কোমলতা—কমনীয়তা।
- (৮) অমুরণম—প্রতিশব্দ জ্ঞান।
- (৯) ত্রিস্থানতম—তিন সপ্তকে সমান অধিকার।
- (১০) শ্রাবকত্ব—শ্রোতাদের শ্রবণ-স্থপকর গুণ।
- (১১) মাধুর্য—মধুরতা (মিষ্টতা)।
- (১২) সাবধানত্ব—স্বরের গুণ সম্বন্ধে অবহিত থাকা।

### দশ রকম দোষ

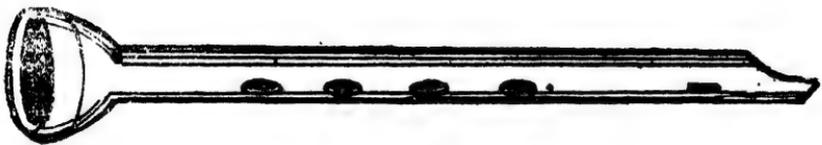
- (১) যমল—এক ফুঁ-এর পর আর এক ফুঁ দেবার সময় প্রতিশব্দ।
- (২) শ্রোক—প্রয়োজন অল্পসারে স্বরকে মোটা রাখতে না পারা।
- (৩) ক্রশ—স্বরের দুর্বলতা, উপযুক্ত ওজনে কোন স্বরে পৌঁছাতে না পারা।
- (৪) স্থলিত—মাঝে মাঝে অপ্রয়োজন থেমে যাওয়া।
- (৫) কম্পিত—স্বর কাঁপা।
- (৬) তুষকা—কাঁপা মোটা আওয়াজ।
- (৭) কাকী—কাকের মত স্বরধ্বনি।
- (৮) সন্দষ্ট—চেরা আওয়াজ।
- (৯) অব্যবস্থিত—কখনো কম কখনো বেশী ক্রশ স্বর।
- (১০) সুরিত—কবদোষগত জড়ানো স্বরধ্বনি।



### অত্থু বা ওত্তু

**অত্থু বা ওত্তু ( Ottu ) :** এই শুধির বাণ্ডটি দক্ষিণ ভারতে শ্রুতি শানাই নামে পরিচিত। প্রধান নাগপুরের সঙ্গে অবিরাম স্বর রাখার জগ্য এই শানাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটি প্রায় আড়াই ফুট মত লম্বা হয়। দেখতে অবিকল নাগপুরের মত। ফুঁ দেবার জায়গায় ধাতুর তৈরী গোল আঁটা পরান থাকে এবং রাড দিয়ে বাজান হয়। শানায়ের বহির্মুখে অর্থাৎ ধ্বনিপ্রকাশ স্থানে, গোলাকার এক টুকরো কাঠ দিয়ে আংশিকভাবে আঁগ্নাজটিকে চেপে দেওয়া হয়। শানায়ের গায়ে যে চার-পাঁচটি ফুঁটা থাকে, তাদের দু-একটি বাদে বাকি সমস্ত ফুঁটোই মোঁম দিয়ে বন্ধ করা হয়, শব্দ-হারিস্বের কারণেই এই ব্যবস্থা।

**আইয়ারখুনল :** দক্ষিণভারতের পাবত্য-অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার বাঁশের বাঁশী। পাহাড়ী রাখালেরাই এই বাঁশী বাজিয়ে থাকে। অতি প্রাচীন এই বাঁশীটিতে ছয়টি স্বরছিদ্র থাকে ও চার ফুট লম্বা হয়। এটি কাঁপে জাতীয় বাঁশী ও গ্রাম্য গল্প। বাজাবার জায়গায় অর্ধে বাঁশীর গোড়ায় ভেঁপুর মত তালপাতার জিত দিয়ে বাজান হয়।



### আলগোবা

**আলগোবা :** পঞ্জাবে ব্যবহৃত একজাতীয় বাঁশীকে আলগোবা বলা হয়। এটি সভ্য যন্ত্র হলেও বাহির্দারিক। বাঁশীটি বাঁশের বা কাঠের তৈরী হয়। এতে চারটি মাত্র স্বরছিদ্র থাকে, অনেক আলগোবায় সাতটি স্বরছিদ্রও থাকে; এছাড়া সমস্তই সরল বাঁশীর মত। পঞ্জাবী গ্রাম্যসঙ্গীতের সঙ্গে একে বাজতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই বাঁশী পারস্ত থেকে আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখনও সঠিক সন্ধান পাইনি। পারস্তের (Nay) 'নে' বা 'নাই' বাঁশীটির মত এর আঁগ্নাজ খুব মধুর। আলগোবা নামটি পারস্ত থেকে এসেছে বলে

অনেকে মনে করেন। অন্ধপ্রদেশেও এই ধরণের বাঁশীর ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের ধারণা এটি আমাদের সরল বাঁশীর অনুলকরণ। অনেক আলগোঝার বহিমুখ ফানেলের আকারের।



### কলম বাঁশী

**কলম বাঁশী :** এই বাঁশীর গোড়া বা মুখ (অর্থে যেখানে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়) লেপবার কলমের মত চ্যাপ্টা ধরণের বলেই একে কলম বাঁশী বলা হয়। পাদিয়া, আফগানিস্তান, তাতার, টার্কি প্রভৃতি দেশেও এই বাঁশীকে কলম বাঁশী বলা হয়। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন যে গ্রোসের (Calamus) কলমস বাঁশীর অনুলকরণেই এটি গড়ে উঠেছে। সরল বাঁশীর মত এর স্বরাছন্দ ও ধরার কায়দা একই রকম; কেবল বাজাবার জায়গায় দেশী সানায়ের মত একটা ছোট নল বসান থাকে, এবং বাজাবার আগে এই নলটিকে খুঁতু দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। ক্যারবনেট ওবে প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাঁশীতে এবং আমাদের দেশী সানাই প্রভৃতিতে অল্পরূপে জিভ ব্যবহার করা হয়। জিভ দেওয়া বাঁশীগুলিকে শাস্ত্রে কাংল জাতীয় বাঁশী বলা হয়েছে। কলম বাঁশী কাংল জাতীয়।

**কাংলা :** দক্ষিণভারতে এটি পূজাপার্বণের সময় মান্দরে বেজে থাকে। সঙ্গীত গ্রন্থে আমরা দুই প্রকার কাংলার সঙ্গান পাই। প্রথমটি এক রাড (অর্থে জিভ) দেওয়া কাঠের বাঁশী। সম্মুখভাগে আটটি স্বররঞ্জ অর্থে স্বরাছন্দ থাকে। দক্ষিণ ভারতে সববাত্মম বাজাবার সময় এই ধরণের কাংলা সেই বাত্মসম্মেলনে বেজে থাকে। পেতলের তৈরী, শৃঙ্গজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে **করণাল** নামে ট্রাম্পেট জাতীয় একটি যন্ত্রের নাম দেখা যায়, সেই যন্ত্রটিই বর্তমানে **কুর্গা** বা **কাংলা** নামে পরিচিত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

Dictionary of South India Music & Musicians নামক পুস্তকের (Volume II) ২য় খণ্ডে ৩০২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে : "A wind instrument used in temple rituals. It is also used in Uzbekistan in the

U. S. S. R. The Karna is used in the performance of Sarva Vadyam in South Indian Temples.”

অন্য প্রকার কাণীর ব্যাখ্যায় আমরা পাই যে পিত্তল নির্মিত এক ধরণের ভারী বক্রতল নলাকার শুমিরযন্ত্র। খুব জোরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। বাজনাটির আওয়াজ জোরদার ও রুক্ষ (উচ্চনাদী ও শ্রুতি-কঠোর)। বেটপ মাপের ১৩য় ধরার অস্থবিধা। Indian Music by Shahinda নামক পুস্তকটির ৮১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : “It is a heavy curved pipe awkward to hold. It is blown hard and played in a band in times of important occasion ( war, marriage & big festivals ), made of brass, sound is harsh & loud.”

এখানে দেখা যায় যন্ত্রটি বিবাহাদি উৎসবে বা যুদ্ধের সময় সমবেত বাহির্দ্বারিক যন্ত্রমণ্ডলিতে বাজতো। যন্ত্রটির কোন sketch আমাদের হাতে না থাকায় বর্তমান সংস্করণে সেটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। রাজস্থানে কাণী নামে সরল আকারের এক প্রকার শুমিরবাণ প্রচলিত আছে।



ক্যারিনেট

**ক্যারিনেট :** এটি পাশ্চাত্য দেশীয় শুমির যন্ত্র। যন্ত্রটিকে **ক্যারিওনেট-ও** বলা হয়। এটি কাহল জাতীয় যন্ত্র। শানাই প্রভৃতি ভারতীয় যন্ত্রের মত এতে রীড পরিষে বাজান হয়। জার্মানির হ্যুরেমবার্গ শহরের মিঃ জে. সি. ডেমার ( J. C. Demmer ) নামে এক তত্বলোক ইউরোপীয় চ্যালুমোঁ ( Chalumeau ) যন্ত্রের অন্তর্সরণে এবং তাতে speaker key-র স্থাপনায় ক্যারিনেট যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন ( ইং ১৬৯০-১৭০০ )। ইং. ১৭২০ সালে ডেমার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ডেমার অনেক নূতন চাবি যোগ করে এই যন্ত্রের আরও উন্নতি করেন। শিল্লীরা নূতন চাবিযুক্ত যন্ত্রটিতে বাজাবার অনেক সুবিধা পান। ১৮১০ সালে আইওয়ান মুলার ( Iwan Muller ) এই যন্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। ১৮৪২ সালে মিঃ ক্লোপে ( Klose ) এই বাঁশীকে বোহেম সিস্টেম ( Boehm System ) প্রবর্তন করেন।

যন্ত্রটিকে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমে ফুংকার রঞ্জের দিক বা যেদিকে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়, সেটিকে বলা হয় মাউথ-পিস ( Mouth piece ), এই রঞ্জের পিছন দিকে জার্মান-সিলভারের তৈরী বা নিকেল করা অল্প ধাতুর তৈরী লিগেচার ( Ligaturè ) দিয়ে বাজাবার রীডটি মাউথ-পিসের সঙ্গে আটকানো থাকে। দ্বিতীয় অংশটি সকেট ( Socket )। সকেটের পর তৃতীয়াংশে মেন বডি ( Main Body ), মেন বডি ও সমগ্র যন্ত্রটি আব্রুসকাঠ বা ইবোনাইটে তৈরী হয়। মেন বডিতে স্বরাচ্ছন্ন থাকে, এবং এই ছিদ্রগুলিকে কনট্রোল করে বাজাবার ভগ্নে নিকেলের বা সিলভারের স্প্রিং-যুক্ত চাবী ও তার সরঞ্জাম রাখা থাকে। সবশেষ মুক্ত প্রান্তে ( নীচের দিকে ) থাকে হর্ন ( Horn ) বা চোঙ্গা। এই বাশীর ওপর দিকের ( ফুংকার রঞ্জের দিকে ) মাউথ-পীসটি ও রীড যাতে সহজে আঘাত না পায়, তাই মাউথ-পীসটি মাউথ-ক্যাপ ( Mouth-cap ) দিয়ে ঢাকা থাকে। ক্ল্যারিনেটের সমস্ত অংশগুলি আলাদা করে বাক্সে রাখা যায় এবং বাজাবার সময় প্রত্যেক অংশটিকে যুক্ত করে একক যন্ত্রে পরিণত করে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে একটি রীড এবং ১৩ থেকে ২৫টি পদন্ত চাবী থাকে।

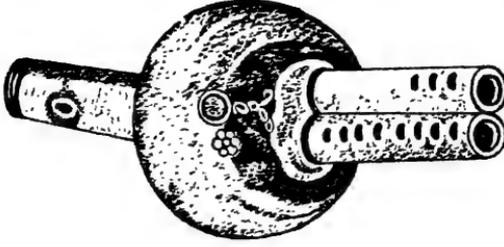
ক্ল্যারিনেট সাধারণতঃ 'এ' ও 'বি' স্কেলের দেখা যায়। তা ছাড়া 'সি' স্কেল, হাই 'ডি-ক্ল্যাট', হাই 'ইফ্লাট,' 'এক' প্রভৃতি স্কেলের পাওয়া যায়। 'বি-ক্ল্যাটে'র ক্ল্যারিনেটকে 'বাস ক্ল্যারিনেট' (Bass Clarinet) বলে, এর ( হর্ন ) চোঙ্গাটির মুখ ওপর দিকে বাকান থাকে। গীতানুসরণে ও বাণমণ্ডলীতে বাজাবার স্রবিধার জন্মেই ক্ল্যারিনেটে বিভিন্ন স্কেলের ব্যবহার। যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধরূপে মণ্ডলবাণে ও ক্রুতানু-সরণে সমান উপযোগী। যন্ত্রটির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থাকলেও বিস্তৃতির আশঙ্কায় বিরত থাকছি।

**গোশূঙ্গ বা গোশিঙা :** গরুর শিং থেকে যেসব ছোট আকারের শিঙা তৈরী হয় তাদের গোশিঙা বলে। আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে গোশূঙ্গের নাম পাই পুরাকালে যুদ্ধের সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহৃত হত।



গোশূঙ্গ বা গোশিঙা

চুকা : চারহাত লম্বা একজাতীয় প্রাচীন তিস্তিরীবাঁশী, বর্তমানে লুপ্ত।



তুবড়ী-বাঁশী

**তুবড়ী-বাঁশী** : আমাদের দেশে সাপুড়েরাই এই বাঁশী বাজিয়ে থাকেন। শুদ্ধ ভাষায় তুবড়ী **ভুজঙ্গস্বরম্** ও **তিস্তিরী** নামে পরিচিত। গ্রাম্য ভাষাতে একে তুবড়ী বা **পুঙ্গী** অথবা **পুঙ্গী** বলা হয়। এই যন্ত্রের খোল (ধ্বনিকোষ) বা বায়ুকোষটি তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী। শুষ্কজাতীয় এই গ্রাম্য যন্ত্রটিকে **তিস্তিরী** বা **তিস্তি** নামে ডাকা হয়। তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী বলেই একে তিস্তিরী বলা হয়। একে নাক দিয়ে বাজান হত বলে এর আর এক নাম ছিল **নাসাবংশী**, সাপ খেলা বা ধরার সময় এই বাঁশী ব্যবহৃত হয় বলে এর অপর নাম **নাগিন-বাঁশ**, দক্ষিণভারতে এটি **মাগুদী**। এর অপর এক শুদ্ধ নাম **তুম্বকী** (Tumbaki)।<sup>১</sup> এটি বিদেশে **তুমেরা**, **জিন্গুর** (Jingur) **জিনাগোভী** (Jinagovi) নামেও পরিচিত।<sup>২</sup>

প্রাচীনকালে কচিং এতে হারণের চামড়ার তৈরী খোল ব্যবহৃত হ'ত, বর্তমানে চামড়ার খোলের প্রচলন নাই। এর খোলের তলদেশে ছুটি নলের আকারের সমমাপের বাঁশী খোলের সঙ্গে মোম দিয়ে জোড়া থাকে। এই বাঁশী (সিঙ্গাপুরী) পবহান বাঁশ থেকে তৈরী হয়। ছুটি বাঁশীর (নলের) একটিতে পাঁচটি ও অপরটিতে নয়টি ছিদ্র রাখা হয়। পাঁচটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশীটির দুই ও চার নম্বর ছিদ্র ব্যতিরেকে বাকি তিনটি মোম দিয়ে বন্ধ থাকে। এই

১। The eight Principal Rasas of the Hindus by Raja Sir Sourendra Mohon Tagore. Page No. 19.

২। "Pungi also called Tumeri, Tubri, jingur or Jinagovi. Indian snake-charmer's reed pipe. The body and mouthpiece are of Gourd, two cane pipes are inserted, one a tonic drone, the other with finger holes for melody"—The International Cyclopedia of Music & Musicians. 9th edition, 1964, Page 1708.

বাঁশীটি অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বাঁশীটির মুক্তপ্রান্তে অর্থে আগার দিকে সাতটি স্বরছিদ্র থাকে। এই স্বরছিদ্রের ওপর অঙ্গুলি চালনাতেই স্বর প্রকাশিত হয়। এই নলটির প্রথম ছিদ্রটি (খেলের দিকের) নলের পশ্চাত্তিক পর্যন্ত (আরপার ভাবে) ছিদ্র করা থাকে। সাধারণ বাঁশীতে যেভাবে ফুঁ দিয়ে বাজান হয় এতে ঠিক সেভাবে ফুঁ দেওয়া হয় না। ফুঁ দেবার আগে গাল ফুলো করে একমুখ বাতাস নিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন মাত্রিক ফুঁ দিয়ে বাজান হয়ে থাকে।<sup>৩</sup>

সম্ভবত একনলা বাঁশীর পরেই দুইনলা আবিষ্কৃত। ভারতে শানাই, নাগস্বরম্ প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ত তুবড়ী বাঁশীরই অন্তর্করণ। পাশ্চাত্য দেশের ব্যাগপাইপ প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও তুবড়ীর অন্তর্করণেই গড়ে উঠেছে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ প্রাচীন তুবড়ী বাঁশীর খোল মুগচর্মে তৈরী হত বলে জানা যায়। পৃথিবীর অগ্রাণ্ড দেশের এই ধরনের আদিম বাঁশীগুলির মতো যথেষ্ট আকৃতিগত মিল থাকায় কোন দেশের বাঁশী প্রথমে আবিষ্কৃত তা নিশ্চয় করে এলা কঠিন। কেবলমাত্র সভ্যতার বিকাশের উপর নিভর করেই আমরা বলতে পারি যে আমাদের ভারতই এদের আদিম উৎপত্তিস্থল। মিশরের নাবিকেরা জুমারা বা জুকোয়ারা নামে যে দ্বিনল বাঁশী ব্যবহার করেন বা তাঁদের বর্তমান আঙ্গুল বাঁশী অবিকল আমাদের তুবড়ীর মত। আঙ্গুলের একটি নল অপরটি থেকে কিছু বড় হয়। মিশরের লাউহীন সমার্কাত দ্বিনল বাঁশীকে থাম বলা হয়। এই যন্ত্রেব সম্বন্ধে অনেক কিছু বগার ইচ্ছা থাকলেও বহুমানের বিরত থাকছি।



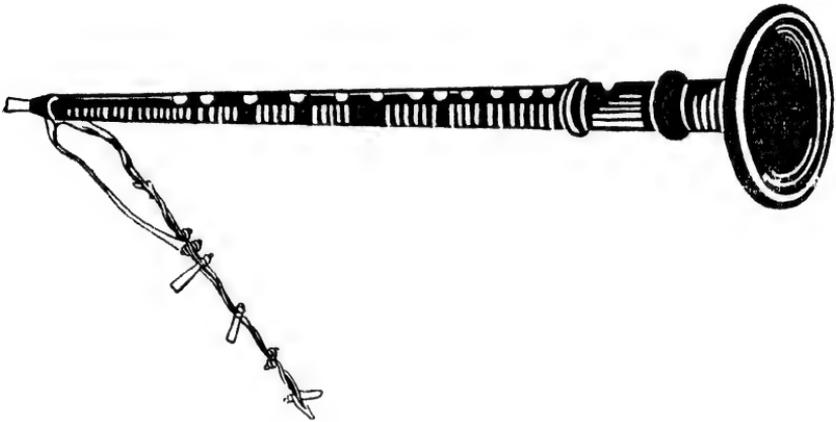
তুরী

**তুরী :** আমরা আগে বলেছি যে শিঙাগুলি অনেকটা ইংরাজি বর্ণমালার 'S' এস্ অক্ষরের মত। তুরী একপ্রকারের শিঙা হলেও এর আকৃতি সরল।

৬। ভারতীর সঙ্গীত কোষ—শ্রীযুত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, পৃঃ ৯২ “এই বাঁশী ক্রম করিতে গেলে সাপুড়িয়াগণ ফুৎকার ছিদ্রটি অত্যধিক বড় করিয়া কাটিয়া বিক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের ব্যবহারে বাঁশীর ছিদ্রটি অত্যন্ত ছোট এবং বাদনকালে, যখন তাঁহারা বাস গ্রহণ করেন, তখন ফুৎকার ছিদ্রটি জিহ্বাষারা বন্ধ করিয়া রাখেন, তাহাতে লাউয়ের সঙ্কিত বায়ু ধীরে ধীরে বাঁশীকে ধ্বনিত করিতে থাকে ”

তুরী পিতল বা তামার তৈরী। সঙ্গীত রত্নাকরে তুরীর উল্লেখ আছে। সেখানে তুরী **তুরুতুরু**, **তুরতুরী** বা **তিত্তিরী** নামে পরিচিত। ভারতের নানা প্রদেশে তুরীকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন মাপে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে তুরী, **তুতুরী** নামে পরিচিত। ট্রাম্পেট যন্ত্রটি তুরীর অঙ্কুরূপ। প্রাচীনকালে তুরী যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে এর প্রচলন নাই।

**তুণ্ডকিনী :** কাহল জাতীয় দুহাত লম্বা রীড দেওয়া বাঁশী। এর অপর নাম **তুরুতুরু**, **তিত্তিরী** বা **যমল**। তুণ্ডকিনীতে রীড থাকে। তুণ্ডকিনী তুরীর নামান্তর হলেও রীড থাকে বলে একে তুরী বলা যায় না।



নাগস্বরম

**নাগস্বরম :** আমাদের শানায়ের মত দেখতে। দক্ষিণে দুই প্রকারের নাগস্বরম প্রচলিত। প্রথমটি **তিমিরি**, দক্ষ বাদকেরা এই তিমিরি নামের বড় আকারের শানাইটি বাজিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়টি **বারি**, এটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। আমাদের শানায়ের মত নাগস্বরমের সঙ্গে স্রুতি নামে আর একটি বাঁশী অবিশ্রাস্ত স্রব দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। (অতথু বা শুভু দেখুন) আমাদের তুবড়ী বাঁশীর এক নাম ভুজঙ্গস্বরম, নাগস্বরম নামটি ভুজঙ্গস্বরম থেকেই জন্ম নিয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

**নেতুনকুবাল :** অভিনব এই বাঁশী দক্ষিণভারতে বেজে থাকে। আবিষ্কারকের নাম ও জন্ম তারিখ জানা যায়নি। দক্ষিণভারতের রাশালদের বাঁশী। বাঁশীটি বাঁশের তৈরী। বর্তমানে এই বাঁশীটি লম্বায় ৩ ফুট ২ বা ৪ ইঞ্চির মত হয়। আকারের তুলনায় আওয়াজ কম জোর, দুর্ থেকে শোনা যায় না।

বাঁশীটির বৈশিষ্ট্য, এর ফুঁ দেবার ফুঁটো, প্রায় মাঝখানে থাকে এবং ফুঁ দেবার জগ্গে একটি মুখ লাগান থাকে। এইভাবে মাঝখানে ফুঁ দেবার জায়গা থাকায় বাঁশীটি



### নেহুন কুঝল

হুভাগ বলে মনে হয়, ফুঁ দেবার জায়গাটি মুখের সামনে রেখে বাঁশীটি সোজা করে ধরে বাজান হয়ে থাকে, সময় বিশেষে আড় বাঁশীর মত ধরেও বাজান হয়। একই বাঁশীকে দুটি জোড়াবাঁশী বলে মনে হয়, ফুঁকার রঙ্গ থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত এক অংশ এবং রঙ্গের নিচের থেকে হাঁটুর দিক পর্যন্ত অপর অংশ। নীচের অংশটিতে আটটি স্বরছিদ্র থাকে এবং মূল স্বর এখানেই বাজে। উপরের সাতটি ছিদ্রবিশিষ্ট অংশ শ্রুতিমানায়ের মত একস্বর প্রকাশ করে।

বাঁশীর ফুঁকারছিদ্র ও হুঁদিকের স্বরছিদ্রের মাঝে টিনের ঢাকনা থাকে যেটি বায়ুঘরের (wind chamber-এর) কাজ করে। বায়ু-ঘরের পাশের ছিদ্র দিয়েই বাতাস বাঁশীটির নলের হুঁদিকের অংশে চলে যায়।

**গ্রাসতরঙ্গ :** অঙ্গৈক দেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্ষশ্চ জায়তো,

উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কাবন্ডিস্তব্দশিভিঃ।

পৃথিবীর নানাদেশে বংশীজাতীয় নানাধরণের ফুঁকারযন্ত্র দেখা যায়। কোনটি কত দিনের প্রাচীন, কোনটি কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ অথবা কোনটি কোন দেশ থেকে এসেছে এসব নিয়ে নানা তর্ক। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে কোনটিই সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। আমাদের পরাধীনতার স্বেযোগ গ্রহণ করে অগ্রাগ্র অনেক জাতিই আমাদের নিজস্ব সম্পদকেও তাঁদের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঐতিহাসিকেরা ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আমাদের বাণ্যন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট অভাব ছিল। সেই কারণে প্রকৃত তথ্যের অভাবেও আমাদের অনুবধানতার অবকাশে অগ্রাগ্র দেশের সঙ্গীতৈতিহাসিকেরা অবাধে আমাদের ভারতীয় যন্ত্রকেও তাঁদের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ভারত ব্যতীত অগ্র কোন দেশের প্রাচীন বা আধুনিকসঙ্গীত ইতিহাসে গ্রাসতরঙ্গের নাম শোনা যায় না। এমন কি বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অগ্র কোন প্রদেশেও এই যন্ত্রটির নাম বা বাদকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে গ্রামতরঙ্গকে উপাঙ্গ বলা হ'ত। যন্ত্রটি এক জোড়া ছোট শানাই-এর আকারের অর্থাৎ তার ক্ষুদ্র সংস্করণও বলা যায়। যন্ত্রটি পাতুর তৈরী দুটি



গ্রামতরঙ্গবাদক

আলাদা নলের মত, লম্বায় প্রায় এক ফুট। গোড়ার দিকটি সরু ও আগার দিকটি মোটা হয়। দেখতে শানাই-এর মত হলেও গোড়ার দিকের মুখ ছাড়া আগাগোড়া নিশ্চিহ্ন। এই সরু মুখের দিকে নলের মধ্যে বিল্লিময় স্তম্ভ অংশ থাকে। এই বিল্লিময় অংশটিতেই স্বর-পরিবর্তন ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় ফুংকার বস্তুর বিভাগে একে ধরা হ'লেও বাঁশী দুটি ফুঁ দিয়ে বাজান হয় না। গ্রামতরঙ্গের গ্রাম শব্দটির অর্থের মধ্যে প্রাণায়ামের গ্রাসের আভাস পাওয়া যায়। বাদন পদ্ধতিতে ফুংকারের বদলে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় আশ্চর্য ধরণের শ্বাসকোশলের চাপের তারতম্যের ফলে বিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গের আন্দোলনে বংশীয়গলে বিভিন্ন স্বর ও স্বরগ্রাম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রটি গলার

তুপাশে রেখে কঠতন্ত্রীতে নিখাসের চাপ দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের বাজের কায়দা অতি দুর্লভ, কষ্টসাধ্য এবং বিশেষধরণের কুস্তকসাধনার অন্তর্গত বলেই আজ এ যন্ত্রের কোনও বাদক নাই এবং যন্ত্রগুলও সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে। অতীতে কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই এই যন্ত্রবাদনে সিরু কয়েকজন বাঙ্গালী গুণী সঙ্গীতজ্ঞের নাম শোনা যায়। প্রথমেই কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে গোপাল সিংহ রায়, নীলমাধব চক্রবর্তী ও আলাউদ্দীন-ভ্রাতা আফতাবুদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। স্বর্গীয় সঙ্গীতচার্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই যন্ত্রে রাগবাদনের ৭ স্তরের সূক্ষ্মবাজের যাতুকর ছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারতের এই বিস্ময়কর যন্ত্র পরিবেশন করতে পারেন এমন একজন বাদকও বর্তমানে বাংলায় বা ভারতের অত্র কোন প্রদেশেই নাই।



#### পাব

**পাব :** প্রাচীনকালের এক ধরণের বাঁশের বাঁশী। বাঁশীটির শরীর বাঁশপাতা দিয়ে জড়ানো থাকতো। বাঁশীটি ফুঁ দেবার জায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত চোদ্দ আঙ্গুল লম্বা হত। মুখের ছিদ্র থেকে ন' আঙ্গুল দূরে আরম্ভ হ'ত স্বরচ্ছদ্র। আধ আঙ্গুল পরপর আটটি ফুটো থাকতো, শেষের ফুটোটি হাওয়া বেরোবার জগ্গেই নিদ্বিষ্ট থাকতো। বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।



#### পাবিকা

**পাবিকা :** প্রাচীনকালের একপ্রকারের বাঁশীর নাম। বাঁশের তৈরী, চোদ্দ আঙ্গুল লম্বা, বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা শরীর। ফুটোগুলি কড়ে আঙ্গুলের মাপের। ত'মুখই খোলা, ৫টি স্বরচ্ছদ্র থাকতো। রত্নাকরে এর নাম ও সামান্য পরিচয় আছে।

**বর্ষক ॥** বৃহদাকারের কড়ি জাতীয় শব্দ বিশেষ। এই জাতীয় শব্দ বর্তমানে দেখা যায় না।

**বিজয় ॥** একপ্রকার বাঁশী, বর্তমানে লুপ্ত। বিজয় নামে একপ্রকার শব্দেরও নাম পাওয়া যায়।

বেণু ॥ বাঁশ থেকে তৈরি। পুরাকালে রাখালরা গোচারণের সময় এই বাঁশী বাজাতো। বেণু গ্রাম্য যন্ত্র বলে পরিচিত। “আয়রে কাণু বাজারে বেণু”



### বেণু

পণ্ডে কাণু অর্থে কৃষ্ণকেই ধরা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ গোচারণের সময় বেণু বাজাতেন অথবা আড় বাঁশী বাজাতেন তা বলা শক্ত। বেণু আগে ধর্মীয় গানে বা নৃত্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হত জানা যায়। মিশরের “জিকার” নামে ধর্মীয় নৃত্যের সঙ্গে সেখানকার ফকিরেরা এই ধরণের বাঁশীর সঙ্গত করতেন। ভারতে প্রাচীন জঙ্করী নৃত্যের সঙ্গেও ব্যবহৃত হত। এই জঙ্করী নৃত্যই মিশরে জিকার বলে প্রচলিত। ইংরাজীতে একে দাবি ফ্লুট ( Dervi flute ) বলে। যন্ত্রটি সরলভাবে ঈষৎ বোঁকিয়ে ধরে অল্প-অল্প ফুঁ দিয়ে বাজান হয়। ফুঁ-এর বলের ( কম বেশী ওজনের ) ওপরই এর নানা স্বরধ্বনির প্রকাশ। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ব্যতীত এই বাঁশী বাজান সম্ভব হয় না। বাজান কঠিন বলেই এর বাদক সংখ্যা কম। বেণু বাজিয়ে খুব কম দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বর্তমানের “টিপারা বাঁশী”ই বেণু। প্রাচীন বেণুই বর্তমানে টিপারা বা ত্রিপুরা ফ্লুট বলে প্রচলিত। এই বাঁশী প্রায় ৬’ফুট লম্বা হয়।



### ভেঁপু

ভেঁপু ॥ কাহল জাতীয় এক ধরণের তাল পাতার বাঁশী, বাংলায়, ওড়িশ্যাতে এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে বাজতে দেখা যায়। এই বাঁশীর ফুঁ দেবার জায়গায় তালপাতার জীভ ( reed ) ব্যবহার করা হয়। এটি গ্রাম্য যন্ত্র। ছেলেমেয়েরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা ও স্নান যাত্রার সময় ( অথবা বর্ষাকালে ) বাজিয়ে থাকে। ভেঁপু একস্বর প্রকাশক বাঁশী।

আমের ঝাঁটি বা কষি থেকেও ভেঁপুর মত এক স্বর প্রকাশক একপ্রকার বাঁশী বর্ষাকালে ছেলেরা বাজিয়ে থাকে। আমাদের ধারণা ভারতের ছেলেদের হাতের এই আম-কষির-বাঁশী থেকেই সমস্ত কাহল জাতীয় বাঁশীর জন্ম হয়েছে। কাজেই এগুলি কত প্রাচীন তা বলা কঠিন।

**ভেরী** ॥ ভেরী বাণযন্ত্রটির বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়! অনেকে এটিকে শুবির যন্ত্রের বিভাগে ধরেছেন। অন্তেরা একে আনন্ধ যন্ত্রের বিভাগে রেখেছেন। প্রথমে আমরা আনন্ধ জাতীয়ের কথাই বলছি।

ভেরী মন্ত্রকে সঙ্গীত রত্নাকরের বাণাধ্যায়ে ( ত্রিবেন্দ্রাম, সং : প্লোক নং ১১৪৮-১১৫০ )

“বিতস্তিত্রয় দৈর্ঘ্যা স্মাদ্ ভেরী তাম্রৈণ নিম্নিত।

চতুর্বিংশত্যঙ্গুলে চ বদনে বলয়ান্বিতে

তস্তাঃ সবলয়ে চর্ম্মচ্চন্নে ছিদ্রসমান্বিতে

রজ্জ্বা নিয়ন্ত্রিতে গাঢ়ং মধো সূত্রৈণ বন্ধনম্”

এই থেকে জানা যায় যে ভেরী চর্মাচ্ছাদিত আনন্ধ যন্ত্র বিশেষ এবং এই চর্মাচ্ছাদিত ত্রামার তৈবী ও চামডার ঢাকাটি ছোট্ট দিয়ে টানা থাকতো। এর গোলাকার মুণ প্রায় ১১/২ ফুট মত বড়। যন্ত্রটি আবার ত রকমের হয়। (ক) রণভেরী—যেটি যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হত ও (খ) জয়ভেরী—যেটি যুদ্ধ জয়ের পর বাজান হত। রামায়ণে আমরা যুদ্ধ বাণের মধ্যে ভেরীর উল্লেখ দেখতে পাই। বর্তমানে ভেরী যন্ত্রটি লুপ্ত বলা চলে।

দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ শুবির জাতীয় ভেরীর কথায় আমরা রাজা স্মার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর “যন্ত্রকোষ” নামক পুস্তকে ভেরীর বিষয়ে লিখেছেন—  
“ইহাকে সচরাচর ভডঙ্গ বলে। ইহা দূরবীক্ষণের গ্রায় ও তাহারই মত একটি নলের ভিত্তর আর একটি এইভাবে স্তবকে স্তবকে রাখা থাকে, বাজাইবার সময় এক একটি করিয়া বাহির করা হয়। ইহা পূর্বে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে নৌবতে ইহার ব্যবহার।”

আমাদের ধারণা ভডঙ্গ যন্ত্রটির ব্যাখ্যা তিনি যা লিখেছেন সেটি সম্ভবত ভুরুঙ্গ বা ভডঙ্গকে ভেরী ধারণা করার কারণেই হয়েছে। সম্ভবত প্রাচীনকালে ভুরুঙ্গ নামে এক জাতীয় ভেরী প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে ভুরী নামে এক প্রকার শৃঙ্গ জাতীয় বাণযন্ত্রের প্রচলন আছে, (covered brass horns used in temples)। এটি শুবির যন্ত্রের বিভাগে পড়ে। এই ভুরীই উত্তর ভারতে ভেরী নামে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

আমরা Mr. Sahinda-র লেখা Indian music নামক পুস্তকটিতে **ভীর** (Bheer) নামে একটি যন্ত্রের নাম পাই। তিনি লিখেছেন “Bheer—Is one of the most ancient flutes of mythological interest. It

was played in the marriage of Mahadeo and Parbati. It is made entirely of copper and has a shrill sound”.

রাজা সাহেব এই ভেরীর বিষয়ই তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে দুই প্রকারের ভেরী প্রচলিত ছিল। একটি দামামা জাতীয় ও অপরটি তুরী জাতীয়। দামামা জাতীয় ভেরীকে যদি আমরা ভেরী বলি ও তুরী জাতীয়টিকে যদি ভডঙ্গ বলি তবে নামভেদে আকারভেদ সহজতর হয়। আমাদের কাছে হুই প্রকার ভেরীর কোন প্ৰেচ না থাকায় পাঠকদের কাছে এই যন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি পরিবেশনে অক্ষম।



মুরলী

**মুরলী** ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে যে বাঁশী দেখা যায় সেই আড় বাঁশীই মুরলী নামে পরিচিত। মুরলীকে উর্দু ও কাশ্মীরী ভাষায় “ভাজী-নাই” বলা হয়। এই বাঁশীর মাঝখান ফাঁপা। বাঁশীর বাঁশে কোন পাব অর্থে গাঁট থাকে না। মুরলী ছোট বড় নানা আকারের দেখা যায়। মুরলী ভারতের অতি প্রাচীন সুরের বন্ধ। বাঁশীর গোড়ার ফাঁকা ছিদ্রটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। গোড়ার (শিরোভাগের) তিন চার আঙ্গুল বাদে ফুঁ দেবার জগ্ন ফুঁকার-রন্ধ থাকে। এই রন্ধে ফুঁ দিয়ে বাঁশীটি বাজান হয়। এই ছিদ্রের কম বেশী চার আঙ্গুল বাদে পর পর ছ’ সাতটি ছিদ্র থাকে, এই সমস্ত ছিদ্রগুলিকে স্বরছিদ্র বলা হয়। এই ছয়টি ছিদ্র থেকেই ফুঁএর বলের (বায়ুর চাপের) কমবেশীতে ও আঙ্গুলের চাপের তারতম্যে স্বরধ্বনির বিচিত্রতার বিকাশ ঘটে।

মুরলী দু হাত দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে ধরে বাঁ হাতের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে গোড়ার দিকের তিনটি স্বরছিদ্র এবং ডান হাতেও অনুরূপভাবে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে আগার দিকের তিনটি স্বরছিদ্র ইচ্ছামত চাপা দিয়ে বাজান হয়। বাঁশীর পিছনে বুড়ো আঙ্গুলের ঠেকানো রাখা হয়। বাঁশীতে ফুঁ দেবার কায়দা গুরুত্ব আছে শিখে নিতে হয়, এসব বিষয় লিখে বোঝান সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রচলিত মুরলীর সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত মুরলীর কিছু তফাৎ দেখা যায়। রত্নাকরে হরকমের মুরলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমটি দু হাত লম্বা। শিরোভাগে একটি ফুঁ দেবার এবং মুক্তপ্রান্তে চারটি স্বরপ্রকাশের ফুঁটো থাকে।

দ্বিতীয়টির বর্ণনায় দেখা যায় সাড়ে বাহার আঙ্গুল ৩১ যব লম্বা। মাথা থেকে ৩৫ আঙ্গুল পরে কুঁ দেবার ফুটো, এই ফুটোটির বাস ১৪ আঙ্গুল বড়। আটটি ফুটো স্বরপ্রকাশের জন্য থাকে ও ফুটোগুলির বাস ৩৬ যব হয়। স্বর প্রকাশের ফুটোগুলি ১৪ আঙ্গুল পর পর থাকে।\*

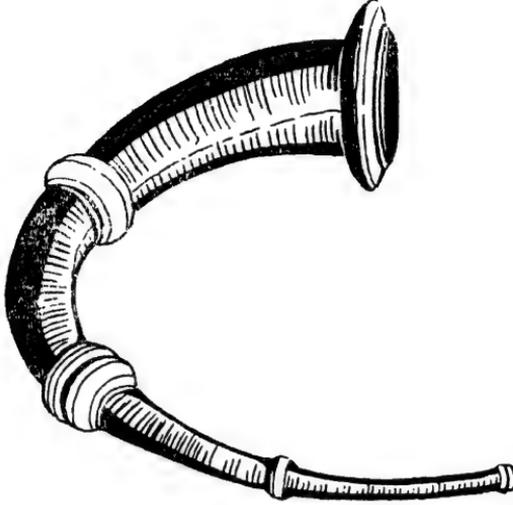


মোচঙ্গ

**মোচঙ্গ** ॥ যন্ত্রটি ত্রিস্তরের আগার মত দেখতে। Jews' Harp-এর সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। বিস্তৃত লোহা থেকে তৈরী হয়। লোহার একটি সরু পাত যন্ত্রটির মাঝখানে লাগান থাকে। যন্ত্রের মোটা দিকটা বা হাতের মাঝের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুলে চেপে ধরে এবং সরুদিকটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে ডান হাতের প্রথম আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে রাখা লোহার পাতে ঘা দিয়ে বাজান হয়। একতারার মত একটি স্বরই যন্ত্রটি প্রকাশ করে। আঘাতের সঙ্গে প্রথাসের বল ও দীর্ঘতার উপর স্বরের হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং ডান হাতের আঘাতের কায়দার ও প্রথাসের বিশিষ্ট ব্যবহারের ওপর এর বাদন কুশলতা নির্ভর করে। যন্ত্রটির ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে সমবেত বাজমণ্ডলিতে এর অংশগ্রহণে। বাজ মণ্ডলিতেই এর ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ তবে তবলা ও পাখোয়াজের সাথে কদাচিত একে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে অংশ গ্রহণে দেখা যায়। কুশলী বাদকেরা এই যন্ত্রে পথাবজের সঙ্গতে নানা প্রকার চন্দ্র বৈচিত্র্য দেখান। যন্ত্রটির মাঝের লোহার পাতটিতে মোম অথবা ময়দার মণ্ড দিয়ে স্তর বাঁধা হয়। হায়দ্রাবাদের পার্বত্যাঞ্চলে চেকু জাতির বা বংশনির্মিত মোচঙ্গাকৃতির একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁদের বাঁশের তৈরী এই মোচঙ্গের নাম **টৌগারাম্মা**। এই যন্ত্রে ষাঁরা বেশী রিয়াজ করেন, তাঁরা প্রায়শই দাঁতের রোগে বা হাঁপানিতে ভুগে থাকেন। এই কারণেই অধুনা উত্তর ভারতে এর বাদকসংখ্যা অতি নগণ্য। দক্ষিণ ভারতে এখনো কিছু সংখ্যক বাদককে এই যন্ত্র বাজাতে শোনা যায়। মহীশূরের সীতারাম আইয়ার এই যন্ত্রের একজন দক্ষ বাদক।

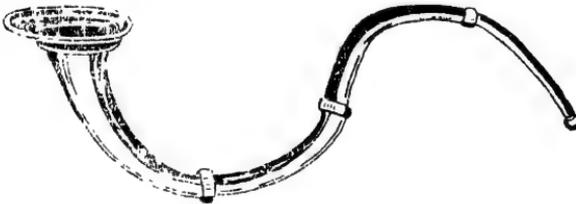
**রগশূঙ্গ** ॥ চলতি ভাষায় এটিকে **রগশিঙা** বলে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। এই শিঙা তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতু থেকে বড়

আকারে তৈরী করা হত। সৈন্যদের আহ্বান করা ও উৎসাহ দেওয়ার কাজে এই শিঙা ব্যবহার করা হত। এই শিঙা আকারে অনেকটা ইংরাজি 'S' এস্



রঙ্গশিঙা

অক্ষরের মত। এর পরিবর্তে বর্তমানে বিউগল্ (Bugle) ব্যবহৃত হয় ফুঁ এর কম বেশীও পরই স্বরধ্বনির তারতম্য নির্ভর করে। (শৃঙ্গ দেখন)



রামশিঙা

**রামশৃঙ্গ বা রামশিঙা** ॥ রামশিঙা সাধারণত ধর্মীয় শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নগর সংকীর্ণনে এর ব্যবহার ক্চিৎ নজরে পড়ে। রঙ্গশিঙা থেকে এগুলির ব্যাসের আকার বড়, আওয়াজও মোটা। উভয় শিঙার বাজাবার কায়দা একই। এগুলি আকারে বড় তামা বা পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরী। দক্ষিণে ও উত্তরে প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পূজা ও উৎসবের সময় রামশিঙাকে বাজাতে দেখা যায়। রামশিঙাকে মঙ্গল্য যন্ত্র বলা হয়।

**রৌশনচৌকী** ॥ এবড় সন্মিলিত বাগ্মযন্ত্রের সমবেত বৈঠকের নাম রৌশন-চৌকী। “রৌশন”<sup>১</sup> শব্দটি ফারসী শব্দ অর্থ প্রকট বা জাহির করা অথবা চমকপ্রদ এবং চৌকী শব্দের অর্থ বৈঠক বা আখড়া। রৌশনচৌকী এই দুটি শব্দের মিলিত অর্থ এক সন্মিলিত বাগ্ম বৈঠকের মাধ্যমে চমকদার স্বর প্রকাশ করা; এই বাগ্ম



রৌশনচৌকী

বৈঠকের কায়দা পারশ্ব থেকে আমদানি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। রৌশনচৌকীর বৈঠকে নয়টি বাগ্মযন্ত্রের সন্মিলনে স্বর প্রকাশ করা হত এবং এই বাদনরীতি সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক আনীত বলা হয়। পুরু রাজার রাজত্বকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত। The story of Indian Music and its instruments by Ethel Rosenthal page 84-এ লেখা হয়েছে— “The Naubat implying a combination of nine instruments is supposed to have been invented by Alexander the Great…… A special apartment known as Naubat or Naqqara khana is usually reserved for Musicians about the Gate ways lead into the palaces and shrines” গ্রীক সম্রাটের পক্ষে নৌবত শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিপূর্ণ নয় বলে পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন ও তাঁরা এটি আলেকজান্ডারের আবিষ্কৃত বলিয়া মাত্ৰ দেন না।

শানায়ের মত পূজা পার্বনে ও বিশেষ উৎসবে এর ব্যবহার এখনও দেখা যায়। বর্তমানে নয়টি বাগ্মের মিলিত বৈঠক আর বসে না। এখনও অনেক নবাব বা আমীর উমরাহের বাড়ীর ফটকে নৌবতখানা দেখা যায়। আগের দিনে এই নৌবতেই রৌশনচৌকীর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে বিলাহাদি উৎসবে সেই অল্পকরণে অনেকে তাঁদের বাড়ীর সদর দরজায় বা তার পাশে সাময়িক ভাবে বাঁশের মাচায় নৌবতখানা তৈরী করেন ও তার ওপর শানাইবাদকদের বৈঠক বসান। এই বৈঠককেও নৌবত বলা হয়। চলতি ভাষায় এই মাচা নবৎখানা নামে পরিচিত। “Naubat—Instruments of Music, sounding

১ ওদ্ব হিন্দি শব্দকোষ—মুহম্মদ মুস্তাফা খাঁ মদাহ।

at the Gate of a great man at certain intervals"—Students Practical Dictionary (Urdu-English Dictionary) by Ram Narain Lal 1947, 11th edition.

অনেকে বলেন নববাদ কথাটি থেকে নৌবত শব্দটি এসেছে। যদিও আসলে নৌবত শব্দটি আরবা শব্দ তবু এঁরা বলেন—নব অর্থে নয় ও বাদ অর্থে বাজ এইভাবে নয়টি বাজের সম্মিলন ঘটে বলেই এর নাম নববাদ। আমাদের ধারণা নৌবত শব্দটি প্রচলিত হবার পর নববাদ কথাটি এই বাজ বৈঠকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

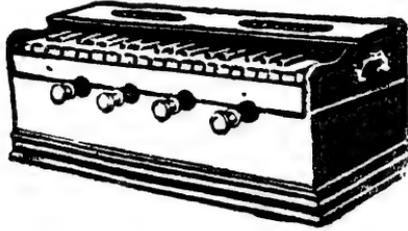
আকবর বাদশাহের নৌবতে নয়টি শানাই বাজান হত বলে শোনা যায়। আবুল ফজলরূত আইন-ই-আকবরিতে বলা হয়েছে যে সম্রাট আকবরের নৌবতে ১৮ জোড়া কুর্ণ, ২০ জোড়া নাকারা, ৭টি ঢোল, নয়টি শানাই, ২টি নান্দেরা, ৬টি কার্ণা, ২টি শিঙ্গা ও ৩ জোড়া ঝাঁবা ব্যবহৃত হত।

অল্পতর দেখা যায় নৌবতে সাধারণত নয়জন বাজিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা যথাক্রমে—দুই জন শানাই বাদক, দুজন নাকারা, একজন ঝাঁবা, একজন জামেদার (অর্থে পরিচালক), একজন তালিবাদক ও একজন সহকারী শানাই বাদক অর্থে শ্রতিশানাই বাদক। এই নয়জনে নৌবত। জানা যায় এই রৌশন চৌকীতে যে সব শানাই বাজান হত তাদের আকার ছোট ছিল ও তীব্র স্বর প্রকাশ করতো। পাশ্চাত্ত্য ওবো (oboe) যন্ত্রের সঙ্গে এই ধরনের শানায়ের মিল আছে বলা হয়।

**লয়বাঁশী** ॥ রাজা স্মার শেরীজুমোহন ঠাকুরের যত্নকোষে এই বাঁশীর নাম পাওয়া যায়। বিশেষ ধরনের বাঁশ থেকেই এই বাঁশী তৈরী হয়। সকল বাঁশীর মত এর মুখ চ্যাপ্টা হয় না। হাওয়া বেরোবার কোন পৃথক ছিদ্রও এতে থাকে না। গোড়া ও আগার মুখ সম্পূর্ণ খোলা থাকে। গোড়ার দিকের খোলা মুখ কাত করে ধরে ফুঁ দিতে হয়। বাঁশীটি একটু বেঁকা করে ধরা নিয়ম। অনেকটা টিপারা বাঁশীর কায়দায় বাজান হলেও টিপারা ফুঁট থেকে এগুলি আকারে অনেক ছোট। বাজাবার কায়দার কিছু পার্থক্য আছে। এই ধরনের বাঁশী আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত। অনেকের ধারণা এই ধরনের বাঁশীর মুখ চ্যাপ্টা থাকতো ও আকারে অনেক ছোট হত।

**হারমোনিয়ম** : হারমোনিয়ম একটি পাশ্চাত্য স্বর-যন্ত্র। যন্ত্রটি বায়ু-চালিত একে Aerophones বিভাগে ধরা হলেও পাশ্চাত্যে এটিকে Reed Organ

family, Reed wind family, বা Free Aerophone হিসাবে ধরা হয়েছে। এটি ফ্লুইড-এর সাহায্যে না বাজলেও আমরা একে বায়ু-চালিত যন্ত্র বলে শব্দের যন্ত্রের বিভাগে রাখতে বাধ্য হয়েছি। বর্তমানে ভারতে যে বক্স-হারমোনিয়ম প্রচলিত সেটি ইউরোপীয় টেবিল হারমোনিয়মের অন্তর্করণে নিমিত সহজতর একটি সংযোগী যন্ত্র। যন্ত্রটি সভ্য যন্ত্রের বিভাগে পড়ে।



হারমোনিয়ম

হারমোনিয়মের প্রথম আবিষ্কারকদের ক্ষেত্রে আমরা কোপেনহেগেন শহরের শব্দ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ডাঃ ক্রাটজেনস্টেইন ( Dr. Kratzenstein ) ও জি. জে. গ্রেনী ( G. J. Grenie ) এই দুজনের নাম পাই। এঁরা চীন দেশের চ্যাং যন্ত্রের অন্তর্করণে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝে ( ইং. ১৭৫৬—১৮৩৭ ) এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনে অগ্রণী ছিলেন।<sup>১</sup> গ্রেনীর আবিষ্কার বলে এই যন্ত্রটি তখন Orgue Expressif নামে প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সের বহু স্থানে হারমোনিয়ম আজও Orgue Expressif নামেই চলছে। হারমনি প্রসারক হয়েও যন্ত্রটি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত হারমোনিয়ম নাম পায় নি। এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে Jacob Estay, Jacob Alexandre, Victor Mustel প্রভৃতি বহুজনের নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি হারমোনিয়ম নাম পাবার আগে Adelophone, Melodica, Harmonine, Harmonica প্রভৃতি বহু নামে চলতে থাকে।<sup>২</sup>

ইং. ১৮৪০ সালে প্যারিসের ( A. Debain ) এ ডিবেঁ নামে এক ভদ্রলোক এই যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের Wind Channel প্রবর্তন করেন। এই চ্যানেলের মাঝ দিয়ে stopper-এর সাহায্যে হারমোনিয়মের রীডগুলির বিভিন্ন দলে পৃথক পৃথক ভাবে হাওয়ার ধাক্কা পৌঁছাত। এই বৈশিষ্ট্যের বলে স্বকোশলে তিনি যন্ত্রটির

১। Harvard Dictionary of Music 2nd Ed. 1970, Page 371.

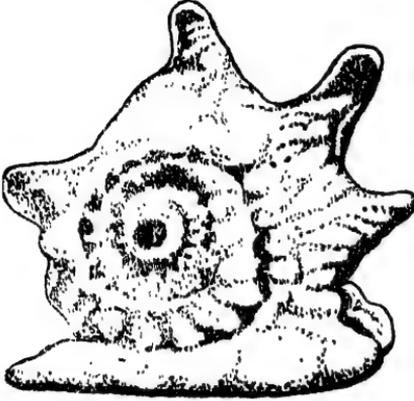
২। The Oxford Companion to Music by Percy A. Scholes. 9th Ed. Page 870.

উদ্ভাবক বলে নিজের নামে Patent Registration করিয়ে নেন ও যন্ত্রটির হারমোনিয়ম নাম রাখেন।<sup>৩</sup> সরকারি সনদ ও কৃতিত্বের বলে তাঁর নামটাই এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলে পরিচিতি পায়। যদিও আসলে হারমোনিয়ম কোন একজনের কৃতিত্বে গড়ে ওঠে নি। নানা জনের নানা দানেই এটি গড়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে এই যন্ত্রটি টেবিল হারমোনিয়ম রূপে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে আসে, এর শেষের দিকে ডেয়ার্কিন কোং-র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিকল্পনায় এটি বন্ধ হারমোনিয়মে পরিণত হয়। ( ভিন্নমতে মোহিনী ফ্লুট কোং'র মোহিনীবাবু।) প্রথমে এর (Bellow) হাফরটি বাক্সের ওপরে রাখা হত। টেবল-হারমোনিয়মে হাফরটি (Bellow) পায়ে করে চালান হত। বর্তমানে এটি হারমোনিয়ম-বাক্সের পিছন দিকে রাখা হয়। সে সময়ে এক একটি প্লেটে দুটি করে একসুরে বাঁধা রীড রাখা হত। বর্তমানে স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়মের প্রবর্তনে Dass Bros.-এর সিদ্ধেশ্বর দাস, জি. এন দাস, ধীরেন দাস প্রভৃতির নাম দেখা যায়।

আমাদের দেশে যন্ত্রটির জনপ্রিয়তার কারণ : (১) অগ্ৰাণ্ণ যন্ত্রের দামের তুলনায় সাধারণ হারমোনিয়মের দাম খুব বেশী নয়। (২) অপরাপর তার যন্ত্রের মত স্বর বাঁধার জগ্ৰ দীর্ঘ সময় লাগে না বরং যন্ত্রটি নিজেই অল্প যত্নে স্বর মেলাতে সাহায্য করে। (৩) রীডের ওপর আঙ্গুল টিপলে সহজেই স্বর প্রকাশ পায়। (৪) অল্প সময়ে বাজাতে শেখা যায়। বলা বাহুল্য কুশলী বাদক হতে যথেষ্ট শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন হয়। (৫) স্বর-সহযোগীতায়, একক বাদনে, বৃন্দবাদনে, লহরার বাজে, নৃত্যাদির সহযোগীতায়, কৃতান্তসরণ প্রভৃতিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। (৬) সব সময় নির্দিষ্ট স্বরটিকে এক ভাবে পাওয়া যায়, স্বর-বিচ্যুতির ভয় থাকে না। (৭) নবীন সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে ও সাধারণভাবে কণ্ঠসাধনার সহযোগীতায় বিশেষ কার্যকরী।

এই যন্ত্রের প্রতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণীদের উদাসীনতার কারণ : (১) ভারতীয় নির্দিষ্ট স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ইকোয়ালী টেম্পার্ড স্কেলের (সমান স্বরাস্তরযুক্ত ঠাটের স্বরগুলি) স্বরসমষ্টির সঠিক মিল নাই। (২) স্বরের দোলন, মীড়, গমক প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার প্রকাশ করা যায় না। (৩) রাগালুয়ায়ী বিশেষ শ্রুতিযুক্ত স্বর প্রকাশ করা যায় না। (৪) সহযোগীতার সময় অনেক ক্ষেত্রে গায়কের স্বর বেশুরো মনে হয়, (যদিও তানপুরার সঙ্গে ঠিক মিল পাওয়া যায়)। রাগের সঠিক শ্রুতি হারমোনিয়মে প্রকাশ করার অভিশ্রায়ে Clements সাহেব ২২ শ্রুতি

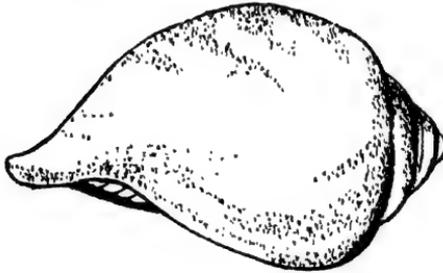
প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন রীড দেওয়া হারমোনিয়ম তৈরী করে ভারতীয় কণ্ঠ-সঙ্গীতবিদদের সঙ্গে বাজাবার ব্যবস্থা করেও কঠে প্রকাশিত রাগোচিত শ্রুতিকে সঙ্গতের সময়ে (বিশেষ শ্রুতিযুক্ত রীডের ব্যবহারেও) মস্তকভাবে ধরতে পারেন নি। (৪) এইসব কারণে ভারতীয় পণ্ডিতেরা যন্ত্রটিকে বেসরো বলে থাকেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও একথা মানেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানেই ছেদ টানছি।



গোমুখশঙ্খ



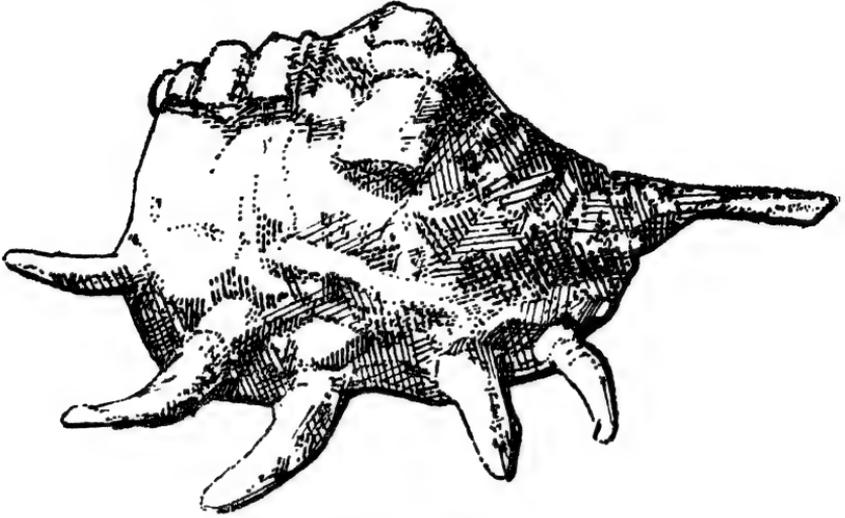
গৌবশঙ্খ



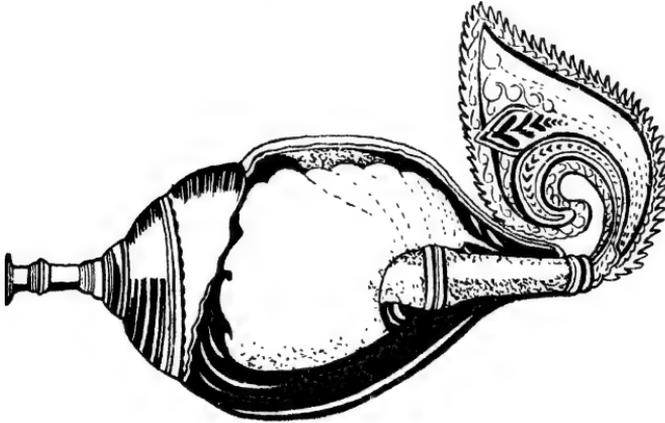
সাধারণ শঙ্খ

**শঙ্খ :** আমরা ভগবান বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ দেখতে পাই। এর আবিষ্কার নাম অথবা সাল তারিখ পাওয়া সম্ভব নয়। এই স্তমির জাতীয় বায় অতি প্রাচীন, যন্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল বা ধাতুর ব্যবহার যখন মাহুঘের অজানা ছিল, এই প্রকৃতি-প্রসূত যন্ত্রটি মানব সভ্যতার সেই আদিম অবস্থাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুদ্ধ ভাষায় একে কন্ধু বলা হয় (যদিও দক্ষিণ ভারতে সকল রকম শিল্পার সাধারণ নাম কন্ধু)। পূজা পার্বনে, সকল প্রকার স্তম্ব কাজে ও উৎসবে এর ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুদের দেব মন্দিরে, গৃহস্থের ঘরে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজাবার রীতি

প্রচলিত। শঙ্খকে চলতি ভাষায় শাঁখ বলা হয়। প্রাচীনকালে শঙ্খ যুদ্ধের সময় ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম, অর্জুন দেবদত্ত এবং অন্টাণ্ড নামী রথী মহারথীরা প্রত্যেকেই এক একটি বিভিন্ন নামের শঙ্খে ধ্বনি তুলেছিলেন।



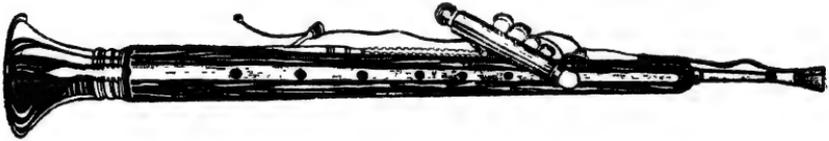
বৃহৎ পঞ্চমুখীশঙ্খ



অলংকরণশঙ্খ

শঙ্খ কয়েক প্রকারের দেখা যায়। তন্মধ্যে গোমুখশঙ্খ, গৌরীশঙ্খ, পঞ্চমুখীশঙ্খ, ধ্বলশঙ্খ, পানিশঙ্খ ইত্যাদি প্রশিদ্ধ। গোমুখ আকৃতিতে

গরুর শিংযুক্ত মুখের আকারের হয়। প্রায় একই প্রকার আকারের ছোটগুলিকে **গৌরীশঙ্খ** বলা হয়। এই শঙ্খ বাজাবার বিশেষ কৌশল আছে; শাঁখারীদের কাছে শিখে নিতে হয়। গোমুখ ও গৌরীশঙ্খকে হিন্দুরা পবিত্রভাবে ব্যবহার করেন। **দক্ষিণাবর্তগোমুখ** কচিং দেখা যায়, এই শঙ্খকে দেবদেবীর মত আসনে রেখে পূজা করা হয়। সাধারণ শঙ্খও কচিং দক্ষিণাবর্ত হ'য়ে থাকে। দক্ষিণাবর্ত শাঁখের পেটটি ডানদিকে ঘোরান থাকে। পঞ্চমুখীশঙ্খের ডানদিকে পাঁচটি আঙ্গুলের মত বন্ধ রজ্জ মুখ থাকে। কোন কোন পঞ্চমুখীতে একটি লেজও থাকে। অনেকে লেজযুক্ত পঞ্চমুখীকে **ষট্‌পদী** বলে থাকেন। দক্ষিণভারতে একপ্রকার অলঙ্কৃতশঙ্খ দেখা যায়, এর ফুংকার রঞ্জ পিতল, তামা বা রূপার মুখ লাগান হয়। দক্ষিণের এই শঙ্খ **ধ্বলশঙ্খ** বা **অলংকরণশঙ্খ** নামে পরিচিত। ধ্বল শঙ্খের গায়ে নানা প্রকার নক্সার কাজ দেখা যায়। **পানিশঙ্খ** দেবদেবীর আর.তর সময় মাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি বাজান হয় না। বাঙ্গালায় কয়েকটি নাট্যশালায় ও সঙ্গীতাসরে **শঙ্খতরঙ্গ** বাজান হয়েছিল। এই তরঙ্গে সাত স্বরের অথবা বার স্বরের বারটি শাঁখে কোন এক প্রকার রাগ বাজান হয়।



### শানাই

**শানাই বা সানাই :** খৃষ্টজন্মের ৩০০০ তিন হাজার বছর পূর্বের ইজিপসিয়ান কবরের স্মৃতিস্তম্ভের চূড়ায় (Nay)\* নাই জাতীয় বাঁশির ছবি দেখা যায়। অনেকের ধারণা এই নাই থেকেই শানাই আবিষ্কৃত। নাই যন্ত্রটি সম্বন্ধে Indian Music নামক পুস্তকে লেখা হয়েছে "Nai has been the theme of all poets and love deities It is the invention of Omar Aiyyar to ensnare maidens with its magic sounds. It is exactly like the barrels of a gun and has seven openings" Page 99. এই পুস্তকে শানাই যন্ত্রের আবিষ্কারকের নামও লেখা হয়েছে।

\* "The Arabic Mizmar and Parsian word 'Nay' stands for any instrument of the wood wind family in case of Reed pipe also." Studies in Oriental Musical Instruments by Henry George Farmer, Ph. D. (Its Series) 1931 page 58.

Senai is the remarkable invention of **Hakim Bu Ali Senaichi**. Senai is more or less similar to Uns in appearance. Both tube and cup are made of black-wood. The metal needle, ivory disk and blade of grass are adjusted on top as in Uns, only they vary in sizes. Senai is played in the temples and in a band called Naubat. Page no. ১৩. এখানে আমরা ষা'কিম বু আলি শানা'ইচর নাম দেখতে পাই। কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দিহান। অনেকের ধারণা, 'নাই' থেকেই শানা'ই এসেছে। এটি বাদশাহদের প্রিয় ছিল এবং সেই থেকে শাহ শাহের 'শা' অক্ষরের সঙ্গে 'নাই' যুক্ত হয়ে শানা'ই হয়েছে। 'অন্তেরা বলেন, 'সিয়াহি' অর্থে কাল, ও 'নাই' অর্থে বিশেষ বাঁশী। কালো রং-এর বিশেষ বাঁশী বলে এর নাম (সিয়াহি + নাই = সিয়াহিনাই এবং সেই থেকে) "সানা'ই" রাখা হয়েছে। পারস্যের এই 'নাই' যন্ত্রটি রাড দেওয়া বাঁশী এবং শানা'ই যন্ত্রটিও রাড দেওয়া। অনেকের ধারণা যে শানা'ই যন্ত্রটি নাই থেকেই এসেছে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা কঠিন।

নানটি এভাবে জন্ম নিলেও আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মনে করেন, আমাদের প্রাচীন **মধুকরী** নামক বাঁশীটিই নাম ভেদে ও আকার পরিবর্তনে শানা'ই নামে প্রচলিত হয়েছে।

ভারতে মধুকরী যন্ত্রটিই শানায়ের মত বাজানো হ'ত। শানা'ই আকারে ধূঁতরো ফুলের মত, যন্ত্রটির স্বরধ্বনি সকলকেই মোহিত করে। এই সুন্দর ধ্বনির কারণে এর আর এক নাম **সুনা'দী**। উৎসবে ও মাঙ্গলিক অর্চনানে এর ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ, তবে আজকাল সঙ্গীতাসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনে একে অংশ নিতে দেখা যায়। যন্ত্রটি বাহির্দারিক হলেও বর্তমানে কয়েকজন কুশলা বাদক রাগ পরিবেশনে এই যন্ত্রটিকে সভা শব্দের সম্মানে উন্নীত করেছেন। যন্ত্রটি এককভাবে বাজে না, স্বরের জমজমাট বজায় রাখার কারণে মূল গ্রামিক স্বরটিকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে আর একটি শানায়ের বাজান হয়। এই একস্বর পরিবেশক সঙ্গী শানা'ইটিকে **শ্রুতিশানা'ই** বলে। বাদনকালে মূল শানা'ইবাদকের পশ্চাতে আর একজন পরিবেশক এই শ্রুতিশানা'ই বাজিয়ে থাকেন। শানা'ই-এর সঙ্গে সঙ্গত করার জগু বাঁশীর আকারের দুটি তালবাণ বেজে থাকে। এর একটি অপরটি থেকে ছোট। এগুলিকে নাকাড়া বা নাগারা বলা হয়। নাকারার বড়টিকে **জিল** ও ছোটটিকে **ধুমা** বলা হয়।

শানাই লম্বায় সাধারণত ১১ ফুট থেকে ২ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর মুক্ত প্রান্তের ওপর দিকে ৮৯টি সন্ধ ছিদ্র থাকে, এর মধ্যে ৭ (সাতটি) ছিদ্র প্রয়োজনে লাগে এবং বাকি ১২টিকে মোম দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। এর ফুংকার স্থানে রীড (স্বর চিহ্ন) অর্থে জিভ পরান হয়, এই জিভ বিশেষ এক প্রকারের **পালাঘাত** থেকে তৈরি হয়। বাজাবার আগে ফুংকার রঞ্জের কাছে হাতের দাঁতের সন্ধ মুখের তিতর এই জিভ পরান হয়। সাতটি ছিদ্র থাকলেও ২১ সপ্তকের কড়িকোমল প্রভৃতি সমস্ত স্বরই এতে প্রকাশিত হয়। ফুঁ এর কম বেশীর ওপর এবং স্বর-রঞ্জে আঙ্গুলের চাপের কম বেশীর ওপরই এতে বিভিন্ন স্বর প্রকাশ পায়।

আকবরের সময় প্রসিদ্ধ শানাই বা সুরনাই বাদক হিসাবে উস্তা মহম্মদের নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বারানসীর (Benares) বিলাতুস ভাতাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

**শৃঙ্গ বা শিঙা :** সংস্কৃত শৃঙ্গ শব্দ থেকেই শিঙা কথাটি এসেছে। শিংওয়াল জন্তুদের শিং থেকে তৈরী হ'ত বলেই এর নাম শিঙা। দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে আমরা শিঙা যন্ত্রটি দেখতে পাই। যন্ত্রটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন আমাদের ধাতুর ব্যবহার জানা ছিল না তখন নানা প্রকারের জীবজন্তুর হাড়, শিং, চামড়া প্রভৃতি থেকেই বাজাদি নিমিত হত। বর্তমানে শিঙা পিতল, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। অতীতে শিঙা, সংকেত জ্ঞাপনে, দূরাস্থানে, জনসমাবেশ একত্রীকরণে ও যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে পূজায়, উৎসবে ও ব্যসনে এদের ব্যবহার দেখা যায়। ভারত ছাড়াও অগ্রাণ্ড দেশে শিঙার ব্যবহার দেখা যায়। পারস্যের **কারগে**, হিব্রুর **কেরেণ**, গ্রীসের **কেরাণ**, রোমের **কর্ণু**, ফ্রান্সের **কর**, জার্মানি ও ইংলণ্ডের **হর্ন**, ওয়েলসের **কর্ন**, হাঙ্গেরীর **কারুং (Kurt)** প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও আমাদের শিঙার মত দেখতে। বর্তমানে শিঙার বদলে অনেক স্থানে বিউগ্লে ও ট্রাম্পেট (Bugle & Trumpet) ব্যবহৃত হয়। সাধারণ শিঙা ছাড়া অগ্রাণ্ড বিশেষ বিশেষ শিঙার কথা অগ্রত লেখা হয়েছে।



সরল বাঁশী

**সরল বাঁশী :** আমাদের সরল বাঁশী পারস্যে আলগোঝা নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন এটি পারস্য থেকে আনদানি করা হয়েছে। অনেকে

বলেন এটি প্রাচীন ভারতীয় বাঁশী, পারস্য থেকে আমদানি করা হয় নি। পাশ্চাত্য দেশের ফ্লাজিওলেট (Flageolet) রেকর্ডার অথবা (Fipple Flute) বাঁশী আমাদের সরল বাঁশীর অনুরূপ, মুরলীর মত এটিতেও ছ' সাতটি ফুটো থাকে। এই ফুটোগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় স্বর-রঞ্জ বলা হয়। মুরলী বাঁশীর যে ফুটোতে ফুঁ দিয়ে বাজান হয় অর্থাৎ মুরলী বাঁশীর ফুঁকার রঞ্জের স্থানে এই বাঁশীর বায়ুরঞ্জ (অর্থাৎ হাওয়া বেরোবার ফুটো) থাকে। সেই কারণে বায়ুরঞ্জে ফুঁ না দিয়ে এই বাঁশীর মুখে অর্থাৎ একেবারে গোড়ার দিকে জ্বইশেলের মত চ্যাপ্টা জায়গাটিতেই ফুঁ দিতে হয় এবং হাওয়া-ফুটোটি (বায়ুরঞ্জটি) খোলা রাখতে হয়। বাঁশীটি সোজাভাবে অর্থে সরল ভাবে ধরে বাজান হয় এবং সেই কারণেই এর নাম সরল-বাঁশী। হাওয়া-ফুটো ছাড়া এই বাঁশীতে আরও ছ' সাতটি ফুটো (স্বরছিদ্র) থাকে। ডানহাতের চারটি আঙ্গুল গোড়ার দিকের চারটি ফুটোয় ও বাঁহাতের তিনটি আঙ্গুল আগার দিকের তিনটি ফুটোর ওপর রাখা হয়। বাকি সব কায়দাই মুরলীর মত।

**স্বর-বংশী :** ইংরাজীতে একে Pitch Pipe বা Tuning Whistle বলে। সাধারণত: A, G, D, E, এই চারটি Note (স্বর) এতে পাওয়া যায়। এই চার বা ছয় স্বরের মধ্যে যে স্বরটিতে আপনার যন্ত্র বেঁধে নিতে চান সেই নির্দিষ্ট ফুঁকার ছিদ্রে ফুঁ দিলেই বাঁশীর সেই অংশ থেকে সেই স্বর বনি পাওয়া যায়। আর এক প্রকারের স্বর-বংশী দেখা যায় যেগুলিকে (Chromatic Pitch Pipe) ক্রমিক-স্বর-বংশী বলে। ১৯ শতকে এই পীচ-পাইপটি Eardsley's Patent Chromatic Pitch Pipe নামে প্রচলিত হয়। এই বাঁশীর সাহায্যে আপনার ইচ্ছামত যে কোন স্বরের (note-এর) সঙ্গে আপনি আপনার বাণ যন্ত্র মিলিয়ে নিতে পারেন। বাঁশীর মূলপ্রান্তে একটি স্বর-নির্দেশক কাঁটা এবং একটি চলমান স্বরনামাক্ত ছোট অর্ধচক্রাকার (Dis) প্লেট থাকে। এই স্বরাক্ত চার্টে খুব ছোট ছোট হরফে স্বরের নাম ও তার মাঝের অর্ধস্বরগুলি চিহ্নিত থাকে। স্বরাক্ত নির্দিষ্ট চাকতিটি সরিয়ে কাঁটাটি নির্দিষ্ট স্বরের উপর নিয়ে এসে বাঁশীতে ফুঁ দিলে আপনার প্রয়োজনীয় স্বরটি পেয়ে যাবেন। যে কোন বাণ যন্ত্রে সুর মেলানোর কাজে এই বাঁশী বিশেষ প্রয়োজনীয়।

## ঘনজাতীয় যন্ত্র

বাণ্যযন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ধাতুর ব্যবহার জানার পরই ধাতব বাণ্যযন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়। ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহারই প্রথম। 'ঘন' শব্দের অর্থ লৌহ, তাই লোহার তৈরী যন্ত্রদের ঘনজাতীয় যন্ত্র বলা হয়। অগ্গাণ্য ধাতুর আবিষ্কারের পর এই জাতীয় অধিকাংশ যন্ত্র বিভিন্ন ধাতুতে ব্যবহৃত হতে থাকলেও, ঘনজাতীয় যন্ত্র নামেই এরা প্রচলিত থেকে যায়। কাঁচ ও বাঁশের বা কাঠের যন্ত্রও পরবর্তী কালে ঘনজাতীয় বাণ্যযন্ত্রের তালিকায় অংশ গ্রহণ করে। মুগুর, কাঠি বা অন্য কোন বস্তুর আঘাতে অথবা পরস্পরের আঘাতে এদের বাজান হয়। অগ্গাণ্য বাণ্যযন্ত্রের মত ঘনজাতীয় যন্ত্রও তিনভাগে বিভক্ত।

### ১। স্বতঃসিদ্ধ

সপ্তসরাব  
বাঁশতরঙ্গ  
মুকুরতরঙ্গ প্রভৃতি

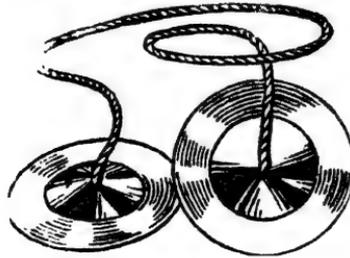
### ২। অনুগতসিদ্ধ

কাসি  
মন্দিরা প্রভৃতি

### ৩। মাল্য

ঘণ্টা  
কাসর প্রভৃতি

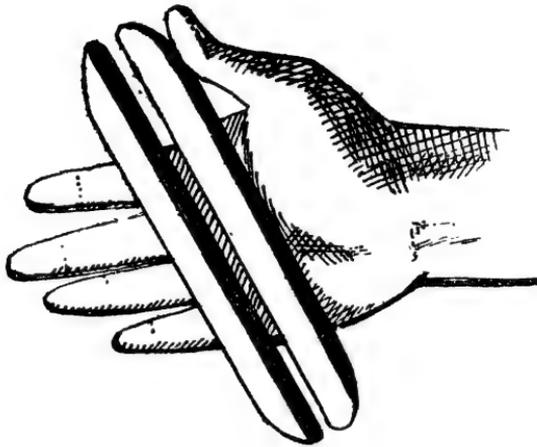
বর্তমানে ঘনজাতীয় সমস্ত যন্ত্রের বিষয় লেখা সম্ভব না হলেও প্রচলিত ও কিছু লুপ্ত যন্ত্রের বিবরণ লেখা হয়েছে।



করতাল

**করতাল :** অনেকটা বাঁকেরই মত। কাঁসা বা পিতল দিয়ে তৈরী দুটি ছোট গোলাকার কিনারহীন খালার আকারের। করতালকে অনেকে খঞ্জনী বলে থাকেন। মন্দিরকেও খঞ্জনী বলা হয়। করতালকে কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নামগানে ও খোলের সঙ্গে সঙ্গতে এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরার মাঝখানটি গভীর কিন্তু করতাল অনেকটা

সমতল তবে মাঝখানটি সামান্য অবতল। করতালকে খরতালী বা খর্তাল অথবা খন্তালও বলা হয়।



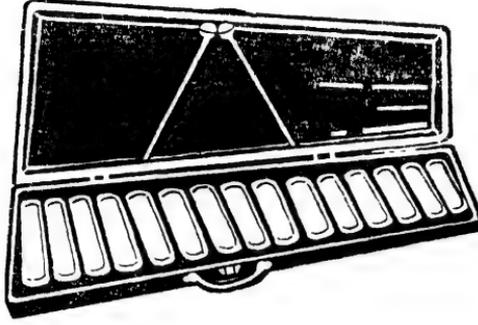
করতালি

**করতালি :** দুটি অর্ধগোলাকার বিগুপ্ত লোহার তৈরী যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রদ্বয়গলের মাঝের অংশ মোটা ও দুদিকের মুখ সরু হয়। যন্ত্র দুটি করতলের মাঝে রেখে হাত কাঁপিয়ে পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়ে থাকে। যাত্রায় জুড়ির গানে অথবা শোভাযাত্রার গানে একে বাজাতে দেখা যায়। অনেকে একে **কর্তাল** বা **খরতাল** বলে থাকেন।

**কত্রো :** খয়ের কাঠ বা বেগুন তৈরী হত। বারো আঙ্গুল লম্বা ও দু আঙ্গুল চওড়া চারটি কাঠের টুকরো, মাঝখানটা মোটা ও শেষ দিকটা কিছু সরু। প্রতি হাতে দুটো করে কাঠি, (একটি মাঝের আঙ্গুলের গোড়ার দিকে ও অপরটি ডগার দিকে) ধরে কজি কাঁপিয়ে বাজান হত। প্রায় করতালির মতই, বর্তমানে লুপ্ত। কাঠে তৈরী হলেও একে ঘনজাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে।

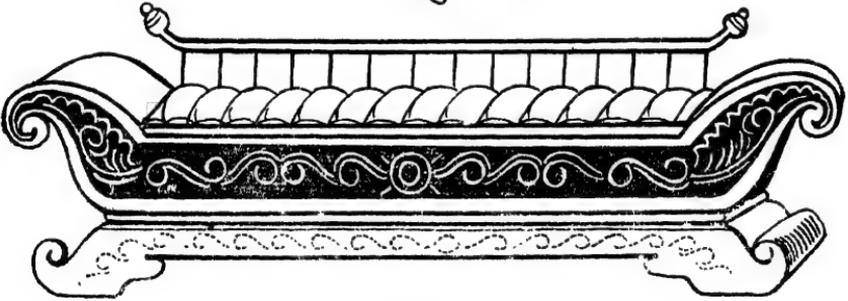
**কাঁচতরঙ্গ :** বাঁশতরঙ্গ ও কাঠতরঙ্গের পর এই কাঁচতরঙ্গের আবির্ভাব। বাঁশতরঙ্গে বা কাঠতরঙ্গে স্বরের পদা (Reed) কাঠের বা বাঁশের টুকরো থেকে তৈরী হয়। কিন্তু কাঁচতরঙ্গে এগুলি মোটা কাঁচের ছোট বড় আকারের টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়। এই যন্ত্র প্রধানত উত্তর ভারতেই প্রচলিত। ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এর প্রচলন দেখা যায়। শুদ্ধ ভাষায় কাঁচতরঙ্গ “মুকুর-তরঙ্গ” নামে পরিচিত। জলতরঙ্গের থেকে অপেক্ষাকৃত

ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হলেও পরিষ্কার ও মধুর স্বরধ্বনি। আড়াই সপ্তক পর্যন্ত এতে বাজান যায়। ১৫ থেকে ১৯ খানি পর্দা সাজান থাকে। দুটি কাঠি দুহাতে



কাঁচতরঙ্গ

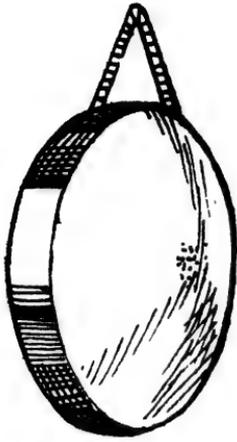
ধরে কাঁচের পর্দার ওপর ঘা দিয়ে বাজান হয়। স্বরধ্বনির অল্পপাতে পর্দাগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়। বাজানার কাঠির মাথাগুলি মথমল দিয়ে মোড়া থাকে।



কাঠিতরঙ্গ

**কাঠিতরঙ্গ :** চলতি ভাষায় এটি কাঠিতরং নামে প্রচলিত। সাধারণতঃ সম্মিলিত বাণ্ণমগুলিতেই এর স্থান। স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপেও একে কচিং তবলার সঙ্গতে বাজতে দেখা যায়। তবলার সঙ্গে অতি দ্রুত গতিতে এটি বাজে। মধুর পরিষ্কার স্বরধ্বনি এ থেকে পাওয়া যায় না বলেই সমবেত বাণ্ণমগুলিতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অনেকে এটিকে বাঁশতরঙ্গের নকল বলে থাকেন। প্রায় ২২ অথবা ২৪ খানি মোটা চওড়া কাঠের পর্দা (স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে)

একটি অর্ধবৃত্তাকার কাঠাসনের ওপর রাখা থাকে ও দুটি হাতে দুটি কাঠের মাথা-মোটা ছোট মুণ্ডর দিয়ে বাজান হয়।



কাঁসর

**কাঁসর :** কাংশ্রময় দাতু অর্থে কাঁসা থেকে তৈরী বলে এই ঘনজাতীয় বাগ্গটিকে কাঁসর বলা হয়। বাঁঝর থেকেই কাঁসরের জন্ম। কাঁসর গোলাকার হয় এবং ধার (কিনার) তোলা ও মোড়া থাকে। এরসর্বত্র সমতল, পৃষ্ঠটি ঈষৎ উত্তল। এর পিঠে বাঁঝরের মত কোন কুঁজ থাকে না। এটি মাল্লয়া বাগ্গ। হিন্দুদের পূজার সময় অঙ্গণে ও প্রাঙ্গণে একে বাজতে দেখা যায়। সংবাদ জ্ঞাপনের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। কাঁসর বাঁহাতে ধরে ডানহাতে মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কাঁসরের উর্ধ্বমুখে দুটি ছিদ্র থাকে সেখানে দড়ি বেঁধে এটিকে

ঝোলান অবস্থায় দড়ি ধরে বাজিয়ের সামনে রেখে বাজান হয়।

**কাঁসি :** কাঁসরের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কেবল ঢোলের সঙ্গে সঙ্গতেই একে দেখা যায়। কাঁসরের মতই একে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁহাতে ধরে ডানহাতে কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কাঁসির আওয়াজ কিছু তীব্র। ঢোলের সঙ্গে তাল দেওয়াই এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। একঘেয়ে তাল ও মাত্রা দেওয়া ছাড়া এর বোলের কোন বিচিত্রতা নাই। ঢোলের নানা কাঠির বিচিত্র লয়দার বোলের সঙ্গে কাঁসিতে একভাবে মাত্রা রেখে যাওয়া কঠিন। বিশেষ অভ্যাস ব্যতিরেকে কাঁসিতে সঙ্গতের সময় একভাবে লয় রক্ষা করা, সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।



কাঁসি

**কাংস অথবা কাংশ্রতাল :** পদ্মপাতার আকারের দুটি গোলাকার কাঁসার থালা ১৩ আঙ্গুল ব্যাসের। তলদেশের মাঝখানে দু আঙ্গুল মুখ, তার মাঝে এক আঙ্গুল নিচু জায়গায় ফুটো এবং সেই ফুটোর মাঝখানে দিয়ে দড়ি পরিয়ে হুহাতে তালি দেওয়ার মত বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত। (অনেকটা দক্ষিণ ভারতের জালরার মত)।

**খঞ্জলী :** ( মন্দিরা দেখুন ) ।

**খুঁজিভালম :** এটিও জালরার মত । অনেকটা আমাদের খঁতালের মত বলা চলে । মাঝখানটা অবতল ( concave ) । এটি দক্ষিণ ভারতের একপ্রকার ঘনবাঘ, গানে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।



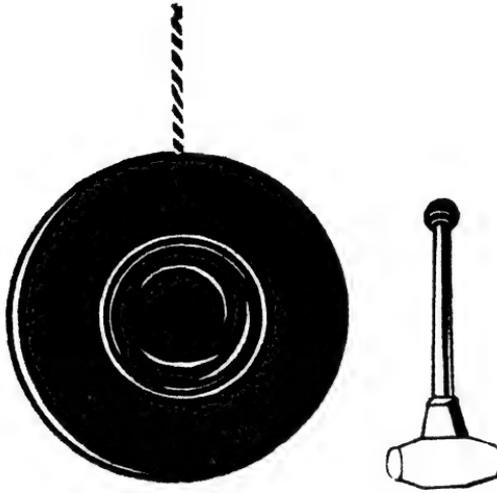
হাতঘণ্টা



ঝুলন-ঘণ্টা

**ঘণ্টা :** প্রাচীন কালে ঘণ্টা সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হত, বর্তমানেও একে ক্চিৎ সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হয় । কোন বিজ্ঞাপনের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই ঘণ্টা দুইকমের— প্রথম **হাতঘণ্টা** এবং দ্বিতীয় **ঝুলান-ঘণ্টা** । দুইকমের ঘণ্টাই কাঁসা, পিতল, রূপা, ব্রোঞ্জ, ভরণ, লোহা প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হয় । হাতঘণ্টার ওপরে একটি দাণ্ডি থাকে । দাণ্ডিটি হাতে ধরে হাতঘণ্টা বাজান হয় । হাতঘণ্টা সচরাচর দেবমন্দিরে পূজা ও আরতির সময় বাঁহাতে ধরে বাজান হয় তাই এটিকেও মাজল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয় । বড় বড় ঘণ্টা গীর্জা ও মন্দিরের

মাঝে লোহার শিকল বা মোটা দড়ি দিয়ে ঝোলান থাকে এবং পূজা ও পাবণে বাজান হয়। এই ঝুলান ঘণ্টা বৃহৎ এবং অতিবৃহৎ আকারের হয়। রাশিয়ার ষাটঘরে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঝুলান ঘণ্টা রাখা আছে।

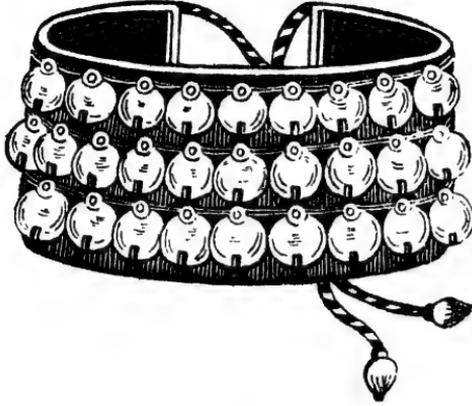


ঘড়ি

**ঘড়ি :** ধাতুর তৈরী একপ্রকার ঘনঘন। গোলাকার, কিনারহীন খালার মত সমতল। প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা কাঁসার চাদর থেকে গোলাকার ভারী এই যন্ত্রটি তৈরী হয়। আকারে প্রায় ৮" থেকে ১৮" ইঞ্চি ব্যাসের দেখা যায়। ঘড়িক শব্দ থেকেই ঘড়ি কথাটি এসেছে। হিন্দুদের দেবদেবীর পূজার সময় এর ব্যবহারের কারণে এটিকে মাঙ্গলা যন্ত্র বলা হয়। সংবাদ প্রচাবে বা সময় নিরূপণের কাজেও একে স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যখন যান্ত্রিক ঘড়ি ছিল না তখন সময় জ্ঞাপনের কাজে এর বিশেষ ব্যবহার ছিল, এবং সেই কারণেই এর নাম ঘড়ি রাখা হয়েছিল। ঘড়ির মাথায় একটি ছেঁদার মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে কাঠের মুণ্ডর দিয়ে একে বাজান হয় অথবা কাঠের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রেখে মুণ্ডরের ঘা দিয়ে বাজান হয়। এর ধ্বনি মধুর ও সুদূরপ্রসারী।

**ঘুঁড়ুর :** শুকু ভাষায় ঘুঁড়ুরকে **স্কুড্র-ঘণ্টিকা** বলা হয়। পেতল, ব্রোঞ্জ বা কাঁসার তৈরী ছোট ছোট অনেকগুলি ঘুঁড়ি খুঁত দিয়ে বেঁধে নাচের সময় পায়ে পরা হয়। এই ছোট ছোট ঘুঁড়ির গুচ্ছকে **তোড়া** বলা হয়। নাচের সময় ঢটি তোড়া

ছপায়ে পরে তাল দেওয়া হয়। নানা ধরণের পা ফেলার কায়দায় তোড়া ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চলে। বিভিন্ন লয়ে ঙ্গত পা ফেলার কায়দাকে তোড়ার



তোড়া

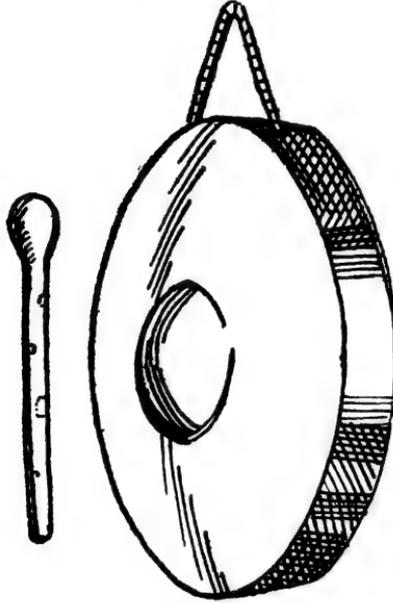
কাজ বলা হয়। গ্রাম্য গীতে যথা মনসার গান, শীতলার গান, তরজাগান প্রভৃতির সময়ে গায়করা অনেকে ঘুঙুরের তোড়া ব্যবহার করেন। ঘুঙুর প্রাচীন যন্ত্র। আজকাল চামড়ার বেণ্টের উপর ঘুটি দিয়ে তোড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**জয়ঘণ্টা :** পুরাকালে যুদ্ধে জয়লাভের পর এই ঘণ্টা ব্যবহৃত হত বলে এর নাম জয়ঘণ্টা রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এই বৃহদাকারের ঘণ্টাগুলি গীর্জার চূড়াঘরে বা হিন্দুর দেব-মন্দিরে ঝুলান থাকে।

**জালরা :** পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরী একজোড়া ঘন যন্ত্র বিশেষ। হরিকথায় ও ভজন গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। দুহাতে দুটিকে ধরে একটির ওপরে আর একটির আঘাত দিয়ে গানে তাল রাখা হয়। দক্ষিণ-ভারতের জালরাকে উত্তর-ভারতে করতাল ও থঞ্জনৌ বলা হয়।

**ঝাঁঝ :** ঝাঞ্জা শব্দ থেকে ঝাঁঝ শব্দটি এসেছে। চলতি ঘন বাণ্যের মধ্যে ঝাঁঝ নামে যেটি প্রচলিত সেটি ঝাঁঝর বা কাঁসর নয়। এই ঝাঁঝ গোলাকার দুটি প্লেট অর্থে কিনারহীন দুটি বড় খালার মত। ঐ খালা দুটির মাঝখানটা হুজ থাকে এবং সেই অবতল স্থানের মাঝে ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুহাতে দুটি খাল বাজান হয়। এগুলি ভক্তিমূলক গানের সঙ্গতে বেজে থাকে। ঝাঁঝ ছুরকম আকারের দেখা যায়। বড় ও মাঝারি ঝাঁঝ ব্যাণ্ড পার্টি বা সমবেত বাণ্যমণ্ডলীতে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের কাংশের আকারের সঙ্গে এর কিছু মিল দেখা যায়।  
ছোট ঝাঁঝকে করতাল বলা চলে এবং বড় ঝাঁঝকে হিংরাজীতে cymbals বলে।



ঝাঁঝ

**ঝাঁঝ :** সমস্ত ঘন জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁঝ অতি প্রাচীন। প্রাচীনকালে ঝাঁঝ লোহা থেকে তৈরী করা হত। লোহার তৈরী বলে বানবানে আশুয়াঞ্জের কারণেই এর নাম ঝাঁঝ রাখা হয়েছিল। এর অপর নাম ঝঞ্জা। বর্তমানে ঝাঁঝ কাঁসায় তৈরী হয়। ঝাঁঝ গোলাকার ও বড় মাপের হয়। এর ধার ( কিনার ) তোলা ও ঝেং মোড়া থাকে। এর পিঠ সামান্য উত্তল থাকে এবং পিঠের মাঝখানের একটু গোল অংশ কুঁজের মত (ন্যুজ) গুঠা থাকে। গোলাকার ঝাঁঝের মাথায় দুটি ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্রের মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বা হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়ে থাকে। এটিও মঙ্গল্য বাত, পূজাপার্বণে একে বাজাতে দেখা যায়। বৃহদাকারের ঝাঁঝ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গং (Gong) নামে পরিচিত। এর অপর একটি নাম **টমটম**। ভারতের আসাম মণিপুরে গং **সেশু** নামে প্রচলিত। বড় গং স্ট্যাণ্ডের মাঝে ঝোলান থাকে এবং কাঠের মূগুর দিয়ে আঘাত করা হয়। ঝাঁঝ বা বড় গং পুরাকালে সংবাদের কাজে, সমন্বিনর্দেশে

ও দূরাহ্বানে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একে দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট স্বরে এটি বাঁধা থাকে না।

**ভাল :** আঙুনে শোধন করা দুটি ক্ষুদ্র গোলাকার কাঁসার খাল। মুখের মাপ সওয়া ২ আঙ্গুল। তার মাঝখানটা এক আঙ্গুল নীচু এবং সেই নীচু জায়গার মাঝে ফুটো। মাঝখানের ঘের দেড় আঙ্গুল উঁচু। ফুটোর মাঝ দিয়ে স্ত্রী বেঁধে দুহাতে দুটি ধরে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। ডান হাতের খালাটির মুখ অল্প বেঁকা থাকে। বর্তমানে লুপ্ত।

**তোড়া :** ষড়্ভূর দেখুন :



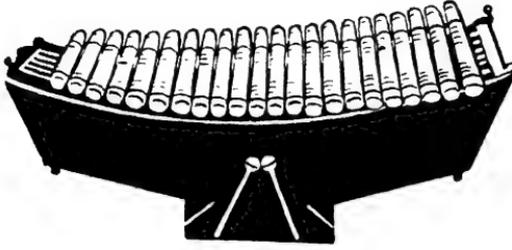
নৃপুর

**নৃপুর :** পায়ের গোছে পরার ধাতুর তৈরী অলংকার বিশেষ। এই অলংকার অনেকটা কড়াই গুটির মত, এর ভিতরে কড়াই গুটির মত গোলাকার গুলি থাকে এবং চলার সময় পায়ের তালে তালে এ থেকে মুহূর্ধ্বনি প্রকাশ পায়। অনেকে নাচের সময় পায়ের পরে তালবাক্সার সৃষ্টি করেন। ছাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে আমরা **নৃপুরের** প্রচলন দেখতে পাই। অতি প্রাচীন এই **নৃপুর** ভারতের নিজস্ব এক ঘন জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। এর জন্মের সাল তারিখ বা আবিষ্কার কর্তার নাম জানা নাই। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির চরণে দেখা যায় বলে ছাপর যুগে সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়।

**পট্ট :** শ্রীপন্থী (গাবপাছের কাঠ) কাঠের তৈরী। ত্রিশ থেকে বত্রিশ আঙ্গুল লম্বা চারকোণা যন্ত্র। একহাত চওড়া, উপরে ও নীচে দুটি লোহার পর্দা। দুটি দড়ি লাগান থাকে। এই দুটি দড়ির সঙ্গে দুটি ছোট ছোট লোহার গোলাকার বালা যুক্ত থাকে। যন্ত্রটি বৃকের সামনে উন্নত মাঝে রেখে পাছের রস বা রসা অথবা কোন আঠায় আঙ্গুল ডুবিয়ে যন্ত্রের ওপর সেই আঙ্গুল ঘষে বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত। বিবরণ সুসম্পূর্ণ না থাকায় সঠিক আকার ও বাদনপ্রণালী লেখা সম্ভব হল না।

**বাঁশতরঙ্গ :** ব্রহ্ম ও চীন দেশে এই যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। আমাদের দেশে সম্মিলিত বাগ্গমগুলীতে কখনও কখনও একে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের জাইলোফোনের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। অনেকের



বাঁশতরঙ্গ

ধারণা এই যন্ত্রের অল্পকরণেই জাইলোফোন জাতীয় যন্ত্রের সৃষ্টি। ব্রহ্ম ও চীন দেশে বাঁশতরঙ্গ = বস্তুরণ (Basataran) নামে প্রচলিত। ১১ থেকে ২৪ খানি পর্যন্ত পর্দা থাকে। বাঁশের তৈরী মোটা মোটা মাপ করা টুকরো (বড় থেকে ক্রমশ ছোট আকারের পর্দা) নৌকার আকারের কাঠের ফ্রেমের ওপর সাজান থাকে। এই পর্দাগুলি সম্পর্কের স্বরধ্বনির সঙ্গে মেলান থাকে। এটি ব্রহ্মদেশ জাত যন্ত্র বলে জানা যায়। গোল মোটা মাথার দুটি কাঠি দুহাতে ধরে পর্দার ওপর ঘা দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হয়ে থাকে। সমবেত বাগ্গমগুলীতে এর ব্যবহার দেখা যায়। কচিং এককভাবে তবলার সঙ্গে বাজতে শোনা যায়। কাঠির কাজেই এর বাজের বৈশিষ্ট্য।

**ব্রহ্মভালম্ :** দক্ষিণভারতের একপ্রকার ঘন জাতীয় বাগ্গযন্ত্র বিশেষ। একজোড়া ছোট গোলাকার ডিমের মত, মাঝখানটা কুঁজের মত উঁচু। কুঁজের মাঝের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে স্ততলী দড়ি পারিয়ে সেই স্ততা দিয়ে দুটি খালা দুহাতে ধরে পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। পূজায় আরাতির সময় নাম কীর্তনে এবং ভজন গানে এই যন্ত্রে গানের সঙ্গে তাল দেওয়া হয়। বৃন্দ-বাদনেও এই তাল যন্ত্রটিতে বাজতে দেখা যায়। উত্তরভারতের গঞ্জমীর মত।

**মন্দিরা :** মন্দিরাকে অনেকে গঞ্জনা বলে থাকেন। কাঁসার তৈরী ছোট ছোট দুটি গভীর বাটি। বাটি দুটির তলদেশের মধ্যস্থান হ্র্যাজ এবং সেই গভীর স্থানে বড় আকারের ফুটো থাকে। এই ফুটোর মাঝ দিয়ে স্ততলী দড়ি গলিয়ে মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে খুব টিলা ভাবে বাঁধা থাকে। দু-হাতে দুটি বাটি ধরে

পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। কালীকীর্তনে, যাত্রার জুড়ী গানে, মাহালিক পালাগানে ও সমবেত ভক্তিমূলক গানে এর ব্যবহার দেখা যায়।



মন্দিরা

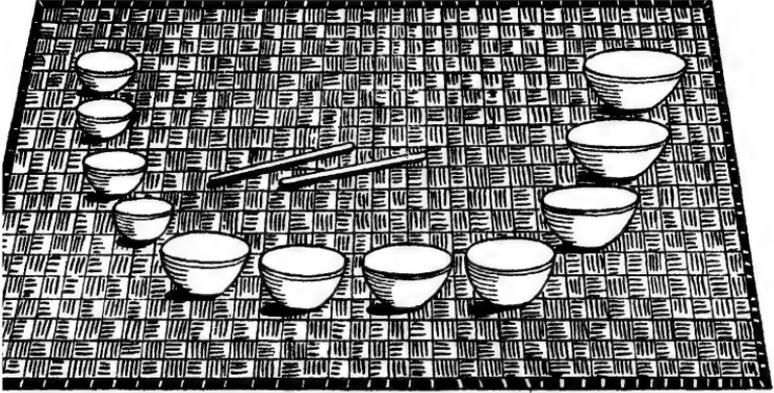


রাম-খরতাল

**রাম-খরতাল :** ধর্মীয় সমবেত সঙ্গীতে বা একক ভজনগানে এই যন্ত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এগুলি ছোট থেকে অনেক বড় বড় আকারের হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। কাঠের খাজের মাঝে মাঝে পিতলের দু'টি চাকতি রাখা থাকে। হাতে ধরে বাজাবার সময় এগুলি থেকে মধুর ঝিনঝিনি আওয়াজ হতে থাকে।

**সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ :** শরাব সার্থে জলপূর্ণ বাটি। সাতটি জলভরা বাটির নাম সপ্তশরাব। প্রাচীন বাগযন্ত্রের তালিকায় এই সপ্তশরাবের নাম পাওয়া যায়। এর ডাকনাম **জলতরঙ্গ**। কাঁসী ভাষায় একে “**চিনী-নাওয়াজ**” বলা হয়। আগের দিনে জলতরঙ্গ কেবলমাত্র সাতটি জলভরা বাটি সাতটি মূল স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজান হত। আজকাল জলতরঙ্গে মূল সাতস্বরের সাতটি বাটির অতিরিক্ত সাত, আট বা দশটিরও বেশী বাটি রাখা হয়। কখনও কখনও কুড়িটি পর্যন্ত বাটি দেখা যায়। এগুলি উদারার মধ্যম থেকে তারা গ্রামের গান্ধার মধ্যম পর্যন্ত রাগ অচুয়ায়ী প্রয়োজন মাহিক কড়ি কোমল স্বরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বাঁধা হয়। বাটিগুলি সাধারণতঃ চিনামাটির তৈরী হয়ে থাকে। বাজাবার সময় জলপূর্ণ বাটিগুলি দুই তিন ইঞ্চি উচ্চ কাঠের গোল পিঁড়িতে কঙ্কলের আসনের উপর বসান হয়। স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা অচুয়ায়ী বাটিগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়ে থাকে।

স্বর বাঁধার সময় স্বর অহুযায়ী বাটিগুলিতে জল কম বেশী করা হয়। বাটিগুলি খুরাঙলা বাটি, এবং বাটির খুরাঙাল পিঁড়ির সঙ্গে কাঁটা পেরেকের খাঁজে আটকান থাকে। জলতরঙ্গ অধিকাংশ সময়ে সমবেত বাগ্গমগুলীতে বেজে



জলতরঙ্গ

থাকে। স্বতঃসিদ্ধ সভ্য যন্ত্ররূপে সঙ্গীতসভায় এককভাবে তবলার সঙ্গতেও একে বাজতে দেখা যায়। জলতরঙ্গের স্বরধ্বনি মধুর, তবে ক্ষণস্থায়ী। দক্ষিণভারতের বেহালা ও মুদঙ্গের সঙ্গে একে বাজতে দেখা যায়। দুই হাতে দুইটি বেতের পাতলা কাঠি ধরে বাটির উপর ঘা দিয়ে জলতরঙ্গ বাজান হয়। কাঠির ঘা-এর বিচিত্রতা এবং একমাত্রার মধ্যে ৮ থেকে ১৬টি কাঠির ঘা রেখে বাজানতে এর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব অল্প সংখ্যক বাজিয়েই এই যন্ত্রে বোল কাঠির ঘা ও তার বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন।

**স্বর শলাকা :** এই শলাকাটি ইংরাজীতে Tuning-Fork বা Pitch-Fork নামে প্রচলিত। ইংরাজী ১৭১১ সালে খ্যাতনামা Trumpet বাজিয়ে জন শোর (John Shore) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (Vide Encyclopaedia Americana—Vol—27, Page 021 Ed. 1967) শলাকাটি ইংরাজী বড় U হরফের আকারের। একটি শলাকা কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশে সক্ষম। হারমোনিয়মের রীড ও পিয়ানো জাতীয় যন্ত্রের তার এই স্বর-কাঁটার সাহায্যে মেলান হয়। এই কাঁটার ডগায় ঘা দিয়ে কানের কাছে রাখলে বহুক্ষণ যাবৎ একটি স্বরের অহুরণন শোনা যায়।

## শব্দ-সূচী

অ		অনাগত গ্রন্থ	
অংশস্বর	৭৮	অনাহত নাদ	৬২
অগ্নিচক্র	৩৫	অনিবন্ধ গীত	৪
অগ্রস্থান ( গমক )	৪৬	অনিয়মিত আন্দোলন	১০৮
অগাধপাল	২৬৩	অনুগতসিদ্ধ যন্ত্র	৭
অঘোর মুখ	২০	অনুতীক্ষনাদ	১৬৪
অঙ্ক	৬১	অনুদাত্ত	৬
অঙ্গুলিত্রতত	১৬৪	অনুক্রম	২৮
অঙ্গুলিপট্টক	১৮১,২১২	অনুপাত	৫৩
অচলঠাট বীণা	১৬৫	অনুপাত-স্বরাস্তর	২
অচল-স্বর	২২	অনুবাদী-স্বর	১৩
অটি	১৮৮	অনুবাদী-সংযোগ	৮৩
অড্ডাভজ	২৮৭	অনুলোম মৌড়	৭৬
অত্থু	৩০০	অনুলোম ক্রম	৬৬
অতাই	৭৭	অনুহতি ( গমক )	৬৬
অতিজটিল তান	৪২	অস্তর গাঙ্কার	২৪
অতিস্বাৰ্ষ স্বর	২২	অস্তর-তুক	১১৪
অতিক্রমত লয়	৬৪	অস্তর মার্গ	৭২
অতীত গ্রন্থ	৬২	অস্তর শ্রুতি	২৬
অতুল্য	৬৫	অস্তরার উঠাও	৮৫
অত্রৌলী ঘরাণা	১২০,১২৮	অস্তরার	১০৮
অভূত রস	৮২	অস্তরার জোড়	১১০
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	২৭	অস্তা ( যতি )	৬৫
অর্ধচন্দ্র চিহ্ন	১০২	অপগ্ৰাস	৭৮
অর্ধখাত্রী চিহ্ন	১০৩,১০৪,১০৬,	অপূষ্ট-নাদ	৫
অর্ধস্থিত স্বর	১১১	অবগ্রন্থ-চিহ্ন	২০, ১০৩

অবঘর্ষণ ( গমক )	৪৬	আইয়ার খুজল	৩০০
অবতল	২১৯	আওয়াজ	২৯২
অবরোধ ক্রম	১৭	আওচার আলাপ	১১২
অবরোধী বর্ণ	৪০	আকার চিহ্ন	১০৪
অবিলোপী স্বর	৪৪	আকারমাত্রিক-স্বরলিপি	৯৯, ১০৪
অভিরুদগতা	৩১	আকর্ষিত স্বর	৪৫
অল্পত্ব	৭৯	আধ্ব	১৪৬
অভ্যাস ( বহুত্ব )	৭৯	আগ্রা ঘরাণা	১২৯
অমৃতি	১৬৫	আঘাট	১৮২
অলংকরণ-শব্দ	৩২০, ৩২১	আঘাট ( বাণ্ড )	২৬৩
অলঙ্কার	৪০	আঘাট " "	১৮৮, ২৬৩
অলংকার চিহ্ন	৯৮	আর্চিক ( তান )	৪৮
অলংঘন ( বহুত্ব )	৭৯	আছোপ	৮০
অলংকারিক ( তান )	৪৮	আড় খেমটা	৫৬
অলংঘন ( অল্পত্ব )	৭৯	আড়াইমুখী-গত	৭২
আল্লাদিয়া খাঁর-ঘরাণা	১২৮	আড়া চোতাল	৫৫, ১১৬
আলাবনী বীণা	১৬৬	আড়ি ( লয় )	১২১
আলাবু সারেঙ্গী	১৬৬	আড়ি ( যন্ত্রের অংশ )	১৮২
অষ্টমাংশ-মাত্রা-চিহ্ন	১০৬	আতাই	৭৭
অষ্টকলা	৬৩	আঁত	১৬৬
অষ্টাঙ্করাবৃত্তি-ছন্দ	৫৬	আদিবীণা	১৬৭
অসমশ্রুতি-সপ্তক	১৩	আদিত্য চক্র	৩৫
অস্থির-আন্দোলন	৭	আদি শ্রুতি	১৬
অস্থায়ী-বোধ	২২৪	আছাবীণা	১৬৭
অস্থাই-বরণ	১১৩	আদানি তাদানি বোল	১৩৭
অহতি ( গমক )	৪৬	আনক বাণ্ড	১৬৩, ২৬৩
অক্ষর চিহ্ন	৯৭	আনন্দ লহরী	১৯৮
অক্ষর ( মাত্রা )	৫৩	আন্দোলন	৬, ৭০
আ		আন্দোলন সংখ্যা	৮
আংটা	২৭৭	আন্দোলিত ( গমক )	৪৬

আপ্যায়নী-মুহূর্না	৩১	আশুরজনী	১৭১
আউজ বা আবজ	২২২	আসন ( বর্ণগণ )	৬৫
আবর্তন	৭৩	আস্থায়ী-উঠাও	৮৪
আবর্ত	৭৩	আস্থায়ীর-গত্	৭২
আবাপ	৬১	আফালন ( গমক )	৪৬
আবৃত্তি ( বহুত্র )	৭২	আহিরী-ঠাট	৩২
আবৃত্তি শেষ-চিহ্ন	১০৫	আক্ষিপ্তিকা	৮২
আভোগের আলাপ	১০২		
আভোগ ( তুক )	১১৪	ইডাক্কা	২৬৩
আভোগ-বরণ	১১৩	ইঙ্গ-চক্র	৩৫
আমকধির-বাঁশী	৩১০	ইমদাদখানি-ঘরাণা	১৮৩
আয়ত-কলা	৬৩	ইমণ ( রাগ )	৮৭
আরবীয় শ্রুতি সংখ্যা	১২	ইমণকল্যাণ ( রাগ )	৮৭
আরবীয় যন্ত্র	১৬৫	ইউরোপীয় শ্রুতি সংখ্যা	২০
আগুল বাঁশী	৩০৫	ইরানী-সঙ্গীতকার	১৪১
আরোহী-ক্রম	৬৬		
আরোহী-বর্ণ	৪০	ঈশান-মুখ	২১
আলফাক-গান	১৫৫		
আলগোবা	৩০০	উগ্রা-শ্রুতি	১৬
আলাতলি	২৮৭	উচ্চনাদ	৬
আলাপ	৫১,১০৮	উচ্চতা ( গমক )	৪৬
আলাপের-অঙ্গ	১০২	উঠান বা উঠাও	৮৩
আলপ্তি	১১৩	উড়ুকাই	২৬৩
আলাপিনী-শ্রুতি	১৬	উৎক্ষিপ্ত ( গমক )	৪৬,৪৭
আলাপিনী বীণা	১৬৭	উৎক্ষেপ	৬২
আলিঙ্গ্য	২২১	উত্তোর	১৫৪
আশ	৪২,৬৬	উত্তরার্দ	৮৬
আশচিহ্ন	১০৬	উত্তরার্দপ্রধান-রাগ	৮৪,৮৫
আশাবরী-ঠাট	৩৭,৮৭	উত্তরাহত ( গমক )	৪৬
আশ্রয়-রাগ	৩৮,৮৪	উত্তরমেলার্দ	৩৪

উত্তরমঙ্গলা-মূর্ছনা	৩১		এ	
উত্তরবর্ণা-মূর্ছনা	৩১	একতন্ত্রী বীণা		১৬৭
উদয়পুর-ঘরাণা	১২০	একতারা		১৬৭, ১২৮
উদাত্ত	২২	একতাল ( ছন্দ )		৫৪.
উদারার-স্বরচিহ্ন	১০১, ১০৬	একনল শুষ্ক যন্ত্র		২২৭
উদগ্রাহ ( তুক )	১১৪, ১১৫	একপাদ-গটুবাগ্গম		১২৩
উদঘর্ষণ ( গমক )	৪৬	একবিংশতি-মূর্ছনা		৩১
উদঘট্ট ( তাল )	৫২	একশ্রুতি-স্বর		২৬.
উনিশ-ঠাট	৩২	একসংখ্যা-চিহ্ন		১০৩.
উপস্বন	৬	একহারা সারেঙ্গী		২৫৩
উপজ	৭২	এয়ারোফোনস্		১৬৩.
উপাক্ষ	৮১	এস্ চিহ্ন		১০২, ১০৭
উপাধ্যায়	৭৬	এশ্রাজ ৭, ৮, ৭১, ১৬৫, ১৬৪, ১৬৮		
উপেজ	৭২		ও	
উলট	৪২	ওত্রু		৩০০
উলট-ঝালা	৭৩	ওবে		৩০১
উল্টা-বাউল	১৪২	ওড়ব		৪২.
উল্টো-মৌড়	৬৭	ওড়বী		৩২
উল্লাসিত ( গমক )	৪৬, ৪৭	ওড়স্বরী বীণা		১৮৪
উর্ধ্বক	২৬৮		ক	
উরুতাই	১২৩	কওয়াল		৭৭
উরুমি-মেলম	২৬৪	কওয়াল-কালবানা		১৩২.
উরুমি	২৬৪	কচ্ছপী বীণা		১৮৪.
উষ্ট্রপালকের-গান	১৩১	কজলী বা কজরী গান		১৫৫
		কণ্		৬৮, ২৩, ১০২
		কত্তোর ঝালা		৭৪.
		কড়ক ( তান )		৪২
		কড়্খা		১৩২.
		কাড়স্বর চিহ্ন		১০৫, ১০৬
		কনকাঙ্ঘি মেল		৩২

কনক-রেখা	৫২	কলা	৫৩
কলাপাত	৬১	কলাবৎ	৭৭
কল্যা-চন্দ	৫৬	কলাবতী	২০৪
কপর্দিনী-মুর্ছনা	৩১	কলি-শেষ-চিহ্ন	১০৫
কবাল	৭৭	কল্যাণী	৩৯
কবালবাচ্ছা-ঘরাণা	১২৬	কল্যাণ-ঠাট	৩৭, ৮৬, ১১৮
কবির-গান	১৫৪	কস্বী	৭৭
কবিয়াল	১৫৫	কাংস বা কাংশু তাল	৩২৮
কমছড বাল	৭৪	কাওয়ালী গান	১৩৯
কম্পন	৭০	কাকলী 'ন'	২৪
কম্পাঙ্ক	৯	কাকলী-কনিডা	৬২
কম্পিত ( গমক )	৪৬, ৪৭	কাকল্যস্তরা	৩২
কম্বু	৩১৯	কাকের ডাক	৫২
কম্রা	৩২৬	কাঁচ তরঙ্গ	৩২৬
কয়েদ-আলাপ	১১২	কায়দা	৬৭
কর্ণাটক পদ্ধতি	২	কাজরী গান	১৫৫
কলামাত্রিক স্বরলিপি	১০০	কাজির	২৬৫
কর্ণাটক সর্গম স্বরলিপি	৯৮	কাটাংরা তাল	১৪৬
কর্ণাসন	২২০	কাটান ( খোল )	১৪৭
কর্তব	৬৯	কাঠি	২৬৪
কত্তাই	১২৩	কাঠ-তরঙ্গ	৩২৭
কর্তরী ( গমক )	৪৬	কাড়া	১৬৩, ২৬৪
কর্তাল	৩২৬	কাণ	১৮২
করতাল	১০৬, ৩২৫	কাণ্ড ( গীত, বাণ, নৃত্য )	১
করতালি	৩২৬	কাণ্ড বীণা	১৮৮
করণ	৮২	কাণ্ডরণ	৮২
করণাল	৩০১	কাতুন	১৮৫
করণভ	১৬৬	কানন	১৮১, ১৮৬
করণমণ	৭২	কানরা ( রাগ )	৮৭
কলম-বাঁশী	৩০১	কাণি	২৮১

কাম্বন	১৮৫	কীর্তনের পদাবলী	১৪৫
কাফি-ঠাট	৩৭	কীর্তনের বৈশিষ্ট্য	১৪৩
কাফি ( রাগ )	১২২	কীর্তনের-জাত-স্বর	১৪৬
কাব্য-সঙ্গীত	১৪২	কীর্তনের সঙ্গত	১৪৭
কাবাল-পদ্ধতি	১২৫	কীলক	১৮২
কামগণ	৬৫	কুকুত	১৬৬
কাম বন্ধিনী	৩৮	কুবাতি	১২৩
কামারচি	১৬৬	কুড়ী	২৮২
কামোদ ( রাগ )	৮৭, ১১৮	কুড়ুকা	২৬৭
কান্তোজী	৩২	কুভল	৭৭
কাত্যায়নী বীণা	১৮৫	কুমুদতী-শ্রুতি	১৬
কাৰ্ণা	৩০১	কুয়াড়ী	১২১
কালকা-বিন্দা-ঘরাণা	১৩৩	কুরুল ( গমক )	৪৬, ৪৭
কাল	৬০	কুর্ম বা কুমী, বীণা	১২০
কালোয়াত	৭৭	কুর্ণা বা কাৰ্ণা	৩০১
কাসি	৩২৮	কুট-তান	৪৮
কাসর	৩২৮	কৃত্রিম-নাদ	৫
কাম্মারী-সঙ্গীতকার	১৪১	কুম্বন	৬৭
কাহল	২২৭	কুমানি-গান	১৫৫
কিঙ্গিরা	১২০	কুষণ ( কলা )	৬৩
কিণার	২৮১	কেচুয়া সেতার	১৮৪
কিন্নরী বীণা	১৮২	কেদারা ( রাগ )	৮৭
কিন্নরী বীণা ( লঘু )	১২০	কেদারী ( গণ )	৬৫
কিন্নরাত বীণা	১২০	কেন্দুমালী ( তাল )	৫৬
কিন্নরা-ঘরাণা	১২৮	কেমানগে অঞ্জুজ ( যন্ত্র )	১৬৫
কিরিকিট্ট বাণ্ডম	২৬৬	কেলিকটু	২৭১
কীর্তনের আধর	১৪৬	কেসর-পুরিয়া ( রাগ )	৮৭
কীর্তন গান	১৪২	কেবল ( গমক )	৪৬
কীর্তনের ঘরাণা	১৪৫	কোমল 'ম'	২৪
কীর্তনের তাল	১৪৬	কোমল স্বরের চিহ্ন	১০১, ১ ০৬

কোয়েল ( এশ্রাজ )	১৭৭	খরজের পঞ্চমভাব	২
কৈবল্য ( গমক )	৪৬	খশিত ( গমক )	৪৬
কৈশিকী 'ন'	২৪	খাঁজ	১৮১
কৌল পদ্ধতি	১২৫	খাদস্বরী-নাদেশ্বর	১৭৭
ক্রম	৩২	খাণ্ডার ( গ্রাম )	১১৮
ক্রমিক-স্বর-বংশী	৩২৪	খাণ্ডার-বাণী	১১৭
ক্রিয়া ( তালের প্রাণ )	৬০, ৬১	খাঘাজ ( রাগ )	১২২, ১৪১, ১৪৬
ক্রুষ্ট ( স্বর )	২৯	খাল	২২৭
ক্রোধা-শ্রুতি	১৭	খিরণ	: ৬৯, ২৮১
ক্র্যারিনেট বা ক্ল্যারিওনেট	৩০২	খুজল	২২৭
		খুজিতালম	৩২২
<b>খ</b>		খেয়াল	৭৭, ১২৩
খঞ্জনী	৩২২	খেয়াল-ঘরাণা	১২৫
খঞ্জরী	২৬৭	খেয়াল ( বাণী )	১২৪
খটকা-তান	৪৯	খেয়াল ( তুক )	১৩৫
খট তোড়ী ( রাগ )	১২৮	খেয়ালের ভাষা	১২৫
খট ( রাগ )	১১৮	পৈরাবাদী-ঘরাণা	১১৯
খড়ি বোল	১২৫	খোটি	১৮২
খণ্ড জাতি	৬২	খোঁদক	২৬৭
খণ্ড মেরু	৪৯	খোল	২৬৮
খন্তাল	৩২৭	খোলা বাজ	২৭০
খনক	৬৮	খ্যাল	১২৩
খম	৬৯		
খমক	১২৯	<b>প</b>	
খমাজ ( ঠাট )	৩৭	গং	৩৩২
খর্পর বা খোল	১৮১	গ, গি, গু	২৫
খরতালি বা খর্তাল	৩২৬	গওহার	১১৮
খরজ ( রবারের তার )	২২৮	গঙ্গা-বন্দনা	১৫৩
খরলি	২৭৫	গজবা	২৮২
খরহরপ্রিয়া ( রাগ )	৩৮	গজল	১৪০
খরোড়া ভাষা	১১৫	গটুবাণম	১৯১

গণ	৬৫	গীত-ক্রিয়া	১১৭
গত্	৭১	গীত-গোবিন্দ	১৪৫
গতিবাগম	১২১	গুজরতন সারেঙ্গী	২৫৪
গতুবাগম	১২১	গুড়রী	২৮২
গত-শেষ-চিহ্ন	১০৬	গুণকার	৭৭
গজ-কুস্ত-চিহ্ন	১০৬	গুণী	৭৭
গন্ধর্ব	৭৭	গুবণ্ডবি	১২২
গবাক্ষাক্রুতি চিহ্ন	২৫	গুপাবাজ	২৭০
গমক	৪৬, ২৬	গুন্দ-বন্ধনী	১০৫, ১০৭
গমক-চিহ্ন	১০৬	গুন্দি ( গমক )	৪৬
গমক-মূর্ছনা	৩০	গুরজ	১৮২
গমনশ্রম ( মেল )	৩৮	গুরু	৬৬, ৬১
গমকী-জোড়	৪৫	গুরুচন্দ	৫০
গমকী-তান	৪৫	গুরুমাত্রা	৫০
গম্ভীরা	১৫২	গুলনকম	১৩৮
গরাণহাটি ( স্টাইল )	১৪৫	গুলি বা গট্টা	২৭২
গ ওহার-বাণী	১১৭	গুলু বা গলা	১৮২
গজল	১৪০	গুস্তা	২৩৫
গাজন-গান	১৫২	গোপুচ্ছ	২২১
গাত্র বীণা	১২৩	গোপুচ্ছা ( যতি )	৬৫
গাথিক ( তান )	৪৮	গোপীচন্দ	১২২
গান্ধার	৪৩	গোপীযন্ত্র	১২৮
গান্ধার-গ্রাম	৪৩	গোমঙ্গল-গান	১৫৫
গান-শেষ-চিহ্ন	১০৫	গোমুগ-শঙ্খ	৩২০
গাব	২৬২, ২৮১	গোয়ালিয়র-ঘরাণা	৮৫, ১২২, ১২৭
গায়ক	৭৬	গোরক্ষ-কল্যাণ ( রাগ )	১২৮
গায়ন বৈশিষ্ট্য	১১৫	গোশিঙা	৩০৩
গাড়াওয়ালী-গান	১৫৫	গোশুঙ্গ	৩০৩
গীটকারী	২৬, ১৭৩	গোড়ায়-বাণী	১১৮
গীটার ( হাওয়াইয়ান )	১২৩	গোল ( ঠাট )	৩২

গোড়হার	১১৮	ঘোড়ী	১৮২, ২৪৫
গোড়সারং ( রাগ )	৮৭	ঘণ্টাবাণ	১৬৩, ৩২৫
গৌরী ( রাগ )	৮৭, ১৪৬		
গৌরী-শব্দ	৩২১	চ	
গ্রহ	৬০, ৬২, ৭৮	চক্র-তান	৪২
গ্রহস্বর	৭৮	চক্র-চিহ্ন	২৫
গ্রাম	৪৩	চক্রদার-তান	১২৭
গ্রাম-মূর্ছনা	৩০	চগণ	৬৫
গ্রাম-রাগ	৮২	চঙ্গংপুট	৫২
গ্রামিক-স্বর	২০৪	চর্চরী বাণ	২৭১
গ্রাম্য-বাণযন্ত্র	১৬৩	চচ্চরী	১২২
গ্রীক প্রতি-সংখ্যা	১২	চটুকা-গান	১৫২
		চড়কতলার-গান	১৫২
		চতস-জাতি	৬২
		চতুরস-জাতি	৬২
ঘড়স	২৭১	চক্র চিহ্ন	১০৬
ঘড়ি	৩৩০	চন্দ্র সারঙ্গ	২০০
ঘরাণা	৭৭, ৯২	চন্দ্রা-মূর্ছনা	৩১
ঘরহা	২৭০	চপক	৬৭
ঘর্ষণ ( গমক )	৪৬, ৪৭	চপক বোণ	২২৮
ঘষিট	৬৬	চর্মরঞ্জু	২৮২
ঘটবাণ্ডম	২৭০	চর্মজ নাদ	৫
ঘাট	১৮২, ২৬২, ২৮২	চল বীণা	১৬৫
ঘাটুর গান	১৫৪	চল-সেতু	২০৬
ঘাড় বা কোমর	১৮১	চলমান-সেতু	২০৭
ঘাড়ি	১৮২	চলস্বর	২২
ঘুরচ	১৮২, ২৪৫	চাপুরা	২০৪
ঘীচক	২০০	চাচপুট ( তাল )	৫২
ঘুঞ্জুর	৩৩০	চাঁচের ( তাল )	১২২
ঘেটুর-গান	১৫৩	চাঁটি	২৮১
ঘোষবতী বীণা	২০০	চাঁটাও	২৮১
ঘোর ( রবাবের তার )	২২৮		

চাঁদ সারেঙ্গ	২০০	চন্দাবতী-শ্রুতি	১৩
চান্দ্রমসী ( মূর্ছনা )	৩১	চন্দবিভাগ-চিহ্ন	১০২
চাপা গুণাবাজ	২৭০	ছাউনি	১৮১, ২৮১
চাপান	১৫৪	ছাদপেটার-গান	১৫১
চাবীঘর	১২৬	ছায়ালগ	৪২
চিকারা	২০১	ছুট তান	৪২, ৬২
চিকারীর কাণ	২৪৬	ছেড়	৭২
চিকারীর তার	২৪৮	ছেড়-বাদন	১০৭
চিতারা	২৪১	ছেন্দা	২৭১
চিত্র	৬০	ছেন্দা-মেলম	২৭১
চিত্রতর	৬০	ছেপ্কা	১৩৫
চিত্রাবীণা	২৪২	ছোট্ট	২৬২, ২৮২
চিত্তশুদ্ধি	১৪৪		
চিনী নাওয়াজ	৩৩৫	জওয়ার	১৬৪, ২০১
চুকা বাঁশী	৩০৪	জকরী-নৃত্য	৩১০
চুটকলা	১৩৬	জগণ	৫৭, ৬৫
চৈতী গান	১৩৪, ১৪০	জগবাম্প	২৬৩, ২৬৪, ২৭২
চৌতারা	২০১	জট	১৩২
চৌতাল	৫৫, ১১৬	জটিল তান	৪২
চৌচন	১১২, ১২১	জনক ঠাট	৩৮
চৌধকী ( যন্ত্র )	১২২	জনক মেল	২৮
চ্যাবিত ( গমক )	৪৬, ৭৭	জনক-রাগ	৮২, ৮৪
		জপ-তাল	১৪৬
ছগণ	৬৫	জবা বা জওয়া	২২৮
ছড	২২১	জবান	১৪১
ছড-বাণ্ড	১৬৭	জমজমা	৬৭
ছডা-গান	১৫৫	জলদ বা অতিক্রমিত গত্	৬৪
ছত্রাবলী	১৬৬	জয়ঘণ্টা	৩৩১
ছন্দ	৫৩	জয়ঢাক	২৭৪
ছন্দানুক্রম	২৭	জয়ন্ত মঞ্জার ( রাগ )	১২৮

জরঙ্গ	১৫৫	ঝাড়খণ্ড	১৪৫
জরব	৭২	ঝাঁতি-তাল	১৪৬
জলদ তান	১৭৩	ঝার	১১০
জলতরঙ্গ	৩৩৬	ঝালা	৫১,১১০
জাত বা জট	১৩৯	ঝালার বা চিকারীয় তার	২০৮
জাতস্বর	১৪৬	ঝাঁঝিট ( রাগ )	১৪১,১৪৬
জাতি ( রাগ )	৪২	ঝিণঝিনি	২৬৫
জাতি ছন্দ	৫৪	ঝুমুর-গান	১৫০
জামিদাইকা	১৯৯	ঝুমরা-সওয়ারী	১২৫
জারিগান	১৫২	ঝুমরা-তাল	৫৪,৫৫
জালরা	৩৫১	ঝুলন ঘট্টা	৩২৯
জিগর	১৪০	ঝুলতী-বরণ	১১৩
জিতার	১৮৪	ঝোঁকের-উচ্চারণ-চিহ্ন	১০৫
জিনাগোষ্ঠী	৩০৪		ট
জিনগুর	৩০৪	টপ্ -খেয়াল	১৩২
জির	২২৮	টপ্পা	৫২,৭৭,১৩১,
জিল	৩২২	টপ্পা-ঘরাণা	১৩২
জীবস্বর	৭৮	টমটম্	৩৩২
জুড়ীর-তার	২২৪	টিকারা	২৭২
জুমারা	৩০৫	টুনটুনা	২০১
জুকোয়ারা	৩০৫	টুকীবাজ	২৭০
জোড়	১০৯	টুস্বর-গান	১৫৪
জোড়ঘাই	২৮৮	টেসটিডো	১৮৪
জোয়ারী-তরফ	২৩৭	টেরামপাট-তান	৪৯
জোনপুরী ( রাগ )	৪৩,৮৭	টোণারাম্মা	৩১৩
		টোটা সারেঙ্গী	২৫৩
		টোড়ী ( রাগ )	৮৬
		টোড়ী-ঠাট	৩৭
			উ
		ঠাট	৩২,৯২

	৫৬, ১০৮, ১৩২		৩
ঠুংরী			
ঠুনঠুনে	২০১	ঢপকীর্তন	১৪৭
ঠুমক	১৩৩	ঢবস	২৭৪
ঠুমরী-ঘরাণা	১৩৫	ঢাউস	২৭৪
ঠেকনা	১৯৭	ঢাক	২৭৪
ঠেস	১৮১	ঢাকা-ঘরানা	২৫২
ঠোকঝালা	৭৪	ঢাড়ি	৭৭
		ঢালু ( গমক )	৪৬
		ঢিমা	১০৮
ডকা	২৮৪	ঢুলিবাহকের-গান	১৩৭
ডপ্লা	১৩২	ঢোল	১৬৩, ২৭১, ২৭৫
ডমক	২৭৩	ঢোলক	২৭৫
ডমারম	২৭৩	ঢোলকি	২৭৭
ডম্বক	২৭৩		
ডমক চিহ্ন	১০৬		
ডম্বক	২৭৬	তান	৫৭, ৬৫
ডম্ফ	২৭৪	ততবাথ	১৬৩
ডা, ডে, ডি	২৫০	তস্তনা	২০১
ডাগুর-ঘরানা	১২০	তস্তাসন	১৮২
ডাগুর-বাণী	১১৮	তবলা	২৭৭, ২৭৮
ডাগু ( নৃত্য )	২৬৪	তবলজাং	২৭৮
ডাফ	২৭৪	তবলার খোল বা খাদি	২৮১
ডাঁয়া	২৭৭	তবলি	১৬৮
ডাঁশপাহিড়া	২৪৬	তরঙ্গা-গান	১৫৫
ডাহিনা	২৭৭	তরঙ্গ	২৯২
ডি, এল, রায়ের গান	১৫৬	তরঙ্গিত-রেখা-চিহ্ন	১০৭
ডুগডুগী	২৭৩	তরফের-কান	১৮১, ২৪৬
ডোরী	২৮২	তরফের-তার	১৩৬
ডোলকী	২৭৪	তলদেশে-ড্যাশ-চিহ্ন	১০৩
ডাঃস-চিহ্ন	১০২	তলদেশে-অর্ধ চিহ্ন	১০৩
ড্রারডা ( বোল )	৫১	তলদেশে-দুই-অর্ধ-চিহ্ন	১০৩

ভলদেশে-ড্যাস-ও-পাশে-চিহ্ন	১০৩	তারি-স্বরের-চিহ্ন	১০১
ভলবগ্গী-ঘরানা	১২৭	তারের মাপের চাট	২৬২
ভলবেড়	১৮২	তারের লম্ব	৮
ভলি	২১৯, ২৬৯, ২৮১	তাল	৩৩৩
ভড়িং-তম্বুরা	২০৬	তালিম	৭৬
ভাউস	১৭৫	তালের-চিহ্ন	১০২
ভাজ	১৭৬	তালের-চন্দ্রের-চিহ্ন	১০৩
ভাজীমাই	৩১২	তালের-বিভাগের-চিহ্ন	১০৭
ভোড়া	৩৩০	তালের মাত্রা-চিহ্ন	১০৪
ভাণ্ডব-নৃত্য	১৫৩	তালের মাত্রা-সংখ্যা	১০২
ভান	৩২, ৪৮, ৫২	তালের সৃষ্টি	৫৪
ভান-ঝালা	৭৪	তালের-দশপ্রাণ	৬০
ভানপুরা	২০২, ২০৪	তাসা	২৮৩
ভানসেন	১১৬, ১১৭	তিস্তিরী	৩০৪
ভানসেন-ঘরাণা	১১৯	তিস্তিরী	৩০৪
ভাস্কবতন্ত্রী	২২৮	তিনতাল	১১৬
ভাভিল	২৮২	তিনতুক বিশিষ্ট-গান	১৩৮
ভাঘুরে	২০৪	তিমিরি	৩০৬
ভামপুর	২০৪	তিমিলা	২৮৪
ভাঘুরো	২০৪	তির্ঘক-মাত্রিক-স্বরলিপি	৯৮
ভাঘুরিণ	২০৪	তিরিণ ( গমক )	৪৬, ৪৭
ভার ( রাগ লক্ষণ )	৭৯	ত্রিশ-ঠাট	৩৮
ভারগহণ	১৮২	তিলং ( রাগ )	১২১
ভার ( নাদ )	৫	তিলক কামোদ ( রাগ )	১২২
ভারদান	১৮১	তিলবাড়া	১০১
ভারপরণ	৫১	তিলমগ্গী-ঘরাণা	১১৯, ১২৭
ভারসানাই	১৭৭	তিল্লানা	১৩৬
ভারস্থান	২৬	তীব্র-নাদ	৫
ভারাপাশক্তি	১২৫, ১৩৬	তীব্রা ( শ্রুতি )	১৬
ভারাহত ( গমক )	৪৬	ভুক	৭০

তুড়ি	৬১	ত্রিভিন্ন ( গমক )	৪৬, ৪৭
তুনতিনা	২০২	ত্রিবট	১৩৭
তুওকিনী	৩০৬	ত্রিবর্ণ মধ্যা	৬৫
তুতরী	৩০৬	ত্রিশ্রুতি	৪৪
তুরতুরী	৩০৬	ত্রিশ্রজাতি	৬২
তুরুরুর	৩০৬	ক্রুটি	৫৩
তুবড়ী	৩০৪		থ
তুমেরী	৩০৪	থাম	৩০৫
তুম্বরী	২০২	থাই-আলাপ	১১২
তুম্বর বীণা	২০২	থিমিলা	২৮৪
তুষ	১৬৬		দ
তুষকী	৩০৪	দগণ	৬৫
তুষা	১৮১	দগু	৮৫
তুষকনারী	২৮৪	দগড়া	২৮৪
তুরাণী	১৪১	দগুচিহ্ন	১০৬
তুরা	৩০৫	দগুমাত্রিক-স্বরলিপি	২৭, ২৮, ২৯
তুগক ছন্দ	৫৭	দম	৬৯
তেওট ( তাল )	১৪৬	দয়াবতী-শ্রুতি	১৬
তেওড়া ( তাল )	১১৬	দত্বর	২৭৮
তেলেনা	১৩৬	দরবারী ( রাগ )	১১৮
তেলেনার বোল	১৫৮	দশকুশী	১৪৬
তেহাই	১২৫	দশ-ঠাট	৩৬
তোড়া	৩৩০	দক্ষিনী তানপুরা	২০৬
তোম ( বোল )	১২৯	দক্ষিনী দোতার	২১১
তোর্ষত্রিক	১	দক্ষিনী মৃদঙ্গ	২৮৫
ত্রিকোন-চিহ্ন	১০৬	দক্ষিনী বীণা	২০৯
ত্রিকোন-ফলক	২০৫	দাগী-গান	১৪৬
ত্রিগত	৭১	দারু বীণা	২০৯
ত্রিতন্ত্রী বীণা	২০৬	দাড়ি চিহ্ন	১০২
ত্রিতাল ( ছন্দ )	৫৬	দাড়ার ডা ( বোল )	৫১

দাদ্রা	১৩৫	দোতার	১৫২, ২০১, ২১০
দাদ্রার-ছন্দ	৫৭	দোলন	৭০
দান্ডি	১৬৮, ১৭২, ১৭৭, ১৮১,	দোলন ( গমক )	৪৬
দানেদার-তান	৪২	দারভাঙ্গা-ঘরাণা	২৫১
দামামা	২৮৪, ২৮৬	দ্বিগুণ	১১০
দিনকী-পুরিয়া ( রাগ )	৮৭	দিনল-স্বাধর-যজ্ঞ	২৯৭
দিলরুবা	১৬৪, ১৭৭	দ্বিপদ	৫৫
দিল্লী-ঘরানা	১২৫	দ্বিরাহত ( গমক )	৪৬, ৪৭
দিশি-চক্র	৩৫	দ্রে, দ্রার, দ্রেদার	২৫০
দীপক ( রাগ )	৯১	দ্রাহায়ণ	১৮৮
দীপচন্দী ( তাল )	১৪১	ক্রত	৫৫
ছই স্বরের-অঙ্কমাত্রা-চিহ্ন	১০৪	ক্রত-অঙ্কমাত্রা	১০৪
ছই স্বরের-দেড়-মাত্রা-চিহ্ন	১০৪	ক্রত-জোড়	১১০
ছই স্বরের-'এস' মাত্রা-চিহ্ন	১০২	ক্রত-বিরাম	৬১
ছকড়	২৭৮	ক্রত-লয়	৬৪, ১১০
ছন্দুভী	২৭৮	ক্রতি ( গমক )	৪৬
ছন	১১২, ১২১	দ্ব্যর্থ-স্বর	১১০
ছনী গত্	৭২	দাশপ্যারী	১৪৬
ছর্গা ( রাগ )	৪৩		
দেড়মুখী-গত্	৭২	ধ, ধি, ধু	২৫
দেড়পোবী সারেকী	২৫৩	ধহু-চিহ্ন	১০৭
দেবধি নারদ	১৩৭	ধহুযজ্ঞ	১৬৪
দেশাঅবোধক-গান	১৫৬	ধন্ডালী ( রাগ )	৮৭
দেশাকী ( ঠাট )	৩৯	ধবল শব্দ	৩২১
দেশী-তাল	৫৫	ধম	১২২
দেশীয়-পদ্ধতির-রূপদ	১১৫	ধর্মতাল	১২২
দেশী ( রাগ )	৮১, ৮৭	ধরতাল	১২২
দৈর্ঘ্য	৯	ধাউসি	২৮৬
দোজ তাল	১৪৬	ধাতু	৭২
দোঠুকা তাল	১৪৬	ধামালি	১৪৬

ধানী ( রাগ )	৮৭, ১২২	নকুল বীণা	২১০
ধানী সারেঙ্গী	২৫৪	নগণ	৬৫
ধামা	২৭৮	নগর কীর্তন	১৪২
ধামার	১২১	নট ( রাগ )	৮৭
ধামার ( তাল )	১২১	নট-নারায়ণ ( রাগ )	৯০
ধামালি	১৪৬	নট-ভৈরবী ( রাগ )	৩৮
ধারী	৭৭	নন্দা	৩১
ধীরশঙ্করাভরণ ( রাগ )	৮	নবহার	১১৮
ধুনধুনাওয়া	১২৯	নগবত বা নৌবত	৩১৫
ধুমা	৩২২	নাকাডা	২৬৩
ধুয়া	৭০, ১১৫	নাগারা বা নাকারা	২৮৭
ধৈবত	২০, ২২	নাগস্বরম	৩০৬
ধ্বনিকোষ	১৮১	নাগিন-বীণ	৩০৪
ধ্বনি-ছিত্র	১২৬	নাজীকাবাদ-ঘরাণা	১২৭
ধ্বনিপটুক	১৮১	নাট ( ঠাট )	৩৯
ধ্বন্তাত্মক-নাদ	৫	নাট্যসঙ্গীত	১৪২
ধ্রুপদের-বাণী	১৭৭	নাড়ীর গতি	৫৩
ধ্রুপদের-ঘরাণা	১১৯	নাদ	৩, ৪
ধ্রুপদাঙ্গীয়-আলাপ	১০৮	নাদতরঙ্গ	১৭৬
ধ্রুপদ	১১৪	নাদেশ্বর বীণা	২১১
ধ্রুব	৬১	নাম-কীর্তন	১৪৩
ধ্রুব-তুক	১১৪	নামমালা-বাজ	২৭০
ধ্রুব-বীণা	১৬৫	নামিত ( গমক )	৪৬
ধ্রুবক	৬০, ১১৫	নায়কী-তার	৭২, ২২৪
ধ্রুবকা ( কলা )	৬৩	নায়কী কানাড়া ( রাগ )	১২৮
		নারদ মত	৯২
ন, নি, হু	২৫	নারদীয় বীণা	২০৮
নওহার	১১৮	নঃরায়ণী ( গমক )	৪৩
নওহার-বাণী	১১৭	নাগাবংশী	৩০৪
নক্স	১৩৮	নাহার	১১৮

ন

নিঃশব্দ-বীণা	২১২	পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	১৮৫
নিঃশব্দ-ক্রিয়া	৬১	পটতাল	১১৬
নিওলিথিক যুগ	২২৮	পটদীপ ( রাগ )	৩৭
নিখাদ	২০	পটমঞ্জরী ( রাগ )	৮৭
নিজতা ( গমক )	৪৬	পটুরী	১৭৬, ১৮১
নিধুবাবুর-টপ্পা	১৩২	পটহ	২৮৭
নিবন্ধ-গান	১১৪	পট্টী	২৮১
নিম্ন-নাদ	৬	পট্টয়ার গান	৫৫
নৈম্ন ( গমক )	৪৬	পট্ট	৩৩১
নিমেষ	৫৩	পণ্ডিত	৭৬
নিয়মিত-আন্দোলন	৭	পতাকা ( কলা )	৬৩
নির্গীত	১৩৭	পতাকা-চিহ্ন	১০৬
নিবাদ	২০, ২২	পদবিদারী	৭১
নিষ্কির কাঠ	১৭৭, ১৮২	পদ্ম-চিহ্ন	৯৫
নীলের গান	১৫২	পদ্ম বীণা	২১২
নৃপুর	৩৩৩	পনব	২৭৮
নেত্র-চক্র	৩৫	পন্থি	১৬৬, ১৬৮, ২০৫
নেত্র-চিহ্ন	১০৬	পশ্চবরালী ( ঠাট j	৫২
নে, তে, য়ে, দীম, তানা	১৩৭	পষাই	২৮৮
নেহুনকুঝল	৩০৬	পর্দা	১৮২
নে বা নাই	১০০	পরজ ( রাগ )	৮৭
নোম তোম বোল	১২৯	পরতলি	২৮১
শ্রাস-স্বর	৭৮	পরতলা	২৮১
শ্রাসতরঙ্গ	৩০৭	পরতা ( গমক )	৪৩
		পরদে	১৮২
		পরমাঠা	১০
পকড	৮৩	পরসাহ	১২০
পথাবজ	২২২	পরাতীক্ষ নাদ	৬
পগণ	৬৫	পরিবাদিনী বীণা	২১২
পঞ্চম	২০, ২১, ৮৭, ৯০, ২০৯	পলট-তান	৫৯
পঞ্চমুখবাণম	২৬৬		

পাগড়ী	২৮১	পীড়া ( গমক )	৪৬
পাকাসরণী	২০৯	পুকার	৬৯
পাকাপঞ্চম	২০৯	পুগী	৩০৪
পাখোয়াজ	১৬৩, ২৭১, ২৯২	পুনগী	৩০৪
পাচালি-গান	১৫৫, ২৭৬	পুথারগায়া	২৯২
পাঞ্জাবী ঠেকা	৫৪, ১২৫	পুনঃসম্মান ( গমক )	৪৬
পাঞ্জাব-ঘরাণা	১২৬	পুনরারস্তির মধ্যে বক্র-বন্ধনীর চিহ্ন	১০৫
পাঞ্জাবী-খডা	১৩৪	পুঁতি	২০৫
পাটকাটার-গান	১৫১	পুরিয়া ( রাগ )	৪৩
পাতকলা	৬১	পুরিয়া-কল্যাণ ( রাগ )	৮৭
পাতন	৬১	পুরিয়া-ধনাস্রী ( রাগ )	৮৭
পাতিয়ালা-ঘরাণা	১২৯	পুষ্ট নাদ	৫
পাণিশঙ্খ	৩১১	পুড়ী	২৮১
পাব	৩০৯	পূর্ণাঘাত	৬২
পাবিকা	২৯৮	পূবী ( রাগ )	৮৭
পার্বন-গান	১৫৫	পূবা ( রাগ )	৮৭
পার্বতী	৯০, ৯১	পূর্ব-কল্যাণ ( রাগ )	৮৭
পারিজাত	৫২	পূরবী-ঠুংরী	১৩৪
পালা-গান	১৫৫	পূর্বাধ	৮৬
পালা ঘাস	৩২৩	পূর্বাঙ্গ	৮৬
পাক্বী বাহকের-গান	১৩৭	পূর্বাঙ্গ প্রধান-রাগ-লক্ষণ	৮৫
পাশে-শৃঙ্গ-চিহ্ন	১০৫	পূর্বমেলার্ক	৩৪
পিছেলা বীণা	১৮৪	পূর্বাহত ( গমক )	৪৬
পিচোলা বীণা	২১২	পূর্বী ঠাট	৩৮, ৮৬
পিছোরা বীণা	২১২	পেনাক	২১৩
পিণাকী বীণা	১৬৮	পেয়া	২১৩
পিনাক	১৬৪, ১৬৮, ১৭৫, ২১২	পোস্ত-তাল	১৪১
পিখাগোরস	৯৫	পৌরবী-মুর্ছনা	৩১
পিপীলিকা-পতি	৬৫	প্যাচদার মুকী যুক্ত বিস্তার	১২৭
পিল ( রাগ )	৩৭, ১৪১	প্যালিওলিথিক যুগ	২৯৮

প্রকল্পিত ( গমক )	৪৬	ফিকরাবন্দী কায়দা	} ১০৮, ১২৫, ১২৭, ১৩১
প্রচয়	২৮		
প্রতিমধ্যম	২৪	ফিরত তান	৬২
প্রস্তার	৬০, ৬৫	ফিরোজখানি গং	৭২
প্রতিষ্ঠা	৬৫	ফুংকার যন্ত্র	২২৭
প্রতিহত ( গমক )	৪৬	ফের	৭৩
প্রতীক স্বরলিপি চিহ্ন	১০১		
প্রত্যরূপাত	৯	বংশী	২২৭
প্রদীপকী ( রাগ )	৮৭	বক্রজাতি	৪৩
প্রধান তার	৭০	বক্রবন্ধনি	১০২, ১০৫
প্রবেশ	৬১	বক্র স্বর	৮৩
প্রবন্ধ	১১৪	বক্রিশ ঠাট	৩৫
প্রশ্নন	২৬	বন্ধি	২৮২
প্রসঙ্গ	১২০	বণ্টম	৭৩
প্রসারিণী বীণা	২১৩	বন্ধান আলাপ	১১৩
প্রসারিণী স্রুতি	১৬	বন্ধিশ	১৩৮
প্রহর	৮৫	বর্জ্যস্বর	৮৩
প্রক্ষেপ	৬৮	বর্গ	
প্রকৃত স্বর	২৩	বর্গ গণ	৬৫
প্রীতি-স্রুতি	১৬	বর্গালংকার	৪১
প্রেম-সঙ্গীত	১৪২	বর্তনী	৮২
প্লাবিত ( গমক )	৪৬, ৪৭	বর্তক শঙ্খ	৩০৯
পুত-মাত্রা	৫৩, ৬১	বল-তান	৪৯, ৯৬
পুতি ( গমক )	৪৬	বল পেচ	৪৯
		বল-সপাট তান	৪৯
		বলি ( গমক )	৪৬, ৪৭
		বলিত ( গমক )	৪৬, ৪৭
ফরদোস্ত	১২৬	বল্লভ সম্প্রদায়	১২৩
ফান্সা	৪২, ১৭৩	বল্লকী বীণা	২০৩, ২১৪
ফাঁকের ক্ষেত্রে-চিহ্ন	১০২, ১০৭	বসন্ত ( রাগ )	৮৭, ৯০, ১২২
ফিরকত	৪৯		

বসন্ত-ভৈরবী ( রাগ )	৩২	বান গণ	৬৫
বসন্ত-বাহার "	১২৮	বাণ চক্র	৩৫
বস্তু	১১৪	বাণ বীণা	২১৪
বস্তু চক্র	৩৫	বামক	২৭৭
বহিনবা অঙ্গের আলাপ	১২৬	বামদেব মুখ	২০
বহুহ	৭২	বালাসরস্বতী	১৭৬
বাতিদ্বারিক যন্ত্র	১৬৩	বায়ুজ নাদ	৫
বাহুলীন বীণা	২১৭	বারি ( নাগশ্বর )	৩০৬
বাংলা গজল	১৪১	বার্তিক	৬০
বাংলা ঠুমরী	১৩৫	বাহার ( রাগ )	১২২
বাংলা পদাবলী	১৪৫	বাহারি	২০৫
বাংলা টনিক সলফা সুরলিপি	২২	বাহাত্তর ঠাট	৩৫
বাঁয়া	২৭৭	বিকর্ষ ( গমক )	৪৭
বাঁশী	২২৭	বিকর্ষণ ( গমক )	৪৬
বাঁশীর দোষ গুণ	২২২	বিকৃত-স্বর	২, ২৩
বাঁশ-তৎস	৩৩৩	বিচিত্র বীণা	১২২
বাইশটি পদার বীণা	১৬৫	বিজয় গণ	৬৫
বাইশ পদার মেতার	১৬৫	বিজয়-বাঁশী	৩০২
বাউণ্ডেলের গান	১৪৮	বিজয়-শঙ্খ	৩০২
বাউলের গান	১৬৮	বিজলী তান	৪২
বাণ্ডরা	১৪৭	বিজ্ঞানী বাদী-সংযোগ	৭৫
বাচন ভঙ্গী	১১৭	বিডার	৬২
বাজের তার	৭, ২৪৭	বিটার	৬২
বাট	৭৩	বিত্তত যন্ত্র	১৬৩
বাট্টা বীণা	১২১	বিদারী	৭৮, ১২৫
বাৎসল্য রস	৮২	বিদ্যাপতি	১৩২
বাড়ুল	১৪৭	বিদ্যামালা ছন্দ	৫৬
বাদী সংযোগ	৭৫	বিন্দুমালী ছন্দ	৫৬
বাদী স্বর	৭৮	বিদ-যতি	৬৪
বান ( বাঁশী )	১১৭	বিনটের বেড়	২৮২

বিজ্ঞান	৭৮	বীর রস	৮৯
বিন্দু চিহ্ন	১০১, ১০৬	বৃত্ত চন্দ	৫৪
বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপি	৯৯	বৃন্দাবনী সারং ( রাগ )	৮৭
বিন্দু বাধনের কায়দা	১৬৬	বৃহতী চন্দ	৫৭
বিপক্ষী বীণা	২১৬	বেড	২৭১
বিবাদী সংযোগ	৭৫, ৭৬	বেড়ামপাট	৪৯
বিবাদী-স্বর	৮	বেতিয়া ঘরাণা	১২০
বিভাষা	৮২	বেদ-চক্র	৩৫
বিয়ারমের চিহ্ন	১০২, ১০৫	বেনারস-ঘরাণা	১২০, ১৩০
বিলম্বিতগতি মূর্ছনা-চিহ্ন	১০৭	বেনারসী-ঠুমরী	১৩৪
বিন্দুশথানি টোড়ি ( রাগ )	৮৭	বেগু	১৮৮, ৩১০
বিলম্বিত লয়	৬৩	বেসরা-বাগী	১১৮
বিলাবল ঠাট	২০, ৩৩, ৮৬	বেহাগ ( রাগ )	১৫৬
বিলোম ক্রম	৬৬	বেয়ারা গনের-গান	১৩৭
বিলোম মীড়	৬৭	বেহালা	৭১, ১৬৭, ২১৭
বিশালা মূর্ছনা	৩১	বৈরাগীর গান	১৪৮
বিশ্রাম-স্থল	৭৩	বোলদার ঝালা	৭৪, ১২৪
বিশ্বকৃতা	৩১	বোল ( বাগী )	৫৫
বিষম-গ্রহ	৬২	বোলান-গান	১৫৩
বিষ্ণুপদ	১৩৯	ব্রত-গান	১৫৪
বিষ্ণুপুর-ঘরাণা	১৩০	ব্রহ্মচক্র	৩৫
বিষ্ণু দিগম্বর স্বরলিপি	৯৮	ব্রহ্মতালম্	১১৬
বিদারী	৭০	ব্রহ্মামত	৯১
বিসর্জিতা কলা	৬৩	ব্র্যাকেট-চিহ্ন	১০৫
বিস্তার আলাপ	১১২		
বিক্ষেপ	৬১, ৬৮	ভবার ( রাগ )	৮৮
বিক্ষিপ্তা কলা	৬৩	ভগণ	৫৬, ৬৫
বীণা	১৬৩, ১৬৪	ভঙ্গিমা	১৩৫
বীণ-সেহতার	২৪১	ভজন-গান	১৪০
বীভৎস রস	৮৯	ভড়ক	৩১১

ভবানী	৬৫	ভৈরব ( রাগ )	৮৭, ৯০
ভয়ানক-রস	৮২	ভৈরবী ( রাগ )	৮৬
ভরত বীণা	২২১	ভোগ	১০২
ভরত-মত	২১	ভোগা ভোগ	১০২
ভাঙ	১৩৫		
ভাওয়াইয়া	১৫২	ম, মি	২৫
ভাটিয়ার	৮৮	মগণ	৫৬, ৫৫
ভাটিয়ালি	১৫০	মদ্বল	২৮২
ভাটের-গান	১৫৫	মধ্জোড	৭০
ভাণ্ডবাণ	২২২	মংসরীকৃত।	৩১
ভাতখণ্ডে স্বরলিপি	১০১	মত্তকোকিলা বীণা	২২৩
ভাহুর-গান	১৫৪	মত্তা ছন্দ	৫৬
ভাব-সঙ্গীত	১৪২	মদন্তী শ্রুতি	১৬
ভারতীয় বেহালা	১৬৭	মধুকরী	২২৮
ভাষাঙ্গ	৮১	মধুবন্তী	১৭
ভাষ্য	৮২	মধ্যনাদ	৫
ভাস	১৭৭	মধ্যলয়	৬৩, ১১০
ভিন্না	১১৮	মধ্যস্থান	২৬
ভিয়ল	২১৮	মধ্যম	২০, ২১
ভীমা	২০৮	মধ্যম গায়	৪৩
ভীমপলশ্রী ( রাগ )	৮৭, ১৪৬	মন্কা বা মেন্কা	২৪২
ভীর	৩১১	মনসার-পান	১৫৫
ভৃঙ্গঙ্গ স্বরম	৩০৪	মনোহরসাহী	১৪৫
ভুরুঙ্গ	৩১১	মনোরঞ্জনী	১৭২
ভূপাল-ঠাট	৫২	মন্দারম	২০২
ভূপালী ( রাগ )	৪৩, ১১৮	মন্দারিনী	১৪৫
ভূমিকা-স্বর	১০২	মন্দা-শ্রুতি	১৬
ভূরী	৩১১	মন্দ্র-নাদ	৫
ভেঁপু	৩১০	মন্দ্রবাহার	১৭৬
ভেরী	৩১১	মন্দ্র-: স্বর	৭২

মস্ত-স্থান	২৬	মান	৬৩, ৭৩
মস্ত-স্বর	২৯	মানকা	২০৫
মস্ত ( রবাবের তার )	২২৮	মানবা	৭২
ময়দাম	২৮১	মানবক ছন্দ	৫৭
ময়নাডাল	১৪৫	মায়ামালবগোল ঠাট	৩৮
ময়রের ডাক	৫২	মায়ুর ( কীর্তনের স্বর )	১৪৬
মরুযষ্ঠী	২৪১	মায়রী	১৭৫
মসৌদখানি গৎ	৭১	মার্গ	৬০
মহতী বীণা	১৬৫, ২২২	মার্গতাল	২, ৫২
মহানাটক বীণা	১২২	মার্গ পদ্ধতির-রূপদ	১১৫
মহা বীণা	২২৬	মার্গ-সঙ্গীত	২
মহারাত্রি ঘরাণা	২৫২	মার্গী-মূর্ছনা	৩১
মহেঞ্জোদাড়ো	২৭	মার্জনী-শ্রুতি	১৬
মহেশ গণ	৬৫	মার্দঙ্গী	৭৭
মাগন গান	১৫৩	মারবা-ঠাট	৩৭, ৮৬, ১১৮, ১২৮
মাঙ্গল্য বাঙ	১৬৩	মারোয়া ( রাগ )	৪৩
মাঝিদের গান	১৩৭	মারু-বিহাগ ( রাগ )	১২৮
মাটকি বাঙ	২৭০	মালকোষ	৪৩, ২১, ১২২
মাটির খোল	২৬৮	মাংদার গম্ভীরা	১৫৩
মাঠার কাজ	৭০	মাংলী ( রাগ )	৮৭, ১২৮
মাণ্ডী	৩০৪	মাংলগোরা ( রাগ )	৮৭
মাণ্ড-ঠাট	১৪১	মিজরাব	১৬৪
মাতান	১৪৭	মিয়ান	২২৮
মাতৃ	৭২	মিশ্র-গমক	৪৬
মাত্রা	৫২	মিশ্র ঘরাণা	১১২
মাত্রা-গণ	৬৫	মিশ্র জাতি	৬২
মাত্রা-চিহ্ন	১০১, ১০৫	মিশ্র-তান	৪৮
মাত্রার-প্রাণ	৫২	মীড	৩০, ৬৬
মাত্রামান-যন্ত্র	৫৩, ২২৪	মীডখণ্ডি-তান	৪২
মাদল	২৮২	মীড-চিহ্ন	১০১, ১০৬

মীড়-ঝালা	৭৪	মেছুনীদের-গান	১৫৫
মীন-সারেকী	১৭৭	মেটোনোম	৬৪, ২২৫
মুকুর-তরঙ্গ	৩২৬	মেঠো-বাউল	১৪৮
মুকুলিত ( গমক )	৪৬	মেঠো-ভাটিশালী	
মুক্তাশী	১০২	মেন-তার	২৪৭
মুগ	৭১	মেরু	১৮২
মুগচাল	১১০	মেরুখণ্ড	১২০
মুগড়া	১১২	মেল	৩২, ২২
মুখারী	৩২, ৮৭	মেলকর্তা	৩২
মুট্টেয় ( গমক )	৪৬	মেলভিত্তিক-স্বরলিপি	২২
মুদারার 'স'	২, ২৩	মেলাপক	৭২
মুদারার স্বরের চিহ্ন	১০১, ১০৬	মেলাপক-তুক	১১৪
মুদ্রিত ( গমক )	৪৬	মৈত্রী-মুর্ছনা	৩১
মুর্ছনা	৩০	মৈদান	২৮১
মুর্ছনা ( গমক )	৪৬	মৈথিলী-পদাবলী	১৪৬
মুর্ছনার-চিহ্ন	১০৭	মোগরা	১৮১
মুরজ	২৮২	মোচঙ্গ	৩১৩
মুরলী	২২৮, ৩১২	মোহড়া	৭১
মূলতান ( রাগ )	৮৭		য
মূলতানী-ধনাত্মী ( রাগ )	৮৭	যগণ	৬৫
মুন্সিলআসানের গান	১৫৫	যৎ তাল	১২২
মুগড়া	৭১	যতি	৫৪, ৬০, ৬৪
মুরক	৪২	যত্ৰুভট্ট	১৫৭
মুরকের-কায়দা	১৩১	যত্নের অঙ্গ	১৮১
মূর্কা	৬৭, ১০৮	যত্ন নামক বীণা	২০৬
মূলতন্ত্রী	২৩২	যত্নের স্বাস	১০৮
মুদঙ্গ	২৬৮, ২৮৫	যমল	৩০৬
মুহু নাড়	৫	যক্ষাণ্ন নৃত্য-নাট্য	২৭১
মেঘ ( রাগ )	২০	যাজ জাতীয়-বাস্ত	২১৪
মেচকল্যানী-ঠাট	৩৮	যাত্ৰিক-যত্ন	২৩৪

যান্ত্রিক-মূর্ছনা	৩০	রাগ শ্রেণী	৪২
যাম	৮৫	রাগসাগর	১৩৯
যুগল-ছেদ-চিহ্ন	১০৬	রাগের দিশা	২৩
যুগল দণ্ড-চিহ্ন		রাগের রসভাব	৮৯
যুগলবন্দ	১১৬	রাগের সংজ্ঞা	২০
যুদ্ধের-গান	১৩৬	রাজা স্বর	৮২
যোগ চিহ্ন	১০৩, ১ ৭	রাঙ্গ-যতি	৬৪
		রাণা কুস্ত	৯৮
র, রি, রু	২৫	রাবণ হাতো বা হাতা	১৩১
রক্তা শ্রুতি	১৬	রাবণ-হস্তক	২৩১
রগণ	৬৫	রাবণাস্ত্রম	১৫০
রজনী-মূর্ছনা	৩১	রাভানা	২৫০
রজনী-বীণা	২২৩, ২২৯	রাম-খরতাল	৩৩৫
রঞ্জনী-শ্রুতি	১৬	বামপুর-ঘরাণা	১৩০
রতিগণ	৬৫	বামপ্রসাদী স্বর	১৪৯
রণশৃঙ্গ বা রণশিঙা	৩১৩	বামশিঙা বা বামশৃঙ্গ	৩১০
রম্যা-শ্রুতি	১৬	রাস-তাল	৫৫
রবাব	৭৪, ১৬৪, ২২৬	রীড	৫-২
রবীন্দ্র-সঙ্গীত	১৫৭	রুবেব	২১৬
রস	২৭	রুদ্র চিহ্ন	৩৫
রস-কীর্তন	১৪৩	রুদ্রবীণা	২০৮, ২৩২
রক্ষণপটি	১২৫	রুঞ্জা	২২৫
রা, রে, রি বোল	২৫০	রূপ-আলাপ	১১১, ১১৩
রাগালাপ	৮২, ১১১, ১১৩	রেখাভিত্তিক-স্বরলিপি	২৬
রাগাঙ্ক	৮১	রেখা ও ড্যান্স মাত্রিক-স্বরলিপি	৯৯
রাগজাতি	৪১	রেখাস্বারিক-স্বরলিপি	৯৬
রাগভাবা	৯২	রেজাখানি গং	৭১
রাগমালা	১৩৯	য়েনেটি স্টাইল	১৪৫
রাগ মূর্ছনা	৩০	য়েফ্ চিহ্ন	১০৬
রাগ লক্ষণ	৭৮	য়েবেক	২১৮

রেকর মুরকের কায়দা	১৩১	লব	৫৩, ২৮১
রেকর-তান	৪২	লঘ	২
রৈখিক দণ্ডমাত্রিক-স্বরলিপি	২৮	লয়	৫২, ৬০, ৬৩
রোহিনী-শ্রুতি	১৬	লয়-বীণী	৩১৬
রোশন চৌকি	২২৭	লয় মান	৬৪
রোত্র রস	৮২	ললিত ( রাগ )	৮৮
রোত্র বীণা	২৩২	ললিত মঙ্গল ( রাগ )	১২৮
রোত্রী-শ্রুতি	১৬	লহব	৫১, ১৪৭
		লক্ষণ গীত	১০৮
লংগোট	১৮১	লঙ্কৌ ঠুমরী	১৩৫
লগ্গী	১৩৫	লঙ্কৌ-ঘরাণা	১২৭, ১৩২, ১৩৫
লগ্নদণ্ড	৬২	লাউ	১৬৬
লঘু	৬১	লাগ	১১২
লঘুছন্দ	৫৩	লাগডাট	৬২
লঘুবিরাম	৬১	নাট্যায়ন-শ্রোত স্তত্র	২২৬
লঘুমাত্রা	৫৩	লীন-গমক	৪৬, ৪৭
লংঘন মূলক-অল্পত	৭২	লীলা-কীর্তন	১৪৩
লচাঁও	১৩৫	লায়ার	১৮৪
লতার-বলয়	২৮৭	লেজাড়ি	২৪৪
লড়ক	৪২	লেটোর দল	১৬০
লড়পুথাও	৪২	লেখারা	৭১
লডলপেট	৬২	লোক-সঙ্গীত	২, ১২৩
লডি	৪২	লোফা	১৪৬
লডি-বোল	৫১, ১৩৫	লৌহজ নাদ	৫
লডি-ফিরত	৫১		
লডি-লপেট	৫১	লংকরা	১১৮
লডি-সপাট	৫১	শঙ্করাভরণ	৩২
লোহার বলয়	২৮৭	শঙ্খ	১৬৩, ২২৭
লমছড় বালা	৭৪	শঙ্খতরঙ্গ	৩২১
লপেট-তান	১২২	শততন্ত্রী বীণা	১৮৫

শব্দ	৩	সুন্ধ সারঙ্গ ( রাগ )	৮৭, ১৩৭
শম্পা	৬১	সুন্ধ স্বর	২০, ২৫, ৩৯
শয্যাগত-যতি	৬৪	সুন্ধ স্বরের চিহ্ন	১০১, ১০৬
শরোদ	১৬৪, ২৩৪	সুভঙ্করের মতে	১৬৬
শশীকলা	৫২, ৫৭	সুভ পল্লবরালী-ঠাট	৫৮
শশিবদনা পংক্তি	৫৮	সুধির-বাণ	১৬৩
শাধ	৩২০	শূন্য চিহ্ন	১০৩
শাক্ত পদাবলী	৩৪৯	শূল তাল	৫৫, ১১৬
শাঙ্খায়ন-শ্রোত সূত্র	১৮৪	শৃঙ্গ বা শিঙ্গা	৩২৩
শাণ্ডিল্য	২১৪	শৃঙ্গার রস	৮৯
শালায়নী	২৪৪	শের	১৪০
শাস্ত-গমক	৪৬	শৌক্তিকমালা ছন্দ	৫৮
শাস্ত-রস	৮৯	শ্রামাসঙ্গীত	১৪৯
শারদীয় বীণা	২৩৭	শ্রুতি	১৫
শারীরজ নাদ	৫	শ্রুতিতন্ত্রী	২৩২
শারদ	২৩৫	শ্রুতি বীণা	২৩৮
শিক্ষা	১৬৩	শ্রুতি মানাই	৩০০
শীতলার গান	১৫৫	শ্রী রাগ	৩৯, ৪৩, ৮৬, ৯০
শীর্ণ-ঢোলক	২৭৭	শ্রীখোল বাণ	১৪৬, ২৬৮
সুন্ধ 'গ' স্বর	২৪		
সুন্ধ তান	৪৮	যটপদী	৩২১
সুন্ধ 'ধ' স্বর	২৪	যটপিতাপুত্রক	৫৯
সুন্ধ 'ন' স্বর	২৪	যড়জ	২০, ২১
সুন্ধ-বরালী ঠাট	৩৯	যট শ্রুতির 'র'	২৪
সুন্ধ-মূর্ছনা	৩২	যট শ্রুতির 'ধ'	২৪
সুন্ধ-বাণী	১১৮	যাডব-জাতি	৪৩
সুন্ধমদলম	২৬৮	যাডবত	৭৯
সুন্ধ 'র' স্বর	২৪	যাডবী-মূর্ছনা	৩২
সুন্ধ রাগ	৪২	যোল পর্দার বীণা	১৬৫
সুন্ধ রাম ক্রিয়া	৩৯	যোল পর্দার মেতার	১৬৫

স		সঙ্গীত-বাণ্ডম্	
		সঙ্গীত-শ্রুতি	১৬
সংকীৰ্ত্তন	১৪২	সঙ্কিশ্ৰুতি-বাণ্ডম্	৮৪
সংখ্যা-বিজ্ঞান	৫০	সঙ্গীত-পাত	৬১
সংখ্যা সংযোগ	৬০	সঙ্গীত-গমক	৪৬
সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি	২৬, ২২	সঙ্গীত-তান	৪২
সংবাদন অলংকার	৭৫	সঙ্গীত	২, ১১, ৩৩
সংযোগ অলংকার	৭৫	সঙ্গীত-মুচ্ছনা	৩০
সংবাদী স্বর	১১, ৮২	সঙ্গীত-বীণা	২৩২
সংস্কৃত পদাবলী	১৪৫	সঙ্গীত-রাব	৩৩৫
সংযোগী	২৬১	সঙ্গীত-বাণ্ড	১৬৩
সংযায়ী	১৮২	সঙ্গীত-আলাপ	১১২
সংকীৰ্ণ-বাণ্ড	৪২	সঙ্গীত-গ্রহ	৬২
সংকীৰ্ণ-জাতি	৬২	সঙ্গীত-চিহ্ন	১০২, ১০২
সঙ্গ	৬৫	সঙ্গীত-গান	১৫১
সঙ্গীত	১	সঙ্গীত-স্থান	১০২
সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি	২০	সঙ্গীত-যতি	৬৪
সঙ্গীত-নায়ক	৭৬	সঙ্গীত-বাণ্ড	৪২
সঙ্গীত-পদ্ধতি	১	সঙ্গীত-মুচ্ছনা	৩২
সঙ্গীত-শাস্ত্র	১	সঙ্গীত-ক্লেষ্টিক-তাল	৫২
সঙ্গীত-শাস্ত্রকার	৭৭	সঙ্গীত-সংযোগ-অলংকার	৭৫
সঙ্গীতের-ছন্দ	৫৩	সঙ্গীত-বীণা	৩২৩
সঙ্গীত-ঠাটের বীণা	১৬৫	সঙ্গীত-তান	৪২
সঙ্গীত-আলাপ	১০২	সঙ্গীত-বন্ধনী	১০৫
সঙ্গীত-বরণ	১৩৩	সঙ্গীত-স্বতী ( আড়ি )	১৮২
সঙ্গীত-বর্ণ	৪০	সঙ্গীত-বীণা	
সঙ্গীত-ছন্দ	৫৮	সঙ্গীত-কলা	৬৩
সঙ্গীত-গানের-গান	১৫৫	সঙ্গীত-যতি	৬৪
সঙ্গীত-জাত-মুখ	২১	সঙ্গীত-ভিত্তিক স্বরলিপি	২৭, ২২
সঙ্গীত	৬	সঙ্গীত-বন্দিশ	১৩৭
সঙ্গীত	২৩২	সঙ্গীত-যন্ত্র	২০০

শব্দ ক্রিয়া	৩১	সুখা-মুর্ছনা	৩১
সহস্রোয়ান-ঘরাণা	১২৭	সুঢ়াল-গমক	৪৬
সহায়ক নাদ	৬	সুন্দরীয়া	১৮২
সাততারের বীণা	১৬৫	সুনাদী	৩২২
সাস্তুরা-মুর্ছনা	৩২	সুফী-গান	১৪৮
সাদরা	১৩৬	সুখুখী-মুর্ছনা	৩১, ৫৮
সাদিক আলি	১২৭	সুর ও স্বর	২৫
সাদরা-চুটকলা	১৫৬	সুর ( রবাবের তার )	২২৮
সানাই বা শানাই	৩২১	সুরচয়ন	২৫৬
সামবরালী	৩২	সুরচৈন	২৫৬
সামরিক বাগযন্ত্র	১৬৩	সুরবীণ	২৫৮
সামিক তান	৪৮	সুরভাষ	১৭৭
সারং ( রাগ )	৮৬, ১১৮	সুরবাহার	৭৪, ১৬৪, ২৫৭
সারঙ্গ বীণা	২৫২	সুরসংগ্রহ	২১০
সারঙ্গা	২৫৫	সুরশৃঙ্গার	২৫২
সারনী	২০২	সুরসঙ্গ	১৭৭
সারিকা	১৮২	সুরসৌ	১৭৭
সারিকাস্থান	১৮১	সুলট-ঝালা	৭৩
সারিকা	১৬৪, ২০০, ২৫৫	সুলু	৪২, ৬৬
সারিন্দী	২৫৫	সুল্লাঘাত	৬২
সারি-গান	১৫১	সুল্ল-নাদ	৫
সারেঙ্গী	১৬৩, ১৬৪	সেতার	৮, ১৬৩, ১৬৪
সালগহুড়	১১৪	সেতার বীণা	২৪১
সিংহের লক্ষন	১১৮	সেতু	১৮২
সিংহরব	৩২	সেনা-ঘরাণা	১১২, ১১৬, ১১৭
সিকিমাত্রার-চিহ্ন	১০৬	সেমু	৩৩২
সিকিমাত্রাঘাদ-ঘরাণা	১২৮	সোওয়ারী	৭, ১৬৮, ১৮২
সিধারখানি-ঠেকা	১২৬	সোহিনী ( রাগ )	৮৭
সিকু ( রাগ )	৮৭, ১২২	সৌবীরী-মুর্ছনা	৩১
সিকি সারেঙ্গী	২৫৪	স্তোভ-জাতীয়-সঙ্গীত	১৩৭

স্থাপনায়ুক্ত-আলাপ	১১০	স্বর-বংশী	৩২৪
স্থায়	৬৭	স্বরলিপি-ইতিহাস	২৫
স্থায়ের-স্থান	১১১	স্বরলিপি-লিখন	২৫
স্থায়ী-ভুক্ত	১১১	স্বর-শলাকা	৩৩৬
স্থায়ী-বর্ণ	৪০	স্বরশৃঙ্খার	২৫২
স্থায়ী-আলাপ	১০২	স্বরাস্তর-অরূপাত	১৩
স্থায়ীর-জোড়	১১০	স্বরাস্তর-তান	৪৮
স্থির-আন্দোলন	৭	স্বরাবর্ত	১৩৮
স্পর্শ-কুস্তন	৬৮	স্বরাজ	২১০
স্পর্শ-চিহ্ন	১০২	স্বরিত-স্বর	২৮, ২৯
স্পর্শ-গমক	৪৬	স্বরের-গমকভঙ্গী	২৬
স্পর্শ-স্বর	১০২	স্বরের-প্রকাশভঙ্গী	২৬
স্পর্শিত-স্বর	৪৫	স্বরের-গীটকারী	২৬
স্ফালন-গমক	৪৬	স্বরের-মীড	২৬
স্বজাতীয়-বাদী-সংযোগ	৭৫	স্বরের-কম্পন	২৬
স্বতঃসিক-যন্ত্র	১৬৪	স্বরের-প্রশ্বন	২৬
স্ববাদিত-তাস্বরা	২০৬	স্বরের-জাতি	২৭
স্বয়ভূ-নাদ	৬	স্বর-দণ্ডমাত্রিক-স্বরলিপি	১০০
স্বর	২, ১৬, ২০	স্বরের নীচে বিন্দুচিহ্নের অর্থ	১০৬
স্বরকম্পনের-কাজ	১২৫	স্বরের নীচে একটি সরলরেখা	
স্বরগত-শ্রুতি	১৬	চিহ্নের অর্থ	১০৬
( জীবের ) স্বরগত স্বরমিল	২৭	স্বরের নীচে দুইটি সরলরেখা	
স্বর-গাথক	২৬	চিহ্নের অর্থ	১০৬
স্বর-চালক	১২৭	স্বরের নীচে বক্ররেখা চিহ্নের অর্থ	১০৫
স্বর-চালক-যন্ত্র	১২৬	স্বর পদমাত্রিক-স্বরলিপি	১০০
স্বর-জিহ্বা	৩২৩	স্বরের-পরিচয়পত্র	২৭
স্বর-নিবন্ধনী	৭১	স্বরের-পরিবর্তন-চিহ্ন	১০৩, ১০৫, ১০৬
স্বর-মণ্ডল	১৮৮, ২৬১	স্বরের পত্নীগণ	২৭
স্বরমঞ্জরী	২৬১	স্বরের পুত্রগণ	২৭
স্বরমালিকা	২৩৮	স্বরের বংশ	২৭

স্বরের বর্ণ বা রং	৭৭	হস্-চিহ্নের অর্থ	১০০
স্বরের জন্মস্থান	২৭	হস্তশুগু-বীণা	২৫৩
স্বরের মাত্রা নির্দেশক চিহ্ন	১০২, ১০৩	হাইফেন-চিহ্নের-অর্থ	১০৫
স্বরের মাথায় এক দাঁড়ি		হাঁড়ি	১৬৭, ২৮২
চিহ্নের অর্থ	১০৩, ১০৪	হাত-ঘণ্টা	৩২২
স্বরের মাথায় দুই দাঁড়ি		হাপুর-গান	১৫৫
চিহ্নের অর্থ	১০৪	হারমোনিয়ম	৯, ৩১৬
স্বরের মাথায় বিন্দু চিহ্নের অর্থ	১০৬	হালকা-তান	৪২
স্বরের মাথায় পতাকা চিহ্নের অর্থ	১০৬	হালোর	১৮১
স্বরের-মীড়চিহ্ন	১০৫	হাসির-গান	১৫৬
স্বর-মূর্ছনা	৩০	হাস্ত-রস	৮৯
স্বরের-রেশ-চিহ্ন	১০৫	হিন্দী-সংখ্যাভিত্তিক-স্বরলিপি	৯৯
স্বরলিপির-চিহ্ন	১০১	হিন্দী-দণ্ডমাত্রিক-স্বরলিপি	৯৯
স্বরের শারীর স্তান	২৭	হিন্দুস্থানী-সংখ্যাধারিক-স্বরলিপি	১০০
স্বরের-সংখ্যা	২০, ২৩	হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত-পদ্ধতি	১
স্বরের স্থায়ীত্বের চিহ্ন	১০, ১০৩, ১০৬	হিন্দোল ( রাগ )	৯১, ১২২, ১২৮
স্বস্থানযুক্ত-আলাপ	১১০	ছন্দ-গমক	৪৬
স্রাহী	২৮১	ছন্দিত-গমক	৪৬
স্রাগিনী-চন্দ	৫৮	ছন্দ-মূর্ছনা	৩১
স্রোতোগতা-বতি	৬৭	হেচু-সারণী	২০৯
		হেজুজ্জী-ঠাট	৩৯
হংসকঙ্কনী ( রাগ )	৮৭	হেমা-মূর্ছনা	৩১
হুডুকা	২৭১	হোরী-গান	১২২
হতাহত-গমক	৪৬	হোলীর-গান	১৬৪
হস্তমং-তোড়ী ( রাগ )	৩৮		
হস্তমস্ত-মত	৯১	ক্ষণকাল	৫২
হরিকাস্তোজী-ঠাট	৩৮	ক্ষতি-শ্রুতি	১৬
হরিদাস-সম্প্রদায়	১২৩	ক্ষুদ্র-নাদ	৫
হরিনায়কের মতে	১৬৬	ক্ষুদ্র-ঘটিকা	৩৩০
হারিনাখা-মূর্ছনা	৩১	ক্ষোণী-বীণা	১২১
		ক্ষোভিনী-শ্রুতি	১৬

গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ

<b>A</b>		Button	২২০
A String	২২১	Bugle	৩১৪
A-Tabal	২৮০	<b>C</b>	
Accent	২২	Calamus	৩০১
Accompanying Instruments	১৬৪	Chalumeau	৩০২
Aerophones	১৬৩	Chinrest	২২০
Acute	২২	Chordophones	১৬৩
Adaptar	১২৭	Circumflex	২২
Adjuster	২২০	Clarinet	৩০২
Asiatic Researches Vol III	২৫	Classical	২
Authority	২২	Combination	৫০
<b>B</b>		Composer	২৬
Bagpipe	৩০৫	Concave type bow	২১২
Balalika	২০৩	Concord	৭৫
Bar	১০৭	Convex-type bow	২১২
Barney	২৫	Chromatic Pitch-Pipe	৭৫
Base	৬	Cymbals	৩৩২
Base Bar	১৮১	<b>D</b>	
Bass Clarinet	৩০৩	D-String	২২১
Bass Drum	২০৪	Dervi flute	৩১০
Beats	৭	Diatonic Pithagorian Scale	১৩
Belly	২১২	Drawingroom Instruments	১৬৩
Bow	২২১	Drum	১৮১
Bowhead	২২১	<b>E</b>	
Bow-hair	২২১	E-String	২২১
Bow-stick	২২১	Electrophones	১৬৪
Bridge	২২০	Epigraphy-Department	২৫
		Extension-nut	১২৭

<b>F</b>		<b>I</b>	
Finger Board	१८१	Idiophones	१७९
First Bracket	१०१	Incitement	१२६
Flageolet	७२४	Initial Starting Point	७
Fipple Flute	७२४	Instruments used in war	१७७
Flute of Bamboo	१८८	Intensity of sound	६
Folk music	१४२	Inversely proportional	८
Folk songs	१६८	<b>J</b>	
Formula	६०	Just Intonation	८
Frequency	८	<b>K</b>	
Fret	१८२, १२७	Key	१८१, २२१
Frock	२२१	Kithara	१२४
<b>G</b>		<b>L</b>	
G-String		Length	८
(Aluminium Coated)	२२१	Ligature	७०७
Gauge	२०२	Lower pitch	७
Glass Dhole	२११	Lyre	१८४
Gong	७७२	<b>M</b>	
Grave	२२	Main String	१०
Guitar	१२४	Melody	२७
Guard Plate	१२६	Membronophones	१७४
<b>H</b>		Metronome	२२४
Harmonics Overtones	१	Mouthpiece	७०७
Harmonium	७१७	Mouth Cap	७०७
Harmony chord	१६	Mystic	१२४
Hawaiian Guitar	१२७	<b>N</b>	
Higher Pitch	७	Neck Bridge	१८२
Horn	७०७	Note	२०
Hyrogliphick	२०२	Nut	२२१

<b>O</b>		<b>S</b>	
Oboe	৩১৩	Sambuka	১২০
Ottu	৩০০	Scale	১৭
Out door Instruments	১৬৩	Scroll	২২০
Overtone	৬	Screw	২২১
		Second Bracket	১০৭
		Sides	১২৫
<b>P</b>		Sine	১৭১
Peg	১৮২, ২২১	Slider	১২৭
Pegbox	১২৬, ২২০	Soloperforming	
Permutation & Combination	৫০	Instruments	১৬৪
Piano	১৮৮	Sound Box	১৭৭
Piano Steel String	২৪৭	Sound Hole	১২৫, ২১২
Pick	১২৭	Sound Post	১৮১
Pitch	৬, ৮, ১৭২	Staff Notation	৯২
Placing	২৪৬	Strings	১২৬
Plate	২৩৫	Style	১, ১১৭, ১৫২
Plectrum	২০৩	Syllabo-phonetic-System	২৫
Pluritone	৭৫	Sympathetic Vibrations	৭
Pokak	২৫		
Position of rest	৬	<b>T</b>	
Position of Mark	১২৬	Tabula	২৮০
Practical	১	Tail piece	১৮১, ২২০
Primitive Music	১৪২	Tamburine	২০৪
Psychic	১৪২	Tamburo	২০৪
		Theory	১
<b>R</b>		Theoretical	১
Raised Nut (metal)	১২৬	Thickness	৮
Ribs	১২৫	Tension	৮
Rural Instruments	১৬৩	Testido	১৮৫

Tonic Solfa	२२		
Tonic Scale	२७		
Trigonon	१८१		
Tuning Fork	७७७		
		<b>V</b>	
Vibration	२४८		
Violin	२२१		
Violin Cello	११७		
Volume	२७		
			<b>W</b>
		Whitney's Grammar	२२
		Weight	८
		Wind chamber	७०१
			<b>Z</b>
		Zaring Note	२०६
		Zylophone	७७४

### Bibliography

Arab Music & Musical Instrument	S. Danialls
Asiatic Research Journal	Asiatic Society
Bibliography of Musical Instruments and Archaeology	K, Schlesinger
Evolution of the Classic Guitar	Wilfrid.
Folk Dances of Bengal	Gurusaday Dutt.
India in Greece	Mr. Pokak.
Indian Music	Sahinda.
Introduction to the Study of Bharatiya Sangit Sastra	H. Krishnamacharyya
Indian Folk Musical Instruments	Kothari. S. N. Ac.
	N. Delhi
Introduction to the Study of Musical scales	Alain Danielou
History of Music	Charles Burney
History of Indian Music	Sambomoorthy

History of Indian Musical Instruments	Curt Sachs
History of Arab Music	Farmer
Journal of Music Academy	Madras
Music of India	N. Augustus Willard
Music of India	Rev. Popley.
Music of Hindusthan	Fox Strangway
Music through the Ages	Elizabeth E. Rogers
Music Instruments of India	S. Krishnaswamy.
Music Instruments through the Ages	Iris Urwin (Translator) by Anthony Baines.
Music Instruments and their History	Karl Geringer
Musical Instruments	A. J. Hipkins
Laya Vadyas	P. Sambamoorthy
New Oxford History of Music	Egon Wells.
Oxford Companion of Music	Percy A. Scholes
Ragas & Raginees	O C. Ganguly.
Short Notices on Hindu Musical Instruments	Raja Sir Sourindra Mohan Tagore.
Studies in Oriental Musical Instruments	Henry George Farmer,
Sruti Vadyas	P. Sambamoorthy
The Story of Indian Music & its Instruments	Ethel Rosenthal
The Story of Musical Instruments	H. W. Schwartz.
The story of Indian Music	O. Gaswami
The eight principal Ragas of the Hindus	Raja Sir Sourindra Mohan Tagore.
The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan	By Capt. C. R. Day (Oxfordshire Light Infantry)
To whom dhrupad owes its origin.	Dagar S. S. Mandir.

Universal History of Music	Tagore
Dictionary of Music & Musicians	Grove's
Dictionary of South Indian Music & Musicians	P. Sambomoorthy
Directory of the World Music and the Musicians Guide	1968.
Encycloepadia Britannica	1973. Edition.
Encycloepadia Americana	1966 Int. Edition.
Encycloepadia of the Violin	Bachmann.
Harvard Dictionary of Music	1970. 2nd Edition.
International Cycloepadia of Music & Musicians	9th Edition

## গ্রন্থ-পঞ্জী

আন্তরঙ্গনীতব

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত

এসরার মুকুল

এসরার তরঙ্গ

কীর্তন ( বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ)

কীর্তন গীতি প্রবেশিকা

গীতসুত্রসার

তবলার কথা

তবলাবিজ্ঞান ও বাণী

দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর

প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিন্তা

বাংলা ছন্দমালা

বাংলার লোকসাহিত্য ( ৩য় খণ্ড )

ঐক্যতান স্বরলিপি

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

ভক্তি রত্নাকর

ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা

মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা

যন্ত্রকোষ

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা

রাগরূপায়ণ

হিন্দুসঙ্গীত

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ( ১ম ও ২য় খণ্ড )

সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা

সঙ্গীত চন্দ্রিকা

সঙ্গীতসার

তত্ত্ববোধিনী

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

” ”

সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুবোধ নন্দী

শ্রীরবিন্দ্রকুমার বসু

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি

শ্রীশান্ততোষ ভট্টাচার্য

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর নরহরি দাস

ডাঃ বিমল রায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

রাজা স্মার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

” ” ” ”

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

রাজা স্মার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

সম্পাদক—শ্রীদিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দী

সঙ্গীতজ্ঞকে স্মরণ	বিলায়েৎ হুসেন
সঙ্গীতসুদর্শন	পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য
হামারে সঙ্গীতরত্ন	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি	পণ্ডিত বিশ্বনারায়ণ ভাতখণ্ডে
হিন্দী-বাংলা অভিধান	শ্রীগোপালচন্দ্র বেণ্যাস্ত্যাজী
*হিন্দী শব্দ-সাগর ( অভিধান )	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

উর্দু

হিন্দী-উর্দু-শব্দকোষ	মহম্মদ মুস্তাফা খান
আইন-ই-আকবরী	আবুল ফজল
তুহাফতুল-হিন্দু	মীর্জা খাঁ
নগমাতে আসরফী	মহম্মদ রজ্জা
মাদেনুল মুসীকি	করম ইমাম
কিতাব-অল-কাফী ফিল-মিউজিক (আরবী)	হুসেন ইবন জাইলা

সংস্কৃত

চতুর্দশী প্রবেশিকা	ভেক্টামথী
নারদীয় শিক্ষা	নারদ মুনি
পঞ্চমসার সংহিতা	নারদ মুনি
পাণিনীয় শিক্ষা	পাণিনি মুনি
বৃহদেনী	মতঙ্গ মুনি
নাট্যশাস্ত্র	ভরত মুনি
মানসোজাস	সোমেশ্বর
যাজ্ঞবল্কীয় শিক্ষা	যাজ্ঞবল্ক্য মুনি
রাগতরঙ্গিনী	লোচন কবি
রাগবিবোধ	সোমনাথ
রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসার	মহারাজা প্রতাপ সিংহ
সঙ্গীত সময়সার	পার্শ্বদেব
সঙ্গীতরাজ	মহারাণা কুম্ভ

সঙ্গীতচূড়ামণি	কবিচক্রবর্তী জগদেকমল্ল
সঙ্গীত দামোদর	পণ্ডিত শুভকর
সঙ্গীত পাদ্রিজাত	পণ্ডিত অহোবল
সঙ্গীত মকরন্দ	নারদ
সঙ্গীত রত্নাকর	শঙ্করদেব ( এ্যাডেয়ার সংস্করণ )
সঙ্গীতোপনিষদ্ সারোৎকার	সুধাকলশ
হৃদয়-কোঁতুক	হৃদয়নারায়ণ
হৃদয়-প্রকাশ	”
ভরত-ভাষ্যম্	নাগ্গদেব
স্বরমেল কলানিধি	রামামাত্য
পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (English Translation)	পণ্ডিত কালাণ্ডে
বীণা প্রপাঠক	পরমেশ্বর
শৃঙ্গার-সাবিত্রী	পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক
তৌর্য্যাত্মিক	সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
বালক	” শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী
ভারতী	” শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুর ও সঙ্গীত ( প্রবন্ধ )	” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঙ্গীত-চিন্তা ( প্রবন্ধ )	” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরছন্দা ( বাংলা )	” শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত-কোষ	” শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

বহু সঙ্গীতগ্রন্থ পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহে থাকলেও এবং বহু সঙ্গীত গ্রন্থের পরিচয় জানা থাকলেও সকল গ্রন্থের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কেবলমাত্র এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থ সংকলনের সময় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের নামই এই গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পেয়েছে।